প্রণেতা

মৌলবী আজাহার আলী

প্রকাশক—

হাজী আফাজদ্দিন আহাম্মদ্

৩৩৭।২ নং অপার চীৎপুর রোড,

কলিকাতা।

মূল্য ২।॰ টাকা মাত্র।

হে আল্লাহ জল্লশানহু !

আমরা ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে আদর্শ
মহাপুরুষ, আধ্যাত্মিক বিদ্যার পূর্ণ খনি,
শরিয়ত ও তরিকতের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক
অদ্বিতীয় মহাবীর হজরত আলী করমুল্লাহ্
ওয়াজহুর এই জীবন-চরিত লিখিয়া প্রকাশ
করিলাম। গ্রন্থকার, গ্রন্থ-সংশোধক ও পুনঃ
লেখক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী এবং তাঁহার
সর্ব্ব প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তার প্রতি করুণা-বারি বর্ষণ
কর। উপরোক্ত মহাপুরুষ ও তাঁহার পবিত্র
বংশধরগণের দোওয়ায় ইহাদের প্রতি
তোমার অনন্ত রহমৎ নাজেল কর।
এই গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গীয় মোসলমান
সমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার
সাধিত হইলেও ইহাদের
পরিশ্রম, অর্থব্যয় প্রভৃতি
সার্থক হইল বলিয়া
মনে করা হইবে।

মুখবন্ধ।

যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিজগতের অধীশ্বর,—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি ত্রিবিধ অবস্থার নিয়ন্তা,—যিনি জীবকুলের হর্ত্তা, কর্ত্তা, পাতা, বিধাতা, —যিনি এই বিশ্বজগতকে নদ, নদী, সাগর, মহাসাগর, প্রান্তর, পর্ব্বত, বৃক্ষ, ফল ও ফুল সুশোভিত করিয়া, নিজ সৃষ্টি-কৌশলের অপূর্ব্ব ও অত্যাশ্চর্য্য শক্তি এবং মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন,—কত অসংখ্য ভূচর, খেচর, জলচর, উভচর প্রাণী ও মানবকুলে কত পয়গম্বর, পীর, অলি, গওছ, কোতব, জ্ঞানী, মানী, ঋষি, মহর্ষি রাজা, মহারাজা, রূপবান্, জ্ঞানবান, বীর্য্যবান্, কত মহাত্মা পুণ্যাত্মার সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার দয়াময় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন,—নভোমণ্ডলে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপ-গ্রহ ইত্যাদি কত অসংখ্য অসংখ্য জোতির্ম্ময় পদার্থের সৃষ্টি করিয়া ধরণীতে অজস্রভাবে দয়ার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন—সেই সর্ব্বাধীশ্বর বিশ্বজনক বিশ্বকর্ত্তার নামোচ্চারণ করিয়া ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিরূপ ভেলক অবলম্বনে বীর-কেশরী মহর্ষি হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহুর জীবন-চরিতরূপ মহার্ণব মহাগ্রন্থ পার হইবার আশায় অবতীর্ণ হইয়াছি। আজি পর্য্যন্ত উক্ত মহাত্মার জীবনী বঙ্গভাষায় প্রকাশিত না হওয়ায় জন-সাধারণ তাঁহার আমূল বৃত্তান্ত ও পবিত্র অবস্থা অবগত হইতে পারেন নাই। সুতরাং ভক্তি-পরায়ণ মুসলমান ভ্রাতাগণ এক অভাবনীয় অভাব অনুভব করিতেছিলেন, সেই অভাব দূরীকরণ মানসে ও কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে মৌলবী আজাহার আলী দ্বারা উর্দ্দু গ্রন্থ হইতে বঙ্গানুবাদ করাইয়া, এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে ইহা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইলেই সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বিনীত—

প্রকাশক।

দ্রষ্টব্য।

এই পুস্তক পাঠকালে যে যে স্থানে পয়গম্বর ও সাহাবাগণের এবং ধর্ম্মাত্মা এমাম ও আলেমগণের নাম উচ্চারণ করিবেন, সেই সকল স্থানে নিম্নলিখিত দরুদ ও শব্দ সমূহ পড়িবেন।

(দঃ বা সালঃ) দরুদ—সাল্লাল্লাহ আলায়হে ও সাল্লাম।

(রাঃ বা রাজিঃ) রাজি আল্লাহো আন্‌হু (স্ত্রীলোক হইলে আন্‌হা)

(কঃ বা কঃ-ওঃ) করমুল্লাহে ওজহু।

(আঃ বা আলাঃ) আলায়হেস্ সালাম।

এই পুস্তক-প্রণয়নকালে পরমসুহৃদ বৰ্দ্ধমান আনখোনা নিবাসী সৈয়দ মহসিন আলী বিবিধ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। প্রথম পুস্তক প্রকাশ কালে প্রায় সকলেরই নানাবিধ ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, সেই জন্য পাঠকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, এই সকল ভুল-ভ্রান্তি জন্য কেহ জানাইলে আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব।

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দয়াময় আল্লাহতালার কৃপায় পাঠকবৃন্দের আগ্রহে মির এণ্ড কোং হইতে হজরত আলীর (রাজিঃ) জীবনী নামক পুস্তকের কপিরাইট্ উচিত মূল্যে খরিদ করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ১ম সংস্করণ অপেক্ষা ২য় সংস্করণে কাগজ, কালি, ছাপা উৎকৃষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত, সংশোধিত ও কলেবর বৃদ্ধি করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করি নাই।

আফাজদ্দিন আহাম্মদ
৩৩৭।২ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর জীবনী যাহাতে খাঁটি ইতিহাস সঙ্গত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয় মোসলমানগণের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যক, জাতীয়, মোসলমান বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, বহু সংবাদ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও বহু গ্রন্থ-প্রণেতা মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের হস্তে ইহার সংশোধন-ভার অর্পণ করিয়াছিলাম; তিনি বহু উর্দ্দু ইতিহাসের সাহায্যে গ্রন্থখানিকে নূতন আকারে গঠিত করিয়াছেন। মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন, খলিফাতুল মোস্‌লেমিন ৪র্থ খোনকার রাশেদিন হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর খেলাফতের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার শাহাদৎ কালের বিবরণ, তাঁহার সহধর্ম্মিণীগণ ও পুত্রকন্যাগণের পরিচয়, তাঁহার সদ্‌গুণ-রাজি, আওছাফ্‌ প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এজন্য পুস্তকের আকারও বৃহৎ হইয়াছে; ২৭৫ পৃষ্ঠার স্থলে ৬৫৬ পৃষ্ঠা হইয়াছে, তজ্জন্য মূল্য ১॥০ স্থলে ২॥০ আড়াই টাকা করা হইল।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক—
আফাজদ্দিন আহাম্মদ
৩৩৭।২ নং অপার চীৎপুররোড, কলিকাতা।

পুস্তক-সংশোধকের আত্ম-নিবেদন।

কলিকাতার বিখ্যাত সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী জনাব হাজী মুন্‌শী আফাজুদ্দীন আহাম্মদ সাহেব ও তদীয় সুযোগ্য ম্যানেজার পরম স্নেহাস্পদ মুন্‌শী বজলোর রহমান সাহেব, মৌলবী আজহার আলী প্রণীত "মহাবীর হজরত আলীর জীবন-চরিত" নামক গ্রন্থখানি আমাকে সংশোধন করিবার জন্য প্রদান করেন। আমি পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহা কোনও বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত হয় নাই; অনৈতিহাসিক বাজে উর্দ্দু কেতাব অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। আবার এমন সকল কথা লেখা হইয়াছে, যাহা অতি অন্যায় ও অসঙ্গত। কোনও কোনও স্থান এমন দূষণীয়, যাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে ইমানে খলল হইবার আশঙ্কা। এজন্য আমি বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত ইতিহাস অবলম্বনে পুস্তকখানি সংশোধনে প্রবৃত্ত হই। পুস্তকের মধ্যে মধ্যে কতক বিষয় অব্যাহত রাখিয়া অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত অংশই বাদ দেওয়া হইয়াছে। যেটুকু রাখা হইয়াছে. তাহাতেও বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব। ৪র্থ খলিফা মহামান্য হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর জীবন-চরিত বাজে কথায় পূর্ণ থাকা উচিত নহে। হজরত আলী (রাজিঃ), হজরত রছুলে মকবুল মোহাম্মদ মোস্তাফা আহ্‌মদ মোজতাবা

ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওসাল্লমের সঙ্গে যে সকল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, সেই সকল যুদ্ধের বিবরণ ইহাতে বিস্তৃতরূপে দেওয়া হইল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী রসুল-নন্দিনী স্বর্গের মহারাজ্ঞী হজরত ফাতেমা জোহরা রাজি আল্লাহ আন্হার বিবাহিত জীবনের এবং পরলোক গমনের বিবরণও অনেকটা দেওয়া হইয়াছে। তৎপর মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন, খলিফাতুল-মুস্লেমিন হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর খেলাফতের বিবরণ "তারিখে ইস্লাম" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস হইতে বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ভিত্তিহীন ও প্রমাণহীন রওয়ায়েত একটীও দেওয়া হয় নাই।

প্রুফ্-রীডারের দোষে পুস্তকে কতক ভুল-ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। বলিতে গেলে ইহা একখানি সম্পূর্ণ অভিনব পুস্তক হইয়াছে। এজন্য পুস্তকের আকারও পূর্ব্বাপেক্ষা আড়াই গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। সত্য ও প্রামাণ্য ইতিহাসের গৌরব রক্ষার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে।

কড়েয়া, কলিকাতা।	খাদেমে কওম—
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল।	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ।

হজরত আলীর জীবনী।

সূচী-পত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয় | পৃষ্ঠা।

মহাবীর

হজরত আলীর জীবনী

(প্রথম খণ্ড)

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ্‌তায়ালা জল্লশানহু স্বীয় দয়া ও প্রেমে বিভোর হইয়া, এক অনুপম অদ্বিতীয় পরম পবিত্র জ্যোতিঃ সৃষ্টি করতঃ, তাহা হইতে এক পরম ভক্ত ও অনুরক্ত সাধক শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় মহানুভব মহাপুরুষের সৃষ্টি করেন এবং আহ্‌মদ বা মোহাম্মদ এই প্রেমময় নামে অভিহিত করিয়া, সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের নেতারূপে এই ভবধামে প্রেরণ করেন। যাঁহার মধুময় উপদেশালোকে কোটী কোটী পাপীর অন্তরের পাপ-তিমির দূরীভূত হইয়া ভীষণ নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অক্ষয় স্বর্গ-সুখভোগ করিতেছেন—যাঁহার ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় অসংখ্য অসংখ্য পাপক্লিষ্ট ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরলোকে অশেষ সুখ-শান্তি ভোগ করিতেছেন—যে ধর্ম্মের পূর্ণ জ্যোতিঃ অতি দীর্ঘ মহা-প্রলয় কাল ব্যাপিয়া আলোকিত ও সমুন্নত রহিবে—সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ভব-ভয়-

ত্রাণকর্ত্তা, মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ), সত্যপথ-ভ্রষ্ট পথিকের পথ-প্রদর্শকের ন্যায় প্রকৃত ইস্‌লামীয় ধর্ম্মের উজ্জ্বল সুস্নিগ্ধ আলোক হস্তে লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরম প্রিয়-বন্ধু চারিজন প্রধান আছহাব মহাপুরুষ কায়ার ছায়ার ন্যায় সতত তাঁহার ধর্ম্ম ও মতানুসরণ করিয়া, ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তায় ব্রতী থাকিতেন। উক্ত মহাত্মা চারিজন এই ঃ—(১) হজরত আবুবক্কর সিদ্দিক (রাজিঃ), (২) ওমর ফারুক (রাজিঃ), (৩) ওছমান গণি জেন্নূরায়েন ও (৪) আলী করমুল্লাহ্ অজহু এই মহাগৌরব-সূচক নামে অভিহিত। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) ইস্‌লাম ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া ও সমগ্র জগৎ পূর্ণচন্দ্রালোকের ন্যায় ইস্‌লাম ধর্ম্মালোকে আলোকিত করিয়া ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) পদ প্রাপ্ত হন, এবং দুই বৎসর তিন মাস সাত দিন নিরাপদে প্রতিনিধিত্ব (খলিফার) পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, কঠিন রোগশয্যায় শায়িত হন। পরিশেষে তিনি জীবনাশায় হতাশ হইয়া, অন্তিমকাল সমুপস্থিত বুঝিয়া, নিজ পদে হজরত ওমর (রাজিঃ)কে বরিত করেন, এবং পঞ্চদিবস মাত্র শয্যাগত থাকিয়া, হিজরীর একাদশ সালে, জমাদিওল আখের মাসের তেইশে সোমবার দিবসে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পবিত্র দেহ হজরতের সমাধি-পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়। তৎপর হজরত ওমর প্রতিনিধিত্ব (খলিফা) পদ

গ্রহণান্তর দশ বৎসর ছয় মাস চারিদিন ধর্ম্মপ্রচার ও রাজ্যশাসন করিয়া হিজরির তেইশ সালের জেলহজ্জ মাসের প্রথম দিন শনিবার অপরাহ্ণ সময়ে ৬৩ বৎসর বয়সে ফিরোজ নামক জনৈক ক্রীতদাসের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া স্বর্গবাসী হন।

হজরত ওমর (রাজিঃ) পরলোকগত হইলে, হজরত ওছমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ) হিজরির চব্বিশ সালের মহরম মাসের প্রথম দিবসে প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নানা প্রকার সদানুষ্ঠান সুকীর্ত্তিতে সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই মোস্‌লেম-কুল শিরোমণি, ধর্ম্মরাজ্যের উজ্জ্বলতম রত্ন পবিত্র কোর্‌-আন শরীফের বাক্যাবলী (আয়েত) সমুহ সংগ্রহ করতঃ পুস্তিকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া চিরস্মরণীয় ও অমরত্ব লাভ করিয়াগিয়াছেন। তদনন্তর এগার বৎসর এগার মাস আঠার দিন সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিয়া, একাশি বৎসর বয়ক্রমে বিপ্লববাদিগণের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর চতুর্থ প্রতিনিধি হজরত আলী (কঃ-অঃ) ধর্ম্মরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারই পবিত্র জীবনী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল।

হজরত আলীর পিতৃপুরুষগণের নাম।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) বলিয়াছেন,—আমি আর হজরত আদমের (আঃ) জন্মগ্রহণের চতুর্দ্দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে খোদাতালার সৃষ্ট এক পবিত্র নূর (জ্যোতিঃ) হইতে সৃষ্ট হইয়াছিলাম। খোদা আদিপুরুষ আদমের (আঃ) যখন দেহ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে পবিত্র আত্মা স্থাপন করিয়া জীবন দান করেন, সেই সময় তাঁহার ললাট দেশে ঐ জ্যোতিঃটী স্থাপিত হয়; ক্রমশঃ ঐ জ্যোতিঃ ১ হজরত আদম হইতে তৎপুত্র ২ হজরত শিশ্; পরে হজরত শিশের পুত্র নমুস ৩, নমুসের পুত্র কিনান ৪, মোহালাইন নবী (আঃ) ৫, উহার পুত্র বারোদ ৬, আখনুথ ৭, মোনসোলখ ৮, নোহ্ (আঃ) ৯, সাম ১০, ফাখসাদ ১১, ছালেখ ১২, জাবের ১৩, ফানেস ১৪, ছারাগ ১৫, বাউ ১৬, নাজর ১৭, আজর (মূর্ত্তি-পূজক) ১৮, হজরত ইব্রাহিম (পরম খোদাভক্ত সত্য ধর্ম্ম প্রচারক) ১৯, হজরত ইস্মাইল (আঃ) ২০ (ইনি আল্লাহতালার নিকট কোরবাণী হইতে গিয়াছিলেন), ইঁহার পুত্র কেদর ২১, আওয়াম ২২, আউস ২৩, মুর ২৪, শামিহ ২৫, রোজা ২৬, নাজিব ২৭, মোসের ২৮, ইয়াহাম ২৯, আফ্তাদ ৩০, ইসা ৩১, হাস্সান ৩২, আন্ফা ৩৩, আরোভা ৩৪, বালচি ৩৫, বাহরি ৩৬, হারি ৩৭, ইসন ৩৮, হোমরান ৩৯, আলুরোয়া ৪০, ওবেদ ৪১, আনাফ্ ৪২, আসকি ৪৩, মাহি ৪৪, নাখুর ৪৫, ফাজিম ৪৬, কালেহ ৪৭, বাদলান ৪৮, ইয়ালদারুম ৪৯, হেরা

৫০, নাসিল ৫১, আবিলায়াম ৫২, মাতাসায়েল ৫৩, বারু ৫৪, আউস ৫৫, সালামন ৫৬, আল্-হোমায়সা ৫৭, আদাদ ৫৮, আদনান ৫৯, মোয়াদ ৬০, হামাল ৬১, নাবেত ৬২, সালমন ৬৩, আল্হোমায়সা ৬৪, এমিসায়া ৬৫, আদাদ ৬৬, আদ ৬৭, আদনান ৬৮,মোয়াদ ৬৯,নজর ৭০, মোদের ৭১, ইলিয়াস ৭২, মদিরকা ৭৩, খে'জায়মা ৭৪, কানানা ৭৫, আল্ নজর ৭৬, মালেক ৭৭, ফহর বা কোরেশ ৭৮, (ইহা হইতে কোরেশ বংশ), গালেব ৭৯, লাভি ৮০, কায়ার ৮১, মোররা ৮২, কেলাব ৮৩, কোসাই ৮৪, আব্দে-মনাফ ৮৫, হাশেম ৮৬, (ইঁহা হইতে বনি হাশেম বা হাশেমি বংশ), আবদুল মেত্তালের ৮৭, এইরূপে বংশ পরম্পরায় ঐ জ্যোতিঃটী নিকটে নীত হইয়া পরম ভাক্তিভাজন ওয়ালেদ মাজেদ আবদুল্লার ললাটে স্থাপিত হয় ও আমি তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করি।

অনাদিকারণ অখিল পৃথিবীপতি আল্লাহতালার আদেশ ও ইচ্ছায় শেষে নবীপদে বরিত হইয়া সনাতন ইস্লাম ধর্ম্ম প্রাচারার্থে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইলাম। বীরাগ্রগণ্য অমিত-তেজাঃ (মহাত্মা) আলী (কঃ অঃ) ধর্ম্ম প্রচারে সতত আমার সহায় ও সানুকূল থাকিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অসীম ও অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক বিধর্ম্মিগণকে পরাস্ত করিয়া ইস্লাম ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন।

হজরত আলীর জন্ম-বিবরণ।

হজরত আলীর (রাজিঃ) মাতা হজরত ফাতেমা বিন্তে আসদ, বিন্ হাশেম, বিন্ আবদে মনাফ্। ইঁনিই প্রথম হাশেমী নারী—যাঁহার গর্ভে খাঁটি হাশেমী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ ইঁহার পিতৃকুল ও স্বামীকুল উভয়কুলই হাশেমী। ইনি মদীনা মনুওরায় পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ৭০ বৎসর বয়সে, ৪র্থ হিজরীতে মদীনা মনুওরায় ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

হজরত আলীর (রাজিঃ) পিতার নাম আব্‌দে মনাফ্ (আবুতালেব), তাঁহার পিতা আবদুল মোত্তালেব, তাঁহার পিতা হাশেম, তাহার পিতা আবদে মনাফ্। আবুতালেব তাঁহার কুনিয়াত নাম। আবু তালেব হজরত রছুলোল্লার হাকিকী চাচ্চা (পিতার সহোদর ভ্রাতা) ছিলেন। যখন হজরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালেব পরলোক গমন করেন, তাহার পর হইতে হজরতের প্রতিপালনের ভার আবুতালেবই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত তাঁহার এই পিতৃব্যকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন।

হজরত আলীর ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ :—

আবদে মনাফ্ আবুতালেবের চারি পুত্র ও দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম তালেব। তালেব বদরের যুদ্ধে কোরেশ মোশরেক-

গণের পক্ষাবলম্বী হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, সেই যুদ্ধেই তাহার মৃত্যু হয়। তালেবের দশ বৎসরের ছোট হজরত আকিল (রাজিঃ). তাঁহার দশ বৎসরের ছোট হজরত জাফর তইয়্যার (রাজিঃ) তাঁহার দশ বৎসরের ছোট অর্থাৎ সর্ব্ব কনিষ্ঠ হজরত আলী (রাজিঃ)। শেষোক্ত তিন ভ্রাতাই মুসলমান ছিলেন। কন্যাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম ওম্মে হানি ও দ্বিতীয়া অর্থাৎ কনিষ্ঠার নাম জমানাঃ; ওম্মে হানি ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; জমানাঃ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

হজরত আলীর নাম জাহেলিয়ত অবস্থায় (ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে) ও পরে, উভয় সময়ই আলী (রাজিঃ) ছিল। তাঁহার কুনিয়াত আবুল হাসান, আবু তোরাব, আবুল আম্মা, আবুল কছম ও আবু রায়হান ছিল। আবুল রায়হানের অর্থ দুই ফুলের বাপ, অর্থাৎ হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ) এবং হজরত এমাম হোসায়েন (রাজিঃ)এর পিতা।

হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) হজরত আলী (কঃ-অঃ) কে কি জন্য আবু তোরাব উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন, তাহা শুনুন। এ সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন রেওয়ায়েত আছে। এবনে এছহাক (রহঃ) হজরত এমার বিন-এয়াছব (রাজিঃ) হইতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়ছেন যে, আমি (এমার-বিন্ এয়াছব [রাজিঃ]) এবং হজরত আলী (কঃ-অঃ) আসিরের গয্ওয়ায় (জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধে), হজরত রছুলে করিম (ছালঃ) এর সঙ্গে একস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলাম; তখন মদলজ

সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক এক চশ্‌মায় (নির্ঝরিণী বা ঝরণায়) কাজ করিতে ছিল। হজরত আলী (কঃ-অঃ) আমাকে বলিলেন, আইস, আমরা দেখি, এই সকল লোকেরা কিরূপে চশ্‌মায় কাজ করিতেছে। তদনুসারে আমরা উভয়ে চশ্‌মার নিকট উপস্থিত হইয়া লোকেরা কি ভাবে কাজ করে, তাহার তামাশা দেখিতে লাগিলাম। কিছুকালের মধ্যেই আমরা নিদ্রা-কৃষ্ট হইয়া পড়িলাম; এবং ঝরণার অদূরবর্ত্তী ভূশয্যায় একটী খেজুরের বাগানে—যেখানে ছোট ছোট খেজুরের গাছ সকল ছিল তাহার ছায়ায় শুইয়া পড়িলাম। বাতাস বহিতেছিল, তাহাতে বালুকারাশি উড়িয়া আমাদিগের বস্ত্রাদি ঢাকিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে হজরত রছুলে করিম (ছালঃ) সেখানে পৌঁছিলেন, আমাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া তিনি স্বীয় পবিত্র পদদ্বারা নাড়িয়া আমাদিগকে জাগাইলেন। যখন আমরা নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলাম, তখন হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) হজরত আলী (কঃ-অঃ) কে সম্বোধন করিয়া ফরমাইলেন, "হে আবু তোরাব (মৃত্তিকার পিতা)! আমি তোমাকে এমন দুই ব্যক্তির পাত্তা (সন্ধান) দিতেছি, যাহারা দুনিয়ার সমস্ত লোকের মধ্যে বদ্‌বখ্‌ত (হতভাগ্য)। তন্মধ্যে একজন আহমির ছমুদ—যে ব্যাক্তি (হজরত) ছালেহ্ (নবী)এর উষ্ট্রীকে হত্যা করিয়াছিল; দ্বিতীয় ব্যক্তি যে তোমাকে শহিদ (হত্যা) করিবে।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একদা হজরত রছুলে করিম (ছালঃ) হজরত ফাতেমা রাজি আল্লাহআন্‌হার গৃহে তশরিফ

আনিলেন। তিনি স্বীয় দুহিতা-রত্নের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আলী (কঃ-অঃ) কোথায় ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমার উপর রাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। হজরত তখন সেখান হইতে উঠিয়া হজরত আলীর সন্ধান করিতে করিতে মস্‌জেদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, হজরত আলী (কঃ-অঃ) মস্‌জেদের প্রাচীর ঘেসিয়া যমিনে (ভূতলে) পড়িয়া আছেন। শরীরে এবং বস্ত্রে ধূলা বালি উড়িয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া হজরত রেছালতমাব (ছালঃ), হজরত আলীর শরীর হইতে ধূলা বালি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিয়াছিলেন, قم يا ابا تراب উঠ, হে মৃত্তিকার বাপ, উঠ! ঐ সময় হইতে হজরত আলী (রাজিঃ) এর কুনিয়াত "আবু তোরাব" বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাঁহার অন্যান্য لقب লকব (উপাধি) এই :—

১। বয়দাতল-বলদ, ২। আমিন শরীফ, ৩। হাদী, ৪। মহতদি, ৫। খিল আওযলন্ ওয়ায়িয়া, ৬। হায়দার কার্রার, ৭। লায়ীযরল আমাতা, ৮। যোলকারনিন, ৯। সিদ্দিক। এমাম আহ্‌মদ (রহঃ) মস্‌নদ গ্রন্থে, বাবুল মোনাকেবে, আবু লায়লা (রহঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে হজরত রছুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ও ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, সিদ্দিক তজন; তন্মধ্যে ১ম সিদ্দিক ফেরাউনের বংশীয় খরকিল নামক ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী মোমেন ব্যক্তি। যখন দুরাচার ফেরাউন ও তাহার কওম (সম্প্রদায়ের লোকেরা) হজরত মুসা (আলাঃ) কে কতল (হত্যা) করিতে চাহিয়াছিল, তখন এই খরকিল দূরন্ত

ফেরাউনের ভয়ে ভীত না হইয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله কি তোমরা এমন ব্যক্তিকে কতল (হত্যা) করিবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে আপনার পরওয়ারদেগার (সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু) বলিয়া অভিহিত করেন ?

দ্বিতীয় সিদ্দিক আল্ ইয়াছিনে হবিব-বিন্-মরি আল খেজার ছিলেন। পবিত্র কোরআন শরিফের ছুরা ইয়াছিনে ইহার উল্লেখ আছে। যখন হজরত শময়ুন ও হজরত ছুমান (আঃ) আন্তাকিয়া (এণ্টিওক) শহরে তত্রত্য লোকদিগকে খোদা-তালার নামে তাঁহার দিকে আহ্বান করিতে (পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে) আসিয়াছিলেন, তখন তত্রত্য খোদাদ্রোহী অধিবাসিগণ তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উপহাস করিতেছিল। সেই সময় ইহাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ্‌তালা হজরত শময়ুন (আঃ)কে তথায় পাঠাইলেন। খোদাদ্রোহী আন্তাকিয়াবাসী-গণ বলিল, আমরা তোমাদের এখানে থাকা নহুছত (কুলক্ষণ) বলিয়া মনে করি। যদি তোমরা এইরূপ উপদেশ দানে বিরত না হও, তবে আমরা তোমাদিগকে ছঙ্গেছার (প্রস্তরাঘাতে বধ) করিব। হজরত শময়ুন (আলাঃ) প্রভৃতি বলিলেন, তোমাদের বদ-শগুনি (দুর্ভাগ্যতা) তোমাদের সঙ্গেই আছে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, ঐ সময় আন্তাকিয়া শহর হইতে হবিব নজ্জার নামক খোদা ভক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিলেন, এবং নিজের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন, يا قوم اتبعوا المرسلين হে আমার স্বজাতিবৃন্দ! এই রছুলদিগের

পদানুসরণ কর—যাহারা তোমাদের নিকট কিছু পারিশ্রমিক চাহেন না, আর বাস্তবিক ইহারা সত্য পথে আছেন।

আর তৃতীয় সিদ্দিক আলী বিন্-আবু তালেব। ইনি পূর্ব্বোক্ত দুইজন সিদ্দিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হজরত আলী (কঃ-অঃ) আছহাবে ফিল ঘটনার ৭ বৎসর পরে, ১২ই রজব তারিখে পবিত্র মক্কা নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, তিনি কাবাগৃহের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা সত্য নহে।

পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের সময় হজরত আলী করমুল্লাহে অজহুর বয়স কত ছিল, এই বিষয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। এবনেজওযি (রহঃ) লিখিয়াছেন, ৭ বৎসর, ৯ বৎসর, ১০ বৎসর কিংবা ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যখায়েরুল আকবা গ্রন্থে মোহাম্মদ-বিন-আবদুর রহমান্ হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, হজরত আলী (কঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ)—ইঁহারা উভয়ে ৮ বৎসর বয়সে ইস্‌লামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এ-বনে এছহাক বলেন, দশ বৎসর বয়সে হজরত আলী (রাজিঃ) মুসলমান হন। আবার কেহ তের বৎসর, কেহ চৌদ্দ বৎসর, কেহ বা ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার ইস্‌লাম গ্রহণের কাল নির্ণয় করেন। এই সকল বিভিন্ন মতের আলোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির করা যায় যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

এ বিষয়েও মতভেদ আছে যে, কে প্রথমে ইস্‌লাম ধর্ম্ম

গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও ইতিহাসবেত্তার মতে হজরতের সহধর্ম্মিণী হজরত খোদায়জাতুল্ কোবরা (রাজিঃ-আন্হা) প্রথমে ইস্‌লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন। কাহারও কাহারও মতে হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) আর কাহারও কাহারও মতে হজরত আলী (কঃ-অঃ) সর্ব্বপ্রথমে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, বালকদিগের মধ্যে হজরত আলী (কঃ-অঃ), বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের মধ্যে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে হজরত খোদায়জাতুল্ কোব্‌রা (রাজিঃ) সর্ব্বপ্রথমে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। একমাত্র তবুকের যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধেই হজরত আলী (রাজিঃ) হজরত রসুলে করিম (ছালঃ)এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, এবং শত্রুদলের সঙ্গে মহা-বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তবুকের যুদ্ধে আহ্‌লে বায়েতের (হজরতের পরিবার বর্গের) হেফাজত অর্থাৎ তত্ত্বা-বধানের জন্য হজরত তাঁহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। যখন হজরত সদল বলে তবুক যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হন, তখন হজরত আলী (রাজিঃ) বলিয়াছিলেন, এয়া রসুলেল্লাহ, আপনি আমাকে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের মধ্যে ছাড়িয়া যাইতেছেন? তদুত্তরে হজরত ফরমাইয়াছিলেন, হে আলি! তুমি কি এ বিষয়ে রাজি নহ যে, তুমি আমার সঙ্গে ঐ অবস্থায় থাক, যে অবস্থায় হারুণ (আলাঃ) মুছা (আলায়হেচ্ছালাম) এর সঙ্গে ছিলেন। পার্থক্য এইটুকু যে, আমার পরে আর কেহ নবী হইবেন না।

হজরত আলী (রাজিঃ) পাহালওয়ান (মহাবীর) ছিলেন, তাঁহার দেহ সুগঠিত সুডৌল সম্পন্ন ছিল। তাঁহার মস্তক বৃহৎ ছিল, তিনি মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ফেলিতেন। দাড়ি ঘন অথচ সুদীর্ঘ ছিল। কেশ রাশিও খুব ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। সওয়াদাঃ বিন-খজলা (রাজিঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, আমি হজরত আলী (রাজিঃ)কে যরদ খেজাব (হল্‌দে চুলের কলপ) ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু খেজাবের রেওয়ায়েত সওয়াদাঃ (রাজিঃ) ব্যতীত আর কেহই করেন নাই। ইহাও হইতে পারে যে, তিনি একবার খেজাব ব্যবহার করিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ সমুদয় রাবি (বর্ণনাকারী) এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, হজরত আলীর (রাজিঃ) দাড়ি সুদীর্ঘ ও ঘন সন্নিবিষ্ট এবং ছফেদ (শ্বেত বা সাদা) ছিল। অবশ্য ইহা তাঁহার শেষ জীবনের—অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের অবস্থা। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাঁহার উদর দেশ বৃহৎ ছিল, তাঁহাতে এবং সর্ব্ব শরীরে ও বক্ষঃস্থলে প্রভূত লোম রাজি বিরাজ করিত।

আবু সয়ীদ তমিমি হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, বাল্যকালে একদা আমরা (মক্কা শরীফের) বাজারে কাপড় বিক্রয় করিতে-ছিলাম ; হজরত আলী (রাজিঃ) ঐ পথে গমন করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার বড় পেট দেখিয়া "বোযর্গ সেকম" "বোযর্গ সেকম" ("বৃহৎ উদর" "বৃহৎ উদর") বলিয়া কুর্দ্দন করিতেছিলাম ; তিনি আমাদিগকে বলিলেন "তোমরা ইহা কি

বলিতেছ?" তদুত্তরে আমরা বলিলাম, আমরা বলিতেছি যে আপনি বৃহৎ পেটওয়ালা। তচ্ছ্রবণে তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন "হাঁ, ইহার উপরে এলেম (বিদ্যা) ও ভিতরে খানা (খাদ্য দ্রব্য) আছে। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, উভয় শানের মাঝখানে, ব্যবধান বেশী ছিল। গ্রীবা দেশ লম্বা সুরাহির আকার বিশিষ্ট ও হাতলী মাংসল ছিল। তিনি একটু বেঁটে আকারের ছিলেন। চেহেরা হাস্যোম্মুখ এবং গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল ছিল।

একজন আরবীক ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রজব মাসের ১ম দিন শুক্রবার দিবসে বিবী ফাতেমা একটী পুত্র-প্রসব করেন। শুভদিনে শুভক্ষণে নিরুপম রূপলাবণ্য বিশিষ্ট পুত্ররত্ন লাভ করিয়া' প্রসূতি অসীম আনন্দে বিভোর হইলেন। বীর-প্রসবিনী মাতা আজ যেন আকাশের পূর্ণ-শরধর নিজ করে পাইলেন—মর্ত্তে বাস করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন; সন্তান-বৎসলা জননী স্নেহভরে তনয়ের মুখচন্দ্র পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন; আজ জগতের সমুদয় দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া অনিমিষ লোচনে পুত্রের মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুত্রের কমলাদপি কোমল দেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। আহা! মাতা প্রিয়তম পুত্র-রত্ন লাভ করিয়া জগতের সমুদয় বস্তু শান্তিময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিবাসী আত্মীয়-স্বজনবর্গ নবজাত শিশুকে দেখিতে আসিয়া, স্বর্গীয়রূপ-জ্যোতিঃ ও কমনীয় মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ

হইলেন ; যেন একটী সগু-প্রস্ফুটিত স্বর্গীয় পারিজাত কুসুম স্বর্গোগ্যান হইতে তুলিয়া আনিয়া মর্ত্ত্যে স্থাপন করা হইয়াছে। একশত পূর্ণচন্দ্রের বিমল বিভায় যত না সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়, শিশুর মুখচন্দ্র ততোধিক শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। আজানু লম্বিত সুকোমল বাহুযুগল, ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূদ্বয়, রক্তজবারাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠ, আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন যুগল ইত্যাদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রীতিকর শিশুর প্রতিমাখানি দর্শন করিয়া দর্শকগণ বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রিয়দর্শন আলী মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র একজন পরিচারিকা আবুতালেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই শুভ সংবাদ প্রদান করিল। আবুতালেব এই প্রীতিকর সংবাদ শ্রবণে আনন্দ উৎফুল্লচিত্তে, নবজাত তনয়ের বদনশশী নিরীক্ষণ অভিলাষে প্রসব-গৃহে আগমন করতঃ পুত্রের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য, মুখকান্তি ও অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনে স্নেহরসে আপ্লুত হইলেন এবং স্বয়ং পুত্রের শোভনীয়, শ্রুতিমধুকর নাম রাখিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্র-বনে তাঁহার স্ত্রী বিবী ফাতেমা বলিলেন, স্বামিন্! আমি স্বয়ং এই নবকুমারের নাম রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আবু-তালেব কহিলেন প্রিয়ে! ইহা কখনও হইতে পারে না, আমি বর্ত্তমানে এ বিষয়ে তোমার কোন অধিকার নাই। আমিই শোভনীয় নামে পুত্রের নাম শোভিত করিব। সর্ব্বসুলক্ষণ-যুক্ত উপযুক্ত নামে ভূষিত করা আমারই প্রধান অধিকার। অতএব তুমি এই সংকল্প পরিত্যাগ কর। এইরূপে উভয়

দম্পতিতে নানা তর্কবিতর্কের পর যুক্তি স্থির করিলেন যে, আমরা পবিত্র কাবার নিকট যাইয়া, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি পুত্রের যে নাম রাখিবার আদেশ প্রদান করিবেন, আমরা তাহাই রাখিব। এই বলিয়া উভয়েই কাবা শরীফের নিকটবর্ত্তী হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ভক্তিভাবে সরলান্তঃকরণে বলিলেন, হে দাতা কৃপাময় সৃষ্টিকর্ত্তা! এই শিশুর কি নাম প্রদান করা হইবে, কৃপাপূর্ব্বক তাহা তোমার করুণাময় দৈববাণীতে প্রকাশ করিয়া আমাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দাও। ভক্ত-বৎসল প্রভু দয়াময় ভক্তের করুণ প্রার্থনায় ও অকপট আরাধনায় সন্তুষ্ট হইলেন। তন্ময়চিত্তে ভক্তিভরে যে তাঁহার নিকট কৃপা ভিক্ষা করে, তিনি তাহাকেই কৃপাদানে কৃতার্থ করেন। এই জন্য তাঁহার অপর একটী নাম কৃপাময়। বিশ্ব-নিয়ন্তার কি অপার মহিমা! তিনি ভক্তপরায়ণ দম্পতিদ্বয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বায়ুকে আদেশ করিলেন, আমি শিশুর নাম রাখিলাম, "আলী মস্তফা।" তুমি শীঘ্র এই সংবাদ বহন করিয়া উহাদের কর্ণগোচর কর। অনতিবিলম্বে শূন্য-মার্গ হইতে দৈববাণীতে ঐ মধুময় নাম শ্রবণ করিয়া, দম্পতিযুগল পরম চরিতার্থ হইলেন এবং সেই দয়াময় আল্লাহ্ তালার প্রতি একান্ত ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া প্রফুল্লান্তঃ-করণে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাল্যে হজরত আলী কর্ত্তৃক সর্প সংহার।

মক্কা নগরে—পবিত্র ধাম কাবা গৃহের অনতিদূরে অত্যুচ্চ পর্ব্বতপার্শ্বে—আবুতালেবের বাস-গৃহ ছিল। সেই পর্ব্বতের গহ্বর সমূহে অসংখ্য বিষধর সর্প বাস করিত। একদা বাল্যাবস্থায় হজরত আলী (কঃ) শয্যায় শায়িত থাকিয়া বাল-স্বভাব চপলতা বশতঃ হস্তপদাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় গর্ত্ত হইতে একটী সর্প বহির্গত হইয়া, শায়িত শিশুকে (হজরত আলীকে) দংশন উদ্দেশ্যে ফণা বিস্তার করে। অবিলম্বে শিশুবর দংশনোদ্যত ফণির শিরে কঠোর মুষ্ট্যাঘাত করেন। অহিবর বজ্রসম সেই কঠিন আঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। বাল্যকাল হইতে তাঁহার শার্দ্দূল সদৃশ অসীম বীরত্বের পরিচয় পাইয়া সমগ্র আরববাসী স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিল। হজরত আলী (কঃ অঃ) 'আলী' এই সমুজ্জ্বল নাম প্রাপ্ত হইবার হেতু-মূলক বহুসংখ্যক হাদিস প্রচারিত আছে।

হাদিস্।

যৎকালে আলী তিন বৎসরের মাত্র শিশু, ফাতেমা পুত্রের নাম রাখিবার মানসে প্রতিমা-মন্দিরে গমন করিলেন এবং প্রতিমাগণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বহু অর্চ্চনা, বন্দনা,

স্তব-স্তুতি করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাবল প্রতিমাকে স্বীয় মনো-ভিলাষ নিবেদন করিলেন। তখন হজরত আলী তিন বৎসরের শিশু মাত্র, মাতাকে পৌত্তলিকপরায়ণা দেখিয়া, বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তাঁহার হৃদয়ের খোদা-পরস্তির দেবভাব বিদ্যুতের ন্যায় সতেজে প্রকাশিত হইল। তিনি মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, জননি! তুমি কাহার নিকট অবনত মস্তকে বিনীত ভাবে করুণস্বরে দয়া ভিক্ষা করিতেছ? যে মূর্ত্তি ক্ষমতাহীন জড় পদার্থ, যাহা একখানি নিরেট প্রস্তর মাত্র, যাহার বাক্‌শক্তি, চলচ্ছক্তি, দর্শনশক্তি প্রভৃতি কোনই শক্তি নাই, এবম্ভুত মনুষ্য নির্ম্মিত প্রাণহীন এক খানি শীলাখণ্ডকে নতশিরে নমস্কার করিতেছ! ছি ছি মা! এমন নীচ প্রবৃত্তিকে অন্তরে স্থান দিয়াছ? প্রস্তর নির্ম্মিত অচেতন মূর্ত্তি পূজিলে যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয় মা, তাহা হইলে মহাতাপসীগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া সর্ব্বশক্তি-মান নিরাকার আল্লাহতালার উপাসনা কেন করিবে? ছি মা! কি ঘৃণার কথা। যিনি জীবকূলের স্রষ্টা, যিনি অসীম জগতের অধিপতি, ত্রিজগতে যাঁহার দয়ার স্রোত সদা প্রবাহমান, সেই নিখিল পতি আল্লাহতালাকে ভুলিয়া কাহার আরাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছ? অতএব মাতঃ! এ কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা নিরাকার আল্লাহর আরাধনা কর, তন্ময়চিত্তে তাঁহাকে মনপ্রাণ অর্পণ কর, তিনি সর্ব্ব কামনা সিদ্ধি করিবেন, সকল বিপদ হইতে

উদ্ধার করিবেন। সুকুমার তনয়ের ধর্ম্মময় উপদেশ বাক্যে সন্তানবৎসলা জননী লজ্জাবনত বদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। একদা দম্পতিদ্বয় নিজ শিশুপুত্র আলীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে-ছিলেন, এস্‌লাম ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) নবজাত শিশুর দর্শনাভিলাষে পিতৃব্য-আলয়ে গমন করেন এবং শিশুর অলোকসামান্য রূপকান্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাতঃ! আপনারা কি নামে এই শিশুর নাম শোভিত করিয়াছেন? তাঁহারা তাঁহার • এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব রহিলেন দেখিয়া, মহাত্মা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিলেন, আমি ইহাকে "আলী" এই গৌরব-সূচক নামে ভূষিত করিলাম।

হজরত আলীর শৈশবাবস্থায় আরব দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে কিশোর বয়সেই জনক জননীর স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যেমন জগৎপূজ্য মোস্‌লেম কুলরবি হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) শৈশবে মাতৃবিয়োগের অল্পদিন পরেই দয়ার্দ্রচিত্তা গুণবতা ধাত্রী হালিমার হস্তে প্রতিপালন জন্য ন্যস্ত হন, সেইরূপ আলীর জনক জননী দারিদ্র্যতা নিবন্ধন পরদুঃখকাতর করুণাহৃদয় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আলীর প্রতিপালনভার গ্রহণ করণাভিলাষে হজরত আবুতালেবের নিকট প্রার্থী হন। হজরতের এই স্নেহময় করুণ প্রার্থনায় আবুতালেব সন্তোষ অন্তঃকরণে

আলীর প্রতিপালনের ভার হজরতের করেই সমার্পণ করেন, তিনিও গুরুজনবাক্যে প্রীত হইয়া সাদরে আলীর প্রতি-পালনভার গ্রহণ করেন। সেই অবধি হজরত আলীও (কঃ অঃ) নিজ গুণে আদৃত হইয়া, ছায়ার ন্যায় হজরতের চিরসঙ্গী হন। হজরত আলীকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, এমন কি যে সমুদয় লোক হজরত আলীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন প্রেরিত পুরুষ তাঁহাদিগকে আন্তরিক স্নেহ মমতা করিতেন। এবং তদ্বিরোধিগণকে ঘৃণা করিতেন। হাদিসে লিখিত আছে যে এক দিবস খোতবা পাঠ কালে পয়গম্বর সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, আমি আলীকে অন্তরের সহিত স্নেহ করি, আশা করি, মোস্‌লেম মাত্রই আলীকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন, যে তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সে আমার ও মোস্‌লেমবৃন্দের চির শত্রু।

যে সময় পবিত্র কাবা মন্দির হইতে পরম কারুণিক বিশ্বনিয়ন্তার উপাসনা সমূলে বিলুপ্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তথায় আরব জনসাধারণ কর্ত্তৃক নানা দেব-দেবীর প্রতিমা সকল পূজিত হইতে থাকে, সেই সময়ে জগৎপূজ্য বীরাগ্রগণ্য মহাবীর হজরত আলী (কঃ) পৌত্তলিকগণের সহিত অমিত বিক্রমে একাদশ বার যুদ্ধ করিয়া কাবা মন্দির পুনরুদ্ধার ও প্রতিমা সকল বিধ্বস্ত করেন, এবং সেই সময় মোস্‌লেম জগতের কর্ণধার হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সন্তোষান্তকরণে "আলী" নাম রাখিয়াছিলেন।

বালকদিগের মধ্য হজরত আলী (কঃ অঃ) ই সর্ব্ব প্রথমে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যাঁহারা পবিত্র কোর্‌আন মজিদকে একত্র সংগ্রহ করিয়া হজরত রছুলে করিমের (ছলঃ) খেদমতে পেষ করেন হজরত আলী (কঃ অঃ) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বনি হাসেমের মধ্যে তিনিই প্রথম খালিফা। তিনি জন্মগ্রহণ কাল হইতে কখনও প্রতিমা পূজা করেন নাই। হজরত রছুলে আকরম মোহাম্মদ মেস্তফা আহম্মদ মজতবা (ছালঃ) যখন মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে মদীনা তৈয়বায় হেজরত করেন তখন তিনি হজরত আলী (রাজি) কে এজন্য মক্কায় রাখিয়া যান যে, তিনি যেন হজরতের নিকট আমানতি জিনিষ গুলি উহার মালিকদিগকে বুঝাইয়া দেন। হজরতের এই আদেশ প্রতিপালনান্তর তিনিও হেজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া যান।

বীরবর আলীর জ্ঞানবত্বা ও সাধুতার পরিচয়।

সলমন ফারসী ও আবিজার গফফারী মহাত্মাদ্বয় স্ব স্ব প্রণীত মূলগ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরিত-পুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা আলী সর্ব্বপ্রথমে অদ্বিতীয় বিশ্বপালক জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি ও

আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সনাতন এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রেরিত-পুরুষ ও আল্লার আদেশ সমূহ কায়মনো-বাক্যে ও প্রাণপণ যত্নে পালন করিয়াছেন। প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা ছিল। এই সাধু পুরুষাগ্রগণ্য মহাত্মা মহাবল আলী অপর সাধারণ পুণ্যাত্মা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই তাপস-কুলচূড়ামণি ঘোর নিভৃত অরণ্যে মানবচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত-ভাবে থাকিয়া তন্ময়চিত্তে ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। যে শরীরে সুতীক্ষ্ণ তরবারি সবল অস্ত্রাঘাতে বিন্দু পরিমাণ চিহ্নাঙ্কিত হইত না, লৌহ, প্রস্তর অপেক্ষা যে দেহ কঠিন ছিল, সেই সুকঠিন কলেবর উপাসনাকালে নবনীত সদৃশ কোমল হইয়া যাইত। আল্লার উপর আত্মা ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া যেন তাঁহাতেই লীন হইয়া যাইতেন। আর এই বীর-চূড়ামণি যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল উপবাস থাকিয়াও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর বা বিচলিত হইতেন না, অতি দীনভাবে কালযাপন করিতেন। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল না, পাঁচ দেরহেম মাত্র মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিতেন। নিজে উপবাস থাকিয়াও অভ্যাগত অতিথিগণের যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিতেন। দীন দুঃখী ভিক্ষুক-গণকে যথোচিত দানে পরিতুষ্ট করিতেন। তিনি যেমন শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন, তেমনি পরোপকারীতা ও দানশীলতায়

অতুলনীয় ছিলেন। যাচক কখনও তাঁহার গৃহে বিমুখ হইয়া যাইত না।

হজরত আলীর লোকান্তরকালে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মহাত্মা হজরত এমাম হাসন (রাজিঃ) বলিয়াছেন, এস্‌লাম জগৎ আজ তিমিরাচ্ছান্ন হইল, মোস্‌লেম গৌরবশশি অস্তমিত হইল। এই মহাপুরুষ সদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ইহজগতে আর কেহই জন্মগ্রহণ করিবেন না। এই মহাত্মা আলী (কঃ) হইতেই তসওফবেত্তা সাধুপুরুষগণের হৃদয়ে মারফত বিদ্যা জাজ্জ্বল্যরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। আর এস্‌লাম গুরু হজরত মোহাম্মদ (ছানঃ) বলিয়াছেন, প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিদ্যায় আলী (কঃ) সকল মানব অপেক্ষা উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রধানত ইঁহা কর্ত্তৃক অদ্যাবধি জগতে মারফত বিদ্যা প্রচারিত রহিয়াছে।

আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, পরমকরুণাময় আল্লাহ্‌ অমূল্যরত্ন বিদ্যাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার দয়া ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ একাধারে মহর্ষি আলীকে চারি পঞ্চমাংশ বিদ্যারত্নালঙ্কারে শোভিত করিয়াছিলেন ও অবশিষ্টাংশ বিদ্যা জগতের সমগ্র মানবমণ্ডলীকে প্রদান করেন। সাধুবর মসুউদের পুত্র আবদুল্লা (রাজিঃ) মহোদয় হজরত মোহাম্মদের-(ছালঃ) প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আলী (কঃ) সমগ্র মানব ও জেন অপেক্ষা নয় গুণ অধিক বিদ্যা প্রাপ্ত

হইয়াছেন। যেহেতু, করুণানিধান আল্লাহ্ তালা দশ প্রকারের বুদ্ধি-কৌশল জ্বেন ও মানবের জন্য সৃষ্টি করিয়া উহার মধ্যে নয় প্রকার কেবল মাত্র হজরত আলীকে অর্পণ করেন ও অবশিষ্ট এক প্রকার মাত্র কৌশল সমগ্র জগতে বিতরণ করিয়াছেন। মহাত্মা হাসন (রাজিঃ) বলিয়াছেন, পিতৃদেব সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু সমগ্র মানব অপেক্ষা গোপনীয় বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এরূপ খোদাপরায়ণ সিদ্ধকাম সাধু পুরুষ সদৃশ ধর্ম্মাত্মা পুণ্যবান্ ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহ।

অনন্ত বিদ্যাবিভূষিত হজরত আলী (কঃ) শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারফত এই চারি প্রকার বিদ্যায় পূর্ণ কৃতবিদ্য ছিলেন। অধুনাতন মারেফত নীতি অনভিজ্ঞ ফকির উপাধিধারী কতিপয় ভণ্ড তপস্বী মারেফত বিদ্যা-চূড়ামণি পরম তপস্বী মহাত্মা হজরত আলীর (রাজিঃ) মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিপথগামী হইতেছে। সাবধান! *যেন কপটাচারিগণের কুহকে পড়িয়া সত্যপথ ভ্রষ্ট হইও না*; মারেফত-পণ্ডিত মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) ও হজরত আবুবক্কার সিদ্দিক (রাজিঃ) এর মারেফত বিদ্যা নীতি অনুসরণ করিয়া সিদ্ধকাম সাধকের নিকট একাগ্রচিত্তে শিক্ষা কর, মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে, ক্রমশঃ জ্ঞানের উচ্চ উচ্চ মঞ্চে উঠিতে পারিবে।

মহাত্মা আলীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

স্বয়ং মহা মাননীয় আলী (কঃ অঃ) আরববাসীদিগের নিকট প্রকাশ করেন যে, একদিন হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) আমাকে বলিয়াছেন, হে আলি! যখন মানবগণ পরকালের সম্বল স্বরূপ সদনুষ্ঠান সকল পরিত্যাগ করিয়া পর্থিব অস্থায়ী সুখ বিলাসে মত্ত থাকিবে, আল্লাহতালার প্রিয় সম্পত্তি অপহরণ ও অপচয় করিবে, তাঁহার আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তখন তোমার কি অবস্থা হইবে? তখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিলাম, যদি বিশ্বপালক দয়াময় আল্লাহতালা সৎপথে আমার মতিগতি রাখেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে কায়মনোবাক্যে ঐ সকল কুক্রিয়াসক্ত পাপাচারিগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিব এবং ধৈর্য্যাবলম্বনে নিজ মন ও আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক রাখিব। হজরত আলী (কঃ অঃ) দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, সদালাপ, মিষ্টবাক্য, ধৈর্য্য, পরোপকারিতা প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার তুলনা ছিল না কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে, তাহার প্রতিশোধ লইতেন না, বরং ক্ষমা গুণের দ্বারা নিজের মহত্ব ও ক্ষমাশীলতার অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। অতি ভয়ঙ্কর শত্রুকেও নিজ আয়ত্তাধীনে পাইলে ছাড়িয়া দিতেন। বৈরনির্যাতনের স্পৃহা আদৌ তাঁহার মনে স্থান পাইত না।

একদিন তিনি এক বিধর্ম্মী কাফেরের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অতুল বিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বিধর্ম্মী পুরুষ অমিততেজা মহাপরাক্রমশালী রণনিপুণ ব্যক্তি ছিল। মল্লযুদ্ধ ধনুর্যুদ্ধ ও অসিযুদ্ধ হইল, কোন প্রকারে কোন পক্ষে জয় পরাজয় হইল না। মহাবীর আলী (কঃ অঃ) রোষ-বিহ্বল সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া দৈবশক্তিবলে বিধর্ম্মীকে ভূতলে পাতিত করিয়া তাহার বক্ষোপরি উপবিষ্ট হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ অসি হস্তে লইয়া দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিলেন। এমন সময়ে পাপাত্মা অধর্ম্মাচারী কাফের তাঁহার পবিত্র বদনে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল। ক্ষমা-পরায়ণ মহাত্মা আলী (কঃ অঃ) বিধর্ম্মী কাফেরের অন্যায় ব্যবহারে কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ না করিয়া বরং ধৈর্য্যা-বলম্বন পূর্ব্বক অবিলম্বে তাহার বক্ষঃস্থল হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং তরবারি কোষে রাখিয়া দিলেন। বিধর্ম্মী পুরুষ হজরত আলী (কঃ অজঃ) এর এই অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমাশীলতা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং করুণস্বরে নিবেদন করিল, হে পরম ধার্ম্মিক ক্ষমাশীল অমিততেজা বীরবর! এই পরাভূত অকৃতঘ্ন শত্রুকে বধ না করিয়া কি জন্য দূরে দণ্ডায়মান হইলেন? তদুত্তরে ধার্ম্মিকপ্রবর আলী (কঃ অঃ) কহিলেন নীচাশয় কাফের! আমি তোকে পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে-ছিলাম, যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ও এস্‌লাম ধর্ম্ম স্বীকার

করিলি না, সেই জন্য আল্লাহতায়ালার আদেশানুযায়ী তোকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তাহাতে তুই আমার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়া আমার অন্তরে ক্রোধ ও ঈর্ষার উদ্দীপন করাইলি। কিন্তু এ সময়ে তোকে বধ করিলে স্বকীয় ক্রোধ ঈর্ষা প্রভৃতি রিপু চরিতার্থ করা হইবে, খোদাতালার আদেশ অনুযায়ী হত্যা করা হইবে না। সেই জন্য তোকে বধ না করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলাম। সেই বিধর্ম্মী পুরুষ হজরত আলীর এবম্বিধ অতুলনীয় অপার্থিব ক্রোধ সম্বরণ, দয়া, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সর্ব্বোপরি আল্লাহ-তায়ালার আদেশ প্রতিপালনে দৃঢ়তা দর্শনে তৎক্ষণাৎ আলীর (কঃ অঃ) নিকট পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

হজরত এমাম মালেক (রহঃ) বলিয়াছেন,—এস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) শিষ্য-মণ্ডলীয় সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা হজরত আলীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ইচ্ছার অনুকূলে বাধা প্রদান করতঃ স্ব স্ব ইচ্ছা সমর্থন কবিয়াছে এবং সমাজে স্বেচ্ছাচারিতার ভাব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া কুপথগামী হইয়াছে। তাহারা হজরত রছুলের (ছালঃ) শিষ্য হইতে পরিত্যক্ত হইবে। যেহেতু হজরত আলী (কঃ অঃ) গোপনীয় (মারেফত) বিদ্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি সালেহিন সাধু পুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্বগুণে অগ্রগণ্য। হজরত আলী (কঃ-অঃ) বাল্যকাল হইতে হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ)

নিকট থাকিয়া অতি যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তথাপি পার্থিব ভোগ-বিলাসে সম্পূর্ণ স্পৃহাহীন ছিলেন, আহার্য্য ও পানীয় বস্তুর কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও অঙ্গাবরণ জাঁকজমক-বিহীন অতি অল্প মূল্যের ছিল। তিনি দশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)এর নিকট এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সোমবার দিবসে শত্রুভয়ে সংগোপনে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) ধর্ম্ম প্রচার-ব্রতে ব্রতী হন। হজরত আলী (কঃ-অঃ) মঙ্গলবার দিবসে পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পূর্ব্বে হজরত-সহধর্ম্মিণী খোদেজা (রাজিঃ) হজরত (ছালঃ)কে পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে খোদেজা (রাজিঃ) ও তৎপরে আলী মহাত্মা এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরম বিশ্বাসী ভক্তপ্রবর হজরত আলী (কঃ-অঃ) হজরতের নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়া অতি তরুণ বয়সেই হজরতের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্যই হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) তাঁহাকে আলী নামে অলঙ্কৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

হজরত আলীর বীরত্ব-কাহিনী।

হজরত আলী (রাজিঃ) ভুবন-বিখ্যাত অতুল বল-বিক্রমশালী অদ্বিতীয় বীরপুরুষ ছিলেন। কতিপয় ভীষণ সংগ্রামে তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়কর বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন বীর-বর রণক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া শত্রু সংহারার্থ অসি চালনা করিতেন, তৎকালীন তাঁহার সেই ভয়াবহ মূর্ত্তি দর্শনে সামান্ত মানব দূরে থাকুক, দেব দৈত্য দানবগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত। রণক্ষেত্রে তাঁহার অসির ক্ষিপ্র চালনা ও গভীর গর্জ্জন শুনিয়া কঠিন-হৃদয় যমেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। তাঁহার যুদ্ধকালীন উচ্চ নিনাদে কত কত বীর নামে খ্যাত সৈনিকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইত। কত সৈন্য ত্রাহি ডাক ছাড়িতে—যম যেন প্রলয় সাধনে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পদভরে ভূমিকম্পের ন্যায় ধরণী কম্পিত হইত। এস্‌লাম-জগত তাঁহাকে দৈববীর বলিয়া আজি পর্য্যন্ত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অদ্যাবধি অনেকে রণস্থলে যুদ্ধাদিতে বীরত্ব প্রকাশ করিতে বা অন্য কোন প্রকার শক্তির পরিচয় দিতে "আলী আলী" নামোচ্চারণ করিয়া থাকেন। মহাত্মা হজরত আলী স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনটী কার্য্য আমার বড়ই প্রীতিপ্রদ। প্রথম, প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে উপবাস-ব্রত উদযাপন (রোজাপালন); দ্বিতীয়, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান; তৃতীয়, রণক্ষেত্রে অসীম সাহস সহকারে অসি সঞ্চালন। জেহাদে (ধর্ম্মযুদ্ধে) আমি একান্ত পরিতৃপ্তি

লাভ করিয়া থাকি। রণস্থলই আমার ক্রীড়াভূমি। ইতিহাস-বেত্তা হাসেন এবনে-সালেহ্ বলিয়াছেন—হজরত আলীর সদৃশ অসীম শক্তিশালী মহাযোদ্ধা, অদ্ভুত রণনিপুণ বীরপুরুষ কখনও দেখি নাই। যখন তিনি সমরক্ষেত্রাভিমুখে তীরবেগে ধাবিত হইতেন, তখন এমন কোন যুদ্ধ-নিপুণ বীরপুরুষ দেখি নাই, সম্মুখ সমরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া জয় লাভ করে। হজরত ওমর এবনে-ইয়াসের (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বয়ং মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, আলীর তুল্য দ্বিতীয় বীরপুরুষ জগতে নাই। যুদ্ধবিদ্যায়, দাতব্যে, দরিদ্রতায় এই ত্রিবিধ অবস্থায় তিনি জগতে অদ্বিতীয়, অতুলনীয় ও অনুপম। দানের নিমিত্ত তাঁহার নিকট সতত চারিটী মাত্র দেরহেম সঞ্চিত থাকিত। দানবীর আলী (কঃ অঃ) উহা চারি প্রকার নিয়মে দান করিয়া চরিতার্থ হইতেন। প্রথমটী দিবাভাগের মধ্যে কোন এক সময়ে, দ্বিতীয়টী রজনী যোগে, তৃতীয়টী গোপনে অতিথি অভ্যাগতদিগকে ও চতুর্থটী প্রকাশ্যে যাচকগণকে দান করিতেন। বদান্যবর আলী (কঃ-অঃ) এই দানের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লার উদ্দেশ্যে স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় দীন-দুঃখী, দরিদ্র, আতুর অন্ধ প্রভৃতি নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে দান করিয়া পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পুরস্কারের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তালা শ্রেষ্ঠতম স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

হতরত আলীর এস্‌লাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ

হে কম্বলাবৃত মহাপুরুষ! গাত্রোত্থান কর, স্বীয় গন্তব্য পথ অবলম্বন করিয়া কৰ্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে প্রস্তুত হও। যে উদ্দেশ্যে মর্ত্ত্যভূমে প্রেরিত হইয়াছ, তাহা সফল করিতে দণ্ডায়-মান হও। তুমি লোকগণকে সাবধান করিয়া দাও যেন তাহারা পাপকাৰ্য্য হইতে বিরত ও ধৰ্ম্মকাৰ্য্যে নিরত হয় এবং তুমি সতত খোদার গুণগান কীৰ্ত্তন করিতে থাক। যখন খোদাতায়ালার এইরূপ আদেশ অহি অর্থাৎ প্রত্যাদেশ যোগে হজরতের নিকট পৌঁছিল, তখম জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধনে কৰ্ম্মবীর কৰ্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় আত্মীয় স্বজনের নিকট নির্ভীকচিত্তে এস্‌লামধৰ্ম্ম-প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। হজরতের সহধৰ্ম্মিণী খোদেজাতুন কোব্‌রা (রাজিঃ) প্রথমে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, এস্‌লাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ পূৰ্ব্বক তদনুযায়ী উপাসনা ও অন্যান্য ধৰ্ম্মকৰ্ম্মাদি সম্পন্ন করিতে থাকেন। তদনন্তর প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) আলী (কঃ-অঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আলি! আমি আল্লার আদেশে ধৰ্ম্ম-প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, এক্ষণে পিতৃপুরুষের পৌত্তলিক ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট সত্য সনাতন এস্‌লাম ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, মুসার ভ্রাতা হারুণের ন্যায় আমার সাহায্যকারী হও।

মহাত্মা আলী (রাজিঃ) হজরতের নিকট ধৰ্ম্মের এই

জ্যোতির্ম্ময় বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, দেব! আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু পিতাকে একবার জানাইয়া এ কার্য্য সমাধা করিলে কি ভাল হয় না? হজরত বলিলেন, তাহাতে ক্ষতি কি? তবে যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাঁহার বিনা আদেশে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার। আলী (রাজিঃ) আর কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া তৎক্ষণাৎ পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এ বিষয় হজরত আলীর পিতা আবুতালেব কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই, পরে যখন তিনি লোক পরম্পরায় জানিতে পাইলেন, আলী (রাজিঃ) নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তখন তিনি হজরতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কোন্‌ ধর্ম্মানুযায়ী চলিতেছ?" হজরত বলিলেন, যিনি সকলের স্রষ্টা, বিধাতা, পাতা, যিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের অধীশ্বর; স্থাবর, জঙ্গম, জল, স্থল, সরিৎ, সিন্ধু, সাগর, মহা-সাগর, পাহাড়, পর্ব্বত, ভূচর, খেচর সকল রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভু; যাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা অদ্বিতীয় বিশ্ব-স্রষ্টার ও তাঁহার স্বর্গীয় দূতগণের—তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারকগণের এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় মহাত্মা এব্রাহিমের ধর্ম্মানুযায়ী চলিতেছি। আল্লাহ্‌ তাঁহার জগতবাসী ভৃত্যগণকে সত্যধর্ম্ম শিক্ষার্থ আমাকে এই মর্ত্ত্যভূমে প্রেরণ করিয়াছেন। হে তাত! আপনিও আল্লার ভৃত্যদিগের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য যোগ্য ব্যক্তি। অতএব আমি

আপনাকে এই সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ও ইহার বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আবুতালেব বলিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, একান্ত বিশ্বাস্য; কিন্তু সামাজিক প্রথার অনুরোধে আপাততঃ পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লার অনুগ্রহে যতকাল জীবিত থাকিব, তোমাকে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্নবান হইব। তৎপরে তিনি হজরত আলীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রাণাধিক পুত্র! তোমার ধর্ম্ম কি?

হজরত আলী (রাজিঃ) হর্ষোৎফুল্লচিত্তে প্রশান্তমনে উত্তর করিলেন, পিতঃ! নিরাকার জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লার এবং তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। যাঁহার কৃপায় এ মানবদেহ ও বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই অর্চ্চনা, স্তব-স্তুতি ও বন্দনায় জীবন অতিবাহিত করিব। আর এই ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যাঁহার অনুগ্রহে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহকে অবগত হইতে পারিয়াছি, যিনি পাপের অন্ধকারময় কলুষকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া সদা দীপ্তমান ধর্ম্মের সরল সুপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি আমার ধর্ম্মপথের চালক, ভবার্ণবের কাণ্ডারী, যাঁহার ধর্ম্মে ইহকালে শান্তি পরকালে মুক্তি, সেই মহাপুরুষ

মহাত্মা হজরত মোহাম্মদের (ছাল্ঃ) প্রচারিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছি।

আবুতালেব স্নেহ সহকারে পুত্রকে বলিলেন, বৎস! তাঁহারই অনুগামী হইয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথের অনুসরণ কর।

হজরত মোহাম্মদ (ছাল্ঃ) ধর্ম্ম প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া প্রধান সহচর আলী (রাজিঃ)কে সঙ্গে লইয়া কোরেশবংশীয় আত্মীয়গণের নিকট মহোৎসাহে প্রত্যহ ধর্ম্মের মধুরতাময় সদুপদেশ-সুধা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। একদিন হজরত আলীকে বলিলেন, আলি! তুমি কোরেশ-বংশীয় সমুদয় ব্যক্তিকে আমার গৃহে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। আলী (কঃ-অঃ) হজরতের আদেশানুসারে সমস্ত কোরেশীয় সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে হজরতের গৃহে ভোজনার্থ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদি নানা উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করাইলেন। আহারান্তে তিনি ধর্ম্মের সারগর্ভপূর্ণ মধুময় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারায় কোরেশ-দিগের নিকট তাঁহার ধর্ম্মমত ও স্বর্গীয় আদেশগুলি প্রকাশ করিলেন এবং তাহার সারমর্ম্ম উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। উপসংহারে ওজস্বিনী ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেহই উপসনার যোগ্য নহে। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ সমুদয় লোকের নিকট সত্যধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সকলেই

পরিণামে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আল্লাহতালা তাঁহার অপার্থিব পবিত্র সুধাময় উপদেশগুলি আপনাদের ও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট প্রচার করিতে আমাকে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। যাঁহার নামে সমগ্র জগৎ পবিত্র ও আনন্দে উৎফুল্ল এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, আপনাদের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই স্বর্গীয় আল্লাহ্ প্রদত্ত উপদেশসুধা পান করিতে ইচ্ছুক? কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই সনাতন ধর্ম্মের মহামন্ত্র গ্রহণে চরিতার্থ হইতে বাসনা করেন? কোন্ কোন্ সৌভাগ্যবান্ সাধু পুরুষ ধর্ম্মপ্রচারে ভ্রাতার ন্যায় আমার সাহায্যকারী হইয়া আমার মতাবলম্বী হইতে অভিলাষী? আসুন—শীঘ্র আসুন, ইসলাম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন।

হজরতের এই পাষাণ-বিগলিত কোমল ভাবব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সে সময় কাহারও কাহারও বদনমণ্ডলে বিস্ময়ের রেখা অঙ্কিত হইল মাত্র। অবশেষে হজরত আলী (কঃ-অঃ) ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য হজরতের সম্মুখভাগে অতুল সাহসে দণ্ডায়মান হইলেন। হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) আলী করমুল্লা অজহুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বলিলেন, হে সমাগত ব্যক্তিবর্গ! আপনারা আমার ভ্রাতা, মন্ত্রদাতা ও প্রতিনিধিকে দর্শন করুন, একাগ্রচিত্তে ভক্তি সহকারে ইঁহার উপদেশ শ্রবণ করুন। এই

বলিয়া হজরত (ছালঃ) আলী (রাজিঃ)কে আপনার স্থানে স্থাপন করিয়া কোরেশগণকে সত্যধর্ম্মের উপদেশমালা প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন।

হজরত আলী (কঃ-অঃ) হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)এর আদেশানুসারে নিম্নলিখিত উপদেশ কোরেশগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে কোরেশগণ! তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহাকেও কিম্বা জগতস্থ কোনও পদার্থকে প্রণিপাত করিও না; সেই অদ্বিতীয় নিরাকার অখিলপতি আল্লাহ্‌কে জ্ঞানচক্ষে লক্ষ্য করিয়া কায়মনসমর্পণে একমাত্র তাঁহারই নামে আত্মোৎসর্গ কর। সতত তাঁহারই উপাসনায় জীবন অতিবাহিত কর। সত্যপথ-ভ্রষ্ট পাপাত্মা শয়তানকে চিনিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণে দণ্ডায়মান হও। পরকালের বিষয় অবগত হইয়া তাহার কামনা কর, আর সংসারের বিষয় অবগত হইয়া তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হও। সাবধান, যেন সংসারের পাপের মোহিনী শক্তি তোমাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে ভুলাইয়া না রাখে। আপাত মধুর পাপ-প্রলোভনরূপ কীটাবলী যেন তোমাদের ধর্ম্মের অঙ্কুরগুলিকে বিনষ্ট না করে। দীপ্তমান সনাতন সত্যপথ দৃষ্টি করিয়া সেই পথ অবলম্বন কর। অনিত্য অসত্য পথ ঘৃণিতভাবে পরিত্যাগ করিও।

অতঃপর আলী (কঃ-অঃ) দ্বিতীয় উপদেশটী এইরূপ সরলভাবে সকলকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, সংসারে মানব-

কুলের জন্য তিনটী সামগ্রী উত্তম। ১ম, পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ; ২য়, পবিত্র দেহে—পবিত্র চিত্তে মহাগ্রন্থ কোর-আন শরিফ পাঠ; ৩য়, প্রেরিত-পুরুষের প্রতিনিধিত্ব।

হজরত আলী (কঃ-অঃ) তৃতীয় উপদেশটী মধুর ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে চেষ্টা করে, ধর্ম্ম তাহার জন্য স্বর্গীয় সুখ অন্বেষণ করে এবং যে ব্যক্তি পাপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, অনন্ত শাস্তিবিধানের জন্য নরকে তাহার চিরনিকেতন প্রস্তুত হয়। অতএব হে সমাগত ব্যক্তি-গণ! সেই সর্ব্বপ্রকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, বিধাতা, সর্ব্বসুখ-বিধানের নিয়ন্তা, প্রভু আল্লাহর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না, তাঁহার অপ্রীতিকর কোন কার্য্য করিও না, তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহারও অর্চ্চনা আরাধনা করিও না। ব্যভিচার, পরনিন্দা, পরদারগমন, পরদ্রব্যাপহরণ, কাহারও মনে অযথা ক্লেশ দান ইত্যাদি দুষ্ক্রিয়া সকল সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে। ইহা আল্লাহর অনুমোদিত আদেশ। সাবধান! তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইও না এবং সতত সদনুষ্ঠান ও সদ্ব্যবহার দ্বারা মহাধর্ম্ম প্রচারককে সন্তুষ্ট করিবে এবং তাঁহার সম্মানের জন্য সুখে দুঃখে প্রেরিত-পুরুষের অনুগামী হইবে। কোরেশগণ যুবক আলীর হৃদয়গ্রাহী মধুরতাময় বক্তৃতা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় বাক্য-চ্ছটায়, গভীর জ্ঞানগবেষণাপূর্ণ স্নিগ্ধ উপদেশালোকে কোন কোন ব্যক্তির পাপতিমিরাচ্ছন্ন চিত্ত আলোকময় হইয়া উঠিল।

তাহারা সত্য অসত্য নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়া, সাগ্রহে অকপট-চিত্তে ভক্তি-পবিত্রপূর্ণ হৃদয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কেহ বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। কিন্তু আবু লাহাব ও তাহার দলস্থ কতিপশ নীচাশয় পাপাত্মা নানা প্রকার অশ্রাব্য ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করিতে করিতে সভাস্থল পরিত্যাগ করিল। পাপীষ্ঠ পিশাচ আবুলাহাব এবং আরও কতিপয় নারকী নরাধম হজরত আলীর প্রতি পাপময় তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া রোষবিহ্বল অন্তরে প্রস্থান করিল। আরব দেশে সত্য সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে হজরত আলী (কঃ-অঃ) কোরেশগণের নানারূপ লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা আবুতালেব প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময় আবুতালেব কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন।

তিনি জীবনের অন্তিমকাল সমুপস্থিত বুঝিয়া আত্মীয় স্বজনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা আত্মীয়গণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিও। পরস্পর কেহ কাহারও প্রতি দ্বেষ, হিংসা, বিপক্ষতাচরণ করিও না। আমার প্রিয় পুত্র আলী ও ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদের প্রতি অন্যায়াচরণ ও অত্যাচার করিও না। মোহাম্মদ আল্লাহর আদেশে জীবনের একটা মহান্ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। আরবের বিভিন্ন স্থানের মহামহোপাধ্যায় মহজ্জন সকল তাঁহার উপদেশাবলী মূল্যবান্ জ্ঞানে শিরোধার্য্য পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

আমিও তাঁহার ধর্ম্মময় উপদেশবাক্য অন্তরের সহিত স্বীকার করিয়াছি ও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। তোমরাও তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিও। তাঁহাকে ভক্তি করিও, প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিও। তাহারা বলিল, আপনি মোহাম্মদ (ছালঃ)কে আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ করুন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিব। আবুতালেব, হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) ও আলীকে ডাকাইয়া কোরেশদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। তচ্ছ্রবণে হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, আমি তাহাদিগকে একটী মাত্র কথা উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করি; যদি তাহারা তাহাতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহারা অবাধে একমাত্র আরব দেশের অধিশ্বর হইতে পারিবে! তদুত্তরে আবুজেহেল বলিল, একটী কেন? সহস্র সহস্র কথা উচ্চারণ করিতে বিমুখ হইব না। হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন—"এক মাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (ছালঃ) তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক" এই বাক্য অকপটে অন্তরের সহিত স্বীকার কর ও মুখে উচ্চারণ কর। এই কথা শুনিয়া কোরেশগণ ক্রোধোত্তেজিত অন্তরে বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিল। হজরত আলী (কঃ-অঃ) আবুতালেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পিতঃ! দুরাচার কোরেশগণের ব্যবহার দেখুন। এই মাত্র তাহারা স্বীকার করিয়াছিল, মোহাম্মদের (ছালঃ) সহস্র সহস্র বাক্য অবাধে উচ্চারণ করিব, কিন্তু একটী মাত্র

কথা উচ্চারণ করিতে বলাতেই বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। কুপথগামী কোরেশগণকে ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিয়া, ভীষণ নরকাগ্নি হইতে মুক্তি প্রাপ্তির মহামন্ত্র উচ্চারণ করিবার উপদেশ দেওয়ায়:তাহারা তাহার প্রতিকারে, আমাদের সহিত মহাশত্রুতাভাব প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পাপের মোহান্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে গভীর নরককূপে পতিত হইয়া, অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তত্রাচ আমাদের সহিত শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ করিবে না। আপনি জীবিত থাকিতে আপনার বিদ্যমানে আমাদের প্রতি কিরূপ অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা আপনি স্বয়ং দেখিলেন; সুতরাং আপনার অবিদ্যমানে আমাদিগকে নিঃসহায় নিরাশ্রয় জ্ঞানে আমাদিগের প্রতি অসঙ্কোচে শত্রুতাসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

আবুতালেব পুত্রের এবম্বিধ আক্ষেপপূর্ণ বাক্যে বাৎসল্য-স্নেহে বিগলিত হইয়া বলিলেন, বৎস! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। তোমরা যখন আল্লাহর আদিষ্ট সত্যধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাতে আত্মা-মন সমর্পণ করিয়াছ, তখন তিনিই তোমাদিগকে সকল প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন। সেই বিঘ্নহন্তা ভয়ত্রাতা, জগৎপাতা করুণাময়ের কৃপায় সমগ্র আরববাসী তোমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেও, তোমাদের কণামাত্রও অনিষ্ট সাধন করিতে

পারিবে না। আবহমান কাল হইতে অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের একাধিপত্য রহিয়াছে ও থাকিবে। তনয়! "যথা ধর্ম্ম তথা জয়" এই সাধুবাক্য কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? যেমন পূর্ণচন্দ্র বিকাশে তমসাচ্ছন্ন রজনীর ঘোর অন্ধকার অনন্ত-গহ্বরে লুক্কায়িত হয়, তেমনি ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃতে পাপ-তিমির চঞ্চলা চপলার ন্যায় অন্তর্হিত হয়। অতএব প্রিয় বৎসগণ! নির্ভীকচিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কর। দুরাচার কোরেশগণ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

তৎপর হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মোহাম্মদ! হতভাগ্য কুপথগামী কোরেশগণ তোমার মুক্তিপ্রদ উপদেশ-রত্ন গ্রহণ করিল না। তাহারা নরকের কীট। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই নরকই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। আল্লাহ তাহাদের কর্ম্মফলের পুরস্কার স্বরূপ প্রধানতম নরকে (জাহান্নাম) উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং তোমার প্রচারিত ধর্ম্মের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ তাহাদের অন্তরে স্থান পাইতেছে না। যদিও দুরাত্মাগণ তোমার ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই, কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে তোমার প্রচারিত ধর্ম্মে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

তাঁহার বাক্যের ভাবভঙ্গিমায় হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) মনে মনে ভাবিলেন যে জ্যেষ্ঠতাত বোধ হয় ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে ইস্‌লাম-মন্ত্র

(কলেমা) উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আবু-তালেব বলিলেন, মোহাম্মদ! আমি এই মুমূর্ষুকালে কোরেশ-গণের ভর্ৎসনা লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিব না, তাহারা বলিবে, আবুতালেব সুস্থ সবল অবস্থায় ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, জীবনের অন্তিমকালে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব আর তুমি ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিও না। হজরত বলিলেন, পিতৃব্য আপনি আমাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে বহু কষ্টে লালন পালন করিয়াছেন। আশৈশব আমার প্রতি কত স্নেহ, কত মমতা কত যত্ন, কতই সাহায্য করিয়াছেন, আজীবন যে ঋণজালে আবদ্ধ আছি, তাহার কিছু মাত্র পরিশোধ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে এ জীবনের অন্তিমকালে যদি একটিবার মাত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূল মন্ত্র (কলেমা) অকপটচিত্তে ভক্তি সহকারে উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে আল্লাহর নিকট আপনার পাপ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিব।

এই ঘটনার পর হজরতের প্রতি এই মর্ম্মের অহি নাজেল হইল, যথা :—তুমি কাহারও পথপ্রদর্শক নও। জগতে আমিই একমাত্র সৎপথ প্রদর্শক। আমার সহায় ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। আমিই কুপথগামী মানবের অন্তরে জ্ঞান-ধর্ম্মের বিমলজ্যোতিঃ প্রদান করিয়া সৎপথে আনয়ন করিতে সাহায্য করিয়া থাকি। আমিই উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অপার সমুদ্রে

মগ্নপ্রায় তরণীর কাণ্ডারীরূপে মুমূর্ষু মানব জীবন রক্ষা করিয়া থাকি। আমিই মুহূর্ত্তে অতলস্পর্শী বারিধিকে গগন-ভেদী পর্ব্বতে এবং সিংহ ব্যাঘ্র সমাকুল বিজন বনকে সৌধমালায় সুশোভিত মানব কোলাহল পূর্ণ বিশাল নগরীতে পরিণত করিতে পারি। জগতের সমগ্র কার্য্য আমারই আজ্ঞা ও ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়া থাকে। আমার আজ্ঞা বা ইচ্ছা না হইলে শত চেষ্টায় কাহারও উদ্দেশ্য সফল হয় না।

অনন্তর হজরতের নিকট আল্লাহর আদেশ বাক্য (আয়েত) অবতীর্ণ হইল। (তফ্‌সির হোছেনা) "তুমি যাহাকে স্নেহের সহিত সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাক, সে সৎপথ অবলম্বন করে না। কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ যাহাকে প্রদর্শন করান, সেই সৎপথ অবলম্বন করে। তিনি সৎপথগামীদিগের বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন।"

হজরত আবুল ফেদা (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে অবুতালেব ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আব্বাস (রাজিঃ) তাঁহার মুমূর্ষাবস্থায় শিয়রে বসিয়া পবিত্র কলেমা উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছিলেন। হজরত আব্বাসের নিকট এই শুভ সংবাদ শুনিয়া যার পর নাই সুখী হইলেন। পরন্তু পরম-ভক্তিভাজন পিতৃব্যের মৃত্যু সংবাদে শোকে দুঃখে বিহ্বল হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং আল্লাহর নিকট তাঁহারা আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত ও পাপ মার্জ্জনার জন্য কাতর-বাক্যে

প্রার্থনা করিলেন। অবশ্য এই রওয়ায়েত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। আবুতালেবের মৃত্যুতে হজরত (ছালঃ) বহুদিন পর্য্যন্ত শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে কালযাপন করিয়াছিলেন। যেহেতু, হজরত অতি শৈশবকাল হইতেই তাঁহার সাতিশয় যত্ন ও স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং বয়োপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই অনুগ্রহে শত্রুগণের প্রবল প্রকোপ হইতে নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত থাকিতেন। হজরতকে কোরেশ শত্রুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। কোরেশগণের অসীম উৎপীড়নে নিপীড়িত হইয়া আবুতালেবের কয়েকবৎসর যাবৎ অনিদ্রায় অনশনে হজরতসহ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ বন্দাভাবে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। ঈদৃশ হিতাকাঙ্ক্ষী পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠতাতের বিয়োগ-বিরহে হজরত নিতান্ত শোকাকুল হইয়া নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আল্লাহর উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং পিতৃব্যের আত্মার মঙ্গলার্থে সকরুণবাক্যে মুক্তিদাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

মহাবীর হজরত আলী (কঃ অঃ) পরম ভক্তিভাজন পিতার মৃত্যুতে শোকে, দুঃখে এবং মনস্তাপে নিতান্ত অধীর হইরা পড়িলেন। অনন্ত শোকোচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্নপ্রায় হইয়া পড়িল। অবশেষে শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে মৃতদেহের সৎকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শবদেহ রীত্যনুযায়ী

ধৌত ও স্নান করাইয়া এবং আতর, কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত নববস্ত্র পরিধান করাইয়া সমবেত কোরেশগণসহ সমাধি স্থানে শবদেহ আনয়ন করিলেন এবং পবিত্রভাবে মহাসমারোহে সমাধিস্থ করিয়া সকলে আপন আপন আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন। হজরত আলীর বয়ঃক্রম যখন তেইশ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে আবুতালেবের মৃত্যু হয়। তিনি পরম রূপবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহকান্তি ও অঙ্গসৌষ্ঠব অতীব প্রীতিপ্রদ ও নয়নানন্দদায়ক ছিল। মিষ্ট-ভাষিতা ও সরলতাগুণে তিনি সর্ব্বসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিলেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, পরোপ-কারিতা, বিনয়, উদারতা সত্যবাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহে তিনি ভূষিত ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর দুর্ব্বৃত্ত কোরেশগণ হজরত (ছালঃ) ও হজরত আলীর প্রতি প্রবল শত্রুতা আরম্ভ করিল। পরন্তু আরবকেশরী বীরচূড়ামণি মহাত্মা আলী (কঃ অঃ) কায়ার ছায়ার ন্যায় হজরতের অনুবর্ত্তী থাকিয়া অসীম সাহস ও বীরত্বের সহিত নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন এবং কখন কখন মৃগয়ার্থে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মৃগয়ালব্ধ পশু আনিয়া হজরতের নিকট উপস্থিত করিতেন।

হজরত আলী কর্ত্তৃক জ্বেন বন্ধন।

অমিততেজা বীরবর হজরত আলী (কঃ) অসীম সাহসে, নির্ভয়চিত্তে আরবদেশের পর্ব্বত, প্রান্তর, অরণ্য ও মহারণ্যে মৃগয়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্যে ও পদভরে ধরণী বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিলে সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি অরণ্য-বিহারী শ্বাপদকুল তাঁহার ভীতিপ্রদ তেজোময় মূর্ত্তি অবলোকনে প্রাণভয়ে গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইত। কেহ বা ঊর্দ্ধশ্বাসে যোজনপথ অতিক্রম করিয়া আপনাকে নিরাপদ বিবেচনা করিত। এরাক নিবাসী জনৈক মহাত্মা প্রণীত ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, একদা হজরত আলী (রাজিঃ) মৃগয়ার্থে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্লান্তকলেবরে উদ্যানস্থ এক খর্জ্জুর বৃক্ষ মূলে বিশ্রাম-মানসে উপবিষ্ট হন, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, খর্জ্জুর আহরণার্থ বৃক্ষোপরি আরোহণ করিতে আরম্ভ করেন। বৃক্ষে উঠিতে উঠিতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ দেখিতে পাইলেন, কতিপয় লোক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া খর্জ্জুর ভক্ষণ করিতেছে। তখন তিনি ক্রোধোত্তেজিত-স্বরে তাহাদিগকে বলিলেন, রে পরস্বাপহরণকারী দুরাত্মাগণ! উদ্যানস্বামীর বিনা আদেশে অপহরণ করিয়া খর্জ্জুর ভক্ষণে পাপ-উদর পূর্ণ করিতেছিস্। অধর্ম্মাচারী পাপাত্মাগণ দূর হ'। তাহারা হজরত আলীর বজ্রনাদসম কঠোরবাক্যে ভীত হইয়া সত্বর পলাইয়া গেল।

কিন্তু একজন দুরাত্মা বৃদ্ধ জ্বেন আত্মগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া হজরত আলীকে বলিল, মানবতনয় ওরে বালক! কাহার সঙ্গে এমন আত্মম্ভরিতা ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্, জানিস্? আমরা জ্বেনবংশীয় মহাপরাক্রমশালী জ্বেন সম্প্রদায় বহুকাল যাবৎ এই উদ্যানের ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া থাকি: আজ কিনা তোর ন্যায় ক্ষীণ-দুর্ব্বল মানব ভয়ে ব্যাধ-বিতাড়িত শশকের ন্যায় পলায়ন করিব? বীরকেশরী আলী (কঃ) রক্তজবা-রাগরঞ্জিত লোচনে বীরদর্পে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, রে দৈত্যাধম! এত আস্পর্দ্ধা কেন? মানব বলিয়া কি হীনবল কাপুরুষ বিবেচনা করিয়াছিস্? শীঘ্রই তোর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতেছি। ইত্যবসরে দুরাত্মা দৈত্য সহসা নিজ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক হজরত আলী (রাজিঃ)কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। মহাবীর আলী (রাজিঃ) ক্ষিপ্রতার সহিত একগাছি লতা ছিন্ন করিয়া তাহাতে এস্‌ম্ (মন্ত্র) পাঠ করিয়া ফুৎকার করিলেন এবং পদাঘাতে উত্তেজিত দৈত্যকে ভূতলশায়ী করিয়া মন্ত্রসাধিত লতাপাশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। দৈত্য বন্ধন-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিনীতভাবে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিল, হে বালক! আমার কর-বন্ধন মোচন করিয়া দাও। আমি এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করি। হজরত আলী (রাজিঃ) পৌরুষ বচনে কহিলেন, রে পাপাত্মা! ইহাই তোর স্বকৃত পাপের সমুচিত প্রতিফল। ইহাই তোর আত্ম-গরিমা রোগের মহৌষধ। এই বন্ধন-যন্ত্রণা তোর পূর্ব্বকৃত

অপরাধের পুরস্কার। কিছুকাল এই দুর্নিবার কষ্ট ভোগ করিয়া কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর। এই মধু-মিশ্রিত বাক্য-বাণে দৈত্যরাজকে আপ্যায়িত করিয়া বীরবর আলী অন্যত্র গমন করিলেন।

কোরেশগণ হজরতের সহিত পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজিত হইয়া সকলে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল। মক্কা নগরের সর্ব্বত্রই হজরতের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হওয়ায় নগরস্থ লোক সমূহ দলে দলে উপস্থিত হইয়া হজরতের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

এদিকে অগণিত জ্বেন সম্প্রদায় মক্কা নগরে উপস্থিত হইয়া সাগ্রহে ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। কতিপয় জ্বেন ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইস্‌লামীয় রীতিনীতি, কর্ত্তব্য কার্য্য প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি হজরতের নিকট শিক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর এক বৃদ্ধ দৈত্য হজরতের সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে দয়াশীল মহাত্মা প্রেরিত পুরুষ! কৃপাপূর্ব্বক অধীনকে এই অশেষ যন্ত্রণা-প্রদ কর-বন্ধন মোচন করিয়া অধীনকে এই নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদানের আজ্ঞা করুন। আর এ কঠিন লতাবন্ধন সহ্য করিতে পারিতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে, আত্ম-হত্যা করিয়া এই দুর্নিবার জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করি। হজরত মোহাম্মদ (ছ,লঃ) বৃদ্ধ জ্বেনের কাতর প্রার্থনায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)কে দৈত্যের কর-বন্ধন

মোচন করিতে আদেশ করিলেন। আবুবক্কর সিদ্দিক (রাজিঃ) হজরতের অনুজ্ঞাক্রমে দৈত্যকে বন্ধন মুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টায় ব্রতী হইলেন, কিন্তু তাঁহার শত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে হজরতের আদেশানুযায়ী ওমর ফারুক (রাঃ), ওসমান গণি (রাজিঃ) বন্ধন মোচনার্থে বহু আয়াস ও উপায় অবলম্বন করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। ঐ লতা-বন্ধন ছেদন জন্য বীরবর খালেদ (রাজিঃ)ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে হজরত নিতান্ত বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। দৈত্যবর হতাশ হইয়া বাষ্প বিগলিত নেত্রে কাতরকণ্ঠে বলিল, হজরত! আমার আর কর-বন্ধন মোচন আশা বিফল। ইহাই এ হতভাগার অদৃষ্ট-লিপির অখণ্ডনীয় বিধান। সুতরাং ইহা দৈত্য-নির্ব্বন্ধ নিয়তি-লিখন। এ দুর্গতি নিবারণ হইবার কোন উপায় নাই। এতদ্দর্শনে হজরত বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে করুণার্দ্র হৃদয়ে বলিলেন, হে বৃদ্ধ! কোন কঠিনহৃদয় নির্দ্দয় পুরুষ তোমার হস্তে এই দুশ্ছেদ্য কঠিন বন্ধন করিয়াছে যে, সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে শত শত বীরপুরুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অক্ষম হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ বলিল, হজরত! একদা উদ্যানস্থিত এক খর্জ্জুর বৃক্ষে আরোহণ করিয়া নির্ভয় চিত্তে আমি খর্জ্জুর ভক্ষণ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে এক বীরকেশরী বালক তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে বীরদর্পে খর্জ্জুর ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিল। আমার কুমতি

ঘটিল, আত্মাহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া উপেক্ষিত চিত্তে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিলাম না; বরং ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে তাঁহার প্রতি কতিপয় রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিলাম। সেই বীরকেশরী আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বজ্রসম এক কঠিন মুষ্ট্যাঘাতে আমাকে ভূতলশায়ী করিল, এবং পাপের প্রতিফলস্বরূপ আঙ্গুর লতায় দৃঢ়রূপে আমার কর বন্ধন করতঃ বীরপদ বিক্ষেপে প্রস্থান করিল। এই প্রকারে বৃদ্ধ আনুপূর্ব্বিক নিজের দুর্দ্দশার বিষয় বিবৃত করিতে করিতে দুঃখে, অনুতাপে বর্ষা-বিগলিত বারিদের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার বিলাপধ্বনি সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে হঠাৎ হজরত আলী (কঃ-অঃ) শাণিত করবাল ধারণ করিয়া বীরবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ দৈত্য অকস্মাৎ কৃতান্তস্বরূপ তাহার পূর্ব্বপরিচিত ভয়াবহ হৃদ্‌কম্প মূর্ত্তি অবলোকনে আতঙ্কে প্রাণভয়ে বিকট চীৎকার করতঃ উন্মত্তের ন্যায় "ঐ, ঐ" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সহসা বৃদ্ধের এ অভিনব দুর্দ্দশা দেখিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইলেন। অনন্তর বহুকষ্টে দৈত্যের মূর্চ্ছা অপনোদন করা হইল। বৃদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করিয়া হজরত আলীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া সবিনয়ে কাতরকণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। আলী (রাজিঃ) তাহার কাতরতা ও বিনীত প্রার্থনায় নিতান্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া অবিলম্বে তাহার কর-বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, হে দৈত্যগণ! তোমরা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া

আমাদের সহিত অভেদাত্মা হইয়াছ। তোমাদের সহিত আমাদের আর কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তি এক প্রাণ ও এক মাতার গর্ভজাত সহোদর স্বরূপ। এই প্রকারে আলী (কঃ অঃ) স্নেহময় মধুর বাক্যে জেনগণকে (দৈত্য) সন্তুষ্ট করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হজরত আলীর সহিত আবু জেহেলের যুদ্ধ।

ধাম্মিক প্রবর হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রেরিতপুরুষ মোহাম্মদ (ছালঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন! এক্ষণে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা কত? হজরত বলিলেন, তোমাকে লইয়া অদ্য একচল্লিশ ব্যক্তি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দাক্ষিত হইল। ওমর (রাজিঃ) পুনরায় আবেদন করিলেন, আপনারা কোন সময় কিরূপ ভাবে আল্লাহর উপাসনায় ব্রতী হন? হজরত বলিলেন, আমরা আল্লাহ আদেশানুসারে দিবারাত্র মধ্যে নিরূপিত পঞ্চবার বিধর্ম্মীগণের ভয়ে সংগোপনে আল্লাহর উপাসনায় নিয়োজিত থাকি। ওমর (রাজিঃ) নিবেদন করিলেন, হজরত! আপনি সর্ব্ব নিয়ন্তা ব্রহ্মাণ্ডপতি অদ্বিতীয় নিরাকার আল্লাহতালার প্রেরিতপুরুষ, অধর্ম্মচারী পাপাত্মা বিধর্ম্মী কাফেরের ভয়ে ভীত হইয়া সংগোপনে উপাসনা

করিবেন? তাহারা সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়া, নিজ সৃষ্টি-কর্ত্তাকে বিস্মৃত হইয়া, পাপের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জড়ময় প্রস্তর পুত্তলিকার আরাধনা, অর্চ্চনা প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন করিতে সঙ্কুচিত হয় না; আর আমরা সর্ব্ব ভুবনের অধীশ্বর সর্ব্বময় আল্লাহর অর্চ্চনা, উপাসনা গোপনে সম্পাদন করিব? হজরত! বড়ই লজ্জা ও দুঃখের বিষয়, সত্যের জ্যোতির্ম্ময় পথে বিচরণ করিতে—সনাতন অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা গোপনে করিতে হইবে? আমরা কি এত হীনবীর্য্য! আমাদের বাহুতে কি অসি ধারণের ক্ষমতা নাই? যাহা হউক, অদ্য আমরা প্রকাশ্য-ভাবে উপাসনা কার্য্য সমাপ্ত করিব। সকলে নির্ভয় অন্তরে অগ্রসর হউন, অদ্যই কাবা-মন্দিরে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর উপাসনা করা হইবে। যে বিধর্ম্মী নারকী আমাদের এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা প্রদান করিবে, নিশ্চয় জানিবেন, ওমরের এই কোষমুক্ত অসি তাহার পাপ শোণিতে রঞ্জিত হইবে। ইহলোকে কোন্ হতভাগ্যের জীবন ভারাক্রান্ত হইয়াছে যে, আমার শাণিত অস্ত্রের সম্মুখবর্ত্তী হইতে সাহসী হইবে? এই বলিয়া ওমর (রাঃ) অসীম সাহস সহকারে হজরতের পবিত্র করকমল ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। বামে হজরত হামজা, দক্ষিণে হজরত আবুবক্কর সিদ্দিক, সম্মুখে হজরত আলী (রাজিঃ) ও সম্মুখে সর্ব্বাগ্রে মুক্ত অসি হস্তে ওমর (রাজিঃ) নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় চক্রাকারে হজরতকে পরিবেষ্টন করিয়া ধর্ম্মালয় কাবা মন্দিরের দিকে উপাসনা উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেন এবং

অনতিবিলম্বে সকলেই কাবামন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। আবুজেহেল এবং প্রধান প্রধান কোরেশগণ কাবা নিকেতনের অন্তর্ভুক্ত এসমাইন নামক গৃহে সকলে দলবদ্ধ হইয়া হজরতকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছিল। দূর হইতে ধর্ম্মোৎসাহী ওমর (রাজিঃ)কে লক্ষ্য করিয়া আবুজেহেল উপহাস সহকারে কহিল, কৈ ওমর মোহাম্মদের মস্তক কৈ ? তুমি তাহার মস্তক আনিতে গিয়া নিজ মস্তক উপহার দিয়া আসিলে ? তাহাকে হত্যা করিতে গিয়া নিজেই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ?

হজরত ওমর বজ্র-নিনাদবৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রকৃতি সম্যক অবগত আছে, সে সাবধানে আমার সহিত কথা কহিবে; আর যে ব্যক্তি জীবনে কখনও আমাকে চিনিবার অবসর পায় নাই, সে উত্তমরূপে আমাকে চিনিয়া লউক। আমি অধর্ম্মাচারী ইস্লাম-বিদ্বেষী পাপাত্মা নরাধমগণের পক্ষে করাল কৃতান্তস্বরূপ খেত্তাব-পুত্র ওমর। আমি প্রেরিত মহা-পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) সমীপে মস্তক, এমন কি, আত্মা-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি এবং তোমাদিগকেও অনুরোধ করিতেছি, তোমরা তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণে কৃতার্থ হও। নতুবা এই সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তোমাদের দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া কৃতান্তালয়ে প্রেরণ করিব। আরব দেশ হইতে পৌত্তলিকের অস্তিত্ব আজ চির লোপ করিব। ইস্লাম ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃতে সমগ্র আরব জ্যোতির্ম্ময় করিব।

ওমরের এই প্রকার বীরত্বসূচক তেজোগর্ব্ব বাক্যে কোরেশ ও বিধর্ম্মিগণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। অনেকে স্বধর্ম্ম রক্ষায় নিরাশ হইয়া প্রাণভয়ে দ্রুত পদে পলায়ন করিল, কেহ কেহ আত্ম-গৌরব রক্ষার্থে সাহসে ভর করিয়া ওমরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও কি মোহাম্মদের প্রচারিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন? ওমর (রাজিঃ) মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ, আমিও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্ম-পরায়ণ ওমরের ধর্ম্মোত্তেজক বাক্যে বিধর্ম্মিগণ বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিল, হায়! হায়! এ ব্যক্তি আজ মোহাম্মদের মস্তক ছেদন করিতে গিয়া নিজের মস্তক তাহার চরণতলে অর্পণ করিল। কল্য যাহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ অসি করে ধারণ পূর্ব্বক কৃতান্তসম মহাতেজে সগর্ব্বে গমন করিল, আজ তাহারই কুহকে, তাহারই মায়ায় তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া, আমাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে উদ্যত! কাল যে ব্যক্তি আমাদের চিরশত্রুকে নিহত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, আজ সেই ব্যক্তি চিরশত্রুর পরমমিত্র হইয়া আমাদের জীবনবৈরী হইল! হায় রে! কালস্য কুটীলা গতি! তুমি কোন্ সময় কিরূপভাবে কোন্ পথ অবলম্বন কর, তাহা অপরিণামদর্শী মানবের হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। যাহা হউক, আমরাও অরিকুল নিধন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিব। মোহাম্মদ ও তাহার দলস্থ ব্যক্তিগণকে বিনষ্ট না করিলে আমাদের ধর্ম্ম, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

কোরেশ কাফেরগণ এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া হজরত ওমর (রাজিঃ)কে সর্ব্বপ্রথমে আক্রমণ করিল। হজরত ওমর (রাজিঃ)ও শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরবর আলী (কঃ-অঃ) বিধর্ম্মিগণের এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে রোষ-বিহ্বল সিংহের ন্যায় গগনভেদী নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সশস্ত্রে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। অকস্মাৎ মৃগপালে পতিত শার্দ্দূলের ন্যায় বীরকেশরী আলী (রাজি) বিধর্ম্মী দলে প্রবেশ করিয়া, মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত ও অস্ত্রাঘাতে যাহাকে যাহাতে সুযোগ পাইলেন, তাহাকেই যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আলীর বীরত্বে ও রণনৈপুণ্যে বিধর্ম্মিগণ প্রলয়জ্ঞানে ঊর্দ্ধশ্বাসে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। হজরত হামজা (রাজিঃ)ও ওমরের পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া শত্রুকুল নিহত করিতেছিলেন। যখন হজরত আলী (রাজিঃ) বহুক্ষণ অমিততেজে যুদ্ধ করিয়া হজরত ওমরের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে অমিতপরাক্রমশালী এক বিধর্ম্মী যোদ্ধার সহিত ওমর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। বিধর্ম্মী পুরুষ অকস্মাৎ প্রলয়ের কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর হজরত আলী (রাজিঃ)কে দর্শন করিয়া সভয়ে পলায়নোদ্যত হইয়াও হজরত ওমরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও শাণিত অস্ত্রের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না। ওমর (রাজিঃ) ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে সজোরে ভূতলশায়ী করিয়া তাহার বক্ষোপরি উপবেশন পূর্ব্বক তাহার নয়নকোটরে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পরাজিত

আহত সৈনিক দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, "রক্ষা কর" "রক্ষা কর" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং বহু কাতর ক্রন্দন ও কাকুতি মিনতি করিয়া কোন প্রকারে হজরত ওমর (রাজিঃ)এর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ব্যাঘ্র তাড়িত মৃগের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে কোরেশগণ সহ পলায়ন করিল। বিধর্ম্মিগণের সহিত সমরে জয়লাভ করিয়া মহানন্দে, প্রফুল্লচিত্তে কাবা-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। হজরত মোহাম্মদ (ছলঃ) চল্লিশ জন সাহাবা (সহচর—বন্ধু) সহ মন্দির মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর উপাসনা (নামাজ) সমাধা করিলেন। সেই দিন হইতে নিরূপিত আল্লাহর আদিষ্ট অহর্নিশ পঞ্চবার উপাসনা আর গোপনভাবে রহিল না। ইস্‌লাম গৌরব-রবি পাপ-তিমির বিনষ্ট করিয়া পূর্ণ জ্যোতিঃতে বিকশিত হইল। বিদ্রোহিদলকে দমন করিবার জন্য হজরত হামজা (রাজিঃ) ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ অঃ) এই বীরত্রয় বদ্ধপরিকর হইলেন। মোসলেমগণের সাহস উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কোরেশগণের অত্যাচার ও শত্রুতার লাঘব না হইয়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা নানা প্রকারে মুসলমানদিগকে নির্য্যাতন করিতে লাগিল। কোন মুসলমানকে একাকী পথে বা প্রান্তরে পাইলে বিধর্ম্মিগণ তাহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছনা ও গুরুতররূপে প্রহার করিতে আরম্ভ করিত। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ নিদারুণ প্রহার ও শেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া প্রাণপণ যত্নে নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিকপ্রবর হজরত বেলাল

(রাজিঃ) পাষাণহৃদয় উম্মিয়ার কঠোর কণ্টকাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া অবিচলিত অন্তরে নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। বিধর্ম্মিগণের অত্যাচার ভয়ে কেহই গৃহের বাহির হইতে পারিত না। হাটে বাজারে কোন মুসলমানকে দেখিতে পাইলে কোরেশগণ তাহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও লাঞ্ছনা করিত। অবশেষে হজরতের বহু সংখ্যক সহচর (সাহাবা) ক্রমে ক্রমে আবিসিনিয়ায়, হাবেশ-রাজ নজ্জসীর আশ্রয়ে গেলেন। সেখানে গিয়া বাদশাহ নজ্জসীর সদয় ব্যবহারে নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পুরুষদিগের সঙ্গে তাঁহাদের কয়েক-জন সহধর্ম্মিণীও হাবেশ মুলুকে চলিয়া গিয়াছিলেন। অনেকে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া, গুপ্তভাবে মদিনায় হিজরত করিতে লাগিলেন।

হজরত আলীর মদিনা গমন।

দুরাত্মা কোরেশগণ মুসলমানদিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিয়া পরিশেষে সকলে মিলিত হইয়া সঙ্কল্প করিল যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় আল্লাহর অর্চ্চনা উপাসনার জন্য মক্কার সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, যিনি সমগ্র মোস্‌লেম দলের অধিনায়ক, যিনি পৌত্তলিক-ভক্ত মানবগণকে ধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় আলোক প্রদর্শন করাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন, তাঁহাকে শমন-সদনে পাঠাইতে পারিলেই মোস্‌লেমগণ নায়ক-

বিহীন হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে, আমাদেরও উদ্দেশ্য সফল হইবে ও সকল বিষয়ে নিরাপদ হইবে।

অনন্তর কোরেশগণ হজরতের বিনাশ সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। নিশাকালে নিদ্রিতাবস্থায় হজরতের শিরশ্ছেদন করিবে বলিয়া, গুপ্তভাবে ষড়যন্ত্র হইতেছিল। এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রতিপোষক আবুজেহেল, আবুলাহাব, ওম্মিয়া, নজর ও ওকম প্রভৃতি কতিপয় দুরাত্মা পাপাশয় কোরেশ ছিল। সেই রাত্রিতে আল্লাহর আদেশে স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল (অ.লাঃ) হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি অদ্যই রাত্রিকালে মক্কা নগর হইতে মদিনায় প্রস্থান কর। তোমাকে হত্যা করিবার জন্য পাপাত্মা আবুজেহেল ও কোরেশ-গণ গুপ্ত পরামর্শ করিতেছে। অতএব নিজ শয্যায় আলাকে শায়িত করিয়া অবিলম্বে আবুবক্কর সহ শীঘ্র শীঘ্র এ স্থান হইতে চলিয়া যাও। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) ইহা জ্ঞাত হইয়া আপন শয়নাগার পরিত্যাগ করিয়া আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং গরগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হজরত আলী করমুল্লাহ--অজহু হজরতের আজ্ঞানুসারে অকুতোভয়ে তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। হজরতের প্রয়ানের কিছুক্ষণ পরে, দুরাত্মা আবুজেহেল কোরেশগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিল। শয়নাগার হইতে হজরতকে বন্দীভাবে লইয়া যাইবে এবং প্রকাশ্য স্থলে সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ইস্‌লাম

ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের অন্তরে ভীতি উৎপাদন করা হইবে, এইরূপ সঙ্কল্প আঁটিতে লাগিল। অনন্তর পাপাচারী নরহন্তাভিলাষী দস্যুবৃন্দ সদলবলে মহোৎসাহে হজরতের পবিত্রাগারে প্রবেশ করিল এবং হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) অনুমানে হজরত আলী (রাজিঃ)কে আক্রমণ করিল। আবুজেহেল উচ্চৈঃস্বরে সৈনিকগণকে উৎসাহিত করিয়া বলিতে লাগিল, হে প্রিয় সৈনিকগণ! তোমরা সকলে সমবেত হইয়া সতর্কতার সহিত মোহাম্মদকে আক্রমণ কর। অনতিবিলম্বে মোস্‌লেম গৌরবশশী চির অস্তমিত হইবে। সাবধান! যেন ব্যাধ-বিস্তারিত পাশ ছিন্ন করিয়া শিকার পলায়ন করিতে না পারে। আজ আরবের চির কণ্টক দূর করিব। মক্কাবাসীদিগকে শান্তিদায়িনী তরুর সুশীতলচ্ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিয়া অন্যত্র গমন করিব। হে কোরেশবংশীয় বীরপুরুষগণ! আমি তোমাদের সমক্ষে লাত, ওজ্জা প্রভৃতি দেবতাগণের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আত্মীয় বলিয়া মোহাম্মদকে ক্ষমা বা তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া-প্রদর্শন করিব না ও কাহাকেও দয়া প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিব না এবং তোমরাও তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহের কল্পনাও মনের মধ্যে স্থান দিও না। এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর—কল্য প্রত্যূষেই সর্ব্বজন সমক্ষে তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিব। দেখি, কোন্ বীরপুরুষ তাহাকে রক্ষা করে? জগতের সমস্ত দেবতা তাহার সাহায্যার্থে আসিলেও আমার হস্ত হইতে আর উদ্ধারের উপায় নাই। সে

যদি আকাশে, সাগরে, পাতালে, পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তথাপি জানিও, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

আবুজহেলের ভীষণ প্রতিজ্ঞা ও উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে সৈন্যগণ হৈ হৈ রবে গৃহের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিল। কেহ কেহ অসি হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীমরবে গৃহ বিকম্পিত করিয়া তুলিল। কেহ বা গৃহ মধ্যে ইতস্ততঃ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হজরত আলী (কঃ অঃ) গৃহ মধ্যে সহসা শত্রুগণের কোলাহল শ্রবণে শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় গগনভেদী উচ্চ নিনাদে অসিহস্তে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শত্রু সম্মুখীন হইলেন এবং বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, রে বিধর্ম্মিগণ! জড়ময় শিলাখণ্ডকে আল্লাহ জ্ঞানে পূজা করতঃ প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)কে শত্রু মনে করিয়া, এই নিশীথ সময়ে তাঁহাকে হত্যাভিলাষে আসিয়াছিস্? নিশ্চয় জানিস্, আজ তোদের ইহলোকের লীলাখেলা শেষ। আজ তোদের মৃত্যু সন্নিকট। আজ একটীমাত্র প্রাণীও জীবন লইয়া পলাইতে সক্ষম হইবে না। আজ তোদের কৃতান্ত সদৃশ আলীর হস্তে সকলের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। আজ কোন্ হতভাগা মাতাকে পুত্রহীন, পুত্রকে পিতৃহীন ও ভার্য্যাকে বিধবা করিতে অভিলাষ করিয়াছিস্? সত্বর আমার শাণিত অস্ত্রের সম্মুখবর্ত্তী হ', আমার তরবারি সেই বিধর্ম্মীর রক্তে রঞ্জিত করিব। রে দস্যুপ্রকৃতির নীচাশয় পাপাত্মাগণ! চোরের ন্যায় নিশীথে সংগোপনে হত্যাকার্য্য সাধন করিয়া

কাপুরুষের পরিচয় দিতে আসিয়াছিস্? এই তোদের জ্ঞান-গরিমা? এই তোদের বীরত্বের পরিচয়? ধিক্, শত ধিক্ তোদের জীবনে!

হজরত আলীর এই প্রকার বীরগম্ভীর বাক্যে বিস্মিত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সকলে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল; এক পদও অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইল না। ব্যাঘ্র তাড়িত ভীতি-বিহ্বল মেষপালের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহারা সজীব কি নির্জীব, কিছুই অনুমান করা যায় না। এতক্ষণ যাহাদের জয়ধ্বনি ও আনন্দরোলে মেদিনী কম্পিত হইতেছিল, সহসা তাহাদের এ দুর্দ্দশা কেন ঘটিল? যাহাদের প্রাণে বীরপুরুষের বীরনাদ সহ্য হয় না, সেই বীরকেশরীর সহিত তাহাদের যুদ্ধসাধ কেন? আতঙ্কে যে পতঙ্গের জীবন শেষ হয়, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের সহিত তাহার ঈর্ষাভাব কেন? স্বয়ং বিশ্বপতি সতত যাঁহার অনুকূল, সামান্য নগণ্য কীটাণুকীট বিধর্ম্মিগণ তাঁহাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট সাধন করিতে পারে কি? আবুজেহেল বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কত প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনটাই তার মনে স্থান পাইল না। পাপরূপ আশার প্রপঞ্চে পতিত হইয়া কোথায় হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)কে হত্যা পূর্ব্বক চির মনোসাধ পূর্ণ করিবে—না তৎপরিবর্ত্তে পাপবাসনার প্রতিফল স্বরূপ কালান্তক সদৃশ মহাবীর আলীর হাস্তে ভবলীলা বা সাঙ্গ

হয়! যেমন কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইবার সঙ্কল্প করিয়া পরিশেষে পাপবাসনার ফলে নিজ রাজ্যধন সহ দ্বৈপায়নহ্রদে প্রাণ হারাইয়াছিল, তেমনি আবুজেহেল হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)কে হত্যা করিয়া. সমগ্র আরবে নিজ একাধিপত্য স্থাপন করিবে. এই সিদ্ধান্ত করিয়া, শেষে নিজেরই জীবন সঙ্কটাপন্ন করিল, আবুজেহেল অনন্যোপায় হইয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে অনুচ্চস্বরে হজরত আলীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি মোহাম্মদের (ছালঃ) সংবাদ জানেন কি? তিনি কোথায় অবস্থান করিতেছেন? হজরত আলী (কঃ-অঃ) ক্রোধোত্তেজিত স্বরে বলিলেন, রে দুরাত্মা আবুজেহেল! তোর দুরভিসন্ধি আমি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি, আমি কি এই স্থানে তাঁহার প্রহরীরূপে নিযুক্ত ছিলাম যে, তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহার তথ্য অবগত আছি? তাঁহার প্রতি আল্লাহর যখন যেরূপ আদেশ উপস্থিত হয়, তখনই তিনি তদনুসারে কাজ করেন। আমি তাঁহার আদেশানুসারে এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে তোদের অভিপ্রায় কি বল?

আবুজেহেল আলী (কঃ অঃ)এর কথার কোন উত্তর না করিয়া নীরবে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তথা হইতে সহসা শত্রুগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, ধর্ম্মপ্রাণ আলী (কঃ অঃ) হজরতের জন্য সবিশেষ চিন্তিত হইলেন। পাছে দুরাচার কোরেশগণের প্রতিহিংসানলে পতিত হইয়া বিপদাপন্ন

হন, তাই তিনি সর্ব্ব-বিঘ্নহারক বিপদতারণ আল্লাহর নানাবিধ স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। দারুণ দুশ্চিন্তা ও মনোকষ্টে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। কুসুমসম সুকোমল শয্যা দুশ্চিন্তায় কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির অবসানে প্রভাত—এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলেরই শেষ আছে, সেই নিয়মাধীনে হজরত আলীর (কঃ অঃ) চিন্তামর রজনীর অবসান হইয়া নবরূপে নববেশে উষা দেবীর আবির্ভাব হইল। উষার বিমল আলোকে রজনীর ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হইয়া ধরণী ঈষৎ আলোকিত হইল। নিশার অবসান বুঝিয়া হজরত আলী (কঃ অঃ) আল্লাহর নামোচ্চারণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং যথারীতি হস্ত পদ মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত (অজু) করিয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর স্বীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, হজরতের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া, মক্কাবাসী কোরেশগণ তাঁহার গমনে বাধা দিয়া তাঁহাকে তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। প্রণয়ীযুগলের অবিচ্ছিন্নপ্রায় সূত্রে যখন পরস্পরের আকর্ষণ পড়ে, তখন অকপট প্রণয়-পাশাবদ্ধ প্রাণ স্থির থাকিতে পারে কি? পরম সুহৃদের একদিনেরও বিরহ কষ্ট অসহ্য হইয়া পড়ে। তাই হজরত আলী (কঃ অঃ) আর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা

সহ্য করিতে না পারিয়া পরম বন্ধু দীক্ষাগুরুর সহিত মিলিত হইবার জন্য সমুৎসুকচিত্তে অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে লাগিলেন। যিনি মন্ত্রদাতা ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) জন্য অকুণ্ঠিতে নিজের প্রাণ দিতে সতত প্রস্তুত—যিনি সমগ্র আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবাসীকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, কায়ার ছায়ার ন্যায় যাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন—যাঁহার জীবনরক্ষার জন্য নিজ জীবন তুচ্ছ-জ্ঞান করিলেন—এরূপ প্রিয়বন্ধুর বিচ্ছেদে কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? কয়েকদিন অবিরাম গতিতে গমন করিয়া মদিনা শহরে হজরতের সহিত মিলিত হইলেন ও পরমানন্দে মদিনায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর হজরত মদিনাবাসী আনসার দলস্থ এক একজন প্রধান পুরুষের সহিত মক্কা হইতে সমাগত এক একজন মোহাজ্জের পুরুষের সখ্যতা করাইলেন। প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থানুসারে উভয় দলস্থ ব্যক্তিগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত অকাট্য ভ্রাতৃ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

হজরত ওমর ফারুকে, আবুবক্কর সিদ্দিক প্রভৃতি সকল মোহাজ্জেরই আন্সার বিশেষের সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইল দেখিয়া, হজরত আলী (কঃ অঃ) বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি বিনীতভাবে কাতরস্বরে প্রেরিত মহাপুরুষকে কহিলেন, হজরত! মোহাজ্জের ও আন্সারগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইল, কেবল আমিই এই

অভিনব বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত রহিলাম ? হজরত আলীর (কঃ অঃ) এই সকরুণ প্রার্থনায় করুণাবিগলিত চিত্তে বলিলেন, প্রিয় আলী ! দুঃখিত হইও না, অদ্য হইতে আমিই তোমার পরম বন্ধু ও ভ্রাতা হইলাম। হজরত আলী, হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) এইরূপ অভাবনীয় স্নেহময় মধুর বাক্যে যারপরনাই চরিতার্থ হইলেন। সেই দিন হইতে হজরত আলী (কঃ অঃ) প্রফুল্লমনে হজরতের সহচররূপে সতত সঙ্গে থাকিয়া মদিনা মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ কোনও সময়ে হজরতকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে হজরত আলী (কঃ অঃ) সেনা-পতিরূপে তখনি তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেন।

হজরত কর্ত্তৃক কোবা মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ) মক্কা হইতে প্রস্থান করিয়া, তিন দিবস গারস্তুর মধ্যে ছিলেন। তথা হইতে হজরত আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া, মদিনানগরের প্রান্তবর্ত্তী কোবা নামক স্থানে উপনীত হন। চতুর্দ্দশ দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া, জুম্মা উপসনা সম্পন্ন করিবার জন্য আন্‌সার ও মোহাজ্জেরগণকে আহ্বান করিয়া কোবা মস্‌জিদের ভিত্তি স্থাপন করিতে আদেশ করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে কোবার মস্‌জিদ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হজরত আলী (রাজিঃ) আদিষ্ট হন। তিনি স্বয়ং কয়েক জন সুদক্ষ রাজ-

মিস্ত্রির সাহায্যে এক সপ্তাহের মধ্যে মস্‌জিদের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। মদিনা প্রদেশে কোবা নামক স্থানে হজরতের উপসনার জন্য সর্ব্বপ্রথম এই জুম্মা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। তিনি সপ্তাহে একদিন শিষ্যমণ্ডলীসহ এই জুম্মা মস্‌জিদে উপসনা করিতেন। জগতে মুসলমানগণের এই প্রথম জুম্মা মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সপ্তাহে একদিন জুম্মা উপসনা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অনন্তর কোবা মস্‌জিদ নির্ম্মাণের কয়েক বৎসর পর কতিপয় মোনাফেক (কপট) লোক ঈর্ষা পরবশ হইয়া ঐ মস্‌জিদের সন্নিকটে এক নূতন মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক হজরতের উপাসনার বিরুদ্ধে এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করে ও আবু আসার নামক জনৈক পৌত্তলিক পুরোহিতকে তথায় আচার্য্য (এমাম)এর পদে বরিত করে। হজরত কপটাচারিগণের পাপ উদ্দেশ্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, প্রণয়-বিচ্ছিন্ন মুসলমান-গণকে ইস্‌লামীয় একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ও পরস্পরের মনোমালিন্য নিবারণার্থে নবপ্রতিষ্ঠিত মস্‌জিদে উপাসনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ইত্যবসরে সেই সর্ব্বশক্তি-মান সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী আল্লাহ কপটীদিগের কপট উদ্দেশ্য হজরতকে স্বর্গীয় দূতদ্বারা জ্ঞাপন করাইলেন। সেই সময়ে কোর-আনের এই মহাবাণী হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) নিকট অবতীর্ণ হইল (সুরা তওবা)—"যাহারা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পরপীড়ন ও বিদ্রোহিতাচরণ পূর্ব্বক আল্লাহর

বিশ্বাসী মোস্‌লেম সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ সংঘটন করিয়াছে, তাহারা আল্লার ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদের (ছালঃ) সহিত শত্রুতা সাধন মানসে এই নব মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ঈর্ষান্বিত মনে পাপ চিন্তার বিশেষ পরিপোষণ করিবে। দয়াময় বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় তাহারা প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। হে মোহাম্মদ! তুমি কদাচ সেই মস্‌জিদে উপাসনার জন্য উপস্থিত হইও না। সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য যে মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে, অবশ্য তাহা উপাসনার উপযুক্ত স্থান; তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিতে থাক। তোমার সংসর্গে সতত যে সকল লোক রহিয়াছে, তাহারা অকপট সদগুণশালী, নিষ্ঠাবান পুরুষ। তুমি তাহাদের সঙ্গে প্রেম কর এবং ধর্ম্মোপদেশে তাহাদিগকে পবিত্র কর। তাহাদিগকে কপটিদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা কর। অনেকে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া লোক প্রতারিত করে। কিন্তু সেই ভণ্ড তপস্বিগণের অন্তর পাপের কালকুটে পরিপূর্ণ। তাহাদের অন্তরের অন্তস্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি সতত জাগরিত থাকিয়া লোকের ঐহিক পারলৌকিত সর্ব্বনাশের চেষ্টায় নিরত রহিয়াছে”—(কোর-আন, সুরা তওবা)। হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) এই মহাবাণী দৈববাণীতে জ্ঞাত হইয়া, বিশ্বাসী আনসার ও মহাজ্জেরগণকে আহ্বান করিয়া, সকল ব্যাপার জ্ঞাত করাইলেন।

এতচ্ছ্রবণে হজরত আলী (কঃ অঃ) বলিলেন, হুজুর!

আপনি আদেশ করুন, দুরাচার কপটিগণ আপনার সহিত প্রতারণা করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ মনোমালিন্য ঘটাইয়াছে, তাহার প্রতিফল স্বরূপ সমুচিত শাস্তি প্রদান করি। আপনার আদেশ পাইলে কপটিগণের রক্তস্রোতে নদী প্রবাহিত করাইয়া দিই। বাহুতে অসি ধারণের ক্ষমতা থাকিতে কপটিগণ আপনার বিপক্ষাচরণ করিবে, ইহা কখনও আমার প্রাণে সহ্য হইবে না। শীঘ্র অনুমতি করুন, দুরাচারগণকে এখনই সংসার হইতে অপসারিত করিয়া দিই। আমার দেহে জীবন থাকিতে আপনার শত্রুতাচরণ করিয়া কোন্ নরাধম নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে? কার সাধ্য নিরাপদে পাপময় জীবন লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে? কি আক্ষেপের বিষয়! তিনি সর্ব্বশক্তিমান দয়াময়ের প্রেরিতপুরুষ, তাঁহার সহিত শত্রুতা বিদ্বেষভাব প্রকাশ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী,—ইহকালে নিশ্চিত তাহারা অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

মহাপরাক্রমশালী বীরকেশরী আলী (রাজিঃ) ক্রোধ-হুতাশনে দগ্ধ হইবার আশঙ্কায় ভীত হইয়া, কপটিগণ পলায়ন করিল। সেই দিনেই কপটাচারী ব্যক্তিগণের কাল্পনিক মস্‌জিদ ভূমিসাৎ হইল এবং কোবা মস্‌জিদ উপাসনাকারীদিগের দ্বারা পূর্ণ হইল। পরন্তু কপটিগণ মক্কাবাসী কোরেশগণের সহিত যোগদান করিয়া মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার বাদ-বিসম্বাদ করিতে লাগিল।

হজরতের বণিক্‌দল আক্রমণ।

একদা আরববাসী কোরেশবংশীয় বণিক্‌দল প্রচুর স্বদেশজাত দ্রব্য সহ শাম দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান বণিক্ আবুসুফিয়ান ব্যবসাতে প্রচুর লাভবান হইয়া, সদলবলে মহানন্দে মক্কায় প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। কতিপয় ভারবাহী উষ্ট্র এবং চল্লিশ জন অশ্বারোহী পুরুষ সহ তিনি সন্ধ্যা-সমাগমে বদর প্রান্তরে রাত্রি যাপনার্থ শিবির স্থাপন করেন। দয়াময় বিঘ্নতারণ আল্লাহতালা বণিক্‌গণকে আক্রমণ করিবার জন্য জেব্রাইল (আঃ) দ্বারা হজরতকে আদেশ করিলেন। হজরত তদ্বিবরণ হামজা, ওমর, আবিদা, আলী ও অন্যান্য প্রিয় সহচরগণকে অবগত করাইলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে পৌত্তলিক পূজা বিলুপ্ত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সহসা হজরতের নিকট এইরূপ সংবাদ পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইলেন। বিশেষতঃ বণিক্‌দলে অল্প লোক ও বহু ধনসম্পত্তি রহিয়াছে শুনিয়া, আনসার ও মোহাজ্জেরগণ সত্বর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। হজরত সহচরগণের নিরতিশয় যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া সত্বর সৈন্য সংগঠন করিতে আদেশ করিলেন। হজরতের আদেশ পাইবা মাত্র আনসার ও মোহাজ্জেরগণ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে জয় জয় শব্দে রণক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের তিন শত পঞ্চাশ জন মাত্র পদাতিক সৈন্য, সত্তরটী উষ্ট্র, দুইটী

অশ্ব, ছয়টী কবচ, আটখানা তরবারী। বণিকদল সহসা হজরত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, হতজ্ঞান হইয়া পড়িল ও আবুসুফিয়ান শরবিদ্ধ হরিণের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। ভীতিবিহ্বল চিত্তে বলিতে লাগিলেন, হায় হায়! অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল! যে দুরাত্মাকে কখন মনে স্থান দিই নাই, তাহা আজ প্রত্যক্ষ ফলিল। আজ মোহাম্মদ (ছালঃ)এর রোষানলে পতিত হইয়া, সকলকেই ধনে প্রাণে মারা যাইতে হইবে। আজ আর প্রাণ-রক্ষার উপায় নাই! এই অনন্ত প্রান্তরে মহাসঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে একটী মাত্রও বন্ধু নাই। হায়! এবিপদে আত্মীয়-স্বজন কোথায়? কেহই ত আমার সাহায্য করিতে সক্ষম হইল না। যাহা হউক, এই সঙ্কটকালে নগরপতি আবুজেহেলকে এই সংবাদ প্রদান করাই উচিত। এই ভাবিয়া আবুসুফিয়ান তখন পত্রই লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

পত্র।

হে মক্কার অধিপতি বীরবর আবুজেহেল! আজি এই মহাপ্রান্তরে ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়া তোমার কৃপাপ্রার্থী হইতেছি, সত্বর শরণাগতের সহায় হইয়া এ ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর। আমি বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শামদেশ হইতে মক্কা প্রত্যাগমন উদ্দেশ্যে বদর প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়া, বণিকদল সহ বিশ্রাম করিতেছিলাম, সহসা মোহাম্মদ সহচর সৈন্যগণ সহ প্রবলবেগে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আজ এই সহায়হীন বন্ধুহীন প্রান্তর ভূমে শত্রুর শাণিত অস্ত্রে

ভবলীলা শেষ হইবে। যদি আমাদের মঙ্গল ইচ্ছা কর, শত্রুর শাণিত অস্ত্র হইতে এ হতভাগ্যদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে শীঘ্র সসৈন্যে শত্রুসম্মুখীন হও। নতুবা আবু সুফিয়ানকে আজ ইহলোক হইতে চির বিদায় লইতে হইবে।

স্বাঃ—আপনার সাহায্য-প্রার্থী
চিরআশ্রিত—আবু সুফিয়ান।

অনন্তর পত্রখানি জমজম্ নামক একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী দ্বারা মক্কায় প্রেরিত হইল। জমজম্ যথা সময়ে মক্কানগরের রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া, আবুজেহেলকে অভিবাদন পূর্ব্বক সসম্মানে পত্রখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। আবুজেহেল আগ্রহের সহিত পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া কোরেশগণের প্রধান প্রধান বীর পুরুষগণকে, আত্মীয় কোরেশ বণিক্‌দলের বিপদ বার্ত্তা অবগত করাইলেন। কোরেশবংশীয় বীরপুরুষগণ একত্রিত হইয়া আবুজেহেলকে কহিল, নগরাধিপ! এই উত্তম অবসর আমরা বহুদিন হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভিত্তি সমূলে উৎপাটন করিতে ও মোহাম্মদের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছুক আছি। আজ উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। হেন্দার পিতা এর্জ্জা ক্রোধোত্তেজিত সিংহের ন্যায় তর্জ্জন করিয়া আবুজেহেলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, দলপতি! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এখনি মোহাম্মদকে অগ্র পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ

করিয়া শত্রুকবলিত বণিকগণকে উদ্ধার করা হউক। আবু-জেহেল কহিলেন, হাঁ, ইহাই উত্তম সিদ্ধান্ত। চল, এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধে গমন করি। সেনাপতি! তুমি সত্বর সৈন্য সংগ্রহ কর। দূত! তুমিও মক্কানগরের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা কর, যেন যুদ্ধনিপুণ সকল বীর পুরুষ এই যুদ্ধে যোগদান করে। তদনন্তর আবুজেহেল সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেনাপতি আসাদ যুদ্ধোপকরণ ও সৈন্য সমূহ সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে যুদ্ধঘোষণাকারী দূত নগরে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল। কোরেশগণ যুদ্ধ সংবাদ পাইয়া আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে সমরসজ্জা করিতে লাগিল। এতবা আবুজেহেল কর্ত্তৃক জামতা আবুস্থফিয়ানের উদ্ধারের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, বীর পরিচ্ছদে শোভিত হইলেন এবং রণোন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই দিনই তাঁহার প্রিয় পুত্র অলীদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে মাত্র, এতবা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রাণাধিক! আমি নগরাধিপের আদেশানুসারে সেনাপতিপদে বরিত হইয়া, সৈন্য সহ বদরপ্রান্তরে মোহাম্মদের (ছালঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি। এস বৎস। এস, বিবাহ-বেশ পরিত্যাগ করিয়া যোদ্ধ বেশ ধারণ পূর্ব্বক শত্রু-সংহারে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হই—স্বধর্ম্মরক্ষার্থে, স্বদেশরক্ষার্থে, স্বজাতিরউদ্ধারার্থে বদ্ধপরিকর হই। শত্রুগণ সমরপ্রার্থী, এ সময় অন্তঃপুরবাসিনী কুলমহিলার ন্যায় গৃহমধ্যে নিশ্চেষ্ট

নীরব থাকা কি কর্ত্তব্য? তুমি বীরের পুত্র বীর, এস বৎস, সত্বর এস, বীরদর্পে রণক্ষেত্র কম্পিত করি—সহকারী-সেনাপতি-রূপে আমার অনুগামী হও। ঐ দেখ, শত শত কোরেশ বীরপুরুষ আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। রণোন্মত্ত বীরপুরুষগণের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতেছে। অতএব বৎস! আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই; মাতঙ্গবলে শত্রু সৈন্য পতঙ্গজ্ঞানে দলিত কর।

অলিদ পিতার নিদারুণ আদেশ-বাক্যে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বিষাদ কালিমাচ্ছন্ন চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, হায় রে অদৃষ্ট! একদিনের জন্য সুখময় বাসর গৃহে নব পরিণীতা পত্নীসহ সুখ-মিলন হইল না—প্রাণ—প্রেয়সীর সোহাগ পূর্ণ প্রেমালাপন ও বিধুমুখীর অমিয়মাখা বাক্যলহরী, সে মৃগনয়নীর প্রেম-কটাক্ষ—সে মরাল-গামিনীর বীণা-বিনিন্দিত নূপুরধ্বনি, সে কুসুমসম সুকোমল বাসর শয্যার অতুলনীয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া, কৃতান্তের লীলাক্ষেত্র রণভূমির আশ্রয় লইতে হইবে? বিধির অখণ্ডনীয় বিধি লঙ্ঘন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এই প্রকারে নিজ মনকে নিজেই প্রবোধ দিয়া যোদ্ধৃবেশ ধারণ পূর্ব্বক নবপরিণীতা প্রিয়তমা পত্নী লেহাজানের চন্দ্রানন শেষ দর্শন ও বিদায়গ্রহণ মানসে তদীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

স্ত্রীর নিকট অলিদের বিদায় প্রার্থনা।

নবপরিণীতা লেহাজান নানা রত্নালঙ্কার ও বহুমূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিতা হইয়া, সৌন্দর্য্য-বিভায় নিজকক্ষ সমুজ্জ্বল পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় সহসা অলিদ রণবেশে নবপত্নী লেহাজানের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রেম-বিভোরা পতিগতপ্রাণা লেহাজান সহসা স্বামীর যোদ্ধৃবেশ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, প্রাণনাথ, একি! আপনার এ বেশ কেন? প্রিয়দর্শন বিবাহ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, এ ভীতি-প্রদর্শন পরিচ্ছদ কেন? অলিদ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, হৃদয়েশ্বরি! এ সাধের পরিচ্ছদ নহে, পিতৃ আদেশে বদর প্রান্তরে যুদ্ধযাত্রার জন্য এই সৈনিকবেশ ধারণ করিয়াছি, অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে। অনিত্য মানব-জীবন! তাহাতে বদরের রণ-সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিতে হইবে, কূল পাইব কি না, ভরসা নাই! তাই তোমার চন্দ্র-মুখখানির শেষ দেখা দেখিতে ও তৃষিত চাতকরূপে তোমার বাক্যসুধা পান করিতে আসিয়াছি। প্রাণেশ্বরি! এ সময় তোমার মৌন থাকা উচিত নহে, সুধাময় প্রেমালাপনে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।

লেহাজান স্বামীর যোদ্ধৃবেশ দর্শন করিয়া, বাত্যাহত কদলীর ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িল। অলিদ

ধীরে ধীরে প্রিয়তমা পত্নিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বহুকষ্টে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অবলা সরলা যুবতী লেহাজ্জান সংজ্ঞালাভে স্বামীর ক্রোড়ে নিজ মস্তক স্থাপিত দেখিয়া, লজ্জাবনত বদনে ধীরে ধীরে উঠিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিল, নাথ! আজিই পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিলেন, আবার আজিই বিরহ সাগরে ভাসাইতে চলিলেন! আজই সুখ-সম্মিলনের আশা দিলেন—আজই নৈরাশ্য কূপে ডুবাইলেন। হা বিধাতঃ! তুমি স্বেচ্ছায় এ দুর্ব্বলা লতিকাকে তরুবরের আশ্রিত করিয়া জড়াইয়া দিলে, পুনঃ দিনমণির শেষ হইতে না হইতে আশ্রয়চ্যুত করিতে সচেষ্ট হইলে? প্রাণপতি! স্ত্রীর অপর নাম অর্দ্ধাঙ্গিনী; সেই অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা ললনাকে পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ সমরাঙ্গনে আশ্রয় লওয়া কি কর্ত্তব্য? স্বামিন্! ভাবিয়া দেখুন, সতীনারীর পতিই গুরু, পতিই আরধ্য দেবতা, পতিই ভূষণ, পতিই সুখ সমৃদ্ধি, পতিই হৃদয়ে মণি। হে সর্ব্বসুখাকর হৃদয়নিধি হৃদয়েশ! কোন্ প্রাণে ধৈর্য্য ধরিয়া দুর্ব্বার সমরে বিদায় দিব। হে প্রাণকান্ত! যদি একান্তই সমরাভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এ দাসীকে সঙ্গিনী করুন। আসুন আমার স্ত্রী আভরণ রত্নালঙ্কার উন্মোচন করিয়া যুদ্ধ সজ্জা পরাইয়া দিন। আজি রণোন্মত্ত রণরঙ্গিণী বেশে দম্পতীযুগল রণক্ষেত্রে সুখে অগ্রসর হইব। হয় অরিকুল নিঃশেষ করিয়া স্বামীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিব, নতুবা শত্রুসম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া নারীকুলে পতি-

পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইব। অলিদ প্রিয়তমা পত্নীর এতাদৃশ কাতরোক্তিতে সাতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। পরন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! শত্রু-সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশ করা বীরের কার্য্য, পৈতৃক ধর্ম্মের জন্য স্বদেশের মঙ্গলের জন্য, স্বজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান না হয়, সে ব্যক্তি কুলাঙ্গার ও সাধারণের ঘৃণার্হ। আজই স্বজাতি ও স্বদেশ, শত্রুর কবলে গ্রাসিত, কি প্রকারে অন্তঃপুরে নববধুর প্রেমালাপে মত্ত থাকিব। বীরপুরুষ হইয়া কাপুরুষের পরিচয় দিব। প্রাণেশ্বরি! উপাস্য দেবতা স্ত্রীলোকগণকে অবলা দুর্ব্বলা করিয়া অন্তঃপুর তাহাদের চির-নিকেতন নির্দ্দিষ্ট করিরা দিয়াছেন। শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য ও শক্তির পরিচয় দিবার জন্য তাহাদের জন্ম হয় নাই! অতএব প্রাণেশ্বরি, প্রসন্নচিত্তে আমাকে বিদায় দাও। শত্রুগণকে সামান্য কীটাণুকীট জ্ঞানে পদদলিত করিয়া পুনরায় তোমার সহিত প্রেমালাপে মত্ত হইব। অলিদ এই প্রকার প্রণয়-সূচক বাক্যে প্রিয়তমা পত্নীকে প্রবোধ প্রদান করিলেন। লেহাজান দরবিগলিত অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া কাতরকণ্ঠে মধুর স্বরে বলিল, প্রাণনাথ! কাহার আজ্ঞায় এ তরুণ বয়সে জ্বলন্ত অনলে ঝম্প প্রদান করিতে যাইতেছেন। নগরপতি আবুজেহেল কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি জানেন না, মোহাম্মদ (ছালঃ) আল্লার প্রেরিত পুরুষ। তাঁহার বিরুদ্ধে যে কেহ দণ্ডায়মান

হইবে তাহার নিশ্চয় অধঃপতন ঘটিবে। তিনি ন্যায়বান, দয়াবান, ধার্ম্মিক ও মহাপুরুষ। আবুজেহেল তাঁহাকে আক্রমণ, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এমন কি, তাঁহার প্রাণবিনাশ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু যাঁহার প্রতি সতত আল্লার কৃপাবৃষ্টি বর্ষিত হইতেছে, আবুজেহেলের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির ঈর্ষানলে তাঁহার কি অনিষ্ট হইতে পারে। তোমাদের অমানুষিক অত্যাচারে তিনি প্রিয় জন্মভূমি মক্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া মদিনা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি বিদ্বেষপরায়ণ দুরাচার কোরেশগণ তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণে নিবৃত্ত হইল না। যাঁহার প্রতি আল্লাহ সতত অনুকূল, কার সাধ্য তাঁহার অনিষ্ট সাধন করে? আল্লার কৃপায় মোস্লেমকুল এক্ষণে বিশেষ পরিপুষ্ট ও পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছেন এবং জগতবাসীকে তিমিরাচ্ছন্ন পাপকূপ হইতে উত্তোলন করিয়া জ্ঞানালোক প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিতেছেন। সতত যাঁহার যশসৌরভে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল আমোদিত হইতেছে, স্বামিন। ভাবিয়া দেখুন, সেই ব্যক্তি কত মহান্, কত উন্নত? জগতে তাঁহার সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে? অথবা তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতাচরণ করা উচিত নহে। যাঁহার প্রবল প্রতাপে সসাগরা বসুন্ধরা সতত বিকম্পিত, যাঁহার সহচর বন্ধুগণ বল-বিক্রমে কেশরী-বিজয়ী বীরপুরুষ, নাথ! সেই বীরকেশরী মহাপুরুষদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন? প্রিয়! ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন,

বারংবার বারণ করি, ক্ষান্ত হউন। এ দাসীর প্রার্থনা তাচ্ছিল্য করিবেন না, সমর অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে মক্কায় বাস করুন। সে জ্বলন্ত হুতাশনে পতঙ্গের ন্যায় ঝম্প প্রদানের সঙ্কল্প কেন করিতেছেন ? সে উন্মত্ত বারণের পদদলিত হইতে এত সাধ কেন ? অতএব হে প্রাণেশ্বর ! অমূল্য জীবন ধন লইয়া স্বগৃহে সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করুন।

অলিদ নববধূ লেহাজানের মুখে মোহাম্মদের (ছালঃ) অজস্র গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, প্রেয়সি ! তুমি ইস্লাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও মোস্লেম বীরপুরুষগণের সুখ্যাতির বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাকে দুর্ব্বলা নিঃসহায়া কুলকামিনীর ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইবে না। তুমি বীরাঙ্গনা বীর-জায়া। ছি ছি প্রিয়তমে ! তোমার মুখে কি ওরূপ কথা শোভা পায় ? কোরেশগণ পৈতৃক ধর্ম্ম পৌরাণিক প্রথা প্রাণান্তে পরিত্যাগ করিবে না। ইস্লাম ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে কোরেশগণ পৈত্রিক ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে সক্ষম হইবে। যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ কোরেশকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবাক্য ও নেতার আদেশ লঙ্ঘন করে, রমণীর রূপজ মোহে মোহিত হইয়া রণ-বিমুখ কাপুরুষের ন্যায় স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া অন্তঃপুরে বাস করে, তাহার মরণই মঙ্গল ; সেই ঘৃণিত কীটের জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। প্রেয়সি ! তুমি আমাকে কাহার ভয় প্রদর্শন করিতেছ ? আমি বীরবংশে জন্মগ্রহণ করতঃ দুর্ব্বল মোস্মেম সৈনিকগণের

ভয়ে ভীত হইব? আর তুমি ভয়ানক কাহাকে বলিতেছ? কোরেশকুলের বল-বার্য্য, অস্ত্র পরিচালন-নৈপুণ্য তুমি কি বিদিত নহ? যুদ্ধই কোরেশগণের একমাত্র ভূষণ। রণক্ষেত্র তাহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র। প্রাণেশ্বরি! আমি সেই অমিততেজা-বীরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সামান্য ইস্‌লাম-সৈন্য-ভয়ে গৃহে অর্গলাবৃদ্ধ থাকিব? ছি ছি! বড়ই ঘৃণার কথা। ইহা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ। সম্মুখসমরে শিরচ্ছেদ হইলে বীরকুল ধন্য ধন্য করিবে। ইতিহাস যশোগান গাহিবে। অতএব হে প্রিয়ম্বদে! তোমার অনুরোধে যুদ্ধে বিরত থাকা কি আমার কর্ত্তব্য? নবপত্নী লেহাজান মস্তকের অবগুণ্ঠন দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সাশ্রুনেত্রে বলিতে লাগিল, প্রাণেশ্বর! আপনার প্রবোধ বাক্যে আমি কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। এ সময়ে জয়ের ত আশাই নাই, প্রাণরক্ষা আত্মরক্ষা বিষম সঙ্কট। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, কোরেশ-রমণীগণ পতিপুত্র বিয়োগে উচ্চ-রোলে মক্কানগর বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। কোরেশ পক্ষ হইতে শান্তিদেবী চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাই, বলি, প্রাণনাথ! এবারকার মত রণে ক্ষান্ত হউন।

অলিদ বলিলেন, চন্দ্রাননে! তুমি যতই ভয় প্রদর্শন কর না কেন, আমি কিছুতেই রণ-বিমুখ হইব না। ঐ দেখ প্রিয়ে! যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। রণোৎসাহী সৈনিকগণের জয়ধ্বনিতে রাজপুরী বিকম্পিত হইতেছে। প্রিয়ে! আর ক্ষণিক বিলম্বও

অসহ্য। শীঘ্র শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া উভয়ে অবিচ্ছেদে দাম্পত্য-সুখভোগ করিব। উভয়ে আবার প্রেম-তরঙ্গে সুখতরী ভাসাইব। এই বলিয়া অলিদ চকোররূপে লেহাজানের অধর-সুধা পান করিয়া সহসা গমনোদ্যত হইলেন। স্বামীকে একান্ত রণাভিলাষী দেখিয়া, লেহাজান অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কাতর করুণস্বরে বলিল, প্রাণেশ্বর! কণ্ঠরত্ন! হৃদয়রাজ! এ অবলাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া কোথায় যাইতেছেন? প্রাণেশ! আমাকে প্রণয়-পাশে আবদ্ধ করতঃ ক্ষণকাল সুখের আশা প্রদান করিয়া, বিষাদ-সাগরে ডুবাইতে চলিলেন? প্রাণপতি! একান্তই নির্দ্দয় নির্ম্মম অন্তরে চলিলেন? ইহজীবনে ত আশা নাই, পরকালে যেন আপনার ন্যায় পতির পদসেবায় বঞ্চিত না হই, নাথ—এই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

অলিদ প্রিয়তমা পত্নীর কাতর বিলাপে অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন। অবশেষে লেহাজানের হস্ত ধরিয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে সুন্দরি! আমার জীবনের এই একটি ভয়ানক সময়। এ সময় তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া যাইতে পারিলে আমি মহোৎসাহে শত্রুকুল বিনাশ করিয়া নিশ্চয় জয়লাভ করিতে সক্ষম হইব। তোমার এই বিষাদ-কালিমাচ্ছন্ন বদনখানি আমার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া, হৃদয়ের বল, উৎসাহ সকলই দমিয়া যাইতেছে। তুমি শত চেষ্টা করিয়াও আমার যুদ্ধযাত্রার গতি ফিরাইতে পারিবে না। তবে

কেন আমার রণযাত্রা কালে অশ্রুজলে গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া অমঙ্গল লক্ষণ প্রকাশ করিতেছ।

"তবে এস নাথ! এস, আর তোমার বীরনামে কলঙ্ক-কালিমা অরোপিত করিব না। তোমার গন্তব্যপথে আর বাধা দিব না। তোমাকে স্ত্রৈণ নামে কলঙ্কিত করিব না। কিন্তু নাথ! আমার এই অঙ্গ শোভনীয় রত্নালঙ্কার, এই কারু-কার্য্যখচিত রজত কঙ্কণ, এই হৈমময় কর্ণাভরণ কিসের জন্য? কাহার নয়নানন্দের জন্য অঙ্গে ধারণ করিব?" এই বলিয়া লেহাজান প্রত্যেক অঙ্গ হইতে এক একটি আভরণ উন্মোচন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অলিদ আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিলেন না। তিনি সজীবনে প্রিয়তমা পত্নীর বৈধব্যভাব দর্শন করিতে করিতে যুদ্ধগামী সৈনিকগণের সহিত গিয়া সম্মিলিত হইলেন। আবু-জেহেল পূর্ব্ব হইতেই সৈন্য-সামন্ত সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, অলিদ উপস্থিত হইবামাত্র সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, চল, এখনই যুদ্ধে গমন করি। এতবা বলিলেন, দলপতি? যুদ্ধযাত্রার এই উপযুক্ত সময়, আর অনর্থক কালক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া এতবা অগ্রগামী হইলেন। কোরেশগণ অদম্য উৎসাহে তাঁহার অনুগামী হইল। পথিমধ্যে এক শ্বেতশ্মশ্রু বিশিষ্ট বৃদ্ধ পুরুষ তাহাদের সহিত মিলিত হইল। সহসা অপরিচিত ব্যক্তিকে নিজদলে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আবুজেহেল সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অজ্ঞাত

কুলশীল প্রাচীন পুরুষ। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমার দলে মিলিত হইলে? তদুত্তরে ছদ্মবেশী বৃদ্ধপুরুষ কহিল, আমি মোহাম্মদ (ছালঃ) ও তাহার দলস্থ লোকের পরম শত্রু, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের সাহায্য করিতে আসিয়াছি। আমি অসিযুদ্ধে সুনিপুণ এবং শরনিক্ষেপ আমার অব্যর্থ সন্ধান! আজ পর্য্যন্ত কোন বীরপুরুষ আমার সহিত সম্মুখীন যুদ্ধে সজীবনে রণক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অদ্য আপনার শত্রুগণকে সমূলে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিব। আবুজেহেল নবাগত সৈনিক পুরুষকে কহিলেন, হে বীরবর সৈনিক পুরুষ! আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। অদ্য হইতে তোমাকে আমার সৈন্য শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা হইল। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে তোমাকে অন্যতম প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা হইবে এবং আশার অতিরিক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিব।

নবাগত পুরুষ আবুজেহেলের প্রবল উত্তেজনায় উৎসাহিত হইয়া বদরপ্রান্তরে উপস্থিত হইল; কিন্তু আবুসুফিয়ান অথবা তাহার দলস্থ বণিকগণের কাহাকেও তাহারা দেখিতে পাইল না। পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া বিষাদ চিন্তা-বিজড়িত চিত্তে তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিল। পক্ষান্তরে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) সসৈন্যে মদিনা হইতে বহির্গত হইয়া প্রবলবেগে বণিকগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। যখন হজরত সৈন্যসহ

জাকরান নামক প্রান্তরে উপনীত হইলেন, সেই সময় জেব্রাইল (আঃ) আবুজেহেলের সৈন্যসহ ভীষণ যুদ্ধের সংবাদ হজরতকে জ্ঞাপন করিলেন। হজরত জেব্রাইলের নিকট কাফেরগণের এই যুদ্ধাভিলাষের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রিয় সহচরগণকে আমূল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী সৈন্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মোস্‌লেম সৈন্যদল! এক্ষণে দুইটী প্রবল শত্রুদল আমাদের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছে। প্রথম আবুসুফিয়ান ও তাহার দলস্থ বণিক সম্প্রদায়। দ্বিতীয় তাহাদের সাহায্যকারী মক্কা হইতে আগত. আবুজেহেল। তোমরা কোন্ দলের সম্মুখীন হইয়া নিজ শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিতে সংকল্প করিয়াছ? হজরতের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া কতিপয় অর্থলোভী লঘুচেতা বলিল, হজরত! বণিক-দলের সহিত যুদ্ধ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহাদিগকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত করিতে পারিলে, প্রভূত ধন-সম্পত্তি আমাদের হস্তগত হইবে। আবুজেহেলের ন্যায় প্রবল বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা কোন প্রকারেই সাহসী নই। হজরত ভীতি-বিহ্বল সৈনিকগণের প্রমুখাৎ এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন এবং প্রধান প্রধান বীর-পুরুষগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, হে প্রিয় সহচর-গণ! তোমাদের অভিলাষ কি? হজরতের বিষন্নভাব দর্শনে হজরত হামজা (রাজিঃ) বিনীতভাবে বলিলেন, হে ইস্‌লাম গুরো! আপনি কি জন্য চিন্তান্বিত হইতেছেন? যখন

যুদ্ধাভিলাষে মদিনা পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে অরিকুল নিঃশেষ না করিয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করিব না—বিধর্ম্মীর রক্তে এই কোষমুক্ত তরবারি রঞ্জিত না করিয়া, এই বদর প্রান্তরে শত্রুর শোণিত স্রোতে রক্তনদী প্রবাহিত না করিয়া, নিবৃত্ত হইব না। অদ্য যদ্যপি মহাজ্জের ও আনসার-গণ শত্রুদলে মিলিত হইয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তথাপি নিশ্চয় জানিবেন, হামজার দেহে জীবন থাকিতে পশ্চাদ্-পদ হইবে না। যদি আজ জ্বেন, মানব একত্রিত হইয়া আবু-জেহেলের পক্ষ সমর্থন করে, তথাপি নিশ্চয় জানিবেন, বদর-যুদ্ধে হামজার হস্তে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আজ তাহাকে রক্ষা করিতে কাহারও সাধ্য হইবে না। এই ভীষণ প্রান্তরে সসৈন্য তাহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিব। হে মহাপুরুষ! আপনি কি অবগত নহেন যে, কত অগণিত মহারথী মহাবীর আমার বর্শাগ্রে মস্তক প্রদান করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ কি না কীটানুকীট আবুজেহেল কতিপয় সৈন্য লইয়া উন্মত্তের ন্যায় রণক্ষেত্রে আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছে! পিপীলিকার পালক বহির্গত হইলে তাহার মৃত্যু সন্নিকট বুঝিতে হইবে। তেমনি দুরাচার পাপাত্মা আবু-জেহেলের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই জন্য আপনার সহিত তাহার যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। হজরত! আপনি অণুমাত্র চঞ্চল বা ভীত হইবেন না। এই আমি অসি কোষমুক্ত করিলাম, পাপাত্মাকে সমূলে নির্ম্মূল না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।

হামজার রণোৎসাহ ও বীরদর্পে হজরতের বিষণ্ণ বদন প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল। অনন্তর হজরত আলী (কঃ অঃ) বলিলেন, হজরত আমরা জীবিত থাকিতে আপনি যুদ্ধের জন্য কেন চিন্তা করিতেছেন? যুদ্ধের অভিলাষেই মদিনা ত্যাগ করিয়া বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছি। আবুজেহেলের সহিতই যুদ্ধের ঐকান্তিক বাসনা। আল্লাহর আদেশে বিধর্ম্মীর রক্তে বদর প্রান্তর বিধৌত করিয়া, আজ পবিত্র ইস্‌লামকে পবিত্র হইতে পবিত্রতর করিব। ধর্ম্মবলহীন, দুর্ব্বলহৃদয়, অর্থপিশাচ মানব ইস্‌লাম ধর্ম্মযুদ্ধের বিরুদ্ধে কি দণ্ডায়মান হইতে পারে? তাহারা ঐহিক সুখের অভিলাষী, ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ নাই। অর্থই তাহাদের জীবন-সর্ব্বস্ব। পার্থিব সুখ সম্পদই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য। সেই স্বার্থপর ধনলোলুপ ঘৃণিত সৈনিকগণকে আমাদের সংসর্গ হইতে বিতাড়িত করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর হজরত আলী (কঃ অঃ) অপর সৈনিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে প্রিয় মোস্‌লেম সৈনিকগণ! আজ জগদ্বিজয়ী পিতৃব্য হামজা স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রগামী, আমিও তাঁহার পৃষ্ঠ পোষক; তোমরা যদ্যপি সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের অনুরাগী হও, তাহা হইলে সত্বর আমাদের অনুসরণ কর।

প্রধান প্রধান সাহাবা (রঃ অঃ তাঃ)গণ এবং ধর্ম্মপ্রাণ সৈনিকপুরুষগণ হজরত আলীর উৎসাহ-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া "জয় জয়" রবে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া, সমরক্ষেত্রাভিমুখে

অগ্রসর হইতে লাগিল। হজরত আনন্দিত মনে সৈন্যসহ বদরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শিবির স্থাপন পূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

পাপপুরুষ শয়তানের চক্র।

ঘোর অন্ধকার রজনী। মোস্‌লেম-সৈন্যশিবির ও কাফের সৈন্য-শিবির পরস্পর নিকটে স্থাপিত। মোস্‌লেম সৈন্যগণ পথশ্রান্তি বশতঃ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময় শয়তান আবুজেহেলের দলে প্রবেশ করিয়া এই মন্ত্রণা দিল যে, এস্থলে পানীর অভাব, ইস্‌লাম সৈন্যগণকে অপবিত্র করিতে পারিলে, তাহারা কোন প্রকারেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। পাপাত্মা এই প্রকার মন্ত্রণা দিয়া স্বপ্নদোষে দূষিত করিয়া তাহাদিগকে বিষম বিড়ম্বিত করিল।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে হজরত দেখিলেন, সৈন্যগণ স্বপ্নদোষে অপবিত্র দেহ হইয়া পানীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। শয়তান ছদ্মবেশে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হে মোস্‌লেম সৈন্যগণ! তোমাদের দুর্গতির পরিসীমা নাই। দেখ তোমাদের উপসনার সময় নিকটবর্ত্তী, পরন্তু তোমরা অপবিত্র হইয়া রহিয়াছ। এস্থানে একবিন্দুমাত্র পানি নাই যে, গোসল করিয়া দেহ পবিত্র করিবে। তোমাদের

জানু পর্য্যন্ত বালুকারাশিতে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে। কি প্রকারে শত্রু-সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? পক্ষান্তরে তোমাদের বিপক্ষ কোরেশগণ মহোল্লাসে নিরাপদে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের কোন বিষয়েও অভাব বা কষ্ট নাই, তাহারা তোমাদের অপেক্ষা শতগুণে সুখী ও স্বচ্ছন্দ। তোমরা সতত গৌরব করিয়া থাক, সেই অদ্বিতীয় পরম কারুণিক আল্লাহ তোমাদের সহায় ও সানুকূল এবং প্রেরিত-পুরুষ মোহাম্মদ (ছাঃ) তোমাদের পরম হিতৈষী! কিন্তু এ ঘোর সঙ্কট সময়ে তোমাদের প্রতি তাঁহাদের কোন প্রকার সহানুভূতি দেখিতেছি না। তোমাদের এ দুর্গতি নিবারণের কোনরূপ ব্যবস্থাও দেখিতেছি না।

এদিকে মোহাম্মদ (ছালঃ) প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় অতীতপ্রায় দেখিয়া, সেই অদ্বিতীয় দয়ালু আল্লাহ্‌র সন্নিধানে বারি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভক্ত-বৎসল আল্লাহ্-তায়ালা প্রিয়জনের কাতর প্রার্থনায় কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন? প্রসন্নচিত্তে ভক্তের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া, প্রেম ও দয়ার নিদর্শন স্বরূপ অজস্র বারিবর্ষণে বিশুষ্ক বদর প্রান্তরে নদী প্রবাহিত করিয়া দিলেন। স্বপ্নদোষে সৈনিকগণ পবিত্র পানীতে অবগাহন ও অজু করিয়া পবিত্র হইল এবং সানন্দে প্রাতঃ উপাসনা সম্পন্ন করিয়া পুলকিত হইল। পিপাসিত অশ্ব ও উষ্ট্র-গুলি জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল মহাপাতকী শয়তানের মায়াজাল নিমিষের মধ্যে ছিন্ন হইয়া গেল।

বদর যুদ্ধ।

হিজরির দ্বিতীয় বৎসর রমজান মাসের সপ্তদশ দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময়, আবুজেহেলের নেতৃত্বে কোরেশদিগের সহিত হজরতের বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমান ও কোরেশগণের কোলাহল ও জয়ধ্বনিতে রণক্ষেত্র বিকম্পিত হইতে লাগিল। কোরেশ সৈন্য এগার শতের অধিক সমবেত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই শত জন বীরপুরুষ সগর্ব্বে অসিচালনা করিতে করিতে সমর-প্রার্থী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। কেফায়েত তালেব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে,—ময়াইয়ার পুত্র বরিয়া, সয়াদের পুত্র আছ, উম্মিয়ার পুত্র আছ, আব্দোল্লার পুত্র আমের, খালিদের পুত্র আছ, আবদোল্লার পুত্র আমের, খলিদের পুত্র নফল, ওতবার পুত্র অলিদ, অলিদের পুত্র কাবায়েছ, হারেশের পুত্র আবিদা, কয়েছের পুত্র আবুল কাছ, সিবা এবং আসাদ, কোরেশ অধি-পতি আবুজেহেলের বিভিন্ন সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া বিজয়-পতাকা হস্তে ধারণপূর্ব্বক সম্মুখ-সমরে দণ্ডায়মান হইল।

পক্ষান্তরে, হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) তিন শত পঞ্চাশ জন মাত্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু আল্লার অপার মহিমা, বহুসংখ্যক শত্রুসেনা দর্শন করিয়া মোস্লেম সৈনিকগণ পাছে ভীত হয়, তজ্জন্য মোস্লেম সৈন্যের চক্ষে শত্রুসৈন্য মুষ্টিমেয় বলিয়া দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং

বিধর্ম্মিগণ মোস্‌লেম সৈন্যগণকে তাহাদের দ্বিগুণ অনুমান করিতে লাগিল। সুতরাং তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া ভীতি-বিহ্বল চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

সর্ব্ব প্রথমে এতবা নামক বিধর্ম্মী সৈনিক আবুজেহেলের নিকট যুদ্ধানুমতি লইয়া, মহাগর্ব্বে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, মোহাম্মদ (ছালঃ) বহুদিন হইতে আমি তোমার অনুসন্ধান করিতেছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে যোদ্ধৃবেশে এই বদর ক্ষেত্রে দর্শন পাইলাম। এখন প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হও। আইউব এবং আবদুল্লা নামক মোসলেম যোদ্ধা মোহাম্মদ (ছালঃ)এর নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হজরত! আজ্ঞা করুন, ঐ বিধর্ম্মীর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া আসি। দুরাত্মা কাফেরের স্পর্দ্ধা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না (কোর-আন সুরা আল-এমরান, সয়ানিয়ে ওমরি)। হজরত কহিলেন, যাও, আমি তোমাদিগকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি প্রদান করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সত্বর প্রত্যাগমন কর।

আবদুল্লা হজরতের আজ্ঞা পাইয়া বিদ্যুৎ গতিতে রণস্থলে এতবার সম্মুখীন হইলেন। এতবা কহিল, হে যুদ্ধার্থী সৈনিক পুরুষ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার আত্ম-পরিচয় দিয়া বাধিত করুন। আবদুল্লা বীরদর্পে কহিলেন, রে পাপাত্মা বিধর্ম্মী কাফের! আমি তোর সহিত সখ্যতাস্থাপন করিতে রণক্ষেত্রে আসি নাই। যুদ্ধ করিতে আসিয়া আত্ম-পরিচয়ের আবশ্যক

কি ? রণক্ষেত্রই পরীক্ষার প্রকৃত স্থান, তাহা এখনই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবি। আর যদ্যপি আমার অন্য পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিস, তাহা হইলে জানিস্, আমি আনসার দলস্থ আবদুল্লা নামে অভিহিত। বিধর্ম্মীকুল নির্ম্মূল করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে আগমন করিয়াছি। বীরত্ব এবং শক্তি থাকে, সত্বর আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'। বৃথা বাক্-বিতণ্ডায় কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। বিলম্বে তোর মঙ্গল, কিন্তু আমার পক্ষে অসহ্য। সত্বর যে কোন্ অস্ত্র ইচ্ছা নিক্ষেপ কর। আর যদ্যপি ভীত হইয়া থাকিস, তাহা হইলে স্বীয় শিবিরে প্রস্থান কর।

এতবা গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া কহিল, হে মদিনাবাসী আন্‌সার সৈনিক পুরুষ! যদ্যপি আত্মীয় কোরেশবংশ ব্যতীত অপর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ থাকিত, তাহা হইলে তুমি এতগুলি কথা বলিবার অবসর পাইতে না, অবশ্যই এতক্ষণ এতবার শক্তির পরিচয় পাইতে। অতএব তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়া আত্মীয় কোরেশবংশীয় কোন এক ব্যক্তিকে সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ কর।

হজরত এতবার গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া, আন্‌সারগণকে শিবিরে প্রত্যাগত হইতে আদেশ করিলেন এবং আবু ওবায়দা, আলী ও হামজা (রাজিঃ)কে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। আবু ওবায়দা যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া কটিদেশে করবাল ধারণ করিয়া মহাতেজে রণস্থলে এতবার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এতবা মহাগর্ব্বে আবু ওবায়দাকে

জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহার তনয়? এ তরুণ বয়সে তোমার জীবন কি এতই ভারবোধ হইয়াছে যে, আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছ? আমি ইচ্ছা করিলে শোণিত সলিলে বসুন্ধরা প্লাবিত করিতে পারি। কত শত অমিততেজা মহাবীর আমার পদাঘাতে ধরাশায়ী হইয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছে! তুমি আমার তুলনায় সামান্য হীনবল পতঙ্গ-সদৃশ, ফুৎকারে তোমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। তুমি শীঘ্র আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর। বিনা পরিচয়ে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে কেন?

আবু ওবায়দা ধীর গর্ব্বহীন বাক্যে উত্তর করিল, আমি আবুহারেসের পুত্র ওবায়দা কাফেরগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছি। যাহারা হজরতের বিদ্রোহিতাচরণ করিয়াছে, নিশ্চয় তাহাদিগকে নরক-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যাগমন করিব।

পাপাত্মা এতবা আবু ওবায়দার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিহ্বলচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে আপন পুত্র ও ভ্রাতাকে আদেশ করিল, তোমরা ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া, অপর দুইজনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি এই দুষ্টকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইতেছি।

এতবার ভ্রাতা শিবা ও পুত্র অলিদ এই দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী মোস্‌লেম বীরকে আক্রমণ করিল। শিবা হামজার নিকট অগ্রসর হইয়া কহিল, হে বীরবর! আপনি কাহার পুত্র? কেন

অনর্থক যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইবেন? নিশ্চয় জানিবেন, মোহাম্মদের (ছালঃ) সৈন্য ও তাহার ধর্ম্ম চিরকালের জন্য জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

কাফেরের গর্ব্বিতবাক্যে হামজা (রাজিঃ) আরক্তলোচনে কহিলেন, রে কাফেরাধাম? জানিস্ না, আমি কে? আমি আবদুল মোতালেবের পুত্র হামজা, যে ব্যক্তি বহুযুদ্ধ-বিজয়ী বলিয়া জগতে বিখ্যাত, যাঁহার অতুলনীয় বাহুবলে খ্যাতনামা বীরপুরুষগণ প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে, যাঁহার পদভরে ধরা বিকম্পিত, রণস্থলে শত্রুগণ ব্যাকুল হইয়া নতশিরে ক্ষমা-প্রার্থী হইয়া জীবনভীক্ষা করে—সেই হামজা স্বয়ং কৃতান্তরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে—তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

শিবা কহিল, হামজা, তুমি জগতের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ সত্য, কিন্তু আজ তোমার আসন্নকাল উপস্থিত। কেন পতঙ্গের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইতে ইচ্ছা কর? এই কথা বলিয়া দুরাত্মা শিবা সজোরে হামজার প্রতি অসি চালনা করিল। হজরত হামজা, তাহার আঘাত ব্যর্থ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শিবার মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি নিক্ষেপ করিলেন। বীরবরের অব্যর্থ সন্ধানে বিধর্ম্মী সৈনিক পুরুষের মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। শিবার বীরদেহ ধরণীতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। অনন্তর হামজা কেশরী-বিক্রমে আল্লাহ আকবর ধ্বনি ও বিপক্ষ সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন।

পক্ষান্তরে অলিদ বীরদর্পে আলীর (রাজিঃ) সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং জাতীয় প্রথানুযায়ী পরিচয়প্রার্থী হইল। কুমার আলী অলিদের প্রতি তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, রে বিধর্ম্মি! যুদ্ধক্ষেত্রে নাম-ধামের পরিচয়ের প্রয়োজন কি? সাধ্য থাকে অস্ত্র ধারণ কর্। অস্ত্রচালনাশক্তি ও রণনৈপুণ্যই বীরপুরুষের প্রকৃত পরিচয়। আমি হজরতের বাল্যসহচর আলী নামে অভিহিত, মক্কাবাসিগণের নিকট আল্লার শার্দ্দূল নামে পরিচিত। যদি জীবনের আশা ও প্রাণের মমতা থাকে, ব্যাধ-বিতাড়িত শৃগালের ন্যায় প্রাণ লইয়া রণস্থল পরিত্যাগ কর্। তুই যুদ্ধকৌশল-অনভিজ্ঞ সামান্য যুবকমাত্র। তোর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বড়ই ঘৃণার কথা। বিশেষতঃ শুনিয়াছি তুই যুবতী লেহাজানের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিস্! সেই দিনই যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিস্, সে চাতকিনীর ন্যায় তোর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ তোর মৃত্যু-সংবাদে সেই অবলা বালা বাত্যাহত কদলীর ন্যায় ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইবে, অনাথা অসহায়া হইয়া যাবজ্জীবন দুঃখ পারাবারে ভাসিতে থাকিবে। অতএব তোকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, শীঘ্র রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া, অন্তপুরে গিয়া নব-পরিণীতাসহ দাম্পত্য-সুখ ভোগ কর্! নব-প্রেমপাশা-বদ্ধা তোর প্রিয়তমা লেহাজানকে চিরতরে দুঃসহ বৈধব্য-যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিস্ না!

যুবক অলিদ হজরত আলীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া কহিল,

কুমার! আমার হস্তে তোমার জীবনান্ত সুনিশ্চিত। সেই জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতেছ? আমি কোরেশবংশীয় বীরকুল-চুড়ামণি এতবার পুত্র অলিদ। মোস্লেমকুল নির্ম্মূল করিতে, বাস্তবিকই প্রণয়-প্রতিমা নব-পরিণীতার মায়া ও বাসরগৃহের ফুলশয্যা পরিত্যাগ করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সাবধান! এই বর্শাঘাতে তোমার ইহলীলার অবসান করিব। এই বলিয়া বীরদর্পে হজরত আলীকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল। বীরকুল চুড়ামণি হজরত আলী ক্ষিপ্রগতিতে বর্শা বাম করে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে অসি লইয়া অলিদের বামহস্ত ছেদন করিলেন। অলিদ অপর হস্তে অসি ধারণ করিতে উদ্যত হওয়ায়, নিমিষের মধ্যে আলীর শাণিত তরবারিতে অলিদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। নিহত বীরযুবকের তর্জ্জনীতে নববিবাহের চিহ্নস্বরূপ সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ক দর্শন করিয়া, আলী বলিলেন, রে হতভাগ্য! আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নবপরিণীতাকে বিধবা করিলি। আশা করিয়াছিলি, নবপরিণীতাসহ সুখ-সম্মিলনে কতশত সুখ রজনী অতিবাহিত করিবি। যা পাপাত্মা, তৎপরিবর্ত্তে অনন্তকালব্যাপী অনন্ত নরক-যন্ত্রণা গিয়া ভোগ কর্। অনন্তর আলী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত বিধর্ম্মী অলিদকে ধিক্কার প্রদান করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দারাব নামক জনৈক বিধর্ম্মী দ্রুতবেগে আসিয়া আলীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি

নিক্ষেপ করিল, কিন্তু আল্লার অনুকম্পায় তাহাতে আলীর কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইল না। অনন্তর আলী রোষ-বিহ্বল সিংহের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া পাপাত্মা নরপিশাচ দারাবের বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিলেন, সেই পদাঘাতে দুরাত্মার পাপজীবন দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। এইরূপে কুমার আলী অতুল বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া বিধর্ম্মী সৈনিক-গণকে দলে দলে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে মোস্লেম বীর আবু ওবায়দা (রাজিঃ) মহাপরাক্রমশালী বিধর্ম্মী এতবার অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্তকলেবর হইয়া, ক্রমে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। তদ্দর্শনে হামজা ও আলী (রাজিঃ) দ্রুতবেগে এতবাকে আক্রমণ করিয়া কহিলেন, রে বিধর্ম্মী কাফের! সাবধান হও, এক্ষণে কৃতান্তের করাল-কবলে পতিত হইয়াছ, আর তোমার রক্ষা নাই, জীবনের আশা ভরসা পরিত্যাগ কর। এখনিই তোমাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতেছি। তদনন্তর আলী এতবার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হামজা আবু ওবায়দাকে মোস্লেম শিবিরে প্রেরণ করিলেন। আলী সজোরে এতবাকে ভূতলশায়ী করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে উপবেশন করতঃ হস্তদ্বয় কঠিন লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া হজরতের নিকট প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে বদর প্রান্তরে দুই প্রতিপক্ষ দলে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। যুদ্ধান্তে দেখা গেল, বহুসংখ্যক বিধর্ম্মী নিহত ও বন্দী হইয়াছে। কেবল পাঁচ জন মাত্র মোসলেম

সৈনিক বিধর্ম্মীর অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। কোরেশ-বংশীয় বীরবর আসাদ সেনাপতি এতবাকে আলীর হস্তে বন্দী দেখিয়া, একহস্তে রণ-পতাকা ও অপর হস্তে শাণিত কৃপাণ ধারণ করিয়া অমিততেজে হজরত আলীকে আক্রমণ করিল। বীরেন্দ্র-কেশরী হজরত আলী অবিলম্বে আক্রমণকারীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) আসাদের অসীম শৌর্য্য-বীর্য্যের বিষয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। পাছে প্রিয় সহচর আলী শত্রুর হস্তে পরাস্ত হন, সেইজন্য দয়াময় আল্লাহ-তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বশক্তিমান বিঘ্ননাশন, বিপদবারণ, দয়াময় আল্লাহতালা! এই অধম কাতর কিঙ্করের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া এই ভীষণ বদর-প্রান্তরে স্বকীয় দয়ার নিদর্শন স্বরূপ দৈব সাহায্য প্রদান করিয়া বিপদাপন্ন মোসলেমমণ্ডলীকে বিধর্ম্মিগণের কোপানল হইতে রক্ষা করুন। অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি আল্লাহতায়ালা প্রিয়তম ভক্তের কাতর প্রার্থনায় বিগলিতচিত্ত হইয়া তদীয় প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। তদনুসারে বিধর্ম্মিগণ অচিরাৎ শোচনীয়রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

হজরত সেনাদলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বিশ্বাসী মোস্‌লেম সৈন্যগণ! তোমরা নিরুৎসাহ বা ভীত হইও না, এখনই আল্লার অনুগ্রহে তোমরা জয়লাভ করিবে। প্রাণপণে বিধর্ম্মিগণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর। সাবধান! কাপুরুষের ন্যায় বিধর্ম্মিদলকে পৃষ্ঠা-প্রদর্শন করিও না। হজরতের উৎসাহবাক্যে সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া “আল্লাহ-

আকবর” রবে গগন পবন কাঁপাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বিধর্ম্মী সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে, অশ্বের হ্রেষারবে, বীরপুরুষগণের গম্ভীর নিনাদে রণক্ষেত্র বিকম্পিত হইতে লাগিল। এদিকে হজরত আলী (রাঃ) ক্রোধোত্তেজিত সিংহের ন্যায় অসীম বিক্রমে আসাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, পরিশেষে ক্রোধে অধীর হইয়া আসাদের স্কন্ধে গুরুতররূপে অসির আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে আসাদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলশায়ী অবস্থায় আপন জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিল। আসাদের মৃত্যুতে কোরেশ কাফেরগণ হতাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া হজরত আলী (রাজিঃ) বহুসংখ্যক কাফেরকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। বহু দূরব্যাপী সমতভূমি বিধর্ম্মিগণের শবদেহ পরিপূর্ণ হইল।

পরিণাম কাহার না আছে? দিনের শেষে রাত্রি, পূর্ণিমার পর তমসাচ্ছন্ন অমানিশা, শৈশবের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য; সেইরূপ সুখের পর দুঃখ মানবজীবনে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিয়ত বিরাজ করিতেছে। একদিন আবুজেহেলের প্রবল-প্রতাপে সমগ্র হেজাজ সতত সশঙ্কিত ছিল, আজ তাহার দুর্দ্দশা দেখ, বনের ইতর প্রাণীরাও তাহা অপেক্ষা শতগুণে সুখী, স্বাধীন ও সৌভাগ্যবান্। কোরেশ অধিপতি আজ ভয়ে ভীত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় শবদেহের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া প্রাণ-

রক্ষার চেষ্টা করিতেছে! আত্মগ্লানির অন্তর্দাহে তাহার পাপময় জীবন দগ্ধ হইতেছে! আজ তাহার চিরপোষিত পাপলিপ্সা সকল হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া, বজ্রাঘাতসম যন্ত্রণায় অধীর করিয়া তুলিতেছে। শোকে, তাপে, দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া বাতুলের ন্যায় কত কি বিলাপ করিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া নিজের জীবনে ধিক্কার প্রদান করিতেছে। হায়! আজ আমি বন্ধুহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন, হয় ত শীঘ্রই জীবনহীন হইতে হইবে। হায়! আমি সকলই হারাইলাম, আমার চির-অভিলষিত উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। মরিলাম, কিন্তু চিরশত্রু মোহাম্মদ (ছালঃ)কে নিধন করিতে পারিলাম না। দুরাত্মা আবুজেহেল সমরভূমে মনোদুঃখে কত কি আক্ষেপ করিতেছে, এমন সময়ে মসূউদ আবুজেহেলকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, রে পাপাত্মা বিধর্ম্মি আবুজেহেল! তুই একাকী এই নির্জ্জন স্থানে কি ভাবিতেছিস্? রে চিরশত্রু! রে প্রেরিত-মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)এর চিরশত্রু! আজ তোর সে অহঙ্কার মাৎসর্য্য কোথায়? কোন্ মুখে তুই হজরতকে কুহকী বলিয়া নিন্দা করিতিস্? কোন্ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তুই মোস্লেমগণকে সতত বিদ্বেষ-চক্ষে দর্শন করিতিস্? নারকি! তোর সে সৈন্য-সামন্ত, বন্ধুবান্ধব, সহায়-সম্বল কোথায়? পাপাত্মা! ধর্ম্মের বল দেখ, "যথা ধর্ম্ম তথা জয়" এই মহাপুরুষের বাক্য স্মরণ কর্। আজি মসূউদ তোর জীবনান্ত করিতে কৃতান্তরূপে দণ্ডায়মান। কা'র সাধ্য তোকে রক্ষা করে?

মৃতের ভাণ করিয়া শবস্তূপে লুক্কায়িত থাকিলে কি নিস্তার আছে ?

বজ্রনিনাদ সদৃশ মস্‌উদ (রাঃ)এর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া শরবিদ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় আবুজেহেল চমকিয়া উঠিল এবং রোষে, ক্ষোভে ও অভিমানে উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, রে হীনবল সৈনিক! শৃগাল হইয়া সিংহের নিকট আস্ফালন ? মস্‌উদ (রাঃ) কহিলেন, রে দুরাত্মা! কৃতান্ত তোর জীবনান্ত করিতে উপস্থিত। এ সময় বৃথা আস্ফালন পরিত্যাগ কর্। তোর মৃত্যু সন্নিকট। এই বলিয়া মস্‌উদ (রাঃ) কালবিলম্ব না করিয়া, একলম্ফে আবুজেহেলকে ভূতলশায়ী করিয়া, তাহার বক্ষে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিলেন। আবুজেহেল জীবনে হতাশ হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নানাপ্রকার আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, হায়! হায়!! আমি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া যে সকল বন্ধুর উপকার করিলাম, তাহারা আমার এই আসন্নকালে কোথায় ? কেহই ত আমার সহায় হইল না। এ ঘোর সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করিতে একটী প্রাণীও দেখিতেছি না! আবুজেহেলের আক্ষেপ শুনিয়া মস্‌উদ (রাঃ) কহিলেন, রে অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহী পাপাত্মা আবুজেহেল! এখনও যদ্যপি এক নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লাহতালা ও তাঁহার প্রেরিত "রসুলে" বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিস্, তাহা হইলে তোর সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া

ভ্রাতৃভাবে তোকে আলিঙ্গন করি এবং পরকালে তোর মুক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে বিভু-সন্নিধানে প্রার্থনা করি ; আর যদি তোর যুদ্ধ করিবার সাধ থাকে, অসি ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'— আমি তোকে এ নিঃসহায় অবস্থায় বধ করিয়া বীর-হস্ত কলঙ্কিত করিব না। যাহার হৃদয় কলুষ পাপ-তিমিরাচ্ছন্ন, যে হতভাগ্য পাপান্ধ ও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, ধর্ম্মের উজ্জ্বল উপদেশালোকে তাহার কি জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হয় ? কপটী কি কখনও সদুপদেশ-দ্বারা সাধু হয় ? আবুজেহেলের অন্তর শঠতায় পূর্ণ, মহাত্মা মস্‌উদের সদুপদেশে অধিকতর উত্তেজিত ও তাহার পাপ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল ; নরকাগ্নি সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। এখন ধর্ম্মোপদেশ তাহাকে ভাল লাগিবে কেন ? মস্‌উদকে লক্ষ্য করিয়া আবু-জেহেল বলিতে লাগিল, রে মেষপালক মস্‌উদ ! আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিতে আর ইচ্ছা করি না। আমার যুদ্ধসাধ পূর্ণ হইয়াছে। কেশরী-বিজয়ী প্রিয় সেনাপতি আসাদ যখন নিহত হইয়াছে, তখন আমার আর যুদ্ধ-সাধ নাই। হে মস্‌উদ ! প্রাণরক্ষার আমার ইচ্ছা নাই, মৃত্যুকেও আর ভয় করি না। সংসারের আর কোনও বিষয়ে স্পৃহা রাখি না। এই অন্তিমকালে আর মোহাম্মদের (ছালঃ) মতাবলম্বী হইব না। চিরদিন তাঁহাকে শত্রুজ্ঞানে অবজ্ঞা প্রদর্শন ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি এবং পাপপুরুষ সয়তানের উপদেশানুসারে পাপ কার্য্যেই জীবন অতি-বাহিত করিয়াছি, এ আসন্নকালে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া

মোহাম্মদের (ছালঃ) প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছা করি না। এখন মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ, নরকই আমার উপযুক্ত আবাস স্থল। হে মস্‌উদ! আমার মনোসাধ মনে রহিল, অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, এখন মরণই আমার মঙ্গল। আমি জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিলাম। শীঘ্র আমাকে হত্যা করিয়া নিজ মনস্কামনা পূর্ণ কর, আমারও মনোকষ্ট নিবারণ হউক।

মস্‌উদ (রাঃ) কহিলেন, ধিক্ পাপাত্মা! এখনও তোর আত্ম-গরিমা, বিদ্বেষভাব! অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবার যদি একান্তই সাধ হইয়া থাকে, এখনই সেই সাধ পূর্ণ করি-তেছি। এই বলিয়া তরবারির এক আঘাতে আবুজেহেলের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কোরেশ অধিপতি দুরাত্মা আবুজেহেল মস্‌উদের হস্তে নিহত হইলে, মোস্‌লেম সৈন্যের আনন্দ-সূচক তক্‌বির ধ্বনিতে সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এদিকে বীরকেশরী আলীর অস্ত্রাঘাতে পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত হইতে লাগিল। এই বদর যুদ্ধে আবুসুফিয়ানের জ্যেষ্ঠপুত্র খেজানা, হারেসের পুত্র আবিদা, কয়েসের পুত্র ওমর, ওমরের পুত্র হারমানাহ, আলিদার পুত্র করিয়েস, করিয়েসের পুত্র আবুলকাস, রবিয়া, আখবল, এলাস্‌দ, মতলেব, মগিরা, উইসন, হামজী, আমের, মকতুল, মাইয়ার পুত্র বরিয়া, সয়াদের পুত্র আস, উম্মিয়ার পুত্র আস্, মগিরার পুত্র মসয়ুদ, এন্‌কাফের পুত্র আবুল করাইস, মন্‌জরের পুত্র আবতুল্লা, আছের পুত্র রফা, আবতুল্লার পুত্র

আমের, খলিদের পুত্র নফল, আসাদ ইত্যাদি সত্তর জন বিধর্ম্মী নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। অনন্তর মোস্‌লেম সৈনিকগণ ইস্‌লামের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া মহাসমারোহে শিবিরে প্রত্যাগমন করেন। হজরতের আদেশানুসারে সত্তর জন শত্রু-সৈনিককে কঠিন লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়।

বন্দীগণের প্রতি দয়া।

হজরত বদরযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশ জন মোস্‌লেম সৈনিক যুদ্ধে শহিদ হইয়াছেন। তিনি তাঁহাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এদিকে কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী সৈনিকগণের আর্ত্তনাদে হজরত নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, কারাগারে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, কোরেশ-বংশীয় ৭০ জন লোক অসীম যন্ত্রণাপ্রদ কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে এতবা, আবুজেহেলের পুত্র আক্‌রমা, হজরত আলীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা অকিল, হজরতের জামাতা আবুল-আস এবং পিতৃব্য আব্বাস বন্ধন-যন্ত্রণায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাদের ক্রন্দনে হজরতের হৃদয় দয়ারসে বিগলিত হইয়া পড়িল। তিনি সত্বর পিতৃব্য আব্বাসের নিকট আসিয়া তাঁহার কঠিন করবন্ধন

শিথিল করিয়া দিলেন। হজরত আব্বাসের বন্ধন মুক্ত করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আব্বাস নিজ আত্মীয়, কেবল তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে; দয়ার উপযুক্ত পাত্র দেখিলেই দয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য; এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি সকল বন্দীর করবন্ধন শিথিল করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে অসীম যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন।

তমসাচ্ছন্ন গভীর রজনী, প্রকৃতি দেবী নীরব নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র গোরস্থান সদৃশ বদর-প্রান্তরে স্তূপীকৃত শবদেহের চতুষ্পার্শ্বে মাংসলোভী ফেরুপাল নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এদিকে বন্দিগণ নিজ নিজ জীবনাশায় হতাশ হইয়া বিষম চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছে; রজনী প্রভাত হইলে, কাহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, শত্রুর হস্তে কিরূপ ভাবে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে, এই প্রকার নানারূপ দুশ্চিন্তায়—ভীষণ মানসিক যন্ত্রণায় দুঃখময় রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিল। সুখ-নিশি শীঘ্র শীঘ্র প্রভাত হয়, কিন্তু চিন্তাবিজড়িত দুঃখময় রজনী অতীব বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। পরিণাম সকলেরই আছে। দুঃখময় রজনী অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইলেও, বিধাতার নিয়মিত কাল পূর্ণ হইলে, আর ক্ষণকাল তিষ্ঠিবার উপায় নাই। দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। লোহিত রাগরঞ্জিত হইয়া দিবাকর পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া উদিত হইলেন। হজরতের আদেশানুসারে কারাধ্যক্ষ বন্দিগণকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন। হজরতের সহচরগণ আব্বাসকে উদ্দেশ করিয়া

কহিলেন, তুমি জ্ঞানী লোক হইয়া একমাত্র আল্লাহতায়ালার উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্তর প্রতিমা ও প্রস্তর উপলখণ্ড পূজিতেছ এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ অংশীবাদী বিধর্ম্মিগণের পক্ষ সমর্থন করিতেছ? তোমার এরূপ পাপময় জীবনে ধিক্!

মুসলমান আত্মীয়গণের ভর্ৎসনায় অতিশয় লজ্জিত হইয়া আব্বাস কহিলেন, তোমরা কেবলমাত্র আমার দোষগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছ, কিন্তু আমি যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছি, তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করিতেছ না!

হজরত আলী (কঃ-অঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে পিতৃব্য! তুমি এমন কি সৎকার্য্য করিয়াছ? আব্বাস কহিলেন, আমি কাবা শরিফের স্বায়ত্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছি এবং কাবা শরিফের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করতঃ তাহার গৌরব রক্ষা করিয়াছি। হাজী লোকগণকে জমজম কূপের জলপান করাইয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছি। বন্দিগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে যথোপযুক্ত দানে পরিতুষ্ট করিয়াছি। এ সকল কি সৎকার্য্য নহে? তোমরা কেবলমাত্র লোকের পৌত্তলিকতা দর্শন করিয়া থাক, গুণের বিষয় আদৌ লক্ষ্য কর না।

আব্বাস এই কথা বলিবামাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে এই আয়ত অবতীর্ণ হইল।

"যাহারা স্বীয় জীবনে অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা পরিত্যাগ

করিয়া প্রতিমা-পূজায় নিযুক্ত রহিয়াছে, কাবা মন্দিরের স্থায়িত্ব রক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। যদিও তাহারা সেইরূপ সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অংশ-বাদিত্ব দোষে তাহাদের সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইয়াছে এবং অনন্ত-কালের জন্য প্রধান নরক জাহান্নামে তাহাদের চির আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—(কোর-আন, ৯ম সুরা)

এই মহাবাক্যের (আয়তের) মর্ম্মার্থ জ্ঞাত হইয়া আব্বাস অতিশয় ভীত হইলেন এবং বলিলেন, আমি মুসলমানের সহিত যুদ্ধাভিলাষ করি নাই; কোরেশগণ আমাকে বলপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছিল। আমি পূর্ব্বে কখনও মুসলমান-গণের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই এবং এক্ষণেও করিতে ইচ্ছা রাখি না।

তচ্ছ্রবণে হজরত বলিলেন, বিধর্ম্মিদিগের সহিত যোগদান করিয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিলে সেও বিধর্ম্মী দলভুক্ত হয়। সুতরাং এক্ষণে আপনার পাপমুক্তির জন্য কিছু অর্থ উৎসর্গ করা আবশ্যক। আব্বাস বলিলেন, আমি নিজে কপর্দ্দকশূন্য, কি প্রকারে অর্থ প্রদান করিব? হজরত বলিলেন, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে আপনার স্ত্রী ওম্মে ফজলের নিকট পঞ্চ শত মেস্‌কাল স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই প্রদান করুন। আব্বাস হজরতের এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্যে বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার এই সঞ্চিত অর্থের বিষয় হজরত কি প্রকারে অবগত হইলেন?

এক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম, ইনি প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক, ইহার প্রচারিত ধর্ম্মই সত্য সনাতন ধর্ম্ম। অনন্তর তিনি সেই অর্থ দিয়া পাপমুক্ত হইলেন এবং সেই দিনই সত্য সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বন্দিগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের পরই এই আয়েত অবতীর্ণ হইল।

"ধর্ম্মপ্রচারকের কর্ত্তব্য নহে যে, সকল বন্দীর রক্তস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত করা। তোমরা পার্থিব অর্থ সঞ্চয়াভিলাষ করিতেছ, কিন্তু আল্লাহ পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিতেছেন। আল্লাহ সর্ব্বোপরি বিজ্ঞ ও পরাক্রমশীল। আল্লাহ সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছেন যে, বন্দিদিগের মধ্যে বহুলোকের ভাগ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যদি আল্লাহর প্রথম আদেশ না হইত, তাহা হইলে তোমরা গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইতে। (কোর-আন—সুরা আনফাল, ৬৮।৬৯ আঃ)।

এই আয়ত অবতীর্ণ হইবামাত্র হজরত কয়েকজন বন্দীকে বিনা অর্থদণ্ডে কারামুক্ত করিলেন। তন্মধ্যে কেহ বা পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া নরক পূর্ণ করিল; কেবলমাত্র হজরতের জামাতা আবুল আস, বিবী জয়নাব-প্রদত্ত রত্নকণ্ঠহার লইয়া মুক্তি আশায় হজরতের নিকট উপস্থিত হইল। এই কণ্ঠহার হজরত খোদেজা (রাজিঃ) জয়নাবের বিবাহকালে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। হজরত রত্নহার দেখিয়া উহা খোদেজা (রাজিঃ)এর প্রদত্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সহচর ও শিষ্যগণের মত

লইয়া বিনা অর্থদণ্ডে তাহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু বিবী জয়নাবকে মদিনা পাঠাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত জয়নাবকে আনিবার জন্য জয়দকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। অত্যল্পকাল পরে আবুল আস বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহার সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া হজরতের নিকট পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

অবশিষ্ট বন্দিগণের মধ্যে হজরত আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আকিল ও অজ্ঞাতনামা কয়েক ব্যক্তি সনাতন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিল, হজরত, তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ বলিল, কিছু কিছু অর্থদণ্ড করিয়া মুক্তি দেওয়া হউক, অবশিষ্ট মুসলমানগণের ইচ্ছা যে পাপাত্মাগণের শিরচ্ছেদন করিয়া পাপের উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়াই কর্ত্তব্য। যেহেতু ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশগণ তাহাতে ভয়াতুর হইয়া পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। অনন্তর প্রেরিত মহা-পুরুষ, দুরাত্মা নির্দ্দয় মহাপাপী এতবাকে বলিলেন, হে পাপাত্মা এতবা! এখন তোমার সে দর্প—অহঙ্কার কোথায়? খোদার উপাসনা কালে, আমার প্রতি তুমি কত অত্যাচার করিয়াছ, তাহা কি এখন তোমার স্মরণ হয়? থাক, সে সকল কার্য্যের জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, এখন বক্তব্য এই যে, তুমি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুণ্য-সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক পাপ-আবর্জ্জনা ধৌত করতঃ সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায়

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনন্ত শান্তি সুখ ভোগ কর এবং পরকালের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া অক্ষয় স্বর্গ সুখভোগের অধিকারী হও; নতুবা কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, এবং পরকালে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

পাপাত্মা এতবা মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—আজীবন পাপ-পঙ্কে চিত্ত কলুষিত করিয়া মৃত্যু সময়ে ক্ষণিকের জন্য সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ইস্লাম ধর্ম্মগ্রহণ কি কারণ করিব? চিরকাল নির্দ্দয়তা, বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান করিয়া আজ এই আসন্নকালে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি করিব? আমি তোমার সহিত যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তি হওয়াই কর্ত্তব্য। আমার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বচক্ষে দেখিতেছি। ঐ যে আমি স্পষ্টই শুনিতেছি, কে যেন বলিতেছে, রে মহাপাপি! এই যমদণ্ড দর্শন কর্, এই লৌহমুদ্গরে তোর অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ করিব। উঃ! কি ভয়ানক যাতনা! মৃত্যু হইতেও অধিক যন্ত্রণা! জগৎ অন্ধকারময়—মের না—মের না,—হয়েছে পাপের প্রতিফল! উত্তম হয়েছে! ঐ ঐ অগ্নিময় নরকানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! মহাপাপী এতবা মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপে নরক দর্শন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, আর কেন, শীঘ্র শীঘ্র তোমরা আমাকে হত্যা কর।

হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) আলীকে ডাকিয়া বলিলেন,

এখনই এই মহাপাতকী এতবার মস্তক লৌহদণ্ডাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেল। হজরতের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আলী (কঃ-অঃ) ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লৌহমুগ্দর হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, রে পাপাত্মা ! এই দণ্ডাঘাত গ্রহণ করিয়া তোর চির ঈপ্সিত নরককূপে গমন কর্। এই বলিয়া লৌহমুগ্দরাঘাতে পাপিষ্ঠের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে পাপীর প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্ত নরকধামে গমন করিল।

হজরত বদর যুদ্ধের বন্দী-সৈন্যগণের মধ্যে কাহাকেও অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন, কাহাকেও বিনাদণ্ডে মুক্তি দিলেন, কেহ বা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া প্রাণ হারাইল। অতঃপর যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার বণ্টনের সময় মহাগোলযোগ বাধিল। যাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, আমাদের বাহুবলে জয়লাভ হইয়াছে, অতএব যুদ্ধ-লব্ধ সমুদয় সামগ্রী আমাদেরই প্রাপ্য। যাঁহারা পলায়িত সৈন্যের পরিত্যক্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, ইহাতে আমাদের ব্যতীত অপর কাহারও অধিকার নাই। আর যাঁহারা হজরতের প্রহরীরূপে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, অতএব ঐ সকল বস্তু পুরষ্কার স্বরূপ আমরাই প্রাপ্ত হইব। যখন সকলেই এই প্রকারে গোলযোগ করিতেছিলেন, সেই সময় এই আয়েত অবতীর্ণ হইল।

"হে পরস্পর বিবাদকারিগণ! তোমরা শ্রবণ কর এবং সাবধান হও, যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়, তাহার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের, অবশিষ্ট নিরাশ্রয় দরিদ্র পথিকদিগের জন্য ব্যয়িত হইবে। যেদিন দুই দল সৈন্য পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হয়, সেইদিন আমার প্রচারকের প্রতি যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম, তাহার প্রতি আস্থা স্থাপন কর, সকল কার্য্যের উপর আল্লাহ ক্ষমতাশালী।—(কোর আন— সুরা আন্‌ফাল)

শিষ্য ও সৈন্যগণ আয়তটী শ্রবণ করিয়া বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন। হজরত সকলকে স্বহস্তে দ্রব্যগুলি বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করিলেন। হজরত স্বয়ং আবুজেহেলের উষ্ট্র ও মনতেবার জোলফোক্কার তরবারিখানি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ঐ তরবারি খানি হজরত আলী করমুল্লা অজহুকে প্রদান করিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) সন্তুষ্টচিত্তে জোলফোক্কার নামক তলোয়ার খানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত দ্রব্যই অর্পিত হইয়াছিল। পরে ঐ তরবারি খানি হজরত আলীর বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। ঐ দিবসই আক্কাসের পুত্র সাদ, আসের পুত্র সায়াদের ফতিকা নামক প্রসিদ্ধ তরবারি খানি প্রাপ্ত হন।

বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইতিহাসে লিখিত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ইতিহাসের বর্ণনা।

হজরত মোহাম্মদ (ছাল:) মদীনাবাসিদিগকে কোরেশদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাল্‌হা-বিন্‌-ওবায়দুল্লা ও সয়ীদ-বিন্‌-জয়দ (রাজিঃ)কে কোরেশগণের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ জন্য মদীনার বহির্দ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন। ওদিকে হজরতের চিরশত্রু আবু সুফিয়ান বিপুল পণ্য-সম্ভার লইয়া সুরিয়া (শাম) প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। সে সেখান হইতে জম্‌জম্‌ গফ্‌ফারি নামক একজন লোককে ২০ মেস্কাল পারিশ্রমিক দিয়া মক্কার কোরেশদিগের নিকট এই সংবাদ দিতে পাঠাইয়া দিলাম, "তুমি মক্কায় গিয়া কোরেশদিগকে মোহাম্মদের (ছাঁল:) বিরুদ্ধে সত্বর যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য উত্তেজিত।" জম্‌জম্‌ গফ্‌ফারি উর্দ্ধশ্বাসে মক্কাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং প্রায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস শূন্য ও বিবর্ণাবস্থায় মক্কায় পঁহুছিয়া আবুজেহেলের নিকট আসিয়া বলিল, "তোমরা অতি সত্বরে মদীনা আক্রমণ জন্য সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হও, বোধ হয় এবার মদীনার মুসলমানগণ আবুসুফিয়ানকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিবে।" ইহা শুনিয়া আবুসুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা, স্বীয় পিতা এত্‌বা, ভ্রাতা অলিদ ও পিতৃব্য শয়বাকে হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। তদ্ব্যতীত মোহাবারান-বিন্‌-আমর ও জামা-বিন্‌-আস-ওয়াদ মক্কাবাসীদিগকে যুদ্ধার্থ বাহির হইবার জন্য বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ঘোষণা প্রচার করিল যে, প্রত্যেক পরিবারস্থ দুইজন যুদ্ধোপযুক্ত পুরুষের মধ্যে একজনকে যুদ্ধে গমন করিতে হইবে। তদনুসারে যুদ্ধায়োজন

জনিত কোলাহলে মক্কানগরী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কাফের-দিগের উৎসাহ দেখে কে? তাহারা মুষ্টিমেয় পরদেশে আশ্রিত মুসলমানকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিবে, ইহাই ঐকান্তিক কামনা। উৎসাহ ও উল্লাসের সামা-পরিসীমা নাই। হজরতের পিতৃব্য আব্বাস এই যুদ্ধে যাইতে অস্বীকৃত হইলে কোরেশ প্রধানগণ তাঁহাকে বলিল, "আপনি আমাদের একজন প্রধান দলপতি, আপনি যুদ্ধে গমন না করিলে, অন্যান্য লোক যুদ্ধে যাইতে স্বীকৃত হইবে না। একান্ত পক্ষে যদি আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইতে না পারেন, তবে আপনার প্রতি-নিধি স্বরূপ একজন উপযুক্ত লোক পাঠাইতে হইবে।" অবশেষে মহামতি আব্বাস রাজি হইয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। আবুজেহেল স্বয়ং ১০০ অশ্বারোহী ও ৮৫০ জন পদাতিক সৈনের সৈন্যাপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক ৮ই রমজান (৪ঠা জানুয়ারী—৫২৩) মক্কা হইতে মহাড়ম্বরে মদীনাভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে হজরতের প্রেরিত আছহাবদ্বয় মদীনার অনতি দূরবর্ত্তী এক পল্লীতে কসদ্ জাহেনীর গৃহে অবস্থিতি করিতে ছিলেন; এমন সময় মক্কার বণিক্ দলের নেতা আবুসুফিয়ান সিরিয়া (শাম) হইতে প্রত্যাগমন কালে কসদ্ জাহেনীর গৃহে উপস্থিত হইয়া মুসলমানদিগের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু কসদ্ জাহেনী তাহার কথার কোন সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন আবু সুফিয়ান তথা হইতে চলিয়া গেল।

তালহা (রাজিঃ) ও সয়িদ (রাজিঃ) পরদিন কসদ জাহেলীর গৃহ হইতে রওয়ানা হইয়া 'জোল মারওয়া' নামক স্থানে একদিন অবস্থিতি করিলেন ; তথা হইতে 'বদর' প্রান্তরে গমন করিলেও সেখানে আর বিলম্ব করিলেন না, তাড়া তাড়ি মদীনায় চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে হজরত জেব্রিল (আলাঃ)এর নিকট আবু জহলের যুদ্ধ-সজ্জা ও যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ অবগত হইয়া ৮০ জন মহাজের, ২২৫ জন আন্সার, ৭০টী উষ্ট্র, ২টী অশ্ব, ৬খানি বর্ম্ম ও কতকগুলি তরবারি ও বর্শাদি অস্ত্র শস্ত্রাদি সহকারে ১২ই রমজান (৮ই জানুয়ারী) আত্মরক্ষার্থে মদীনা হইতে বহির্গত হইলেন। যাত্রা কালে ওম্মে কুলসুমের পুত্র ওমর (রাজিঃ)কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। পথিমধ্যে 'সওবান' নামক স্থানে তাল্হা (রাজিঃ) ও সয়িদ (রাজিঃ) এর সঙ্গে হজরতের সাক্ষাৎ হয় ; এবং তিনি তাহাদের বাচনিক আবু সুফিয়ানের বণিকদলের কথা অবগত হন। যদি হজরত কোরেশদিগের পণ্য দ্রব্য গুলি হস্তগত করিতে ইচ্ছুক হইতেন, এবং ঐ সকল লুণ্ঠন করা তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিত, তবে অতি সহজেই তাহা করিতে পারিতেন। কিন্তু আত্মরক্ষা করা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। সুতরাং আবুজহলের সেনাদলের সম্মুখীন হইবার জন্য "বদর" নামক প্রান্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বদর নামক একব্যক্তি ঐ স্থানে একটী কূপ খনন করাতে ঐ স্থানটীর নাম 'বদর' হইয়াছিল। পক্ষান্তরে

দেখা যায় যে, আবুজহলের যুদ্ধযাত্রার ৪ দিন পরে আত্ম-রক্ষার্থ তিনি বদরাভিমুখে অগ্রসর হন। যদি কোরেশদিগের পণ্য দ্রব্যাদি হস্তগত করা হজরতের উদ্দেশ্য হইত, তবে তিনি আবুজহলের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই আবু সুফিয়ানকে আক্রমণ করিতেন; এবং অতি সহজেই সিরিয়া হইতে আগত সেই বিপুল সামগ্রী সম্ভার হস্তগত করিতেন; এবং তাহাতে অতি সহজেই সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন। বদরে হজরতের সঙ্গে অধিকাংশ আনসার আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা হজরতকে কেবল শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া প্রথমেই শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত কেবল আত্ম-রক্ষার্থই মদীনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। মোস্লেম-শত্রু-দিগের মধ্যে কেহ কেহ এই যুদ্ধে হজরতের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকে। হজরত মদীনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে ৫ দিন গমনের পর ১৭ই রমজান (১৩ই জানুয়ারী) বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া, তথাকার উচ্চ ভূমির উপর নামাজ পড়িবার জন্য একটী আরিস্ (পর্ণশালা—পাতার ঘর) নির্ম্মাণ করিলেন; এবং আপনাকে রক্ষার জন্য একদল মুসলমানকে প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। হজরতের জামাতা ওস্মান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ) স্বীয় আহলিয়া (স্ত্রী), হজরতের দুহিতা বিবী রোকেয়ার (রাজিঃ) কঠিন পীড়া বশতঃ এই

অভিযানে হজরতের সমভিব্যাহারে গমন করিতে পারেন নাই।

আবু সুফিয়ান বদরে পঁহুছিয়া তথাকার অধিবাসী মস্‌দি-বিন্ আমরে নিকট মুসলমানদিগের ভাব-গতিক ও গতি-বিধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু মস্‌দি তাহার কথার কোন উত্তর দিয়াছিলনা। কিন্তু সুচতুর আবু সুফিয়ান সেই স্থানে মদীনা নগরীতে উৎপন্ন কয়েকটী খেজুরের বীজ (আঁটি বা দানা) দেখিতে পাইয়া নিকটেই মুসলমানগণ আছেন বলিয়া জানিতে পারে। কারণ, মদীনা নগরে উৎপন্ন খেজুরের দানা অতি ক্ষুদ্র। উহা দেখিয়া আবু সুফিয়ান সন্ত্রস্ত ভাবে স্বীয় 'কাফেলা' লইয়া মক্কাভিমুখে প্রস্থান করিল।

আবু সুফিয়ান নির্ব্বিঘ্নে মক্কায় পঁহুছিয়াছে। আবু জহল যথা সময়ে এ সংবাদ প্রাপ্ত হইল। যদি কেবল মাত্র আবু সুফিয়ানকে রক্ষা করাই আবু জহলের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সে তাহার নিরাপদে মক্কায় পঁহুছিবার সংবাদ পাইয়াই নিরস্ত হইত! কিন্তু যখন আবু জহল আবু সুফিয়ান প্রভৃতি সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী কোরেশদিগের নিরাপদে মক্কায় পঁহুছিবার সংবাদ পাইয়াও মদীনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন একথা অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, কোরেশ-দিগের মনে একটা বিষম দুরভিসন্ধি বিদ্যমান ছিল। তাহাদের কার্য্য কলাপে ইহা স্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। মক্কা হইতে ক্রমাগত ৯ দিন গমনের পর কোরেশ সৈন্যদল ১১ই রমজান

(১৩ই জানুয়ারী) বদর প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুসলমান যোদ্ধ পুরুষগণের সম্মুখেই শিবির সন্নিবেশিত করিল। মুসলমানগণ তাহাদের সংখ্যাধিক্য হইয়া চিন্তিত হইলেন। তখন হজরত রেছালত মাব রছুলে আকরম মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (সালঃ) হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক অল্প সংখ্যক মুসলমানের নিরাপদতা ও জয়লাভের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতালার মহা দরবারে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যথা ঃ—হে দয়াময় আল্লাহতা-লা ! আপনি অসহায়ের সহায়, এবং বিপন্নের বিপদ উদ্ধারকারী, আপনি আমাদের সহায় হউন। হে বিশ্বপতেঃ ! যদি এই অল্প সংখ্যক মুসলমান কাফেরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ও নির্ম্মূল হয়, তাহা হইলে, তোমার উপাসনা করিবার জন্য কেহই থাকিবে না।" এই প্রার্থনার পর হজরত স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে বলিলেন, "ভয় করিও না, আল্লাহ তালা আমাদের সহায় আছেন।"

দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কোরেশ দলের মধ্য হইতে অত্‌বা, অলিদ ও শয়বা রণ কণ্ডূয়নে অধীর হইয়া সর্ব্বাগ্রে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। তাহারা গর্ব্ব ও দর্প প্রকাশ পূর্ব্বক মুসলমানদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। তাহাদের রণাহ্বান শুনিয়া ৩ জন আন্‌সার যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে তাহারা বলিল, "আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই, আমাদের স্বদেশীয় ধর্ম্মত্যাগীদিগকে যুদ্ধে আগমন করিতে বল। যদি তাহাদের সাহস ও বীরত্ব থাকে, তবে আমাদের সম্মুখীন

হউক। এতচ্ছ্রবণে হজরত হামজা (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ অঃ) এবং ওবেদা-বিন্ হারেশ (রাজিঃ) ভীম বেগে অগ্রসর হইয়া স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধে হজরত হামজা (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ অঃ) স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিহত করিয়া ওবেদা (রাজিঃ)কে সাহায্য করিতে গেলেন। অত্‌বার হস্তে ওবেদা (রাজিঃ) আহত হইয়াছিলেন। বিজয়ী বীরদ্বয় অগ্রসর হইয়া অত্‌বাকে শমন-সদনে পাঠাইয়া দিলেন। কোরেশ দলের ৩ টী প্রধান বীরের পতন হইল।

কথিত আছে, যুদ্ধকালে হজরত একখানি পর্ণ-কুটীরে আল্লাহ্‌তা-লার উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন। কিছুকাল পরে গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক এক মুষ্টি ধূলি শত্রু সৈন্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক বালুকা রাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। লীলাময়ের অনন্ত লীলা। তিনি সাধকের মনোবাঞ্ছা এই রূপেই পূর্ণ করিয়া থাকেন। যিনি নবী শ্রেষ্ঠ, সাধক শ্রেণী, পয়গম্বরগণের শিরোমনি, সাধক কুল-চূড়ামনি, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে কি কোনও সন্দেহ আছে? ইতিহাসে ইহাও উল্লিখিত আছে, সেই প্রবল বাত্যার সঙ্গে বহু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা শ্বেত ও পীত বর্ণের পাপড়ি মস্তকে ধারণ ও চাক্‌চিক্যশালী উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক কোরেশ সেনাদলকে বিমর্দ্দিত ও নিহত করিতেছিলেন। এই কথা কেবল যে মুসলমানগনই প্রচার

করিয়াছেন, তাহা নহে। বদর যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে একজন মেষ-পালক মেষ চরাইতেছিল; সে বলিয়াছে, "আমি আমার ভ্রাতার সহিত পাহাড়ের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখিতেছিলাম, এবং বিজয়ীদিগের সঙ্গে যোগদান পূর্ব্বক লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিতে পাইলাম সুদূরবর্ত্তী বিস্তৃত মেঘমালা আমাদের দিকে দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের হ্রেসারবে ও পদধ্বনিতে এবং জয়ঢাকের শ্রবণ বিদারী আওয়াজে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যে সময়ে মেঘমালা দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতে-ছিল; সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় দূত দলও অগ্রসর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিল। প্রধান স্বর্গীয় দূতের ভীষণ রব শ্রবণে আমার ভ্রাতা বিষম ভয়াকুলিত হইয়া তদ্দণ্ডেই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল; আমিও মৃতকল্প হইয়াছিলাম।"

বদরের যুদ্ধে স্বর্গীয় দূতের সাহায্য সম্বন্ধে পবিত্র কোর-আন মজিদের ৮ম সুরায় (সুরে আনফালে) বিশেষ রূপে উক্ত হইয়াছে। নিম্নে দুইটী আয়েতের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল; যথা :—"হে মুসলমানগণ! তোমরা তাহাদিগকে বধ কর নাই, আল্লাহতা-লা তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন। হে মোহাম্মদ (সাল্লাঃ) তুমিও তাহাদের চক্ষে বালুকণা নিক্ষেপ কর নাই, তখন বোধ হইতেছিল যে, তুমিই তাহাদের প্রতি বালুকা কণা নিক্ষেপ করিতেছ, কিন্তু আল্লাহতালাই তাহাদের প্রতি বালুকা-কণা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।"—"যখন তোমরা তোমাদের

আল্লাহ্‌এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে সহস্র স্বর্গীয় দূতের দ্বারা সাহায্য করিয়াছি।”

যুদ্ধক্ষেত্রে আবদুল্লা-বিন্‌-মসউদ (রাজিঃ) কোরেশদলের প্রধান সেনাপতি ও অন্যতম প্রধান দলপতি, মুসলমানদিগের ভীষণ শত্রু আবুজহলের উরুদেশে প্রচণ্ড তরবারির আঘাত করায় সে বিরাট তালতরুবৎ ভূতলে পতিত হয়, তৎপর আবদুল্লা (রাজিঃ) তাহার মুণ্ডপাত করেন। সে মৃত্যু কালেও হজরতের প্রতি তীব্র ভাষায় গালি বর্ষণ করিয়া স্বীয় পাপ আত্মা আরও কলুষিত করিয়া নরকের ইন্ধন রূপে পরিণত হইয়াছিল। এব্‌নে হেশাম ৪৪৩ পৃঃ ও এব্‌নোল আসীর ২য় খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠায় বদর যুদ্ধে আবুজহলের নিহত হওয়ার বিবরণ বর্ণিত আছে। স্যার উইলিয়ম মুয়র বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া হজরতের যে জীবন চরিত ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, আবু-জহলের মস্তকটী কাটিয়া যখন হজরতের নিকট আনয়ন করা হইল, তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন, যে, “আরবের উৎকৃষ্ট উষ্ট্র অপেক্ষা ইহা আমার নিকট গ্রহণীয়।” কিন্তু এব্‌নে হেশাম এব্‌নোল আসীর আবুল ফেদা, তাবারি প্রভৃতি বিখ্যাত ইতি-হাস বেত্তাদিগের গ্রন্থে একথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং একথাটী যে স্যার উইলিয়ম মুয়রের স্বকপোল কল্পিত, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

আবু জহল যুদ্ধ যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মক্কা নগরীস্থ

পবিত্র কাবা গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা পবিত্র কোর-আন শরিফের আন্‌ফাল সুরায়—৩২ আয়েতে এইরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছে :—"এবং যখন তাহারা বলিল, হে আল্লাহতা-লা, যদি ইহা (কোর-আন) তোমার নিকট হইতে (আগত) সত্য হয় তবে আমাদিগের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর, অথবা আমাদিগের প্রতি দুঃখ জনক শাস্তি উপস্থিত কর।"

খাবিয়ের পুত্র ওমাইয়া. খাবির (রাজিঃ) নামক এক জন আন্‌সারের হস্তে নিহত হয়। এই যুদ্ধে কোরেশ পক্ষের ৭০ জন যোদ্ধা নিহত ও ৭০ জন মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। আহতের সংখ্যা অনেক ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। মুসলমান পক্ষে ৬ জন মহাজের ও ৮ জন আন্‌সার শহিদ হন। বিভিন্ন ইতিহাসে এই যুদ্ধের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সার উইলিয়ম মুয়র বিদ্বেষ বুদ্ধি পরবশ হইয়া হজরতের যে প্রকাণ্ড জীবন চরিত লিখিয়াছেন তিনি আক্রমণকারী কোরেশ দলের বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি সত্য ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে সমস্ত দোষ হজরতের প্রতি চাপাইয়াছেন। তিনি ইতিহাসের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। স্যার উইলিয়ম মুয়র বলেন, বদরের যুদ্ধে (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) স্বয়ং অগ্রগামী হইয়া কোরেশদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, আবু

সুফিয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত সিরিয়া হইতে আগত মক্কার কোরেশ বণিক্‌দলকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিবার জন্য হজরত মদীনা হইতে সদলবলে বাহির হইয়াছিলেন; আবু সুফিয়ান আসন্ন বিপদের বিষয় জানিতে পারিয়া কোরেশদিগের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠায়; এইরূপ বদরের চিরস্মরণীয় যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। আমরা স্যার উইলিয়ম মুয়রের উক্তির সম্পূর্ণ অলীকত্ব প্রদর্শন করিব; তাহার উক্তির অযৌক্তিকতা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা দেখাইব। হজরত কোরেশ বণিকদিগকে আক্রমণ এবং তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্য হস্তগত করিবার জন্য যে মদীনা হইতে রণসজ্জা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। তিনি শত্রুদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্যই যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, পাঠকগণ ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে মহা-মহিমাময় আল্লাহ তা-লা পবিত্র কোরআন শরীফে কি বলিয়াছেন, দেখুন :—

"এবং স্মরণ কর, যেরূপ তোমার প্রতিপালক তোমাকে সত্য প্রচারের জন্য স্বীয় আলয় হইতে বাহির করিয়াছেন, এবং নিশ্চয়ই সত্য ধর্ম্মাবলম্বাদিগের একদল তাহাতে অসন্তুষ্ট।" (কোর-আন, ৮ম সুরা—৬ আয়েত।)

এই আয়েত দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, বদরের যুদ্ধকালে হজরত মদীনার বাহিরে আইসাতে বিশ্বাসীদিগের (মুসলমানগণের) মধ্যে এক দল অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যদি কোরেশ বণিকদিগের পণ্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লওয়া তাহাদের

উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই অসন্তুষ্ট হইতেন না। এই ব্যাপারের প্রকৃত কারণ এই যে, বিশ্বাসী দিগের (মুসলমান গণের) একদল মদীনা নগরের মধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার জন্য গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন ; ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, মক্কার স্থল বণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা মুসলমানদিগের ছিল না ; এবং কোরেশগণ যে স্বজাতীয় বণিক্‌দিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল, তাহাও ইহাতে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রমাণিত হইল। হজরত কেবলমাত্র আক্রমণেচ্ছু কোরেশদিগের গতি রোধ জন্যই শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মদীনা হইতে বাহির হইয়া বদরের দিকে গমন করিয়াছিলেন।

কোর-আন শরিফের আরও উক্তি দেখুন :—"যখন তাহারা উপত্যকার নিকটবর্ত্তী ছিল, এবং স্থল বণিক্‌গণ তোমাদের নিম্নে (নীচুস্থানে) ছিল, যদি তোমরা যুদ্ধের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে, তবে নিশ্চয়ই তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইতে ; কিন্তু যে কার্য্য সম্পান্ন কারবার উপযুক্ত হয়, আল্লাহ তাহা সম্পন্ন করেন।" (কোর-আন, ৮ম সুরা—৪৩ আয়েত।)

এই আয়েত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ঘটনাক্রমে মুসলমানগণ কোরেশ সৈন্যগণ ও সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত মক্কার বণিক্‌গণ পরস্পর নিকটবর্ত্তী ও সম্মুখীন হইয়াছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, হজরত ইচ্ছাপূর্ব্বক কোরেশ বণিক্‌দিগের বাণিজ্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিবার জন্য মদীনা হইতে সদলবলে

বাহির হইয়াছিলেন, একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হজরত কোরেশ বণিক্‌দিগকে লুণ্ঠন ও কোরেশদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বদরে আগমন করিয়াছিলেন না। হজরত কেবল আত্মরক্ষার্থ এবং মদীনা নগর শত্রুহস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্যই সসৈন্যে মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কোরেশ বণিক্‌দিগকে আক্রমণের এবং তাহাদের পণ্য দ্রব্য লুণ্ঠনের ইচ্ছা থাকিলে তিনি অনেক পূর্ব্ব হইতেই তাহার যোগাড় করিতেন। আবু সুফিয়ান কয়েক দিন পর্য্যন্ত মদীনার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইল, কোরেশ বণিকগণ মদীনার নিকট দিয়া মক্কাভিমুখে গমন করিল; এ সুযোগ কি তিনি ত্যাগ করিতেন; ঐ সুযোগে আক্রমণ করিলে মক্কাবাসিগণের বিপুল পণ্য সম্ভার অতি সহজেই তাহার হস্তগত হইত। এ সম্বন্ধে যাহারা হজরতের প্রতি দোষারোপ করে, তাহারা হিংসাবাদী ও বিদ্বেষ পরায়ণ সত্যের অপলাপকারী লোক; তাহাদের উক্তির কোন মূল্য নাই।

বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে কোর-আন পাকের আর একটী আয়েত দেখুন :—

"এবং স্মরণ কর, যখন আল্লাহ সেই দুই দলের এক দলকে তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এবং তোমরা ইচ্ছা করিয়াছিলে যে, যাহাদের অস্ত্র শস্ত্র ও প্রতাপাদি নাই, তাহারাই আমাদিগকে আক্রমণ করুক; কিন্তু আল্লাহ্‌ই ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় উক্তি সমূহ দ্বারা সত্যকে

প্রমাণিত করেন, এবং ধর্ম্মদ্রোহিদিগকে সমূলে বিনষ্ট করেন।” (কোর-আন, ৮ম সুরা—৭ম আয়েত।

এই আয়েত দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঘটনা ক্রমে সকল দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া শিবির সংস্থাপন করিয়া ছিল। সেই সময়ে সেই স্থানে মুসলমানগণ কোরেশদিগের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া কোরেশ বণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, কোরেশ বণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা মুসলমান দিগের পূর্ব্বে ছিল না।

এতৎসম্বন্ধীয় আর একটী আয়েত দেখুন :—

“কিন্তু যদ্যপি তাহারা তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনার সহিত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্ব হইতেই আল্লাহ্‌র সহিত প্রবঞ্চনাজনক ব্যবহার করিয়াছে; তৎপরে তাহাদের উপর তোমাদের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।” (কোর-আন, ৮ম সুরা—৭২ আয়েত)।

এই আয়েত দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসী যে সকল লোক (কোরেশ) বন্দী হইয়াছিল, তাহারা বন্দী হইবার পূর্ব্বে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল; তদ্ব্যতীত আরও দেখা যাইতেছে যে, তাহারা মদীনাবাসী মুসলমান দিগকে অগ্রে আক্রমণ করিবার নিমিত্তই মক্কা হইতে অভিযান করিয়াছিল।

এতৎ সম্বন্ধীয় আরও একটী আয়ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

"যাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, এবং ধর্ম্ম প্রচারককে (তাহার নূতন আশ্রয় স্থান হইতে) নির্ব্বাসিত করিতে যত্নবান আছে; এবং যাহারা তোমাদিগকে প্রথমে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে কি তোমরা যুদ্ধ করিবে না? তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিতেছ? কোর-আন, ৯ম সুরা—১৩ আয়েত এতদ্ব্যতীত কোর-আন শরিফের ৩য় সুরার ৫।২৯।৫২।৬৬।৭২ আয়েত; ৪র্থ সুরার ৪ ও ১৫ আয়েতে বদর যুদ্ধের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বদর যুদ্ধের বন্দিগণের কথা।

বদর যুদ্ধে কোরেশ পক্ষের ৭০ জন লোক মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩০ জন কোরেশদিগের মধ্যে ও হাশেম বংশে অতি সম্মানিত ও খ্যাতাপন্ন ছিল। এস্থলে তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম লিখিত হইল। ১। আব্বাস বিন্ আবদুল মোতালেব (হজরতের পিতৃব্য); ২। ওকিল বিন আবু তালেব (হজরত আলীর [কঃ অঃ] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা); ৩। আবুল-আস-বিন-রবি; ৪। ওজায়ের-বিন্-ওমর; ৫। আলিদ

বিন্-মগিরা , ৬। রাহাব-বিন-ওমায়ের ; ৭। সোহেন-বিন্-ওমর, ৮। আক্‌বা-বিন্-মোয়েব ; নজর-বিন হারেস প্রভৃতি।

বন্দিগণ মুসলমানদিগের শিবিরে অতিথির ন্যায় আরামে অবস্থিতি করিতে লাগিল। (১)

এই সময় কোরেশ পক্ষের একজন দূত হজরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)এর নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ)কে বলিয়া অর্থ বিনিময়ে আমাদের বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করাইয়া দিন। দেখুন, বন্দিগণ আপনাদের ও আমাদের আত্মীয়, তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে আমাদের উভয় পক্ষেরই মনোকষ্ট উপস্থিত হইবে।" হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ কথা, আমি হজরতকে বলিয়া বন্দিদিগকে মুক্তি করাইয়া দিব।" তৎপর সেই কোরেশ পক্ষীয় দূত হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রার্থনা জানাইল। তিনি তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, না বন্দীদিগকে কিছুতেই মুক্তিদান করা হইবে না ; উহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে।" ইতিমধ্যে হজরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)

(১) তারিখে এবনে হাশাম ৪৪৫পৃষ্ঠা। স্যার উইলিয়ম মুয়র বলেন, বন্দিগণ বন্দিত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বলিয়াছিল যে মদিনাবাসী মুসলমানগণ আমাদিগকে ঘোড়ায় চড়াইয়া নিজেরা পদব্রজে যাইতেন, এবং আমাদিগকে যবের রুটী খাইতে দিয়া তাহারা সামান্য খাদ্য দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিতেন।

হজরতের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া বন্দী কোরেশ দিগকে মুক্তি প্রদান জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু হজরত তাহার কথার কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) হজরতের নিকট হইতে উঠিয়া আসিবার পর হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন; এবং বন্দীগণকে হত্যা করিবার জন্য হজরতকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হজরত তাহার কথার ও কোন উত্তর দিলেন না। এইরূপে হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) ক্রমান্বয়ে তিন তিনবার স্ব স্ব প্রস্তাব লইয়া হজরতের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং স্ব স্ব মতানুযায়ী কার্য্য করিতে হজরত (ছালঃ) কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অবশেষে হজরত স্বীয় সাহাবা (শিষ্য) দিগকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আবু বকর (রাজিঃ) বন্দিগণের প্রতি মিকাইল (আলাঃ), ইব্রাহিম (আলাঃ) ও ঈশার (আলাঃ) ন্যায় দয়ালু ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন; আর ওমর (রাজিঃ) বন্দিগণের প্রতি জেব্রিল (আলাঃ), নূহ (আলাঃ) ও মুসা (আলাঃ) ন্যায় কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, বন্দিগণকে অর্থ বিনিময়ে মুক্তি প্রদান করা উচিত" সাহাবা (রাজিঃ) গণ হজরতের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাতে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) অর্থশালী (ধনী) লোকদিগকে অর্থ বিনিময়ে

ছাড়িয়া দিলেন; আর আবুল বখ্‌তারি জামা ও হারেশ প্রভৃতি কতকগুলি গরীব বন্দীকে বিনা অর্থে মুক্তি প্রদান করিলেন। দরিদ্র বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা লিখিতে জানিত, তাহারা মহাজের ও আন্‌সারদিগের পুত্রদিগকে আরবী ভাষার অক্ষর সমূহ শিখাইয়া দিয়া মুক্তি লাভ করিল।

হজরত আব্বাস এই যুদ্ধে বন্দী হইলে মুসলমানগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি অনেক সৎ কার্য্য করিয়াছি; এবং কাবা মন্দিরকে রক্ষা করিয়াছি।" এতদুপলক্ষে আল্লাহ জল্লশানহু পবিত্র মহাগ্রন্থ কোর-আনের নিম্ন লিখিত আয়েত অবতীর্ণ (নাজেল) করেন; যথা:—"যাহারা স্বীয় জীবনে ধর্ম্ম-দ্রোহিতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহারা কাফেরদিগের দলভুক্ত হইয়াছে; আর তাহাদের সমুদয় সৎকার্য্য ব্যর্থ হইয়াছে, তাহারা দোজখের (নরকের) চির নিবাসী।"—(কোর-আন ৯ম সুরা)। হজরত আব্বাসের মুক্তির জন্য অর্থ চাওয়া হইলে তিনি বলিলেন, কোরেশগণ আমাকে বল পূর্ব্বক যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করিয়াছিল, আমিত পূর্ব্বে কখনও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই।" ইহা শুনিয়া হজরত বলিলেন, "পিতৃব্য! বিধর্ম্মীদিগের সহিত যোগ দিয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিলে সেও বিধর্ম্মী দিগের দলভুক্ত হয়। অতএব আপনাকে মুক্তির জন্য অর্থ দিতেই হইবে।" তচ্ছ্রবণে হজরত আব্বাছ বলিলেন, "আমার নিজের কিছুমাত্র অর্থ নাই, আমি

কোথা হইতে অর্থ দিব ?" তচ্ছ্রবণে হজরত বলিলেন, আপনি যুদ্ধে আসিবার পূর্ব্বে আপনার স্ত্রী ওম্মে-ফজলের নিকট যে ৫০০ মেশকাল স্বর্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই প্রদান করুন। ইহা শুনিয়া হজরত আব্বাস মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, যখন আমি ওম্মে ফজলের নিকট ৫০০ মেশকাল জমা রাখি, তখন ত কেহ তাহা জানিতে পারে নাই ; যখন ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ (সালঃ) তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তখন ইনি বাস্তবিকই আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর (তত্ত্ব-বাহক—সত্যধর্ম্ম প্রচারক)। অনন্তর তিনি সেই গচ্ছিত টাকা দিয়া মুক্তিলাভ করেন ; এবং অল্পকাল মধ্যেই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। হজরতের জামাতা আবুল আসের মুক্তি সম্বন্ধে পরে লিখিত হইবে। বন্দিগণের মুক্তির পর হজরতের নিকট আনফাল নামক ছুরায় ৬৭ সংখ্যক আয়েত নাজেল (অবতীর্ণ) হয়।

বদর যুদ্ধে জয়-লব্ধ দ্রব্যাদির ভাগ-বণ্টন।

বদর যুদ্ধের মুসলমানদিগকে ৩ তিন দলে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম দল, হজরতের 'আরিস' নামক বাস-গৃহের

প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন; দ্বিতীয় দল, শত্রু পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; ৩য় দল, পলায়মান শত্রুদিগের অস্ত্র-শস্ত্রাদি কাড়িয়া লইতে নিযুক্ত ছিলেন।

হজরত যুদ্ধের জয়-লব্ধ সামগ্রী সম্ভার বদর যুদ্ধে যোগদান-কারী মুসলমানদিগের মধ্যে, এবং হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) সয়ীদ (রাজিঃ) এবং তাল্‌হা (রাজিঃ) এই তিনজন মহাত্মের ও আবু লোব্বাবা, আসেম-বিন্‌-আদি (রাজিঃ) হারেশ-বিন্‌-হাতেব (রাজিঃ), খোয়াৎ-বিন্‌-জোবায়ের (রাজিঃ), হারেস-বিন্‌-সোমার (রাজিঃ) এই পাঁচজন আন্‌সার এবং যাঁহারা কোনও গুরুতর বা অনিবার্য্য কারণ বশতঃ যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে এবং যাঁহারা যুদ্ধে শহীদ (নিহত) হইয়াছিলেন, সেই সকল মুসলমানের উত্তরাধিকারী গণের মধ্যে সমানরূপে ভাগ বণ্টন করিয়া দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই আদেশ শ্রবণে পূর্ব্বোক্ত ৩ দলের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। যাহারা যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, আমাদের বাহু বলেই যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে; অতএব জয়-লব্ধ দ্রব্যগুলি আমরাই প্রাপ্ত হইব। যাঁহারা পলায়মান শত্রুগণের অস্ত্রশস্ত্র ও সামগ্রী সম্ভার কাড়িয়া লইবার এবং সংগ্রহ করিবার কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, সমুদয় জিনিষ পত্র ও সামগ্রী সম্ভার আমরাই সংগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য আমাদেরই প্রাপ্য। আর যাঁহারা হজরতের প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা বলিতে

লাগিলেন, "তোমাদের সকলের অপেক্ষা আমরাই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম ; অতএব আমরাই ঐ সকল দ্রব্য পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইব।" কিন্তু হজরত সকল গোলযোগ ও দাবী দাওয়াস্তে মীমাংসা করিয়া দিলেন ; এবং তাঁহার প্রস্তাবিত নিয়মানুষায়ী অস্ত্রশস্ত্র ও সামগ্রী সম্ভারগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। এই জিনিষ গুলির ভাগ বাটোয়ারা সম্বন্ধে পবিত্র কোর-আন মজিদে যে আয়েত নাজিল (অবতীর্ণ) হইয়াছিল, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—তাহারা জয়-লব্ধ দ্রব্যগুলির বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, (হে মোহাম্মদ) তুমি তাহাদিগকে বল, জয়লব্ধ দ্রব্য সমূহ খোদাতালার ও তাহার পয়গম্বরের (ধর্ম্ম-প্রচারকের) জন্য, অতঃপর আল্লাহকে ভয় কর এবং আপনাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক, তাহা হইলে আল্লাহ ও তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারকের অনুগত হও। (কোর-আন ; সুরে আনফাল—১ম আয়েত)। এতদ্ভিন্ন বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে আরও কতিপয় আয়েত নাজেল (অবতীর্ণ) হইয়াছিল। সাহাবা (শিষ্য)গণ উপরোক্ত আয়েতটী শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্ব স্ব অংশ বিনা বাক্য-ব্যয়ে গ্রহণ করিলেন। হজরত স্বয়ং আবু জহলের উষ্ট্র ও মনতেবার "যোল-ফোকার" নামক স্বনাম প্রসিদ্ধ তরবারি খানি প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ তরবারি খানি স্বীয় প্রিয় জামাতা মহাবীর হজরত আলী (রাজিঃ)কে প্রদান করেন। উত্তর কালে তিনি সকল প্রধান প্রধান যুদ্ধেই এই প্রসিদ্ধ ও ভীষণ তরবারি খানি ব্যবহার

করিয়াছিলেন। হজরত সাদ, বিন্‌-আবি আক্কাস (রাজিঃ) সাদ-বিন্‌-আসের "কতিফা" নামক বিখ্যাত তরবারিখানি প্রাপ্ত হন।

আবুল আস-বিন্‌ রাবির মুক্তিলাভ ও হজরত জয়নবের (রাজিঃ-আঃ) মদীনায় আগমন।

হজরতের প্রেরিতত্ব (পয়গম্বরী) লাভের পূর্ব্বে, আবুল আস-বিন্‌ রাবির সহিত স্বীয় কন্যা হজরত জয়নব (রাজিঃ-আঃ) এর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহ কার্য্য যখন সম্পন্ন হয়, তখন হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রাও জীবিত ছিলেন। আবুল আস ঘোর পৌত্তলিক ছিল; সে ও তাহার পিতা মাতা হজরত জয়নব (রাজিঃ-আঃ)কে নানাপ্রকার কষ্ট প্রদান করিত। পয়গম্বর নন্দিনীর পক্ষে পৌত্তলিক গৃহে বধু রূপে বাস করা কিরূপ ক্লেশাবহ ব্যাপার তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আবুল আস হজরতের বিনাশ সাধনার্থ এই যুদ্ধে আসিয়াছিল। যখন মক্কার বন্দিগণ অর্থ বিনিময়ে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তখন আবুল আস হজরত জয়নব (রাজিঃ-আঃ) প্রেরিত কণ্ঠহার স্বীয় মুক্তির জন্য হজরতের নিকট উপস্থিত করে। এই কণ্ঠহার খানি হজরত খোদায়জাতুল কোবরা (রাজিঃ-আঃ) প্রিয়তমা কন্যার বিবাহকালে যৌতুক স্বরূপ

দিয়াছিলেন। হজরত কণ্ঠহার খানি দেখিয়াই উহা হজরত খোদায়জা (রাজিঃ-আঃ) প্রদত্ত কণ্ঠহার বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সাহাবা (শিষ্য) গণের নিকট আবুল আসকে বিনাপণে মুক্তি প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। হজরতের প্রস্তাবে সকলে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তিনি আবুল আসকে বলিলেন, "তুমি এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, মক্কায় গিয়া জয়নবকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে।" আবুলআস সেই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, হজরত তাহার সঙ্গে স্বীয় বিশ্বস্ত দাস জয়দকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন।

বদরের যুদ্ধে পরাজিত ও কোরেশদিগের প্রধান প্রধান বীর নিহত হওয়ায় হজরতের উপর মক্কাবাসী পৌত্তলিকদিগের ক্রোধানল অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তজ্জন্য জয়দ মক্কার নগর-প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তাহার বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আবুল আস গৃহে পঁহুছিয়া স্বীয় সহোদর কানানাকে বলিল, "তুমি জয়নবকে সঙ্গে লইয়া গিয়া নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে জয়দের নিকট দিয়া আইস। কানানা ভ্রাতার আদেশানুসারে হজরত জয়নব (রাজিঃ-আঃ)কে উষ্ট্রোপরি আরোহণ করাইয়া লইয়া চলিল। গমন কালে পথি-মধ্যে কোরেশ বংশীয় কতিপয় লোক হজরত জয়নবের (রাজিঃ-আঃ) মদীনায় গমন সংবাদ শুনিয়া কানানাকে নানাপ্রকার ভৎর্সনা করিতে লাগিল। এমন কি দুরাত্মা হাবার বিন্-আসওয়াদ হজরত জয়নব (রাজিঃ)কে হত্যা করিবার জন্য

উষ্ট্রের হাওদার মধ্যে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কানানা এই আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে পয়গম্বর নন্দিনীকে রক্ষা করিয়াছিল। আবার নাফেয় বিন্-আবুল কায়েস ফোহরি কানানাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এই সকল গোল-যোগের সংবাদ শুনিয়া কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বিবী জয়নব প্রকাশ্য ভাবে হজরতের নিকট প্রেরিত হইতেছেন শুনিয়া আবু সুফিয়ান ও কানানাকে তিরস্কার করিল, এবং বলিল, "এইরূপ প্রকাশ্য ভাবে জয়নব (রাজিঃ-আঃ)কে হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) নিকট প্রেরণ করিলে আমাদের একতা এবং মর্য্যাদার অনেক লাঘব হইবে; অতএব তুমি উহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া চল; রাত্রিকালে জয়দের নিকট পঁহুছাইয়া আসিও।" তদনুসারে কানানা হজরত জয়নব (রাজিঃ-আঃ)কে। দিবসে আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে রাখিয়া রাত্রিকালে জয়দের নিকট পঁহুছাইয়া দিল। জয়দ প্রভু নন্দিনীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে মদীনায় পঁহুছাইয়া দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে আবুল-আস সিরিয়ায় বাণিজ্য করিতে গিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন কালে মদীনার মহাজনদিগের দেনা শোধ করিবার জন্য মদীনায় উপস্থিত হইয়া হজরতের নিকট পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপর হজরত স্বীয় দুহিতা রক্কে আবুল আসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

হজরত বদরের যুদ্ধ হইতে যখন সশিষ্যে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন তাঁহার জামাতা হজরত

ওস্‌মান গণি (রাজিঃ) ও তদীয় ভ্রাতা, তাঁহার কন্যা হজরত রোকয়ার (রাজিঃ-আঃ) পবিত্র মৃতদেহ কবর দিবার জন্য সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছেন। কোরেশদিগের ভীষণ উৎ-পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া হজরত ওস্‌মান গণি পত্নী হজরত রোকয়া খাতুন (রাজিঃ-আঃ)কে লইয়া আবি সিনিয়ায় হেজরত করিয়া আবিসিনিয়া রাজ উদার প্রকৃতি নজ্জাশীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোহিত সাগরের পরপারে বহু দিবস নির্ব্বাসন অবস্থায় থাকিয়া, মদীনায় প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন; সেই পীড়ার আক্রমণ হইতে কিছুতেই অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না। বদরের যুদ্ধ কালেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। প্রিয়তমা দুহিতা রত্নের মৃত্যুতে হজরত অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যতম কন্যা রত্ন বিবী জয়নব (রাজিঃ-আঃ)কে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শোকের অনেকটা লাঘব হইয়াছিল।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদিগের বিজয় ও কোরেশদিগের ভীষণ পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিবার অব্যবহিত পরেই হজরতের ও ইস্‌লামের মহা-বিদ্বেষী হজরতের পিতৃব্য আবু লহব মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। আবার বদর যুদ্ধের অনতিকাল পরে কনষ্টান্টি-নোপলস্থ খৃষ্টীয়ান গ্রীক্ সম্রাট্; আতস-পরস্ত (অগ্নি উপাসক) পারসিকদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় সিরীয় ও এরাকীয় এলাকা হইতে বিতাড়িত করেন।

সাভিকের যুদ্ধ।

আবুসুফিয়ান স্বীয় নেতৃত্বাধীনে বণিক্‌দল সহ মক্কায় পঁহুছিয়া বদর যুদ্ধে হজরতের বিজয় লাভ এবং কোরেশদিগের শোচনীয় পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণে বিষাদে ম্রিয়মাণ ও ক্রোধে একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। তাহার প্রধান প্রধান বন্ধু ও আত্মীয় এবং সহযোগিগণ রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছে; বড় বড় বীরপুরুষ সমরশায়ী হইয়াছে, এ নিদারুণ ক্লেশ তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। আবুসুফিয়ানের উগ্রচণ্ডা স্ত্রী হেন্দা স্বীয় পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতার মৃত্যুতে নিতান্ত শোকাকুলিত হইয়া, আবু সুফিয়ানকে হজরত হামজা (রাজিঃ) ও হজরত আলীর (কঃ-অঃ) প্রাণবধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। তখন আবুসুফিয়ান এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, "আমি যতদিন পর্য্যন্ত মদীনা নগর লুণ্ঠন করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার বিলাস ব্যসন পরিত্যাগ করিব।"

অনন্তর আবুসুফিয়ান ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মদীনা আক্রমণার্থে মক্কা হইতে বহির্গত হইল। প্রথম সে মদীনার নিকটস্থ বনিনজর দলস্থ আখ্‌তাবের পুত্র হাই নামক য়িহুদীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ডাকিল। হাই তাহার আহ্বানে সাড়া দিল না এবং গৃহ হইতে বাহিরও হইল না। তৎপর সে সালাম-বিন্‌-মসকাম নামক য়িহুদীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অতিথিরূপে রাত্রি যাপন করে। পরদিন নিজের দলবল লইয়া

মদীনার ২।৩ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকস্থ আনসার দিগের খর্জ্জুর বৃক্ষ গুলি কাটিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে। এই সময় তাহারা দুইজন কৃষিজীবী মুসলমানকে হত্যা করিয়াছিল।

হজরত, আবুসুফিয়ান প্রমুখ কোরেশদিগের ধ্বংসকারী কার্য্যের সংবাদ অবগত হইয়া আত্মীয় ও শিষ্যগণের সাহায্যার্থ সদলবলে মদীনা হইতে বহির্গত হন। আবুসুফিয়ান হজরতের আগমন সংবাদ শ্রবণে আপনাদের খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি ফেলিয়া ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে পলায়ন করে। হজরত তথায় পঁহু-ছিয়া ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হন; কিন্তু শত্রুদলের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা তিনি সশিষ্য মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কোনও কোনও ইতিহাসবেত্তা বলেন, এই ব্যাপার বা অভিযান তৃতীয় হিজরীর প্রথম ভাগে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সাভিক—অর্থাৎ শত্রু পক্ষের ছাতুর বস্তা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া ইহা "সাভিকের যুদ্ধ" নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদিগের সঙ্গে কোরেশদিগের যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল না। এই অভিযানেও হজরত আলী (কঃ—অঃ) হজরতের সঙ্গী হইয়াছিলেন।

বনি কিকার যুদ্ধ।

হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) হেজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিবার অল্পকাল পরেই তত্রত্য য়িহুদি দিগের সহিত সন্ধিস্থাপন

করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে হজরতের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িতে দেখিয়া সত্যধর্ম্ম-দ্বেষী ঈর্ষা-পরায়ণ য়িহুদিগণ সন্ধি ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল।

কিকা মদীনার উপনগরস্থ (শহরতলির) একটী মহাল্লা, তথায় একটী বাজারও ছিল। একদা একজন মুসলমান-মহিলা কিকা বাজারস্থ একটী স্বর্ণকারের দোকানে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়াছিলেন। সেখানে কিকা প্রভৃতি ৩টী য়িহুদি সম্প্রদায়ের কতকগুলি যুবকও উপস্থিত ছিল। ঐ উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণ গুপ্তভাবে উপরোক্ত মহিলার পিরাণের পশ্চাদিকস্থ কাপড় খানিকটা ছিড়িয়া ফেলে। য়িহুদি যুবকদিগের এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিবার কারণ এই যে, তৎকালে আরব দেশীয় মহিলাগণ একটী মাত্র পিরাণের দ্বারা সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া রাখিতেন। পিরাণটীর একাংশ ছিঁড়িয়া মহিলাটীর শরীর অনাবৃত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর মহিলাটী কাষ্ঠাসন হইতে উঠিয়া গমনোদ্যত হইলেই পিরাণটী বাতাসে উড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার সর্ব্বশরীর উলঙ্গ হইয়া পড়ে। তদ্দর্শনে যুবকগণ নানা প্রকার উপহাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে থাকে। তখন সেই মুসলমান মহিলা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিতান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। ঘটনাক্রমে সেখানে একজন মুসলমান পুরুষ উপস্থিত ছিলেন; স্বধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলার এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল না; অমাবিষ্ট য়িহুদি যুবকগণের মধ্যে একজনকে তৎক্ষণাৎ সমন সদনে পাঠাইলেন। কিন্তু

অবশিষ্ট য়িহুদিগণ মিলিত হইয়া সেই মুসলমানকে শহিদ (হত্যা) করিল। এই সংবাদ অনতিকাল মধ্যে মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে তাঁহারা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওদিকে য়িহুদিগণও সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। হজরত এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া বনিকিকা দলস্থ য়িহুদিদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন তোমরা ইতিপূর্ব্বে আমার সঙ্গে যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা কেন ভঙ্গ করিয়াছ? অতএব আমার সঙ্গে পুনঃ সন্ধি স্থাপন কর। উত্তরে তাহারা বলিল, "আমরা ত আর মক্কার কোরেশদিগের ন্যায় কাপুরুষ নহি যে, তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিব। তাহারা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী নহে বলিয়া তুমি তাহাদিগকে বদরের যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ। শক্তি থাকে ত আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, নচেৎ তোমাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।" এইরূপ নানা প্রকার কটু-কাটব্য কথা বলিয়া তাহারা মহা উদ্যোগ সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। হজরতও দেখিলেন, এই য়িহুদি দল নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের ধৃষ্টতা ও বেয়াদবি সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তিনি অগত্যা অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। শিষ্যগণ সজ্জিত হইয়া দলে দলে তাহার পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন। হজরত যখন সদলবলে সম্মুখীন হইলেন, তখন তাহাদের সাহস ও উৎসাহাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। য়িহুদিগণ ভয়ে জড় সড় হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। হজরত যখন এই যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন আবু

সোনাবা (রাজিঃ)কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ ১৫ দিন পর্য্যন্ত য়িহুদিদিগের দুর্গ অবরোধ করিয়া থাকিলে, তাহারা নিরুপায় হইয়া হজরতের নিকট আত্মসমর্পণ করে। দুর্গমধ্যে ৭০০ য়িহুদী ছিল। খজরজ দলপতি আব্দুল্লা-বিন্-ওবাই-সোলুল (কপট ও ভণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ) অবরুদ্ধ য়িহুদিদিগের প্রতিনিধির পদ গ্রহণ করিয়া সন্ধিবন্ধনের জন্য হজরতের নিকট আগমন করিল। আব্দুল্লা হজরতকে বলিল, "দুর্গস্থ য়িহুদিগণ তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রাদি আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, আপনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিন।" ইহা শুনিয়া আবাদা বিন্-সামেদ য়িহুদিদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে বলেন। অবশেষে মোন্জের-বিন কোদামা আসলামি তাহাদিগকে বন্দী করেন। কিন্তু হজরত স্বীয় ক্ষমা ও ঔদার্য্য-গুণে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। এই কিকা দলস্থ য়িহুদিগণের নিকট হইতে হজরত একখানি উৎকৃষ্ট তরবারি, ফেজ্জা ও সাদাফিয়া নামক দুইটী দুর্ভেদ্য বর্ম্ম এবং কতুম, রুহা ও বায়জা নামক ৩টী ভীষণ বল্লম (শড়কি বা বর্শা) প্রাপ্ত হন। তরবারি ত্রয়ের মধ্যে একখানির নাম কলাই, ও একখানির নাম হাতফ্ ছিল। এইরূপে অতি সহজেই কিকা যুদ্ধের অবসান হয়।

হজরত কিকা যুদ্ধ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে "ঈদুয্ যোহার" নমাজ পড়িতে আদিষ্ট হন।

তৃতীয় হিজরীর ঘটনা।

কারকারাতোল কদর ও নজদের যুদ্ধ।

মদীনা নগরীর প্রান্তদেশে "বনি সালেম" ও বনি-গাৎফান" নামক দুইটী য়িহুদি সম্প্রদায় বাস করিত। এই দুই সম্প্রদায় একত্র রণসাজে সজ্জিত হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংস সাধন জন্য মদীনাভিমুখে অভিযান করিল। হজরত তাহাদের যুদ্ধ-সজ্জার সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ২০০ শিষ্য সমভিব্যাহারে তাহাদের গতি প্রতিরোধ জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি পথিমধ্যে "বতনে ওয়াদি" নামক স্থানে কতকগুলি উট দেখিতে পাইয়া, এসার নামক য়িহুদিদিগের একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধার্থী য়িহুদিগণ এখন কোথায় আছে?" সে বলিল, "যেখানে পানী আছে, তাহারা সেই খানেই আছেন।" কিন্তু হজরত তাহাদের অনুসন্ধান না পাইয়া অগত্যা মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। য়িহুদিগণ অতর্কিতভাবে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার মৎলব আঁটিয়া ছিল; কিন্তু মুসলমানদিগের—বিশেষতঃ হজরতের সতর্কতায় তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইল দেখিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। পবিত্র ইস্‌লামের পরাক্রমের নিকট তাহাদের সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি সম্পূর্ণ রূপে বিফল হইয়াছিল।

নজদ্ প্রদেশের অন্তর্গত "জিয়ামর" নামক স্থানের বনি সালেমাও বনিমহারেব্ নামক য়িহুদি সম্প্রদায়দ্বয় একত্রিত হইয়া মহাড়ম্বরে হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে, হজরত এই সংবাদ পাইয়া মহাত্মা হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)কে মদীনায়

স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া ৪০০ শিষ্য সহ মদীনা হইতে বহির্গত হন। পথিমধ্যে হাব্বার নামক একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; সে শত্রুদিগের অবস্থান ভূমি হজরতকে দেখাইয়া দেয়। হাব্বার পরে হজরতের নিকট পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের নীতি সমুহ ও সৌন্দর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

হজরত কিছুদুর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, শত্রুগণ একটী পাহাড়ের উপর অবস্থান করিতেছে। হজরত কোনও শত্রুকে অগ্রে আক্রমণ করিতেন না, তাহাদিগকে সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করিতেন। তদনুসারে তিনি য়িহুদী সৈন্যের সম্মুখ হইতে অন্য দিকে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়াতে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি ভিজিয়া গেল। তিনি নিজের দল হইতেও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি শিবিরের অনতিদূরবর্ত্তী একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া বস্ত্রখানির এক প্রান্ত পরিধান পূর্ব্বক অপর প্রান্ত বাতাসে শুকাইতেছিলেন। ঠাণ্ডা বাতাসে তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন বিপক্ষ য়িহুদী সৈন্যদলের একব্যক্তি হজরতকে রক্ষক শূন্য অবস্থায় একাকী নিদ্রাভিভূত দেখিয়া স্বদলে গিয়া সংবাদ দিল, এবং কহিল, "মোহাম্মদ (সালঃ)কে হত্যা করিবার এই উপযুক্ত সময়, তিনি অমুক বৃক্ষতলে একাকী ঘোর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া বিপক্ষ সৈন্যদলের গুরাস নামক একজন মহা পরাক্রমশালী বীরপুরুষ উন্মুক্ত

তরবারি হস্তে সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় তাঁহাকে হত্যা করিতে ছুটিয়া আসিল। হজরত এই সময় হঠাৎ জাগরিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, প্রচণ্ড শত্রু গুরাস নিষ্কোসিত তরবারি হস্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সে হজরতকে জাগরিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হে মোহাম্মদ (সাল্লঃ)! এক্ষণে কে তোমাকে রক্ষা করিবে ?" তিনি তন্মুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিলেন, "আল্লাহ তা-লা আমাকে রক্ষা করিবেন।" ইহা শুনিয়া সেই ভীষণ প্রকৃতি বীরপুরুষের অন্তঃকরণ বিগলিত হইল। তাহার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না ; সঙ্গে সঙ্গে তরবারি খানি তাহার হস্ত হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। হজরত সেই তরবারি খানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, হে সৈনিক পুরুষ! এক্ষণে কে তোমাকে রক্ষা করিবে ?" সে নিরুপায় হইয়া বলিল, "হায়! কেহই নয়।" তখন হজরত তরবারি খানি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "তবে আমার নিকট দয়ালু ব্যবহার শিক্ষা কর।"

হজরত আলীর বিবাহ।

দ্বিতীয় হিজরীর একটী প্রধান ঘটনা মহামাননীয় বিবী ফাতেমা রাজি আল্লাহ আন্‌হার সঙ্গে হজরত আলীর (রাজিঃ) বিবাহ। ঐ বৎসর রজব বা সফর মাসে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমা জোহরা (রাজিঃ) এর সঙ্গে বীর-কেশরী হজরত আলীর (রাজিঃ) শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়

বিবাহকালে বিবি ফাতেমার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর ও হজরত আলীর বয়ঃক্রম একুশ বৎসর পাঁচ মাস হইয়াছিল। বিবী ফাতেমা জোহরা (রাজিঃ) জগতে অদ্বিতীয়া রূপবতী, গুণবতী এবং ধর্ম্মপরায়ণা রমণীরত্ন ছিলেন। অখিল জগতে রমণীকুলে তিনিই আদর্শ স্বরূপা। কোরেশবংশীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার পাণিগ্রহণ-প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) আল্লার আদেশানুসারে আপনার একান্ত স্নেহাস্পদ আলীকেই বিবি ফাতেমার উপযুক্ত পতি বলিয়া মনোনীত করেন। * আলী দরিদ্রতা-নিবন্ধন প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে হজরতের অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন। পরন্তু সে সময় আলীর আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। একটী বর্ম্ম, একখানি তলোয়ার ও একটী মাত্র উষ্ট্র সম্বল ছিল। হজরত ওস্‌মান জেম্নূরায়নের নিকট তাঁহার বর্ম্মখানি চারি শত আশি দেরহম মূল্যে বিক্রয় করিয়া, বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। চারি শত দেরহম দেনমোহর ধার্য্যে হজরত ফাতেমা জোহরা রাজি আল্লাহ আন্‌হার শুভ-উদ্বাহ—শুভ বিবাহ কার্য্য

* মন্তব্য।—হজরত আনেস বলিয়াছেন, একদিন মসজিদের মধ্যে যাইয়া হজরতের মুখে শুনিলাম, তিনি হজরত আলীকে বলিলেন, হে আলি কঃ-অঃ)! আমাকে জেব্রাইল (আঃ) এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন যে, আল্লাহ্ ফাতেমার সঙ্গে তোমার শুভ পরিণয় কার্য্য শেষ করিয়া দিয়াছেন। ঐ বিবাহের জন্ম চল্লিশ সহস্র ফেরেশ্‌তাকে সাক্ষী রাখিয়াছেন।

সম্পন্ন হইয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর সহিত কতকগুলি মৃণ্ময়পাত্র কন্যাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। হজরত উদ্বাহ-যৌতুক প্রদান করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্ তায়ালা! মৃণ্ময়পাত্র যাহাদের প্রিয় সামগ্রী, তুমি তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শণ করিও। অনন্তর তিনি প্রিয় জামাতা আলীকে (রাজিঃ) সস্নেহ সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! এই নারীকুল-ভূষণা, অদ্বিতীয়া বালিকা-রত্ন, মোস্লেম জগৎমান্যা, আমার প্রিয়তমা দুহিতাকে অদ্য তোমার সহধর্ম্মিণী করিয়া তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তুমিও ফাতেমা জোহরার উপযুক্ত পতি, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা চিরদিন অবিচ্ছিন্ন প্রণয়-পাশে আবদ্ধ থাকিয়া সুখ-সম্মিলনে আল্লার আরাধনায় কালযাপন কর। তোমাদের এই শুভ পরিণয় আল্লার-আদেশানুসারে সম্পন্ন করিলাম।

বিবাহের একমাস পরে ফাতেমা খাতুনের (রাজিঃ-আঃ) পতির সঙ্গে প্রথম একত্র বাসের উৎসব হয়। সেইদিন হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) আজ্ঞাক্রমে কুলনারিগণ হজরত ফাতেমা জোহরা (রাজিঃ)কে বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া দিলেন এবং হজরতের প্রদত্ত যৌতুক দ্রব্য সকল স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। সেই সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মৃণ্ময়পাত্র, একটী মিসরদেশীয় শয্যা এবং একটী যবনিকা (পরদা) ছিল। হজরত আলী (রাজিঃ) বন্ধুদিগের ভোজনের জন্য চারি মুদ্রার

ঘৃত, চারি মুদ্রার খোর্ম্মা বাদাম এবং এক টাকার পানর ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ সকল দ্রব্যের পরস্পর সংযোগে হবসি নামক মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ দিবস জফাফের ভোজ সম্পন্ন হইবার পর, হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) এক হস্তে হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্ত ও অপর হস্তে ফাতেমা জোহরার (রাজি-আঃ) হস্ত ধারণ ও তাঁহার মস্তক আপন বক্ষে স্থাপন এবং ললাট-দেশ চুম্বন পুর্ব্বক তাঁহাকে আলীর হস্তে সমর্পন করিয়া বলিলেন, বৎস আলি। তোমার এই পত্নী ফাতেমা জোহরা(রাজি-আঃ)কে ভালবাসিলে আমাকেও তোমার ভালবাসা হইবে। পরে আলীকে ফাতেমার করে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, মা ফাতেমা! তোমার এই স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি রাখিবে। তৎপরে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কয়েক দিন পরে তাঁহাদের আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। হজরত, প্রিয়তমা দুহিতা ফাতেমা বিবীকে স্বামীর আলয়ে পাঠাইবার সময় বিষণ্ণ-চিত্তে একদৃষ্টে তঁহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; যতক্ষণ তাঁহারা দৃষ্টীর বহির্ভুত না হইল, ততক্ষণ অন্যদিকে চক্ষু ফিরান নাই। পরে আল্লার নিকট নব-দম্পতির কল্যানের জন্য প্রার্থনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর কিছুদিন যায়, পরে একদিন হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হজরত আলীর ভবনে ফাতেমা বিবীকে দেখিবার জন্য হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন এবং জামাতা ও কন্যার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর আলী (রাজিঃ)কে কার্য্যান্তরে

পাঠাইয়া নির্জ্জনে কন্যাকে তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ফাতেমা জোহরা (রাজিঃ) বলিলেন, আমার স্বামী নানা সদ্‌গুণে ভূষিত কিন্তু বড়ই দরিদ্র। কাজেই সংসার অতিকষ্টে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

ফাতেমার মুখে এই কথা শুনিয়া, হজরত নবী (সালঃ) বলিলেন, বৎস ফাতেমা! তোমার পিতাও দরিদ্র নহেন, পতিও দরিদ্র নহেন। পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্ন সর্ব্বপ্রথমে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমি তাহা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি নাই, ঘৃণার সহিত পার্থিব ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করতঃ আল্লার নিকট পরকালের অমূল্য মহারত্ন গ্রহণ করিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি, যদি তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে, তাহা হইলে পার্থিব ধন-সম্পত্তি তোমার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইত। মা ফাতেমা! আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য, তোমার স্বামী আলী (কঃ-অঃ) সাধুতায় আমার সহচর-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমত্তায় সকলের অগ্রগণ্য, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত।

ফতেমার [রাঃ-আঃ] দুঃখমোচন।

বিবাহকালীন হজরত আলীর আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল যে, তিনি একজন পরিচারক বা পরিচারিকা পর্য্যন্ত নিযুক্ত

করিতে পারেন নাই; ফাতেমা বিবী (রাঃ-আঃ) স্বহস্তেই সমুদয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। জাঁতায় গোধুম চূর্ণ করিয়া আটা করিবার জন্য স্বহস্তে তাঁহাকে অশেষ পরিশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করিতে হইত। কখন কখন অন্নাভাবে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে নিরন্ন উপবাসে থাকিতে হইত। এ বিষয়ে হাদিস মেস্কাত শরিফের একটি বিবরণ এস্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

হজরত আলী (কঃ-অঃ), স্বীয় পত্নী ফাতেমা বিবি স্বহস্তে যে জাঁতা চালনা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয় বলিবার জন্য হজরতের নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাটিতে না থাকায় সাক্ষাৎ হয় নাই। কাজেই হজরত আয়েশা রাজি আল্লা আনহাকে নিজ আগমনের বিষয় সম্যক জানাইয়া বাটিতে ফিরিয়া আসিলেন। হজরত কার্য্যান্তে বাটিতে আসিলে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ-আঃ) তাঁহাকে হজরত আলীর আগমন ও কষ্টের বিষয় জানাইলেন। তিনি হজরত আয়েশার (রাজিঃ-আনঃ) প্রমুখাৎ সকল বিষয় অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ হজরত আলীর গৃহে গমন করেন। তখন দম্পতি-যুগল শয়ন করিয়াছিলেন, হজরতকে দেখিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হজরত বাধা দিয়া তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া স্নেহপূর্ণ মধুর স্বরে বলিলেন, তোমারা আমার নিকট যে কষ্টের কথা জানাইয়াছ, তদ্বিনিময় এরূপ দুর্লভ পদার্থ তোমাদিগকে প্রদান করিব, যাহাতে তোমরা ঐহিক ও পারলৌকিক স্বচ্ছন্দতা

উপভোগ করিতে পারিবে। আলী (রাজিঃ) বলিলেন, হজরত আপনি জগতের মঙ্গলের জন্য অহর্নিশি কতই না কষ্ট সহ্য করিতেছেন। আপনি আশীর্ব্বাদ করিলে আল্লার অনুগ্রহে অবশ্যই আমরা সুখী হইতে পারিব। হজরত বলিলেন, যখন তোমরা স্বীয় শয্যাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তখন ভক্তিভরে তেত্রিশবার "ছোবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "লায়েলাহা ইল্লাল্লাহ" তেত্রিশবার "আলহামদোলিল্লাহ" ও তেত্রিশবার "আল্লাহো আকবর" উচ্চারণ করিও, তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।

কথিত আছে, হজরত আর একদিন স্বীয় জামাতার গৃহে উপস্থিত হইলে বিবী ফাতেমা (রাঃ-আঃ) বিষণ্ণবদনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, পিতঃ! অন্নাভাবে গত তিন দিবস কাল আমরা উপবাস রহিয়াছি। হজরত বলিলেন, মা! আমিও গত চারি দিবস অনাহারে কালযাপন করিতেছি। এই দেখ, ক্ষুধার যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্য উদরে প্রস্তর বাঁধিয়া রাখিয়াছি। সেই দিবস হইতে ফাতেমা (রাঃ-আঃ) ক্ষুধার সময় যথাসাধ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতেন।

ওহোদের যুদ্ধ।

যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন আবু ছুফিয়ান ১০০০ এক হাজার উষ্ট্র বোঝাই করিয়া সিরিয়া হইতে নানাবিধ পণ্য দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল, তন্মধ্যে মক্কাবাসী কোরেশদিগের

বহু বাণিজ্যদ্রব্য ছিল। আবু সুফিয়ান মক্কার নিকটবর্ত্তী "দারল দাওয়া" নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, পণ্যদ্রব্যগুলি উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে নাঁমাইল; এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, "এই সকল পণ্য দ্রব্যের অধিকাংশ অধিকারী বদর যুদ্ধে গমন করিয়াছে; তাহারা তথা হইতে ফিরিয়া না আসিলে এই সকল পণ্য দ্রব্য বিভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে না, অতএব আপাততঃ এই সকল পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থ নূতন ব্যবসায়ে খাটান হউক''; এই বিবেচনা করিয়া ঐ সকল পণ্য দ্রব্য ব্যবসায় নিয়োজিত করিল। ওদিকে কোরেশগণ বদরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে আবু সুফিয়ান দেখিতে পাইল, সিরিয়া হইতে আনীত পণ্য দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া এই কয়দিনে ৫০০০ মেশকাল স্বর্ণ লাভ হইয়াছে, তখন সে সমবেত কোরেশ-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই যে ৫০০০ মেশকাল স্বর্ণ লাভ হইয়াছে, ইহা দ্বারা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোহাম্মদ (সালঃ)কে আক্রমণ করা হউক; কারণ এই অর্থগুলি আমাদের পরিশ্রম-লব্ধ নয়। এগুলি ঘরে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে লাভ হইয়াছে, সুতরাং বাজে কাজে ব্যয় করিলেও আমাদের মনে কোন কষ্ট বোধ হইবে না।" এতচ্ছ্রবণে কোরেশ দলের আসাদ, আবদুল ওজ্জার পুত্র হোয়ায়তা, ওমাইয়ার পুত্র সফওয়ানা, আবুজহলের পুত্র আকরমা প্রভৃতি প্রধান প্রধান কোরেশগণ আবুসুফিয়ানের প্রস্তাব যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিল। তৎপর তাহারা আসের পুত্র ওমর, ওহাবের

পুত্র ওরায়ারা, জাহেরির পুত্র আবদুল্লা ও আবুওজ্জা এই চারিজন প্রসিদ্ধ বক্তাকে সৈন্য-সংগ্রহার্থ আরবের নানাস্থানে প্রেরণ করিল। ঐ চারিজনের মধ্যে আবুওজ্জা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, সে আর কখনও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ বা তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না—এই সর্ত্তে বিনা অর্থ-বিনিময়ে হজরত তাহাকে বন্দিত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

সেই সভায় কোরেশগণের মধ্যে অনেকে বলিল, "আমরা আমাদের স্ত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিব, সেরূপ হইলে তাহারা আমাদিগকে যুদ্ধ সম্বন্ধে উত্তেজিত করিতে পারিবে। তদ্ব্যতীত যাহাদের স্বামী, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়গণ বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহারাও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া তাহাদের আত্মীয় অন্তরঙ্গগণের প্রতিশোধ লইবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে সক্ষম হইবে।" মোতামের পুত্র জসব এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিল না। সফওয়ান বলিল, যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। আবুজহলের পুত্র আকরমা ও আসের পুত্র ওমর সফওয়ানের প্রস্তাবে অনুমোদন করিল। আবুসুফিয়ান ও আর একব্যক্তি বলিল, "আমরা যুদ্ধে পরাজিত হইলে স্ব স্ব প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব, না স্ত্রীলোক দিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিব?" আবুসুফিয়ানের স্ত্রী অত্‌বার কন্যা হেন্দা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ

করিতে লাগিল। অবশেষে স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মতিরূপে পরিগৃহীত হইল। সায়াদের পুত্র ওমায়মা হেন্দাকে লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করিল। আকরমা, ওমর, হারেজ, তালহা প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান কোরেশ স্ব স্ব স্ত্রীদিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। আবু-আমের নামক এক জন খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ৫০ জন সহচর সঙ্গে লইয়া কোরেশ সেনাদলে যোগ দান করিল। আবু-আমের শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের বিষয় অবগত ছিল, কিন্তু সে হজরতের নবুয়ত স্বীকার করে নাই, তজ্জন্যই সে হজরতের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কোরেশ সেনাদলে যোগদান করিয়াছিল।

কোরেশ দলে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০ যোদ্ধা পুরুষ যোগদান করিয়াছিল। তন্মধ্যে ৭০০ যোদ্ধা জেরাপোষ (বর্ম্মাবৃত্ত) ও ২০০ অশ্বারোহী ছিল। এতদ্ব্যতীত ২০০০ উষ্ট্র ও ১৫টী হাওদা (উষ্ট্রের পীঠের সগদূফ) ও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিল। এই যুদ্ধে কোরেশ বংশীয় সকল লোকই যোগদান করিয়াছিল। আকরমা বিন আবুজহল ও মহাবীর খালেদ বিন অলিদ এই বিরাট বাহিনীর সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিল। আবদুদ্দার বংশীয় প্রধান প্রধান পুরুষেরা পতাকা উড়াইয়া সেনাদলের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। পতাকা বাহিদিগের পশ্চাতেই প্রতিহিংসা-পরায়ণা হেন্দা, পনর জন উগ্রচণ্ডা স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া মহোৎসাহে গমন করিতে লাগিল। ঐ সকল রমণীর

আত্মীয় অন্তরঙ্গগণ বদর যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তাহারা সেই শোকে অধীরা হইয়া প্রতিহিংসামূলক শোক-সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিয়া রণোন্মুখ সৈন্যদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তাহাদের রণ সঙ্গীতের মর্ম্মার্থ এইরূপ—"হে আবদুদ্-দারের সন্তানগণ, সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হও; হে স্ত্রীলোকের রক্ষকগণ, তোমাদের সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা শত্রুদিগকে আঘাত কর, এবং তাহাদের সম্মুখীন হও। যুদ্ধে শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে পারিলে আমরা তোমাদিগকে সুকোমল বাহুলতা বেষ্টনে আলিঙ্গন করিব; যদি রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন কর, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিব"—ইত্যাদি।

এই যুদ্ধার্থী কোরেশ সেনাদল "যোল হালিফা" নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় তিন দিন অবস্থান করিল; তৎপর তথা হইতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই রণোন্মত্ত সেনাদল নানা আমোদ প্রমোদ ও বিকট তাণ্ডব সহকারে "আওয়া" নামক স্থানে, হজরতের জননী হজরত আমেনা বিবীর সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলে, প্রতিহিংসা-পরায়ণা হেন্দা ও কোরেশদিগের অনেকে কবর হইতে হজরত আমেনা বিবীর অস্থিপুঞ্জ বাহির করিবার প্রস্তাব করিল, এবং বলিল, যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অনেকে বন্দী হই, তবে আমেনা বিবীর অস্থি বিনিময়ে মুক্তিলাভ করিতে পারিব, আর যদি কেহ বন্দী না হই, তবে মোহাম্মদ (সাঃ) এতদ্বারা আমাদের অদম্য সাহসিকতার পরিচয় পাইবে, এবং দমিয়া যাইবে। কিন্তু দলপতী আবু সুফিয়ান বলিল,

যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহা হইলে মদীনা নগরস্থ ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী বনুবকর ও বনু খোজায়া দলের লোকেরা আমাদের আত্মীয়গণের অস্থিপুঞ্জ কবর হইতে তুলিয়া ফেলিবে সুতরাং আমেনা বিবীর অস্থিরাজি কবর হইতে তুলিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তর তাহারা এই 'মঞ্জেল' হইতে মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইল।

এই সময় হজরতের পিতৃব্য আব্বাস মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন; তিনি যুদ্ধ যাত্রিদলের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন না। তিনি কোরেশদিগের মহাড়ম্বর পূর্ণ যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া বনি গফ্ফার দলস্থ একজন দ্রুতগামী লোককে এই সংবাদ প্রদান জন্য মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি দ্রুতবেগে গমন করিয়া মক্কা হইতে তিন দিনে মদীনার অদূরবর্ত্তী "কোবা" নামক স্থানে পহুঁছিয়া হজরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; এবং কোরেশদিগের বিরাট যুদ্ধ-সজ্জার বিষয় বিস্তারিত রূপে জানাইল। হজরত সে দিন রাবির পুত্র সায়াদের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি ঐ দূতকে কোরেশ দিগের যুদ্ধসজ্জার বিষয় কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিলেন; রজনী সমাগত হইলে তিনি সায়াদকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া কোরেশ দিগের যুদ্ধসজ্জার কথা বলিলেন; এবং এ সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পর দিন তিনি ছায়াদকে সঙ্গে লইয়া মদীনায় গমন করিলেন। হজরত যখন ছায়াদের নিকট কোরেশদিগের যুদ্ধ সজ্জার কথা বলিতেছিলেন তখন ছায়াদের স্ত্রী অন্তরাল হইতে তাহা

শুনিতে পাইয়াছিলেন, এবং ঐ স্ত্রীলোকটী পরদিন এই কথা সকলের নিকটে প্রকাশ করিয়াদিলেন।

মদীনাস্থ হজরতের শত্রুগণ কোরেশদিগের যুদ্ধাভিযান সংবাদে আনন্দে বিহ্বল হইয়া গেল। মদীনার য়িহুদিগণ মক্কার দূতকে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তি অবশ্যই মক্কা হইতে কোন সংবাদ আনিয়াছে। অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহারা কোবাস্থ মোসলেম-শত্রুদিগের দ্বারা সংবাদ পাইল যে, কোরেশগণ মহাড়ম্বরে মদীনা আক্রমণ করিতে আসিতেছে এই সংবাদে তাহাদের আনন্দের সীমাপরিসীমা রহিল না, তাহারা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার দর্শনে হজরত অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন, এবং সাহাবাগণকে ডাকিয়া আসন্ন বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সমুচিত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন।

বুধবার দিবাগত বৃহস্পতিবারের রাত্রে হজরত স্বীয় ছাহাবা (শিষ্য) মণ্ডলীকে ডাকাইয়া আসন্ন বিপদের কথা জানাইলেন। সেই রাত্রেই তিনি ছায়াদ-বিন্-আবাদা ও ছায়েদ-বিন-হোজায়ের (রাজিঃ) প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান ছাহাবাকে মুসলমান-দিগের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হজরত সমাগত মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের সংখ্যা অতি অল্প; অধিক সংখ্যক প্রবল শত্রুর সহিত প্রকাণ্ড যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিতে আমরা কোনক্রমেই সক্ষম হইব না; এই ক্ষেত্রে নগর-প্রাচীরের মধ্যে থাকিয়া আমাদের

যুদ্ধ করা উচিত। অধিকাংশ ছাহাবা হজরতের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। আবদুল্লা-বিন-ওবাই-সোলুল নামক জনৈক য়িহুদী দলপতি বলিল "আমাদের এই মদীনা নগর কেহ কখনও আক্রমণ করিয়া জয় করিতে সক্ষম হয় নাই, অতএব নগরের দুর্গ মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুসন্তানদিগকে রাখিয়া, আমরা নগর মধ্যে থাকিয়াই আগন্তুক শত্রুদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিব।" "কিন্তু বদর যুদ্ধে যে সকল মুসলমান যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা নগর-প্রাচীরের বাহিরে যাইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হজরত হামজা (রাজিঃ), হজরত ছায়াদ (রাজিঃ), হজরত নওমান-বিন্-সালেব (রাজিঃ) প্রমুখ বড় বড় ছাহাবাগণ এবং আওসও খজরজ বংশীয় মুসলমানগণ বলিতে লাগিলেন, "যদি আমরা মদীনার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধ করি, তবে শত্রুগণ আমাদিগকে উপহাস করিবে, অতএব আমরা নগরের বাহিরে গিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিব।" তখন মহাবীর হজরত আমীর হামজা (রাজিঃ) প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যত দিন কোরেশদিগের সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত রোজা করিব। হজরত মালেক (রাজিঃ) ও নওমান (রাজিঃ) প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, শত্রুদলের সহিত প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিব ; কদাচ লড়াই করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।" তৎপর হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর

ফারুক (রাজিঃ), হজরত ছায়াদ-বিন মায়াজ (রাজিঃ), হজরত ওছায়াদ-বিন্ হোজায়ের (রাজিঃ) বলিলেন, আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকিয়া শত্রুদলের সম্মুখীন হইতে পারেন, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই।" অতএব মদীনা নগরের বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করাই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্থিরীকৃত হইল। পর দিন সকলে হজরতের এমামতিতে জুমার নামাজ আদায় করিলেন। নামাজ পড়া শেষ হইলে হজরত ওজস্বিনী ভাষায় একটী মহাসারগর্ভ ও উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শেষে তিনি মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যাহারা খোদাতালার আজ্ঞানুবর্ত্তী, কর্ত্তব্যপরায়ণ তাহাদেরই জয় হইবে।"

যুদ্ধের জন্য যে সকল মুসলমান সমবেত হইলেন, তাঁহাদের, সংখ্যা ১০০০ এক হাজার। শিশু সন্তান ব্যতিত আর সকল মুসলমান বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই মহোৎসাহে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সেনাদলের মধ্যে জেরাপোষ (বর্ম্মাবৃত) যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ১০০ একশত; আর হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) ও আবুবরদা (রাজিঃ)—ইঁহাদের মাত্র ২টী অশ্বছিল। এই সময় হজরত বলিলেন, য়িহুদিগণ ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ না করিলে আমি তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিব না। "এতচ্ছ্রবনে আবদুল্লা-বিন-ওবাই সোলুল ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে, হজরত তাহাকে যুদ্ধে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন, সুতরাং সে তাহার অনুগামী ৩০০ যোদ্ধা সহ স্ব স্ব গৃহে চলিয়া

গেল। অপর দুই দল যোদ্ধাও আবদুল্লার কুপরামর্শে হজতের সঙ্গত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের দলপতিগণ তাহাদিগকে হজরতের সঙ্গত্যাগ করিতে দেন নাই। কোর-আন শরিফে উক্ত হইয়াছে, "স্মরণ কর, যখন তোমাদের দুইদল ভীরুতা প্রকাশে চেষ্টা পাইয়াছিল এবং আল্লাহতালা তাহাদের সহায় ছিলেন, সত্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের উচিত যে আল্লাতালার উপর নির্ভর করে,"—(কোরআন ৩য় সুরা)—এক্ষণে হজরত মাত্র ৭০০ যোদ্ধা পুরুষ লইয়া মদীনার একমাইল দূরবর্ত্তী ওহদ পর্ব্বতে প্রবল কোরেশদলের সঙ্গে যুদ্ধার্থ গমন করিলেন।

এই যুদ্ধের জন্য হজরত ৩টী রণ-পতাকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একটী পতাকা আতস দলস্থ সা-দ-বিন আবাদার (রাজিঃ) হস্তে, একটী পতাকা খজরজ দলস্থ হাবার-বিন্ মনজরের হস্তে, আর একটী পতাকা মহাবীর হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্তে প্রদান করিলেন। এই যুদ্ধ-যাত্রাকালে হজরত, আবদুল্লা বিন-ওম্মে মকতুম (রাজিঃ)কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৩য় হিজরীর ৭ই শওয়াল শনিবারে হজরত স্বীয় যুদ্ধার্থী শিষ্যদলকে সঙ্গে লইয়া ওহদে উপস্থিত হইলেন। জোফরান, আবুসরা ও এবনে কায়েম (রাজিঃ) এই ৩জন শিষ্য হজরতের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হজরত স্বীয় শিষ্যদলকে ওহদ পর্ব্বত পশ্চাতে ও মদীনা সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলেন। মোসলেম যোদ্ধৃদলের ডান দিকস্থ 'আর

নায়েন' পাহাড়ে একটী সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম (পার্ব্বত্য গিরিপথ) ছিল, হজরত জোবায়রের পুত্র আবদুল্লা (রাজিঃ)কে ৫০জন তীরন্দাজ (ধনুধারী) সৈন্যসহ উক্ত গিরি সঙ্কটে স্থাপন করিলেন। এবং তাহাদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া বলিয়া দিলেন "আমাদের জয় হউক বা পরাজয় হউক, তোমরা এই গিরিবর্ত্ম কিছুতেই ত্যাগ করিবে না।" ওকামা-বিন-আহসান আসাদির হস্তে শিবির পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন। সৈন্যদলের বামদিকের সেনাপতি পদে আবু সালামা-বিন্ আবদুল আসাদ মখজমি (রাজিঃ) এবং আবু ওবায়দা-বিন-জারাহ (রাজিঃ) ডানদিকের সেনাপতি পদে বরিত হইল। আর সাদ-বিন-আবি ওক্কাস (রাজিঃ) সম্মুখেদিকের সেনাপতি পদ লাভ করিলেন। পবিত্র কোরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে ;—"এবং স্মরণ কর হে মোহাম্মদ (সালঃ), যখন তুমি প্রভাতকালে স্বীয় আত্মীয় গণের নিকট হইতে বাহির হইলে, এবং বিশ্বাসীদিগকে আত্ম রক্ষার জন্য যথাস্থানে স্থাপন করিলে ; আল্লাহ জ্ঞাতা ও শ্রোতা।"—(কোরআন্—৩য় সুরা)।

এদিকে কোরেশ সৈন্যদল ও সেই দিন ওহোদে আসিয়া পহুঁছিল। বিশাল কোরেশ সৈন্যদলের ডান দিকের সেনাপতি পদে মহাবীর খালেদ-বিন-অলিদ ও বাম পার্শ্বের সেনাপতি পদে আক্রমা-বিন-আবু জহল নিযুক্ত হইয়াছিল। স্বয়ং আবু-সুফিয়ান সেনাদলের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সফ্-ওয়ান্-বিন্-ওমাইয়া, কাহারও কাহারও মাতে ওমর-বিন-আসআর

নায়ের গিরিবর্ত্মের দিকে দণ্ডায়মান হয়। আবদুল্লা-বিন-ওবাইবিয়া তীরন্দাজ (ধনুর্ধারী) সৈন্যদিগের সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিল। তাল্‌হা-বিন আবিতালহা ও আবদুদ্‌ দার-বংশীয় যোদ্ধৃ পুরুষগণ রণ-পতাকা ধারণ পূর্ব্বক রণ-রঙ্গিণী স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। প্রতিহিংসা পরায়ণা রমণীগণ বদর যুদ্ধে নিহত স্বস্ব আত্মীয় স্বজনের নাম উল্লেখ করিয়া উত্তেজনাময়ী রণ-সঙ্গীত গাইতে লাগিল। তাহারা পতাকা বাহীদিগকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "হে আবদুদ্‌ দারের সন্তানগণ! সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হও, শত্রুদিগের নিকটে গমন কর, শত্রু দলের কাহাকেও ক্ষমা করিও না, রক্ষা করিও না। তোমরা সুতীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ কর এবং নির্দ্দয় অন্তঃকরণ বিশিষ্ট হও ইত্যাদি। এক্ষণে মুসলমান ও কোরেশ সেনাদল পরস্পর সম্মুখীন হইল।

৭ই শওয়াল প্রাতঃকালে এই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুসলমানদিগের আল্লাহো আকবর ধ্বনিতে রণস্থল কম্পিত হইয়া উঠে। ওহোদ পাহাড়ে সেই পবিত্র শব্দের গম্ভীর প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। আবু আমের নামক একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী আরব ৫০ জন যোদ্ধৃ পুরুষ সহ কোরেশ দলে যোগদান করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই সর্ব্ব প্রথমে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে কোরেশগণও ভীম পরাক্রমের সহিত মোস্‌লেম যোদ্ধৃ পুরুষদিগকে আক্রমণ করিল।

এক্ষণে দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বীর পুরুষদিগের হুঙ্কারে, অস্ত্রের ঝনাৎ কারে, আহত সেনাদলের আর্ত্তনাদে রণস্থল বিকম্পিত ও মুখরিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কোরেশ দলের আবদুদ্ দার বংশীয় ৭ জন পতাকাবাহী ও বহু সংখ্যক প্রধান প্রধান লোক সমরশায়ী হইলে, অবশিষ্ট লোকেরা রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এই সময় গিরিবর্ত্ম রক্ষক মুসলমান তীরন্দাজগণ কোরেশাদিগের পরিত্যক্ত সামগ্রী-সম্ভার লুণ্ঠনাশায় এমনই প্রলোভিত হইয়া উঠিলেন যে, হজরতের পবিত্র আদেশ ও উপদেশ ভুলিয়া গেলেন। তাহারা উক্ত গিরিবর্ত্ম অর্থাৎ স্ব স্ব অবস্থান স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন (কোর-আন ৩য় সুরা, ১৪৬ আয়েতে ইহার উল্লেখ আছে)। সেই সময় খালেদ চিবন অলিদ ও আকরমা-বিন-আবুজহল এই প্রয়োজনীয় গিরিবর্ত্মটী রক্ষক শূন্য দেখিয়া, কতকগুলি পলায়মান কোরেশ সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক উহা অধিকার করিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাদিগকে ভীম বেগে আক্রমণ করিল। আবার নূতন ভাবে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সময় আবু ওজ্জার পুত্র শেবা মহাবীর হজরত হামাজা (রাজিঃ)কে আক্রমণ করিল। শেবা বলিয়াছে, "আমি যখন হামজাকে আক্রমণ করি, তখন দেখিয়াছিলাম, সেই মহাবীর পুরুষ দুই হাতে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় কোরেশ সৈন্যদলকে সংহার করিতেছেন।" যখন শেবা

হজরত হামজাকে আক্রমণ করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ই ওহসি নামক একজন ক্রীতদাস (যে ব্যক্তি পাহাড়ের অন্তরালে এই মহাবীর পুরুষকে হত্যা করিবার জন্য লুকায়িতছিল) হঠাৎ তাঁহাকে বর্শা দ্বারা নিদারুণ ভাবে আঘাত করিল। সেই ভীষণ আঘাতে মহাবীর হামজা বিশাল তাল তরুর ন্যায় ভূশায়ী হইলেন। ওহসি জোবায়রের ক্রীতদাস ছিল। জোবায়রের পিতৃব্য অত্‌বা বদরের যুদ্ধে হজরত হামজা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। প্রতিহিংসা পরায়ণ জোবায়ের হজরত হামজাকে বধকরা সম্বন্ধে উক্ত ক্রীতদাসকে বলিয়াছিল, "যদি তুমি হামজাকে বধ করিতে পার, তবে তোমাকে দাসত্ব হইতে আজাদ (মুক্ত) করিয়া দিব।" অত্‌বার কন্যা (আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী—হজরত মাবিয়ার (রাজিঃ) মাতা) ভীষণ প্রতিহিংসা পরায়ণা হেন্দা হজরত হামজাকে হত্যা করিবার জন্য ওহসীকে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। ওহসী সেই প্রলোভনে হজরত হামজাকে হত্যা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল; একাকী সাহস করিয়া সেই বীরেন্দ্র কেশোরীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিতে সাহস পায় নাই। অন্ধকার যুদ্ধে শেবা যখন একদিক হইতে হজরত হামজাকে আক্রমণ করিল, তখন ওহসিও পাহাড়ের অন্তরাল হইতে আক্রমণ করিতে কয়েকবার বিফল চেষ্টা পাইয়া শেষে সফল কাম হইল। ওহসি হজরত হামজার মৃত দেহ হেন্দার নিকট লইয়া আসিলে সেই জিঘাংসা পরায়ণা রাক্ষসী নারী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ

পূর্ব্বক হজরত হামজার নাককাণ কাটিয়া, দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিল, এবং হৃৎপিণ্ড চর্ব্বণ করিয়া স্বীয় প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিল। তাহার কর্ত্তিত নাককাণ দ্বারা মালা তৈয়ার করিয়া গলে ধারণ করিয়াছিল। আবু-স্ুফিয়ান হজরত হামজার পবিত্র দেহ বর্শাগ্রে বিদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

সেই সময় পাপ পুরুষ শয়তান যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিল হজরত মহাম্মদ (ছালঃ) মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মুসলমানগণ নিরাশ, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। এতৎসম্বন্ধে পবিত্র কোর-আন শরীফে উক্ত হইয়াছে "মোহাম্মদ (সালঃ) আল্লাহর প্রেরিত মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে, নিশ্চয় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বর (প্রেরিত পুরুষ)গণের মৃত্যু হইয়াছিল। যদি সে মরিয়া যায়, তোমরা কি পশ্চাৎপদ হইবে ?" কোর-আন ৩য় সুরা, ১৪৪ আয়েত। হজরত ইহা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শিষ্যগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন অধিকাংশ মুসলমান পলায়ন করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র ১৪ জন শিষ্য আসিয়া হজরতের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে হজরত আবুবকর সিদ্দিক, হজরত আলী মর্ত্তুজা, আবদুর রহমান-বিন-আওফ, সা-দ-বিন-অবি-ওক্কাস, জোবায়ের-বিন-আক্রাম, তাল্‌হা-বিন-আবদুল্লা, আবু ওবায়দা-বিন-জার্‌রাহ (রাজিঃ) এই কয়জন মহাজের ও হাবাব-বিন-মনজের, আবু দোজানা, আসেম-বিন-সাবেত, হারেস-বিন-সোমার, সোহল-বিন-

হোলেফ, ওয়াসেদ-বিন-হোজায়ের সা-দ-বিন-মা-জ (রাজিঃ) এই কয়জন আন্‌সার ছিলেন। হজরত তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার আদেশ অগ্রাহ্য করাতেই আজ তোমরা এমন বিপদ গ্রস্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা সাহসের সহিত আত্মরক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।" এতচ্ছ্রবণে হজরত আলী, জোবায়ের, তালহা, হাবার, আবু দোজালা, আসেম, হারেস ও মোছেন এই কয়জন বীর পুরুষ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার্থ শত্রুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ওদিকে কোরেশ দলের মধ্য হইতে আবদুল্লা, কোমাইয়া, আতবা-বিন-অসি আক্কাস, ওবাই-বিন-খলফ এই চারি ব্যক্তি হজরতকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইল। তাহারা দল বদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রস্তর খণ্ড সকল দ্বারা হজরতকে আঘাত করিতে লাগিল। দুরাত্মা আতবা এক খণ্ড প্রস্তর ছুড়িয়া ফেলিয়া হজরতের একটী পবিত্র দন্ত ভাঙ্গিয়া দিল। তখন হজরত এই বলিয়া আল্লাহতালার নিকট প্রার্থনা করেন, "হে দয়াময় আল্লাহতালা! তুমি ঐ সকল পথভ্রষ্ট লোককে সৎপথ প্রদর্শন কর, কারণ তাহারা জানেনা যে, তাহারা কি পাপ কার্য্য করিতেছে।"

হজরতের উপদেশ ও উৎসাহ বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলমান বীরগণ নবোদ্যমে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; হজরত আবু বকর, হজরত ওমর (রাজিঃ) প্রভৃতি প্রধান

প্রধান সাহাবার অনেকে আহত হইলেন। কতিপয় শিষ্য হজরতকে আহত অবস্থায় ওহোদের পাহাড়ে স্থানান্তরিত করিলেন। কোরেশগণ হজরতের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া যুদ্ধে বিরত হইল। আবু সুফিয়ান ওহোদের পর্ব্বতোপরি জয়পতাকা উড্ডীন করিল। কোন কোন নৃশংস কোরেশ হজরত হামজার মৃতদেহ লইয়া আমোদ করিতে লাগিল। হজরত স্বীয় পিতৃব্য হজরত হামজার মৃতদেহ শত্রুদিগের নিকট দেখিতে পাইয়া মহাশোক-বিহ্বল চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "যাহার অতুল বাহুবলে কোরেশ দলের মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষগণ শমন সদনে গমন করিয়াছে, আজ সেই মহাবীর হামজার দেহের কি দুর্দ্দশা! হে দয়াময় আল্লাহতালা! তুমি তাঁহাকে স্বর্গবাসী কর।" কথিত আছে, হজরত জেব্রিলের (আলাঃ) প্রবোধ বাক্যে হজরতের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। হজরত জেব্রিল (আলঃ) তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিলেন, "হজরত হামজা (রাজিঃ) স্বর্গবাসী হইয়াছেন, আর আল্লাহতালার নিকট তিনি "ধর্ম্ম প্রচারকের সিংহ" নামে অভিহিত হইয়াছেন।"

শত্রুদলের উড্ডীয়মান বিজয় পতাকা দর্শনে মুসলমানগণ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এতৎ সম্বন্ধে পবিত্র কোর-আন শরীফে উক্ত হইয়াছে, "অবসন্ন ও বিষণ্ণ হইও না, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে তোমরাই উন্নত।" কোর-আন —৩য় সুরা।

অল্পকাল পরে কোরেশগণ জানিতে পারিলেন, হজরতের মৃত্যু হয় নাই, তিনি জীবিত আছেন। তখন তাহারা আর হজরতকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। ভীষণ যুদ্ধে তাহাদেরও বিষম বলক্ষয় হইয়াছিল। অনন্তর কোরেশগণ মক্কাভিমুখে যাত্রা করিল। কোরেশদিগের গমন পর্য্যবেক্ষণার্থ হজরত কতিপয় শিষ্যকে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, যদি কোরেশগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মদীনা আক্রমণ করা তাহাদের উদ্দেশ্য। আর যদি তাহারা উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা মক্কায় প্রত্যাগমন করিতেছে। ফলতঃ তাহারা উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মক্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। হজরত স্বীয় পিতৃব্য হামজার সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মদীনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ওহোদের যুদ্ধে ৭০জন মুসলমান শহিদ হইয়াছিলেন। কোরেশদিগের পক্ষে ২২জন লোক নিহত হয়। হজরত মদীনায় উপস্থিত হইয়া শাহাদৎ-প্রাপ্ত শিষ্যগণের আত্মীয় স্বজনকে উপদেশ প্রদান ও নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। হজরত হামজার (রাজিঃ) জন্য নিজেও শোক প্রকাশ করিলেন। বিভিন্ন ইতিহাসে এই যুদ্ধের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ওহোদের যুদ্ধ সম্বন্ধে পবিত্র কোর-আন শরীফে ৩য় সুরায় (আল এমরাণে) নিম্নলিখিত আয়েত সকল আছে:—১২১, ১২২,

১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬ ১৫৭, ১৫৮।

ওহোদের যুদ্ধের তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আমীর ২য় খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা, আবুল ফেদা ৪৪পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, ৭ই শওয়াল তারিখে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিব্রি ৩য় খণ্ড ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যুদ্ধের তারিখ ৮ই শওয়াল, এবনে হেশাম বলেন ৫ই শওয়াল। কেহ কেহ ১১ই শওয়াল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পার্সিভাল সাহেব ও আরও অনেক ইতিবৃত্ত লেখকের মতে ১১ই শওয়াল (২৬শে জানুয়ারী) শনিবারে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

কোরেশদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য হামরায়ল-আশাদ সান্নিধ্যে হজরতের গমন।

কোরেশ সেনাদল ওহোদ যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে বিশ্রামার্থ পথিমধ্যে একস্থানে উপবেশন করিল। সেইস্থানে বসিয়া প্রধান প্রধান কোরেশদিগের মধ্যে অনেকে পরস্পর বলিতে লাগিল, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য যথাযথ-

রূপে সম্পন্ন করিয়া আসি নাই। অতএব পুনরায় মদীনা আক্রমণ করিয়া মোহাম্মদের অস্তিত্ব শেষ করিয়া আইসা উচিত। তাহাকে বধ না করিয়া আমাদের পক্ষে মক্কায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ আবু জহলের পুত্র আকরমা পুনরায় মদীনা আক্রমণ করিবার জন্য লোকদিগকে খুবই উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু শাকোয়ান-বিন-ওমাইয়া বলিল, "এক্ষণে আর মদীনা আক্রমণ ও মোহাম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নহে। গত যুদ্ধে আওস ও খজরজ সম্প্রদায়ের যে সকল লোক যোগদান করে নাই, এবার তাহারা মোহাম্মদের সঙ্গে যোগদান করিয়া আমাদের ধ্বংস সাধন করাও অসম্ভব নহে। ওহোদে আমরা জয়ী হইয়াছি, এবার পরাজিত হইলেও হইতে পারি। অতএব পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপদ টানিয়া আনিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু আবুসুফিয়ান প্রমুখ কোরেশ প্রধানবর্গ তাহার উপদেশ না শুনিয়া পুনরায় মদীনা আক্রমণার্থ অগ্রসর হইল।

এদিকে হজরতের প্রেরিত গুপ্তচরগণ আসিয়া কোরেশদিগের যুদ্ধসজ্জার কথা হজরতকে জানাইলেন। হজরত বেলাল (রাজিঃ)কে বলিলেন, "বেলাল! তুমি উচ্চৈস্বরে ঘোষণা কর যে, সকলে কোরেশদিগের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।" হজরত উপস্থিত শিষ্যগণকে বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা ওহোদের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলে, এবার কেবল তাহারাই যুদ্ধার্থে সজ্জিত হও।

তাহা হইলে কোরেশগণ জানিতে ও বুঝিতে পারিবে যে, মুসলমানগণ ওহদের যুদ্ধে অনেকে আহত হইয়াও হতাশ বা হীনবীর্য্য হয় নাই।" এতচ্ছ্রবনে ওহদের যুদ্ধে আহত মুসলমানগণ হজরতের পবিত্র আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। আবদুল্লা পীড়িত ছিলেন বলিয়া তৎপুত্র জাবের ওহদের যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিয়া ছিলেন না, এক্ষণে তিনি হামরায়ল আসাদ যুদ্ধার্থে যাইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হজরত তাঁহাকে যুদ্ধে গমন জন্য অনুমতি দিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) এই যুদ্ধে পতাকা গ্রহণ করিলেন। হজরত এবনে মকতুমকে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া ওহদ যুদ্ধের পর দিন অর্থাৎ ৮ই শওয়াল রবিবারে হামরায়ল আসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা হামরায়ল আসাদ পঁহুছিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং রবিবার দিবাগত রাত্রি কালে তথায় ৫০০ জায়গায় অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া কোরেশদিগকে আপনাদের আগমন সংবাদ জানাইলেন। এতৎসম্বন্ধে পবিত্র কোর-আন শরীফে উক্ত হইয়াছে, "যাহারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও আল্লাহ এবং তাঁহার রছুলের (প্রেরিত পুরুষের) উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সৎকার্য্য ও ধর্ম্মশীল হইয়াছে, তাহারা মহা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। (কোর-আন ৩য় সুরা)।

এই সময় একদল বণিক পণ্য দ্রব্য লইয়া মদীনায় আসিতেছিল। পথিমধ্যে কোরেশদিগের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়।

আবুস্থফিয়ান সেই বণিকদলকে অনুরোধ করিয়া বলে, "তোমরা অগ্রসর হইয়া যেখানে মুসলমান সৈন্য দল দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিও, কোরেশগণ তোমাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য পুনরায় আসিতেছে।" সেই বণিক দল হামরায়ল আসাদে পঁহুছিয়া মুসলমানদিগের নিকট আবুস্থফিয়ানের উক্তি জানাইল। মুসলমানগণ তাহা শুনিয়া বলিল, আল্লাহতালা আমাদের সহায় আছেন। কোর-আন শরীফে এতৎ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "তাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোক সমবেত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে ভয় কর; তৎপর উহাতে তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি হইল এবং তাহারা বলিল, 'আমাদের (জন্য) আল্লাহই যথেষ্ট, যিনি উত্তম কার্য্য সম্পাদক।" (কোর-আন—৩য় সুরা)।

আবি মাব্‌দ খোজাইর পুত্র মাব্‌দ মক্কায় গমন কালে এই স্থানে হজরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; তিনি ওহোদের যুদ্ধের অবস্থা অবগত হইয়া হত এবং আহত মুসলমান-দিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাব্‌দ যদিও তখন পর্য্যন্ত পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন না,—এই ঘটনায় কিছুদিন পরে মুসলমান হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই মুসলমানদিগের সঙ্গে তাহার সহানুভূতি ছিল। অনন্তর মাব্‌দ সেখান হইতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে 'রুহা' নামক স্থানে কোরেশদিগের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। আবু-স্থফিয়ান মাব্‌দকে মদীনা হইতে আসিতে দেখিয়া হজরতের কথা

ও তাঁহার গতিবিধির কথা জিজ্ঞাসা করিল। মাব্‌দ বলিলেন "হজরত শিষ্যগণসহ 'হামরায়ল আসাদে' তোমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।" এই সংবাদ শ্রবণে কোরেশগণ মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। তখন সাফোয়ান বলিল, "আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক হইল।" অতঃপর কোরেশগণের অন্তরে এমন আতঙ্ক ও ত্রাসের সঞ্চার হইল যে, তাহারা শিবির উত্তোলন পূর্ব্বক মক্কাভিমুখে প্রস্থান করিল।

হজরত কোরেশদিগের মক্কায় প্রস্থান করিবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া সশিষ্যে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা হামরায়ন আসাদে বিপক্ষ কোরেশদলস্থ আবুগজরাও মোভিয়া-বিন-মগিরাকে বন্দী করিয়াছিলেন। আবুগজরা ইতিপূর্ব্বে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল; সে আর কখনও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না বলায় হজরত তাহাকে বিনা মুক্তি পণে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে আবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াতে হজরত তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। মোভিয়া পূর্ব্বে কখনও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, তজ্জন্য হজরত তাহাকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, "তুমি ৩ দিনের মধ্যে মদীনা নগর পরিত্যাগ করিবে; নচেৎ তুমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।" কিন্তু সে ৩ দিনের পরেও মদীনা নগরে থাকিয়া কোরেশদিগের গুপ্তচরের কার্য্য করিতে লাগিল। অবশেষে জয়দ (রাজিঃ) ও অমর (রাজিঃ) ৫ দিন পরে হামরায়ল আসাদ

হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাকে মদীনায় দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন।

ওহোদ যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুদ্ধ সমূহ।

চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী।

এই সনে "রজি" নামক কূপের নিকটে অবস্থিত হোজেল বংশীয় য়িহুদিগণের দলপতি খালেদের পুত্র সোফিয়ান মক্কার কোরেশদিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া, ৭ জন লোককে মদীনায় হজরতের নিকট এই বলিয়া পাঠায় যে, আমাদের দলের লোকেরা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, অতএব আমাদিগকে ইস্‌লামী রীতি-নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্য আপনার কয়েকজন শিষ্যকে আমাদের বাসস্থানে পাঠাইয়া দিন। সোফিয়ানের উপদেশানুসারে ৭ জন য়িহুদী মদীনায় গিয়া আসেমের (রাজিঃ) পিতা সাবেত (রাজিঃ)এর গৃহে গিয়া অতিথিরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে হজরতের নিকট তাহাদের প্রার্থনা জানাইল। হজরত সরল বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া সাবেতের পুত্র আসেব (রাজিঃ) খোয়াযেব বিন্ আদি (রাজিঃ), মোরশেদ (রাজিঃ) আবদুল্লা বিন্ তারেখ (রাজিঃ) খালেদ বিন্ কায়েব (রাজিঃ) জারদ বিন্ দাসেনা (রাজিঃ) প্রভৃতি ১০জন প্রধান শিষ্যকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা আস্‌কান ও মক্কার

মধ্যস্থ হোদা নামক স্থানে পহুছিলে, তাঁহাদের সর্দ্দার একজন য়িহুদি সোফিয়ানকে গিয়া সংবাদ দিল, সে তৎক্ষণাৎ ২০০ সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া রজি কূপের নিকট আগমন করিল। সাহাবা (রাজিঃ) গণ ব্যাপার দেখিয়া য়িহুদিগের বিশ্বাস-ঘাতকতার বিষয় বুঝিতে পারিলেন। স্থূলকথা পরস্পরের মধ্যে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে আসেম (রাজিঃ) প্রমুখ ৭ জন সাহাবা মহা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শাহাদত প্রাপ্ত (নিহত) এবং খোয়াযেব (রাজিঃ) প্রমুখ ৩ জন বন্দী হইলেন, বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড য়িহুদিগণ এই আদর্শ ধার্ম্মিক পুরুষদিগকে অতি নৃসংসভাবে বধ করিল। হজরত মদীনার মস্‌জেদে বসিয়া এই নিদারুণ সংবাদ শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, তিনি খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক এই সংবাদ যথা সময় অবগত হইলাছিলেন। উল্লিখিত আদর্শ মুসলমানগণের (সাহাবা [রাজিঃ] গণের) মৃত্যুকালীন অবস্থা পাঠ করিয়া তদানীন্তন মুসলমানগণের বিস্ময়কর খোদা-ভক্তি, জ্বলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস ও আদর্শ আত্মত্যাগের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। তাঁহারা ধর্ম্মবলে কত বলিয়ান ছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে স্তম্ভিত ও বিস্ময়াপ্লুত হইতে হয়।

অতঃপর খালেদের পুত্র সুফিয়ান মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়া আবদুল্লা বিন্ ওনস্ (রাজিঃ) কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হয়, তাহার দলস্থ য়িহুদিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে।

—:—

অন্যান্য ঘটনা।

এই সময় হইতে ওহদের যুদ্ধ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে মদীনার ক্ষমতাশালী বনি নজর দলস্থ য়িহুদিগণের অন্যতম নেতা কায়াব-বিন্ আশরফ বদরের যুদ্ধে মুসলমানদিগের গৌরবান্বিত জয়লাভ দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া মক্কায় গমন পূর্ব্বক কোরেশদিগকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা, এবং মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হজরতের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করা য়িহুদিদিগের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে হজরতের যে সন্ধি হইয়াছিল, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহা ভঙ্গ করা, তদ্দরুণ মুসলমানদিগের অতীষ্ঠ হইয়া উঠা, অবশেষে মোহাম্মদ বিন্ মোস্‌লেম কর্ত্তৃক কায়াবের গুপ্ত হত্যা সঙ্ঘটন একটী প্রধান ব্যাপার হজরত এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারিয়াছিলেন না।

দ্বিতীয় ঘটনা,—হজরত ওসমানগণির (রাজিঃ) প্রথমা স্ত্রী হজরতের কন্যা হজরত রোকেয়া খাতুনের (রাঃ-আঃ) পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে, হজরত তাঁহার অপর কন্যা হজরত ওম্মে-কুলসুমকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন। এতদ্বারা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি-বারি সেচিত হইয়াছিল।

তৃতীয় ঘটনা,—হজরত স্বয়ং হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এর কন্যা হজরত বিবি হাফজা (রাজিঃ) কে বিবাহ করেন। হোজায়ফা-বিন্ হোবায়েম্ তাঁহাকে প্রথমে বিবাহ করেন, হোজায়ফা বদরের যুদ্ধে শহিদ হন। তখন হজরত হাফজা (রাজিঃ) বয়স ১৮ বৎসর। তাঁহার স্বভাব উগ্র বলিয়া হজরত

আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) প্রমুখ প্রধান প্রধান সাহাবাদিগের মধ্যে যখন কেহই তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না, তখন হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ) বড়ই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়া হজরতের নিকট হৃদয় বেদনা জ্ঞাপন করিলেন। তখন হজরত স্বয়ং হজরত বিবী হাফজা (রাজিঃ) কে বিবাহ করিতে সম্মতি দান করিয়া প্রিয় শিষ্যের মনোবেদনা দূর করিলেন। এই বৎসর সাবান মাসে এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ৪৫ হিজরীতে ইনি পরলোক গমন করেন। জিন্নতলবাকা নামক মদীনার প্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে তাহাকে দফন করা হইয়াছিল।

৪র্থ ঘটনা,—খোজায়মা (রাজিঃ) এর কন্যা বিবী জয়নব (রাঃ-আঃ) কে হারেশের পুত্র ওবায়দা বিবাহ করিয়াছিলেন। ওবায়দার মৃত্যু হইলে বিবী জয়নবের (রাঃ-আঃ) আত্মীয় স্বজনগণ তাহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই, অগত্যা হজরত এই নিঃসহায় বিধবাকে বিবাহ করিয়া তাহার দুরবস্থার অপনোদন করেন। উক্ত সনের রমজান মাসে এই পবিত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

৫ম ঘটনা—হজরত এমাম হাসানের (রাজিঃ) জন্ম.——এই বৎসরের ১৫ই রমজান হজরত আলীর (রাজিঃ) ঔরসে. হজরত ফাতেমার (রাঃ-আঃ) গর্ভে হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হজরত প্রিয় দৌহিত্রের জন্মগ্রহণ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র জামাত গৃহে গমন করিলেন, তথায় পঁহুছিয়াই

হজরত বিবী ফাতেমার (রাজিঃ) নিকট হইতে নব প্রসূত শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া দোওয়া করিতে লাগিলেন। বালকের জন্মের সপ্তম দিবসে হজরত তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া, সেই চুলের পরিমাণ স্বর্ণ গরীবদিগকে দান করিলেন—অর্থাৎ যথা নিয়মে শিশুর আকিকা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। হজরত এই নবজাত দৌহিত্রের নাম হাসান রাখিলেন।

৬ষ্ঠ ঘটনা,—এই বৎসরই ফারায়েজ (দায় ভাগ) সম্বন্ধীয় কোর-আন শরীফের আয়েত নাজেল (অবতীর্ণ) হয়।

হজরত এমাম্ হোসেনের জন্ম।

চতুর্থ হিজরীর একটী প্রধান ঘটনা,—হজরত এমাম হোসায়ন (রাজিঃ) এর জন্মগ্রহণ, শাবাণ মাসের ৫ই তারিখে হজরত ফাতেমা জোহরার (রাঃ আঃ) গর্ভে সৈয়দশ্ শোহাদা হজরত এমাম হোসেন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া মাতামহ হজরত রেসালতমাব (সাঃ), পিতা হজরত আলী (রাজিঃ) ও মাতা খাতুনে জান্নাত (স্বর্গের রাণী) হজরত ফাতেমা জোহরার (রাঃ আঃ) আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) এই শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্র আলীর (রাজিঃ) বাটিতে আসিয়া নবজাত শিশুকে দেখিতে চাহিলেন। সে সময় আস্মা বিন্তে আমিম্ নাম্নী মহিলা হজরত

ফাতেমার নিকট হইতে শিশুকে লইয়া জরদ বস্ত্রে আবৃত করতঃ হজরতের করকমলে অর্পণ করিলেন। হজরত তৎক্ষণাৎ শিশুর দক্ষিণ কর্ণে আজান ও বাম কর্ণে একামতের শব্দসমূহ পাঠ করিয়া শিশুর নাম হোসেন বলিয়া প্রচার করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমার বংশ জগৎ বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। ইনিই কারবালা প্রান্তরে ফোরাত নদীর তীরে, জয়নাল আবেদীন নামে একমাত্র পুত্র রাখিয়া দামেস্কাধিপতি দুরাচার এজিদের কুফাস্থ নগরীর শাসনকর্ত্তা ইব্‌নেজেয়াদ ওবায়দুল্লা প্রেরিত সৈন্যদলের হস্তে কারবালার মহাপ্রান্তরে সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। উক্ত হজরত জয়নাল আবেদিন হইতে ক্রমান্বয়ে সৈয়দবংশীয় মহাত্মাগণের ভারতবর্ষে আবির্ভাব হয়।

বীর মউনার যুদ্ধ।

মক্কা ও আস্‌ফান নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ বনি-হোজেল দলস্থ য়িহুদীদিগের বাসস্থানের মধ্যস্থলে বীর মউনা * নামক একটী স্থান অবস্থিত। এই বৎসরে বীর মউনাস্থ মালেকের পুত্র আবুবারাঃ আমের মদীনায় হজরতের সভায় আসিয়া উপস্থিত

* বীর মউনা একটী কূপের নাম হইতেই তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি বীর মউনা নামে অভিহিত হইত।

হইল। হজরত তাহাকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন। যদিও তখন সে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তথাপি উক্ত ধর্ম্মের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিল, "এক্ষণে আমি আপনার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব না, আপনি নজদ্ ও বনি আমের দলদ্বয়কে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য শিষ্য পাঠাইয়া দিন্, তাহারা আপনার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বিশেষ উৎসুক হইয়াছে। তাহারা মুসলমান হইলে পরে আমি ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিব, নচেৎ তাহাদের নিকট বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।" হজরত বলিলেন, "নজ্‌দের অধিবাসিগণের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই, আমার শিষ্যগণ তাহাদের নিকট উপাস্থত হইলে, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহাদিগকে হত্যা করিলেও করিতে পারে!" অবশেষে আবুবারাঃ আমেরের অনেক অনু-নয়ে হজরত তাহার সঙ্গে ৩০ জন শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন। (১)

ঐ সকল শিষ্যের মধ্যে আন্‌সার ও মহাজের এই উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ওমরের পুত্র মন্‌জের তাঁহাদের নেতা হইলেন। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) নজ্‌দ ও বনি আমের দলস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগের নামে এক এক খানি পত্র দিলেন এবং যথাকালে শিষ্যগণ আবুবারাঃ আমেরের সহিত যাত্রা করিলেন।

(১) কেহ বলেন, ৪০ জন, কেহ বলেন, ৭০ জন শিষ্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হাদিসে কেবল মাত্র ১৬ জন মুসলমানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

আবুবারাঃ আমেরের তোফেল নামক এক ঘোর মুসলমান-বিদ্বেষী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। মুসলমানগণ বীরমউনায় উপনীত হইয়া ওমাইয়াজামেরির পুত্র অমর ও সোমায়তারের পুত্র হারেসের নিকট স্ব স্ব উষ্ট্র ময়দানে চরাইতে পাঠাইয়া দিলেন এবং মালেকের পুত্র হারেমের হস্তে হজরতের একখানি পত্র দিয়া তোফেলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হারেম তোফেলের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে অভয় প্রদান করিলে, আমি হজরতের আদেশগুলি আপনার নিকট বিবৃত করিতে প্রস্তুত আছি।" এই সময়ে তোফেলের ইঙ্গিতানুসারে এক ব্যক্তি হারেমের পশ্চাতে আসিয়া তরবারির দ্বারা আঘাত করিলে, সেই আঘাতেই তিনি হত হন। মৃত্যুকালে তিনি বলিলেন, "হজরতের আদেশ প্রতিপালনে আমার প্রাণ গেল, ইহাতে আমি আপনাকে সৌভাগ্যশালী বোধ করিতেছি।" তৎপরে তোফেল বনি আমেরদলস্থ লোকগণকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তাহারা বলিল, "আমাদের দলপতি আবুবারাঃ আমের যাহাদিগকে আশা দিয়া আমাদের দেশে আনিয়াছেন, আমরা কখনই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব না।"

অনন্তর তোফেল, সোলেম, ওসাইয়া, রেয়েল ও জাকোআন-দলস্থ য়িহুদীগণের নিকট সৈন্য সংগ্রহার্থ দূত পাঠাইল। তাহারা সকলে বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে তোফেলের সহিত যোগ দিল এবং বীরমউনায় আসিয়া সেই মুষ্টিমেয় মুসলমানদিগকে

বেষ্টন করিয়া হত্যা করিতে লাগিল। ওমরের পুত্র মনজের বন্দী হইলেন, কিন্তু তিনিও শেষে যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, এই সময়ে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) দৈববলে শিষ্যগণের মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া মদিনাস্থ শিষ্যগণকে বলিলেন, "তোমাদের বন্ধুগণ বীরমউনায় কাফেরদিগের হস্তে হত হইতেছে এবং তোমাদের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছে।

এদিকে অমর ও হারেস ময়দান হইতে উষ্ট্র লইয়া বীর মউনায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তথায় মাংসাশী পক্ষিগণ উড়িতেছে, আর বিধর্ম্মীর দল অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে। তৎপরে তাঁহারা একটী উচ্চস্থানে উঠিয়া দেখিলেন—তাঁহাদের সহচরগণ সকলেই ধরাশায়ী হইয়াছেন। তখন অমর, হারেসকে বলিলেন, "হজরতের নিকট গিয়া ইহার সংবাদ দেওয়া উচিত।" কিন্তু হারেস বলিলেন, "না, তাহা হইবে না ; চল আমরাও ধর্ম্মদ্রোহী-দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।" তৎপরে হারেস যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন এবং শত্রুগণ অমরকে বন্দী করিল।

তোফেলের জননী কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, "আমি একজন বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিব।" তোফেল মাতৃপ্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য অমরকে বন্দী মুক্ত করিয়া দিল।

বনিনজির দলস্থ য়িহুদীদিগের সহিত যুদ্ধ।

এই বৎসর একদা একজন মুসলমান পথিমধ্যে বনি আমের দলস্থ দুই জন নিরস্ত্র য়িহুদীকে শত্রু মনে করিয়া হত্যা করেন। হজরত ঐ য়িহুদীদলের সহিত পূর্ব্বে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এক্ষণে তাহারা ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের হত্যার ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য হজরতকে পত্র লিখিল। হজরত এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় অবগত হইয়া উক্ত মুসলমানকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "কেন, তুমি উহাদিগকে বধ করিলে? উহারা ত আমাদের সহিত কোনরূপ শত্রুতাচরণ করে নাই, পরন্তু আমাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে।" সে বলিল, "আমি ভ্রমবশতঃ বধ করিয়াছি।" ফলতঃ হজরত তাহাদের ক্ষতিপূরণ করা উপযুক্ত মনে করিয়া মদিনার ৪।৫ ক্রোশ দূরস্থ বনি নজির ও বনি কোরায়জা প্রভৃতি য়িহুদী দলগুলির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেই সময়ে বনি নজিরদলস্থ য়িহুদিগণ তাঁহাকে স্বীয় আবাসে 'দাওত (নিমন্ত্রণ) করিল। হজরত মোহাম্মদ, হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হরজত আলী, তালহা, জোবের, মায়াজের পুত্র সায়াদ, হোজায়েরের পুত্র ওসায়েদ এবং আবাদার পুত্র সায়াদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তাহাদের বাসস্থানে উপনীত হইলেন।

বনি নজির দলপতি তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণে হজরতের উপবেশনার্থ:

স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিল। হজরত তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের বাসগৃহের প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়া বসিলেন। য়িহুদিগণ হজরতকে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা) বলিয়া আহ্বান করিল। হজরতকে আবুল কাসেম বলিবার কারণ এই যে, তাঁহার "কাসেম" নামক একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই য়িহুদিগণ তাঁহাকে আবুল কাসেম বলিত, ভ্রমেও তাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) বলিয়া ডাকিত না। যেহেতু তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ তওরাতে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) "শেষ ধর্ম্মপ্রচারক" বলিয়া লিখিত আছে। এখন যদি তাহারা তাঁহাকে "হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)" বলিয়া আহ্বান করে, তবে শেষ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে তাহারা হজরতকে "আবুল কাসেম" বলিয়া ডাকিত।

এই সময়ে হজরতের চিরশত্রু আখ্‌তাবের পুত্র হাই বলিল "মোহাম্মদকে বধ করিবার এই উপযুক্ত সময়, এই সময়ে একজন লোক গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু হইবে।" তখন অন্যান্য য়িহুদিগণ তাহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিল। জোহানের পুত্র ওমর উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল। এই সময়ে মেস্‌কাসের পুত্র সালামা বলিল, "তোমরা হজরত মোহাম্মদকে বধ করিতে অগ্রসর হইও না, যদি তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে আমাদের সহিত হজরতের যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভঙ্গ করা হইবে এবং তিনি এই সংবাদ এখনই

জেব্রিলের নিকট অবগত হইতে পারিবেন। অতএব সকলে নিরস্ত হও।” কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি য়িহুদিদিগের মধ্যে কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

অনন্তর ওমর ছাদে আরোহণ করিয়া তথা হইতে তাঁহার মস্তকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করিলে তিনি দৈববলে জানিতে পারিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া এক এক করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুষ্ট য়িহুদিগণ হজরতকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না দেখিয়া কেনানা নামক এক বিজ্ঞ য়িহুদির নিকট হজরতের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কেনানা বলিল, “হে লোক সকল! খোদাতায়ালা তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় অবগত হইয়া তোমাদের হস্ত হইতে হজরতকে রক্ষা করিয়াছেন। তোমরা আর প্রতারিত হইও না। তওরাতে যে শেষ ধর্ম্ম-প্রচারকের আবির্ভাব হইবার বিষয় উল্লিখিত আছে, ইনিই সেই শেষ ধর্ম্ম-প্রচারক। ইনি তোমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেও করিতে পারিবেন, অতএব যদি তোমরা মঙ্গল চাও, তবে তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ কর।” ইহা শুনিয়া ভ্রান্ত য়িহুদিগণ বলিল, “আমরা নির্ব্বাসিত হইব, তথাপি হজরত মুসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না।”

এদিকে হজরত মদিনায় উপনীত হইয়া মোস্‌লেমার পুত্র মোহাম্মদকে বনি নজির দলস্থ য়িহুদিগণের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, “তুমি বনি নজির দলস্থ য়িহুদিদিগের

নিকট গিয়া বল, তোমরা দশ দিনের মধ্যে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।" মোহাম্মদ-বেন-মোস্‌লেমা অবিলম্বে বনি নজির-দলস্থ য়িহুদিদিগের বাসস্থানে উপনীত হইয়া হজরতের আদেশ ঘোষণা করিলেন। তাহারা সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমরা এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছি।" ইতিমধ্যে আবদুল্লা-বেন-ওবাই-সলুল তাহাদের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "তোমরা দেশ ত্যাগ করিও না, আমি তোমাদিগের সাহায্যার্থে ১০,০০০ লোক প্রেরণ করিতেছি, আর বনি কোরায়জা ও বনি গৎফান দলদ্বয় তোমাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হইয়াছে।" তখন বনি নজির দলস্থ য়িহুদিগণ উৎসাহিত হইয়া হজরতকে বলিয়া পাঠাইল যে, আমরা দেশ হইতে চলিয়া যাইব না, তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার। এই উত্তর শ্রবণ করিয়া হজরতের আদেশে মুসলমানগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। হজরত এব্‌নে-মকতুমকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) পতাকা হস্তে অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

বনি নজির দলস্থ য়িহুদিগণ হজরতের আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সপরিবারে "জুহরা" দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং তন্মধ্যে আসিয়া মুসলমানগণের উপর প্রস্তর ও তীর বর্ষণ করিতে লাগিল; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ভাবে যুদ্ধ চলিল। হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত আবুবকর (রাজিঃ) তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। য়িহুদিগণ

আবদুল্লার সাহায্যের আশায় ১৫ দিবস পর্য্যন্ত দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিল। সোহেলি বলেন, "এই সময়ে হজরত য়িহুদিদিগকে ভয় প্রদর্শনার্থে সালামের পুত্র আবদুল্লা এবং আবুলায়েকে যে সকল খর্জ্জুর বৃক্ষে ফল হইত না, তাহাই ছেদন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।" পঞ্চদশ দিবস পরে য়িহুদিগণ আবদুল্লার সাহায্য না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়া হজরতের নিকট দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইল, "আমরা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি, অতএব আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।" হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) দূতকে বলিলেন, "য়িহুদিগণ স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আহারীয় দ্রব্যাদি উষ্ট্রে বোঝাই করিয়া লইয়া যাউক, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।" তদনুসারে তাহারা ৬০০ উষ্ট্রে বোঝাই করিয়া স্ব স্ব খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া দুর্গ মধ্য হইতে বহির্গত হইল। তাহারা কেহ সুরিয়ায়, কেহ বা খায়বার প্রভৃতি স্থানে গমন করিল। এই ঘটনা চতুর্থ হিজরীর রবিয়ল-আউওল মাসে সংঘটিত হইয়াছিল।*

বনি নজিরের বিপক্ষে হজরতের যুদ্ধ যাত্রার বিষয়ে এব্‌নে অকবা নামক একজন অতি প্রাচীন ইতিবৃত্ত লেখক বলেন, "বনি নজির দলস্থ য়িহুদিগণ মক্কা নগরস্থ কোরেশগণের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া মদীনা আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ ও প্রস্তুর

* এব্‌নে হেশাম, আবুল ফেদা ও তিব্রীর মতে এই ঘটনা সফর মাসে সংঘটিত হইয়াছিল।

আঘাতে হজরতের মস্তক চূর্ণ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল, তজ্জন্য হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) তাহাদিগকে আক্রমণ করেন।"

এব্‌নে মারদেভিয়া, হামিদের পুত্র আব্‌দ্‌, আর আবদুরাজ্জ প্রভৃতি ইতিবৃত্ত লেখকগণ বলেন যে, বদরের যুদ্ধের পর কোরেশগণ মদীনা নগরস্থ য়িহুদিদিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন—"তোমরা হজরত মোহাম্মদ (সালঃ)কে আক্রমণ করিবার চেষ্টা কর।" সেই উত্তেজনাতেই তাহারা প্রথমে তাহাদের সন্ধি ভঙ্গ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, পরে যুদ্ধ সংঘটন হয়।

য়িহুদিগণ ৫০টী বর্ম্ম, ৫০টী পতাকা, ৩৪০ খানা তরবারি ও গৃহাদি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। হজরত তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া একদিন শিষ্যমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আন্‌সারগণ! যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি বনি নজির দলস্থ লোকদিগের ধন সম্পত্তি তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু মহাজেরগণ পূর্ব্ববৎ তোমাদিগের গৃহে অবস্থিতি করিবে ইহা যদি তোমাদের অনভিমত হয় তাহা হইলে ঐ সকল ধন-সম্পত্তি দ্বারা মহাজেরদিগের জন্য স্বতন্ত্র গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া দিই, তাহা হইলে আর তাহারা তোমাদের গলগ্রহ হইবে না।" ইহা শুনিয়া সমবেত আন্‌সারগণের মধ্য হইতে মায়াজের পুত্র সায়াদ, আবদার পুত্র সায়াদ (রাজিঃ) প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান আনসার বলিলেন, "হে প্রেরিত পুরুষ!

আমাদের ইচ্ছা যে, য়িহুদিদিগের ধন সম্পত্তি মহাজেরদিগকে ভাগ করিয়া দিউন, এবং তাঁহারা যেরূপ আমাদের আলয়ে বাস করিতেছেন, সেইরূপই বাস করুন, তাঁহাদের দ্বারা আমাদের গৃহাদি উজ্জ্বল ও পবিত্র হইয়াছে ও হইবে।" ইহা শুনিয়া হজরত আন্‌সারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।* তৎপরে হজরত ঐ সকল ধন সম্পত্তি মহাজেরগণকে ও দুইজন দরিদ্র আন্‌সারকে দান করিলেন।† মহাজেরগণ তদ্দ্বারা স্ব স্ব বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। মায়াজের পুত্র সায়াদ য়িহুদিদিগের ধন সম্পত্তির মধ্য হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বনি-নজির-দলস্থ য়িহুদি-দিগের দেশত্যাগ সম্বন্ধে কোর-আন শরিফের নিম্নলিখিত কয়েকটী আয়েতে উক্ত হইয়াছে। ৫৯ সুরার ২—১৪ আয়েত।

এই বৎসরে হজরতের দৌহিত্র, ওস্‌মানের পুত্র আবদুল্লা, খোজায়মার কন্যা জয়নাব এবং আবু-সালমা-বেনল-আসাদ-মখজুমির মৃত্যু হয়। এই বৎসরেই আবুতালেবের স্ত্রী বীরবর হজরত আলীর জননী বিবী ফাতেমা কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি হজরতকে বাল্যকালে অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হজরত তাঁহার মুমূর্ষাবস্থায় তাঁহার নিকট

* এই বিষয় কোরআন শরিফের হশর সুরার নবম আয়েতে উক্ত হইয়াছে।

† এব্‌নে হেশাম ৬৫৪ পৃঃ, এব্‌নে অল আসির ২য় খণ্ড ১৩৩ পৃঃ, তিব্রী ৩ খণ্ড ৫৪ পৃঃ।

উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে তিনি মাতৃ-শোকের ন্যায় শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। "জিন্নতল বাকি" নামক প্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার শব সমাহিত হইয়াছিল। হজরত স্বয়ং সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার জানাজা ও দফন কার্য্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক, তাঁহার আত্মার জন্য আল্লাহতায়ালার কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই বৎসরে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) ওম্মে-সালেমা (রাজি-আঃ)কে বিবাহ করেন। ওম্মে-সালেমা (রাজি-আঃ) কোরেশদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার স্বামীর সহিত আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি মদীনায় আসিলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং কেহই তাঁহার ভরণ-পোষণ করিতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে হজরত সেই নিঃসহায়া মহিলার প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই বৎসর অর্থাৎ হিজরীর চতুর্থ বৎসরের স'াবান মাসে হজরত আলীর ভুবনবিখ্যাত পুত্র মহাত্মা ইমাম হোসেন (রাজিঃ) জন্ম-গ্রহণ করেন।

বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ।

ওহোদের যুদ্ধকার্য্য শেষ হইয়া গেলে, কোরেশ দলপতি আবু সোফিয়ান মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, "হে মুসলমানগণ! আগামী বৎসরে আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিব।" ইহা শুনিয়া হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) আদেশানুসারে হজরত ওমর (রাজিঃ) আবু সোফিয়ানকে বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যৎ খোদাতায়ালার উপর নির্ভর, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইবে।"

অনন্তর দেখিতে দেখিতে একটী বৎসর গত হইল। আবু সোফিয়াম অঙ্গীকৃত মদীনা আক্রমণের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মসুদ আসজাইর পুত্র নয়িম মদীনা হইতে মক্কায় আসিয়া কোরেশদিগকে বলিল, "এ বৎসর মুসলমানগণ অনেক যুদ্ধাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তোমাদের সহিত সম্মুখীন হইবার জন্য বহ্বাড়ম্বরে যুদ্ধসজ্জা করিতেছে। ইহা শুনিয়া আবু সোফিয়ানের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইল। পরে সে নয়িমকে বলিল, "এ বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমাদের দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, এমন কি ময়দানে পশুদিগের আহারোযোগী তৃণ-লতাদি পর্য্যন্ত নাই, সমুদয়ই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা এবার মদীনা আক্রমণ করিতে পারিব না। অতএব যদি তুমি মদীনায়

গিয়া মুসলমানদিগকে বল যে, "কোরেশগণ অসংখ্য সৈন্য সমভি-ব্যাহারে তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, তাহা শুনিয়া যদি তাহারা ভয়ে যুদ্ধার্থ বহির্গত না হয়, তাহা হইলে আমরা আর অঙ্গীকার-ভঙ্গ দোষে দোষী হইব না। এই কার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে আমরা তোমাকে ২০টী উষ্ট্র পুরস্কার স্বরূপ দিব।" নয়িম পুরস্কারের আশায় উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

নয়িম মদীনায় উপনীত হইয়াই মস্তক মুণ্ডন করিল। কারণ সে মনে করিয়াছিল যে, এইরূপ করিলে মুসলমানগণ জানিতে পারিবে, সে মক্কায় ওমরা-ব্রত উদযাপন করিতে গিয়াছিল। তৎপরে সে মুসলমানগণের নিকট গিয়া বলিল, "আমি মক্কায় ওমরা-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে গিয়াছিলাম; সেখানে দেখিয়া আসিলাম, কোরেশগণ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তোমাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ মদীনা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে।" ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ ভীত হইলেন এবং শত্রুর সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হজরত ওমর (রাজিঃ) ও হজরত আবুবকর (রাজিঃ) হজরতকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, "আমরা এই বৎসরে কোরেশ-দিগের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, যদ্যপি আমরা তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গরূপ অপরাধে অপরাধী হইব।" ইহা শুনিয়া হজরত শিষ্য-গণকে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে বলিলেন। তিনি রয়াহার পুত্র

আবদুল্লাকে মদীনায় আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন এবং হজরত আলীর (কঃ অঃ) হস্তে পবিত্র পতাকা দিলেন। তৎপরে ১৫০ জন শিষ্য ও ১০টী অশ্ব লইয়া হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) বদরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আহারীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে খর্জ্জুর ও অন্যান্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া গেলেন। তাঁহারা বদরে ৮ দিবস অবস্থান করিয়া খাদ্যদ্রব্যগুলি দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিলেন, অবশেষে কোরেশদিগের কোন সন্ধান না পাইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। ইহার বিষয় কোর-আন শরীফের ৩য় সুরার ১৬৭ আয়েতে উক্ত হইয়াছে।

ওদিকে আবু সোফিয়ান ২০০০ সৈন্য ও ৫০টী অশ্ব লইয়া মুসলমানদিগকে ভয়-প্রদর্শনার্থ মক্কা হইতে বহির্গত হইল। তাহারা মক্কার ৮ মাইল দুরস্থিত মার্রোজাহায়ান নামক স্থানে উপনীত হইয়া মুসলমানগণের যুদ্ধ-সজ্জার বিষয় জানিতে পারিয়া ভীত হইল এবং অগ্রসর হইতে আর সাহস করিল না, সন্ত্রস্তভাবে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আবু সোফিয়ান মাক্কায় উপনীত হইয়া প্রচার করিয়া দিল যে, "প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে ময়দান শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তথায় পশুগণের আহারোপযোগী কোনরূপ তৃণ-লতাদিও নাই। এইরূপ অবস্থায় প্রচণ্ড মরুভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক মদীনায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে সৈন্য ও উষ্ট্রগণ অনাহারে ও জলাভাবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। আমি এই বিবেচনায় এ বৎসর মদীনা আক্রমণে ক্ষান্ত থাকিলাম।" ইহা

শুনিয়া ওমাইয়ার পুত্র সাফোয়ান আবু সোফিয়ানকে বলিল, "এই বৎসর যুদ্ধ করিবে বলিয়া মুসলমানগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিলে না। ইহাতে মুসলমানগণ আমাদিগকে হীনবীর্য্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছে, আর তাহারা আমাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে। অতএব তাহাদের ক্ষমতা ধ্বংস করিতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত।" আবু সোফিয়ান ইহাতে অবমানিত বোধ করিয়া সেই সময় হইতে পরিখার (খন্দকের) যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চম হিজরীর ঘটনাবলী।

জয়নবের সহিত হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) বিবাহ।

জহাসের কন্যা জয়নাব হজরতের পিতৃস্বসার কন্যা (ফুফাত-ভগিনী ছিলেন। জয়নাবের মাতা আবদল মোত্তালেবের কন্যা ওমায়মা। হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) ঐ সৎকুলোদ্ভবা জয়নাবের সহিত স্বীয় ক্রীত দাস হারেসের পুত্র জয়দের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। জয়দ নীচবংশোদ্ভব ছিলেন, তদ্বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তজ্জন্য জয়নাব ও জয়নাবের ভ্রাতা আবদুল্লা উক্ত বিবাহ কার্য্যে সম্মত হন নাই। অধিকন্তু জয়নাব বলিয়াছিলেন, "আমি কেন একজন সামান্য লোকের স্ত্রী হইব?" তৎপরে

কোর-আন শরীফের এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "এবং যখন আল্লাহ্ ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ কোন কার্য্যের আদেশ করেন, তখন কোন বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীর পক্ষে উচিত নয় যে, তাহা অগ্রাহ্য করে এবং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের বাক্য অগ্রাহ্য করে, পরে সে নিশ্চয় ভ্রান্তিতে পতিত হয়।" এই আয়েত প্রচার হইলে আবদুল্লা, জয়দের সহিত জয়নাবের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। তৎপর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। জয়নাব উচ্চবংশ-সম্ভূতা বলিয়া সর্ব্বদা অহঙ্কার করিতেন এবং জয়দের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াতে বাস্তবিকই তাঁহার মনে কষ্ট হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি জয়দকে সর্ব্বদা ঘৃণা করিতেন। স্বামী ও স্ত্রীতে পরস্পর সদ্ভাব না থাকায় প্রায়ই উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইত। এইরূপে দশ বৎসর গত হইল; এই সময়ের মধ্যে জয়দ অনেকবার জয়নাবের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হন এবং শেষবারও হজরতের নিকট আসিয়া স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কিন্তু হজরত তাঁহাকে বলেন, "তোমার স্ত্রীকে প্রতিপালন কর এবং তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং খোদাকে ভয় করিও; কারণ খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, 'আপন স্ত্রীকে তুমি যত্নের সহিত আপনার নিকট রক্ষা কর এবং খোদাতায়ালাকে ভয় কর।" ইহা শুনিয়া জয়দ চলিয়া গেল। কিছু দিন পরে আবার জয়দ হজরতের নিকট আসিয়া জয়নাবকে বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব করেন। হজরতও পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু

তাঁহার উপদেশে জয়দের মনের গতি ফিরিল না। অবশেষে জয়দ জয়নাবকে ত্যাগ করিলেন। যখন জয়দ জয়নাবকে ত্যাগ করেন, তখন জয়নাবের বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর। তিনি জয়নাবকে ত্যাগ করিবার ৩ মাস পরে জয়নাব হজরতের নিকট সংবাদ পাঠান, "আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করুন।" তখন হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) জয়নাবকে বিবাহ করিলেন। ইহার বিষয় কোর-আন শরিফের আহজাব সুরার ৩৭ আয়েতে নিম্নলিখিত ভাবে উক্ত হইয়াছে।

"এবং (স্মরণ কর) যাহার প্রতি খোদাতায়ালা সম্পদ বিধান করিয়াছেন এবং যাহার প্রতি তুমি সম্পদ বিধান করিয়াছ, তাহাকে যখন তুমি বলিলে যে, 'আপন স্ত্রীকে তুমি আপনার নিকট রক্ষা কর এবং খোদাতায়ালা হইতে ভীত হও, এবং খোদাতায়ালা যাহার প্রকাশক, তুমি তাহাকে স্বীয় অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে ও লোকদিগকে ভয় করিতেছিলে; খোদাতালাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত যে, তুমি তাঁহাকে ভয় করিবে; অনন্তর যখন জয়দ তাহা হইতে (জয়নাব হইতে) প্রয়োজন সিদ্ধ করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার ভার্য্যা করিয়া দিলাম, তাহাতে বিশ্বাসিদিগের সম্বন্ধে আপন (পুত্র) সম্বোধন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের ভার্য্যাগণের বিবাহের সম্বন্ধে যখন তাহারা তাহাদিগ হইতে প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তখন অন্যায় হইবে না এবং খোদাতায়ালার আজ্ঞাই সম্পাদিত হয়।"

হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) জয়দকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন ; পালিত পুত্রের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করায় লোকে নিন্দা করিতে লাগিল। তাহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "এবং খোদাতায়ালা তোমাদের পুত্র সম্বোধন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে তোমাদের পুত্র সকল করেন নাই, ইহা তোমাদের নিজের মুখের কথা মাত্র।" এতদ্ভিন্ন আরবদেশীয় লোকগণ উক্ত বিবাহে আর কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।

বনি-মোস্তালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা।

হিজরীর পঞ্চম অব্দে ২রা শাবান সোমবারে (৬২৭ খৃঃ অব্দের নবেম্বর—ডিসেম্বর) মোরায়সি কূপের নিকট মোস্তালিক দলের সহিত হজরতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে, কেহ কেহ বলেন যে, চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল ; কিন্তু অধিকাংশ ইতিবৃত্তলেখক বলেন যে, ইহা পঞ্চম হিজরীতেই সংঘটিত হইয়াছিল।

ওহোদের যুদ্ধের পর আরবদেশস্থ যে কয়েকটী সম্প্রদায় হজরতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বনি-মোস্তালিক একটী ; আবিজারার পুত্র হারেস এই সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল। সে আরবদেশস্থ কোন কোন সম্প্রদায়কে হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করে, সুতরাং অনেকে তাহার সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এই সময়ে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) হোজায়ের আস্‌লামির পুত্র বরিদাকে সংবাদ আনিবার জন্য বনি-মোস্তালিক সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন। বরিদা হজরতকে বলেন, "আমার যাহা ইচ্ছা হয়, আমি তাহাদিগকে তাহাই বলিব।" হজরতও তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। বরিদা তথায় গিয়া তাহাদিগকে বলেন, "আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি।" তাহারাও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। তিনি তথা হইতে হজরতকে যুদ্ধসজ্জা করিতে সংবাদ দিলেন। হজরত তদনুসারে যুদ্ধসজ্জা করিলেন এবং হারেসের পুত্র জয়দকে মদীনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিলেন।

তৎপরে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) মহারেজদিগের পতাকা হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্তে এবং আন্‌সারদিগের পতাকা আবদার পুত্র সায়াদের (রাজিঃ) হস্তে দিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মহারেজদিগের ১০টী ও আন্‌সারদিগের ২০টী অশ্ব ছিল। এই যুদ্ধে মোনাফেকদিগের দলপতি আবদুল্লা-বেন-ওবাই সোললও হজরতের সমভিব্যাহারে গিয়াছিল। হজরত প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় সহধর্ম্মিণীদিগের মধ্যে কাহাকেও না কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কেননা ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রী সহচরী ও শান্তিদায়িনীর কার্য্য করিতেন। এই যুদ্ধে বিবি আয়েসা সিদ্দিকা (রাজি-আঃ) তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার গমনাগমনের জন্য একখানি শিবিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেই শিবিকাখানি উষ্ট্রে বহন করিয়া

লইয়া যাইত। হজরত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শত্রুদিগের অবস্থান ভূমির নিকট উপনীত হইলে, তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইল এবং অনেকগুলি সম্প্রদায় ভয়ে পলায়ন করিল; কেবল বনি-মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ লোকগণ তাঁহার সম্মুখীন হইল। হজরত তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হইল না, সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এই যুদ্ধে বনি-মোস্তালিক সম্প্রদায়ের দলপতি হারেস ও দশজন পতাকাবাহী হত এবং ২০০ লোক বন্দী হয়। মুসলমান-গণের মধ্যে এক জন লোক হত হন এবং তাঁহারা ৫০০ মেষ ও ৫০০ উষ্ট্র যুদ্ধে প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বনি-মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ এক ব্যক্তি মুসলমান হন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধকালে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদে আবৃত কতকগুলি অপরিচিত বীরপুরুষকে দেখিয়াছিলাম।"

এই যুদ্ধে হারেসের কন্যা বারা বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি হজরতের নিকট ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জোরায়রিয়া নামে অভিহিত হন।* জয়লব্ধ দ্রব্যসমূহ বিভাগ সময়ে জোরায়রিয়া কায়েসের পুত্র সাবেতের অংশে পতিত হন। ৯ উকিয়া স্বর্ণের পরিবর্ত্তে সাবেত জোরায়রিয়াকে মুক্তি দিবেন, ধার্য্য হয়। জোরায়রিয়া সেই অর্থ হজরতের নিকট প্রার্থনা করেন, হজরত তাহা প্রদান করেন। (১) তখন জোরায়রিয়া হজরতের নিকট

* এবনে হেশাম ৭২৫ পৃঃ; এবনে-অক-আসির ২য় খণ্ড ১৪৬ পৃঃ।
(১) সিরাতুন্নবী ১ম খণ্ড ৩৩২ পৃঃ।

মুক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে হজরত তাঁহাকে বিবাহ করেন। হজরত মোহাম্মদের এইরূপ উদারতা দর্শন করিয়া মুসলমানগণ স্ব স্ব বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে বনি-মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ ন্যূনধিক ১০০ জন লোক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল।

যে দিন বনি-মোস্তালিকের সহিত যুদ্ধকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল, সেই মুসলমান সৈন্যগণ তৃষ্ণা নিবারণার্থ মোরায়সি কূপের নিকট একত্রিত হইয়া পানী তুলিতেছিলেন। পানী উত্তোলন সময়ে খজরজ দলস্থ ওয়েরার পুত্র সেনানা ও মহাজের সম্প্রদায়স্থ ওমরের ভৃত্য জাহাজা একই সময়ে পানী উত্তোলনার্থ কূপ মধ্যে পানী উত্তোলন পাত্র দুইটী নিক্ষেপ করিয়াছিল। উভয়ের পাত্রের রজ্জু পরস্পর জড়াইয়া গিয়া একটী পাত্র কূপে পতিত হয়। ইহা ঐ দুই জনের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। ক্রমে ঐ গোলযোগ গুরুতর হইয়া উঠে, তখন জাহাজা সেনানাকে এক চপেটাঘাত করে, সেই আঘাতেই সেনানার রক্তপাত হয়।

হজরত মদীনায় উপস্থিত হইলে আবদুল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল তাঁহার সহিত কপট বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, সে প্রত্যেক কার্য্যে সুযোগানুসারে গুপ্তভাবে হজরতের বিপক্ষতাচারণ করিত। এক্ষণে সে মহাজের ও আন্‌সার সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া তথায় আসিয়া আন্‌সারদিগকে বলিল, "হে আন্‌সারগণ! দর্শন কর, তোমরা ঐ লোকদিগকে আশ্রয়

দিয়া আপনাদের অবমাননা আপনারাই আনিয়াছ। তোমরা উহাদিগকে নিজ গৃহে আনিয়া নিজের দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছ। এক্ষণে উহারা তোমাদের উপর অত্যাচার করিতেছে; পরে তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিবে। কিন্তু দেখিও, মদীনায় গিয়া ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ দরিদ্র লোকদিগকে (মুসলমানদিগকে) তাড়াইয়া দিবে।"

আরকামের পুত্র জয়দ হজরতের নিকট গিয়া এই গোলযোগের সংবাদ দিলেন। হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) হোজায়েরের পুত্র ওসায়েরকে বিবাদস্থলে যাইতে বলেন। ওসায়ের তথায় উপস্থিত হইলে আবদুল্লা বলিল, "আমি ত কিছুই বলি নাই, জয়দ আমার নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে।" তৎপরে কোরআন শরিফের এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "যাহারা আন্‌সারদিগকে বলে যে, তোমরা প্রেরিত পুরুষের সমভিব্যাহারী লোকদিগকে কিছুমাত্র দান করিও না, তাহা হইলে তাহারা স্বয়ংই তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইবে। তাহারা আরও বলে যে, যদি আমরা মদীনায় প্রত্যাগমন করি, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যশালী লোকগণ দরিদ্র লোকদিগকে তাড়াইয়া দিবে। খোদাতায়ালা তাহাদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিবেন, তাহা হইলে তাহারা কেমন করিয়া সত্যকে উল্লঙ্ঘন করিবে।"

ইহা শুনিয়া সাবেতের পুত্র আবাদা আবদুল্লাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং হজরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সে তাহাতে স্বীকৃত হইল না। এই ঘটনায় কোরআন শরিফের

একটি আয়েত অবতীর্ণ হয়। তাহা শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ আবদুল্লার সঙ্গ ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। সেই গোলযোগের সময় হজরত শিষ্যগণকে মদীনায় যাত্রা করিতে বলেন।

আবদুল্লার পুত্র পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) মদীনার নিকটস্থ ওয়াদি-আকেক নামক স্থানে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে উপনীত হইলে, আবদুল্লা-তনয় পিতার মদীনা প্রবেশ পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং পিতাকে বলিল, "আপনি হজরতের অধীনতা স্বীকার কিংবা শিশু ও স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা আপনাকে হীন বলিয়া স্বীকার না করিলে আমি আপনাকে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না।" অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর আবদুল্লা আপনাকে শিশু ও স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা হীন বলিয়া স্বীকার করিলে, নগর মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইল।

পরিখার যুদ্ধ।

পরিখার যুদ্ধের অপর এক নাম "আহ্‌জাবের যুদ্ধ"। "আহজাব" শব্দটী বহুবচন ; ইহার একবচন হেজ্‌ব্‌। "হেজ্‌ব্‌" শব্দের অর্থ দল। এই যুদ্ধে আরবদেশস্থ অনেকগুলি দল একত্রিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহাকে আহজাবের যুদ্ধ বলে। আকাবার পুত্র মুসা বলেন যে, এই যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীতে এবং এব্‌নে এস্‌হাক

(রঃ) বলেন যে, ৫ম হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল কিন্তু "রওজাতজ আহবাবে" ৫ম হিজরীই উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আবুসোফিয়ান ওহোদের যুদ্ধের পর বৎসর মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়াছিল এবং মদিনা পুনঃ আক্রমণের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সৈন্য-সংগ্রহে রত ছিল। সেই সময়ে দেশতাড়িত বনি-নজির দলস্থ যে সকল ব্যক্তি খায়বারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা মক্কায় আসিয়া আবুসোফিয়ানকে বলে, "আমরা মুসলমান-দিগকে মদীনা হইতে দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছি, অতএব আইস, সকলে একত্রিত হইয়া মদীনা আক্রমণ করি।"* আবুসোফিয়ান তাহাদের অভিলাষ শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল এবং তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিল, "যে ব্যক্তি মুসলমানগণের শত্রু ও তাহা-দিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে অভিলাষী, সেই ব্যক্তিই মহৎ।" এই সময়ে বনি-নজির দলস্থ য়িহুদীগণ আবুসোফিয়ানকে উৎ-সাহিত করিবার জন্য তাহাদিগের দেবদেবীর ও তাহাদের ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল। তৎপরে সকলে কাবা-প্রাঙ্গণে গিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তখন বনি-নজির দলস্থ য়িহুদীগণ মক্কা হইতে বনি গাৎফান দলস্থ য়িহুদীগণের নিকট গিয়া তাহাদিগকে হজরতের বিপক্ষে কোরেশদিগের সহিত যোগদান করিতে

* এবনে হেশাম ৯৬৩ পৃঃ; এবনে অল-আসির ২য় খণ্ড, ৬৯৩ পৃঃ; তাবারী ৩য় খণ্ড ৬০, ৬১ পৃঃ।

অনুরোধ করিলেন। তাহারা প্রথমে তাহাতে সম্মত হন নাই, পরে যখন বনি-নজিরগণ, খায়বারের ময়দানস্থ এক বৎসরের উৎপন্ন সমস্ত খর্জ্জুরফল তাহাদিগকে দিবার অঙ্গীকার করিল, তখন তাহারা সম্মত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। এদিকে আবুসোফিয়ান ৩০০ অশ্ব ও ১০০০ উষ্ট্র সঙ্গে লইয়া মদীনাভিমুখে গমন করিল। যখন আবুসোফিয়ান মারুরোজাহারাণ নামক স্থানে উপনীত হইল, তখন তথায় আস্‌লাম, আস্‌জা, আবুমারা, কানানা, ফাজারা ও গাৎফান প্রভৃতি দলস্থ য়িহুদীগণ আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। এক্ষণে আবুসোফিয়াল সর্ব্বশুদ্ধ ১০,০০০ সৈন্যের নায়ক হইল।

হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) শত্রুগণের মদীনা আক্রমণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আন্‌সার ও মহাজেরদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইলে হজরত আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সলমান ফারসী (রাজিঃ) বলিলেন "হে প্রেরিতপুরুষ! আমাদের পারস্য দেশবাসীরা শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে নগর-প্রচীরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করে এবং তাদ্দারা শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে মদীনার পূর্ব্বদিকে সেইরূপ পরিখা খনন করিলেই অনায়াসে আমরা নিরাপদ হইব।" হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) সলমান ফারসীর (রাজিঃ) প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন এবং শিষ্যগণও তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। মদীনা নগরের তিন দিক্ পর্ব্বত বেষ্টিত,কেবল পূর্ব্বদিকে নগর প্রবেশের

পথ, তথায় কোন পাহাড়াদি নাই। সেই জন্য সেই দিকে পরিখা খনন করাই স্থির হইল। হজরত ৩০০০ শিষ্য ও ৩৬টী অশ্ব সমভিব্যাহারে সালা পাহাড়ের নিম্নভাগে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।* (৫ম হিঃ, শওয়াল মাস)।

তৎপরে পরিখা-খনন-কার্য্য আরম্ভ হইল। হজরত স্বয়ং, উক্ত কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। বোখারি বলেন, "সাবেত বলিয়াছেন যে পরিখা খনন করিতে করিতে একখণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়ে, শিষ্যগণ তাহা ভগ্ন করিতে অক্ষম হইয়া হজরতকে জানাইলেন; হজরত স্বয়ং অস্ত্র হস্তে লইয়া তাহাতে আঘাত করিলে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল।" আহ্‌মদ ও নোসারী (রঃ) বলেন, "হজরত সেই প্রস্তরখণ্ডে প্রথমবার আঘাত করিলে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তাহাতে তিনি বলেন, 'এয়মনের রাজধানী দেখিতে পাইতেছি।' দ্বিতীয় আঘাতে ঐরূপ হওয়াতে বলেন, 'পারস্যের সম্রাটের রাজ-প্রাসাদ দেখিতে পাইতেছি।' তৃতীয় আঘাতে ঐ রূপ হওয়াতে বলেন, 'রুমের (তুরকির) রাজধানী আমার নয়নগোচর হইল।' ফলতঃ ঐ সকল স্থানে শেষে মুসলমানের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইবে, ইহা তাহার প্রথম চিহ্ন বলিয়া সকলে অনুভব করেন।"

এই পরিখা খননের সময়ে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) জাবেরের গৃহে একটী ছাগলের মাংস ও অল্প পরিমাণ ময়দা দ্বারা অসংখ্য লোককে ভোজন করাইয়াছিলেন। অপর একদিন

* এবনে হেশাম, ৬৭৮ পৃষ্ঠা।

তিনি এক ঝুড়ি খর্জ্জুর ফল দ্বারা সমুদয় সৈন্যকে প্রচুররূপে ভোজন করাইয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন এই সময়ে আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, বিস্তৃতি ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

যাহা হউক ২০ দিনের মধ্যে পরিখা-খনন-কার্য্য শেষ হইয়া গেল। ইতিহাস-বেত্তা ওয়াকেদি (রহঃ) বলেন, ২৪ দিনে, মুবি বলেন, ১৫ দিনে পরিখা-খনন কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু রওজাতল আহবাব গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৬ দিনের মধ্যে সেই কার্য্য শেষ হইয়াছিল। পরিখা খনন ও যুদ্ধসজ্জা প্রভৃতিতে ২০ দিন লাগিয়াছিল।

পরিখা-খনন-কার্য্য শেষ হইবার অল্পকাল পরেই আবু সোফিয়ান বিশাল সেনাদল লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পরিখা দেখিয়াই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কেননা আরবদেশে পূর্ব্বে কখনও পরিখা খনন করিয়া যুদ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল না। হজরত শিষ্যগণ-সহ পরিখার অপর পারে সালা পাহাড়ের নিম্নভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আবুসোফিয়ান শুনিল যে, মদীনার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণস্থ বনি-কোরায়জা য়িহুদীগণ হজরতের সহিত এরূপ সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ আছে যে, তাহারা মুসলমানগণের শত্রুর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে। তজ্জন্য সে আপনাদের নিরাপদের জন্য বনি কোরায়জা দলপতি কায়াবের নিকট, বনি-নজির দলস্থ আখ্‌তাবের পুত্র হাইকে পাঠাইয়া দিল এবং তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য

অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। হাই রাত্রে কায়াবের গৃহে উপনীত হইয়া আবুসোফিয়ানের অভিলাষ বিবৃত করিল। কায়াব তাহা শুনিয়া বলিল, "আমরা হজরতের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ আছি, অতএব তোমাদের সহিত যোগ দিতে পারিব না।" ইহা বলিয়া কায়াব গৃহের দ্বার বন্ধ করিল। হাই দ্বার খুলিবার জন্য অনেক অনুনয় করিল; অগত্যা কায়াব দ্বার খুলিয়া বাহির হইল এবং তাহার প্রলোভনে মজিয়া কোরেশদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য বহির্গত হইল।

হজরত বনি কোরায়জাদিগের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় শ্রবণ করিয়া মায়াজের পুত্র সায়াদ (রাজিঃ) ও আবদার পুত্র সায়াদকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাহাদের নিকট গিয়া সন্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাহা শুনিয়া তাহারা বলিল, "হজরত মোহাম্মদ কে? কেই বা আল্লা-তায়ালার ধর্ম্ম প্রচারক? আমরা ত কাহারও সহিত সন্ধিস্থাপন করি নাই।"* তাঁহারা অপমানিত হইয়া আসিয়া, বনি কোরায়জাদলস্থ লোকদের আচরণের বিষয় হজরতের নিকট প্রকাশ করিলেন।

বনি কোরায়জা দলস্থ ব্যক্তিগণ মদীনা-প্রবেশের গুপ্ত পথাদির বিষয় উত্তমরূপ জানিত। তাহারা কোরেশদিগের সহিত যোগ দিয়াছে শুনিয়া মুসলমানগণ অতিশয় ভীত হইলে এই আয়েত অবতীর্ণ হইল,—"এবং স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর হইতে

* এবনে হেশাম ৬৭৫ পৃঃ; মুন্নর ৩য় খণ্ড ২৫৯ পৃঃ।

ও তোমাদের নিম্ন হইতে সৈন্যগণ তোমাদিগকে আক্রমণ করিল এবং যখন তোমাদের চক্ষু সকল বক্র ও প্রাণ কণ্ঠাগত হইল এবং তোমরা খোদাতায়ালার সম্বন্ধে নানা কল্পনা করিতেছিলে। সেই স্থানে বিশ্বাসিগণ পরীক্ষিত ও কঠিন সঞ্চালনে সঞ্চালিত হইতেছিল।" (কোর-আন শরিফ ৩৩ সুরা)।

অল্পবিশ্বাসী মুসলমানগণ বলিতে লাগিল, "হজরত মোহাম্মদ কি আমাদিগকে রাজা করিবেন ? আমরা যে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইব।" ইহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "এবং স্মরণ কর, যখন কপট লোকেরা বলিতেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ আমাদের নিকট প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুইঅ স্বীকার করেন নাই।" অন্য এক সময়ে এক দল মুসলমান হজরতকে বলে, "আমাদের গৃহে কেহ রক্ষক নাই, যদি শত্রুগণ আক্রমণ করে, কে রক্ষা করিবে, অতএব আমরা গৃহে যাইতে ইচ্ছা করি।" তাহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "এবং স্মরণ কর, যখন তাহাদের এক দল প্রেরিত পুরুষের নিকট অনুমতি চাহিল, এবং বলিতে লাগিল, নিশ্চয় আমাদের গৃহ শূন্য আছে ; বস্তুতঃ তাহা শূন্য নয়, তাহারা পলায়ন ভিন্ন আর কিছুই ইচ্ছা করিতেছিল না।" (কোর-আন শরিফ)।

অনন্তর হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হারেসের পুত্র জয়দের সমভিব্যাহারে ৩০০ লোক দিয়া মদীনায় শিষ্যগণের গৃহাদি রক্ষা করিতে পাঠান। কেহ বলেন, ২০ দিন, কেহ বলেন, ২৪ দিন, কেহ বলেন, ২৭ দিন পর্য্যন্ত শত্রুগণ মুসলমানদিগকে বেষ্টন

করিয়াছিল। এই সময়ে মুসলমানগণ অতিশয় কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। বসরের পুত্র আব্বাদ (রাজিঃ) হজরতের প্রহরী-স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। জনৈক শত্রু হজরতকে আক্রমণ করিতে আসিলে, তিনি তাহাকে হত্যা করেন।

একদিন কয়েকজন সাহসী শত্রু, বনি-কোরায়জা দলস্থ লোক-গণের সাহায্যে পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করে। এই সময় হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) "জোলফোকার" নামক তরবারি হজরত আলী (রাজিঃ)কে প্রদান করেন। হজরত আলী (রাজিঃ) সেই তরবারি গ্রহণ করিয়া কয়েক জন প্রধান প্রধান শত্রুকে হত্যা করিয়াছিলেন। মায়াজের পুত্র সায়াদ এই যুদ্ধে আহত হন। তিনি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বলেন, "আমি বনি কোরায়জার ধ্বংস দেখিয়া যাইতে পারিলে সুখী হইব।" অন্য এক দিন কাফেরগণ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া-ছিল। তাহাতে তাহাদের অনেকগুলি প্রধান প্রধান লোক হত হওয়াতে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। যুদ্ধ শেষ হইলে বেলাল (রাজিঃ) সকলকে নামাজ পড়িবার জন্য আহ্বান করিলে, তাঁহারা জোহর, আসর ও মগরেবের নামাজ পর পর পড়িয়াছিলেন।

পরদিন গাৎফান দলস্থ মস্উদ আস্‌জাইর পুত্র নয়িম, হজরতের নিকট আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্ব হইতে নয়িমের ইস্‌লামধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, কেবল আত্মীয়গণের ভয়ে এতদিন সে

ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। নয়িম হজরতকে বলে, "আপনি আমাকে শত্রুদিগের শিবিরে যাইতে অনুমতি করুন, আমি সেখানে গিয়া আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিব, আপনি তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না।" হজরত তাহাতে সম্মত হন। নয়িমের সহিত বনি কোরায়জা দলস্থ য়িহুদিগণের বন্ধুত্ব ছিল, তজ্জন্য সে অগ্রে তাহাদের নিকট গিয়া বলিল, "আমি তোমাদিগকে বন্ধুতার অনুরোধে বলিতেছি যে, তোমরা মক্কা-নগরস্থ কোরেশদিগের বিবাদে যোগ দিয়া কেবল আপনারাই কষ্ট ভোগ করিতেছ, ইহা কি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করা হইতেছে না? তোমরা মনে করিয়া দেখ, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা কি নিরাপদ স্থানে বাস কর? যদি পরাজিত হও, তাহা হইলে কোরেশগণ মক্কায় পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইবে এবং তাহাদের দলস্থ অন্যান্য লোক দূরবর্ত্তী মরুভূমিস্থ স্ব স্ব আবাসে গমনপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবে; কেবল তোমাদের উপরই মদীনাবাসিগণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।" তৎপরে সে কোরেশ ও গাৎফান দলস্থ লোকদিগের শিবিরে গমন করিল এবং তাহাদিগকে বলিল, "বনি কোরায়জা য়িহুদিগণ হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) নিকট আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।" নয়িমের কথা শুনিয়া বনি কোরায়জা, কোরেশ ও গাৎফান দলগুলি ভীত হইল।

আবদুল্লার পুত্র জাবের (রাজিঃ) বলেন যে, হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) এই সময়ে সোম, মঙ্গল ও বুধ এই দিন ক্রমাগত মস্‌জেদে

জোহর ও আসরের নামাজের মধ্যবর্ত্তী কালে খোদাতায়ালার নিকট বিজয় লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। খোদাতায়ালাও তাঁহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৃতীয় দিবসে বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। এই কারণে লোকে সোম, মঙ্গল ও বুধবারে কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্য খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

অবশেষে আল্লাহতায়ালার কৃপায় প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া শত্রুদিগের শিবিরাদি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল এবং পশুগণ ভয়ে বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিল; তাহাদের আহারীয় দ্রব্যাদি ঝড়ে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার আর সন্ধান রহিল না এবং শিবিরস্থ অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কথিত আছে যে, সেই সময়ে স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া শত্রুদিগের শিবিরের বন্ধন-রজ্জু ছেদন ও শিবিরের স্তম্ভ সকল উৎপাটন করিয়াছিলেন; চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্তরখণ্ড আসিয়া শত্রুদিগের উপর পড়িতে লাগিল, তাহাতে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল এবং কোরেশগণ শরবিদ্ধ মৃগের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।* সেই রাত্রে ঝড়ের পর হজরত, হোজায়ফা (রাজিঃ)কে শত্রুগণের অবস্থা দেখিবার জন্য তাহাদের শিবির সন্নিবেশিত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। হোজায়ফা তথায় গিয়া দেখেন যে, শত্রুগণের শিবিরে অগ্নি নাই, তাহাদের দ্রব্যাদি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, তাহার সন্ধান নাই। আবুসোফিয়ান কাঁদিতেছে এবং

* এব্‌নে হেশাম, ৬৮৩ পৃঃ; এব্‌নে আসির, ২য় খণ্ড ১৪০ পৃঃ।

অগ্নির অনুসন্ধান করিতেছে। আবুসোফিয়ান সদলবলে সেই রাত্রেই মক্কায় প্রস্থান করিয়াছিল। কোর-আন শরিফে উক্ত হইয়াছে, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তোমাদের সম্বন্ধে আল্লাহ-তায়ালার দান স্মরণ কর, যখন তোমাদের বিপক্ষে সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তখন আমি তাহাদিগের উপরে বাত্যা ও সেনাবৃন্দ প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তোমরা তাহা দেখ নাই এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক, খোদাতায়ালা তাহার দর্শক।"—"এবং ধর্ম্মবিদ্বেষিদিগকে বিশ্বপাতা তাহাদের ক্রোধসহকারে ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হইল না, খোদাতায়ালা বিশ্বাসীদিগের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ দেখাইলেন; এবং আল্লাহ-তায়ালা ক্ষমতাশালী ও পরাক্রান্ত।" এই যুদ্ধের বিষয় কোর-আন শরিফে আহ্‌জাব স্থরায় বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

কথিত আছে যে, এই যুদ্ধের পর আবুসোফিয়ান মক্কায় গিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, "তোমাদের মধ্যে কে মদীনায় গিয়া হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)কে বধ করিতে সক্ষম? কেননা, তিনি হাটে বাজারে একাকী গিয়া থাকেন এবং ধর্ম্ম-প্রচারে মত্ততাবশতঃ তাঁহার শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকে না। তাঁহাকে গুপ্তভাবে অনায়াসে হত্যা করা যায়।" ইহা শুনিয়া একজন পল্লীবাসী আরব বলিল, "আমাকে সাহায্য করিলে আমি উহা সম্পন্ন করিতে পারি, কারণ আমার একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি আছে।" আবুসোফিয়ান তাহাকে একটী উষ্ট্র ও কিছু পাথেয় দিয়া মদীনায় পাঠাইয়া দিল। সে মদীনায় উপনীত হইয়া

হজরতের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যখন হজরত একটী মস্‌জেদে বসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, সে সেই সময় তথায় গিয়া বলিল, "আবদুল্লার পুত্র কে?" হজরত বলিলেন, "আমি।" তখন সে হজরতের দিকে অগ্রসর হইল। হজরত শিষ্যগণকে বলিলেন, "ঐ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে।" শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া সাবধান হইলেন। হজরত তাহাকে বলিলেন, "তুমি কি জন্য আসিয়াছ সত্য করিয়া বল, তাহা হইলে রক্ষা পাইবে। ইহা শুনিয়া তাহার অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইল এবং সে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। তৎপরে সে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

বনি-কোরায়জার যুদ্ধ।

মদীনার নিকটস্থিত বনি-কোরায়জার দলস্থ য়িহুদিগণ মুসলমানদিগের সহিত এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল যে, তাহারা শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে মদীনা নগর রক্ষা করিবে। কিন্তু তাহারা হজরতের চিরশত্রু বনি-নজির দলপতি আখতাবের পুত্র হাইর পরামর্শে উৎসাহিত হইয়া মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছিল এবং পরিখার যুদ্ধে কোরেশদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। ইহার বিষয় পরিখার যুদ্ধে লিখিত হইয়াছে।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ) বলিয়াছেন, "যখন হজরত পরিখার যুদ্ধ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্নান করিতে-

ছিলেন, তখন বাটীর বহির্ভাগ হইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে সালাম প্রদান করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দেখিলাম যে, দেহিয়াতল-কালবি একটী শ্বেত অশ্বতর-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে ও দন্তে ধুলা লাগিয়াছিল, হজরত তাহা ঝাড়িয়া দিলেন। তৎপরে তিনি হজরতের নিকট কয়েকটি কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। হজরত বাড়ীর মধ্যে আসিয়া বলিলেন, "জেব্রিল আমাকে বনি-কোরায়জার বিপক্ষে যাত্রা করিতে বলিয়া গেলেন।" (১)

হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) স্নানাদি করিয়া বেলালকে বলিলেন, "বেলাল! যুদ্ধার্থ শিষ্যগণকে আহ্বান কর।" বেলাল সকলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। মুসলমানগণ হজরতের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আল্লাহ-তায়ালার আদেশানুসারে তোমরা বনি কোরায়জার বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা কর এবং তথায় গিয়া আসরের নামাজ পড়িও।" শিষ্য-গণও যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। হজরত, এবনে-ওম্মে-মকতুম (রাজিঃ)কে মদীনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিলেন এবং হজরত আলীর হস্তে পবিত্র পতাকা দিলেন। তিনি লোহিব নামক অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ৩০০ সৈন্য ও ৩৫টি অশ্ব সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন। হজরত আবুবকর

(১) হজরত জেব্রিল সময়ে সময়ে দেহিয়াতল কালবির আকৃতি ধারণ করিয়া হজরতের নিকট আসিতেন।

(রাজিঃ) সৈন্যগণের দক্ষিণে ও হজরত ওমর (রাজিঃ) বামে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে বনি-নজ্জার দলস্থ লোকগণ হজরতের সহিত যোগ দিল। মুসলমানগণ রাত্রিকালে বনি-কোরায়জার বাসস্থানে গিয়া আসর, মগরেব ও এশার নামাজ পড়িলেন। তৎপরে তাঁহারা বনি-কোরায়জাদিগকে বেষ্টন করিলেন। এবনে এসহাক (রাজিঃ) বলেন ২৫ দিন ও এবনে সায়াদ ১৫ দিন পর্য্যন্ত বনি কোরায়জা দলস্থ লোকগণ দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ ছিল। এই সময়ে আবি আক্কাসের পুত্র সায়াদ (রাজিঃ) তাঁহাদিগের উপর তীর বর্ষণ করিতেন। য়িহুদিগণ দুর্গমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের অন্তর-মধ্যে বিষম ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। শেষে তাহারা হজরতের নিকট এই বলিয়া দুত পাঠাইল, "বনি নজির দলস্থ য়িহুদিগণ যেরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছে, আপনি আমাদিগকেও সেইরূপ নির্ব্বাসিত করুন।" হজরত তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই।

সেই সময়ে বনিকোরায়জা দলপতি আসাদের পুত্র কায়াব, হাই ও অপর প্রধান প্রধান য়িহুদিদিগকে বলিয়াছিল, "আমরা ত তওয়াতে হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) আবির্ভাবের বিষয় অবগত হইয়াছি ; চল, সকলে গিয়া তাঁহার নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করি।" কিন্তু তাহারা ঈর্ষাবশতঃ হজরতকে শেষ ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া স্বীকার করিল না। অধিকন্তু বলিল, "আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তওরাত গ্রন্থ ত্যাগ করিব না।" তৎপরে

তাহারা হজরতের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "আওস-দলস্থ মায়াজের পুত্র সায়াদের (রাজিঃ) হস্তে আমাদের বিচার-ভার অর্পণ করুন, তিনি আমাদের সম্বন্ধে যাহা বিচার করিবেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব।" হজরত তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎপরে মোস্‌লেমার পুত্র মোহাম্মদ (রাজিঃ) তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। সালামের পুত্র আবদুল্লা (রাজিঃ) তাহাদের স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণের ভার গ্রহণ করিলেন। মুসলমানগণ তাহাদের ১৫০০ তরবারি, ৪০০ বর্ম্ম, ২০০ বল্লম প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পরে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) মায়াজের পুত্র সায়াদ (রাজিঃ) কে আহ্বান করিলেন। সায়াদ (রাজিঃ) পরিখার যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি একটী গর্দ্দভোপরি আরোহণ করিয়া হজরতের নিকটে আসিলেন। এই সময়ে আওস্‌দলস্থ কতিপয় ব্যক্তি সায়াদের (রাজিঃ) নিকটে গিয়া বলিল, "আপনার উপর বনি কোরায়জা-দিগের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, অতএব উহাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।" সায়াদ (রাজিঃ) তাহাদের কথার কোন উত্তর দেন নাই। হজরত তাঁহার উপর উহাদের বিচার ভার অর্পণ করিলে সায়াদ (রাজিঃ) তাহাদের যোদ্ধৃপুরুষদিগকে হত্যা করিতে অনুমতি দিলেন এবং স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা-গণকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।* কোরআন শরিফে উক্ত

* এবনে হেশাম—৬৮৩-৬৯০ পৃঃ, এবনে-অল-আসির ২য় খণ্ড ১৪ পৃঃ,তাবারী-৩য় খণ্ড, ৮পৃঃ।

হইয়াছে, "এবং গ্রন্থাধিকারী (য়িহুদী) দিগের মধ্যে যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গসমূহ হইতে নামাইলেন এবং তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করিলেন তোমরা তাহাদের একদলকে হত্যা এবং অপর দলকে বন্দী করিতেছিলে।"

সুবিখ্যাত হাদিস ও ইতিবৃত্তলেখক বোখারির (রহঃ) কেতাব অল্-জেহাদে লিখিত আছে যে, হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) সায়াদের বিচার শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সায়াদ যথেচ্ছাচারী রাজার (মালেকের) ন্যায় বিচার করিয়াছে।" কোন কোন ইতিবৃত্তলেখক বলেন যে, ঐ স্থানে "মালেক" শব্দটীর অর্থ খোদাতায়ালা। কিন্তু অন্যান্য ইতিবৃত্ত-লেখকগণ বলেন, ঐ "মালেক" শব্দটীর অর্থ রাজা। সৈয়দ-অল-নাস (রহঃ) বলেন যে, হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) অবশিষ্ট বন্দীদিগকে অর্থ-বিনিময়ে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

খৃষ্টান লেখকেরা এই বিচার সম্বন্ধে সায়াদের উপর নানারূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "বন্দীদিগকে হত্যা করা অন্যায়।" কিন্তু য়িহুদীগণ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতক-রূপে হজরতের শত্রুদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল এবং বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তজ্জন্য সামরিক আইনানুসারে তাহারা বাস্তবিকই দণ্ড পাইবার যোগ্য। খৃষ্টান লেখকগণের মধ্যে কেহ ৯০০, কেহ ৭০০, কেহ বলেন ৪০০, য়িহুদী প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, যে রাত্রে

য়িহুদীগণ বন্দী হইয়াছিল, সেই রাত্রে তাহারা বেন্ত-অল-হারেসের গৃহে বন্দী অবস্থায় ছিল। অতএব একটী গৃহে ২০০ লোক থাকাও অসম্ভব। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, ২০০ শতের অনধিক লোক কখন বন্দী হয় নাই। (এবনে হেশামের মতানুসারে লিখিত)।

তুমতল জন্দলের যুদ্ধ।

হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) শত্রুগণ পরিখার যুদ্ধে মক্কাবাসী পরাজিত হইয়াও নিশ্চিন্ত হইল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মদীনার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আসিয়া মুসলমানদিগকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে লাগিল। সেই হত্যাকারীদের মধ্যে তুমতল জন্দলের খৃষ্টান শাসনকর্ত্তা আকিদা একজন।* সে মদীনা গমনের পথ-পার্শ্বে একদল লোক লইয়া সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত এবং মদীনাযাত্রী পথিক দেখিতে পাইলেই হত্যা করিত। হজরত এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য এবং তাহাদের দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করাইবার জন্য ১০০ সশস্ত্র শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় গমন করেন। সেই সময় তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে নিম্ন-লিখিতভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন, "কোন অবস্থাতেই তোমরা প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা করিও

---

* আবুল ফেদা বলেন, "তুমতল-জন্দল দেমস্কের দক্ষিণে সাত দিনের পথ-ব্যবধানে অবস্থিত।" তাহা হইলে এই স্থান মদীনা তৈয়বা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল।

না, কিংবা তোমরা কখনই কোন শিশুসন্তানকে হত্যা করিও না।"* কিন্তু শত্রুগণ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াই পলায়ন করিয়াছিল। হজরত তথায় গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কেবল মাত্র মোস্‌লেমার পুত্র মোহাম্মদ (রাজিঃ) শত্রুদিগের এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া হজরতে নিকট আনিলেন। সে

* এবনে হেশাম, ৯৯২ পৃঃ। হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) এই উপদেশবাণীর সহিত এবং হজরত আবুবকর সিদ্দিক (প্রথম খোলফায়ে রাশেদিন) যখন সুরিয়া (সাম) বিজয় জন্য এজিদ বেন আবু সোফিয়ান (রাজিঃ)কে সৈন্যাপত্য পদে নিযুক্ত করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সহিত এস্রাইল বংশীয় পয়গম্বরদিগের উপদেশের তুলনা হইতে পারে না। এস্রাইল বংশীয় একজন পয়গম্বরের একটী উপদেশ নিয়ে লিখিত হইল, এখন তুমি যাইয়া অমালেককে আঘাত কর এবং তাহার সাফল্য বর্জ্জিত রূপে বিনষ্ট কর, তাহাদেয় প্রতি চক্ষু লজ্জা করিও না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও স্তন্যপায়ী শিশু, গরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকে বধ কর।" (সামুয়েল, ১৫ অধ্যায় ৩) "বৃদ্ধ ও যুবা, কুমারী ও বালক ও বনিতাদি সকলকে নিঃশেষে বধ কর।" (এজিকেল, নবম অধ্যায় ৬)। আবার বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে মহাবল পরাক্রান্ত খ্রীষ্টানশক্তি মাঞ্চুরিয়ার ব্লাগোভেসটেস্ক যুদ্ধে ৫০০০ হাজার চাইনীজ পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু-সন্তানকে হত্যা করিয়াছিল, তাহার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেমেস্ক নগরে ফরাসী দস্যুগণ যে ভীষণ ধ্বংস লীলা এবং পাশবিক হত্যা কাণ্ড করিয়াছিল, মরক্কো—রিফে ফ্রান্স এবং স্পেন এয়ারোপ্লেন হইতে ভীষণ বোমা নিক্ষেপে যে ভাবে রীফের আরব নরনারী এবং শিশু বৃদ্ধ, রুগ্ন লোকদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। অথচ ইহারাই বর্ত্তমান যুগের সভ্য জাতি বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে ইহারা অতি নিরীহ এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদি বহুগুণ বিশিষ্ট সংসার বিরাগী শান্তিদাতা পয়গম্বর হজরত ঈসা মসীহের (আলাঃ) শিষ্য বলিয়া দাবী করিয়া থাকে।

হজরতকে বলিল, “আমাদের দলস্থ লোকগণ আপনার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে।” তখন হজরত তথা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধি।

প্রায় ৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মক্কানগরাস্থ মুসলমানগণ ধর্ম্মের জন্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদীনায় আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই সময়ে আরবদেশস্থ বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীগণ দলে দলে হজরতের নিকট আসিয়া ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ছিলেন; খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষা ও দৈনিক ধর্ম্ম কার্য্যাদির উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন। এই সময়ে হজরত মোহাম্মদ (সাল্লাঃ) সিনাই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সেণ্ট ক্যাথারিণ গির্জ্জায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের সহিত এরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যাহা জগতের ইতিহাসে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদানের একটা অক্ষয় কর্ত্তিস্তম্ভ রূপে বিদ্যমাম রহিয়াছে। তিনি খৃষ্টানদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা তাহাদের ধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণ তাহাদিগকে কখনই প্রদান করেন নাই।

সেই সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল যে, কোন মুসলমান যদি এই সন্ধিপত্রের কোন সর্ত্ত ভঙ্গ করে, তাহা হইলে সে খোদাতালার আদেশ লঙ্ঘনকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে। উক্ত সন্ধিপত্রের

সর্ত্তগুলির মর্ম্ম এই যে, মুসলমানেরা সাধারণ ভাবে খৃষ্টানদিগকে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদের গির্জ্জাঘর ও ধর্ম্মযাজকগণের বাস-গৃহাদি সর্ব্বপ্রকার আপদ বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবেন। তাহাদের উপর অন্যায়রূপ কর স্থাপিত হইবে না। কোন ধর্ম্মযাজককে ধর্ম্মমঠ হইতে বিতাড়িত করা হইবে না। কোন খৃষ্টানকে তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বল প্রয়োগ করা হইবে না। কোন খৃষ্টান সন্ন্যাসীকে তাহার আশ্রম হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া হইবে না। কোন তীর্থযাত্রীকে তীর্থযাত্রায় প্রতিবন্ধক করা হইবে না। মুসলমানদের বাসগৃহের জন্য কিংবা মসজেদের জন্য কোন গির্জ্জাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে না। কোন খৃষ্টান-মহিলা কোন মুসলমানকে বিবাহ করিলে সে তাহার নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসারে চলিতে পারিবে, তাহাকে ইস্‌লাম গ্রহণে কোন প্রকারে বাধ্য করা হইবে না বা তজ্জন্য তাহাকে কোনরূপ বিরক্ত করাও হইবে না। যদি কোন খৃষ্টান তাহার গির্জ্জাঘর বা আশ্রমের জীর্ণসংস্কারার্থ অথবা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে সাহায্যপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে মুসলমানেরা তাহাদিগের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করিতেছি মনে না করিয়া, তাহাদের অভাব মোচনে সাহায্য করিতেছে ভাবিয়া সাহায্য করিবে। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) যে ন্যায় ধর্ম্ম ও দয়ার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন, তাহা তাঁহার এই সকল কার্য্য-কলাপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

যখন দেশে সুবাতাস বহিতে আরম্ভ হইল, তখন হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) স্বীয় জন্মভূমির লোকদিগকে পৌত্তলিকতারূপ

অন্ধকার হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃতে আনয়ন করিতে উৎসুক হইলেন।

আরববাসিগণের নিকট কাবা মন্দির অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সময়ে মদীনাস্থ মুসলমানগণ কাবায় উপাসনা ও জন্মভূমি দর্শন করিতে একান্ত উৎসুক হইলেন। হজরতও এ বিষয়ে শিষ্যগণের ন্যায় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কেননা সেই সময়ে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি যেন শিষ্যগণ সহ মক্কায় ওমরা-ব্রত উদযাপন করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সময় মক্কাস্থ কোরেশ-গণের হস্তে কাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল; তাহারা মুসলমানগণের চিরশত্রু। সেই জন্য হজরত জেলকদ মাস নিকটবর্ত্তী দেখিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কারণ জেলকদ মাস বিশ্রামের মাস, এই মাসে শত্রুগণ পরস্পর বন্ধুত্বভাবে মিলিত হইত।

জেলকদ মাসের প্রথম চন্দ্রোদয়ের সোমবারে হজরত মোহাম্মদ শিষ্যগণকে ওমরা-ব্রত উদযাপন করিবার জন্য সজ্জিত হইতে বলিলেন। শিষ্যগণ আদেশ শ্রবণমাত্র দলে দলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া উপনীত হইলেন। হজরত তাঁহাদিগকে বলি-লেন, "তোমরা কেবল ভ্রমণোপযোগী তরবারি ভিন্ন আর কোন অস্ত্রাদি সঙ্গে লইও না।" খেত্তাবের পুত্র হজরত ওমর (রাজিঃ) ও আবাদার পুত্র সায়াদ (রাজিঃ) যুদ্ধাস্ত্রাদি সঙ্গে লইতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত তাঁহাদিগকে তাহা লইয়া যাইতে দেন নাই। এই সময়ে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) আবদুল্লা-বেন-ওম্মে মক্‌তুমকে মদীনায় স্বকীয় প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করেন। তৎপর তিনি আনসার ও মজাহের প্রভৃতি প্রায় ১৫০০ শিষ্য সঙ্গে লইয়া এহ্‌রাম (হজের সংকল্প) বন্ধনপূর্ব্বক মদীনা হইতে বহির্গত হন।* তিনি কোরবাণীর জন্য ৭০টী উষ্ট্রও সঙ্গে লইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ১৩০০ মুসলমান কিন্তু আবুল ফেদা বলেন যে, ১৪০০ মুসলমান হজরতের সঙ্গে গিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) জোলহলিফা নামক স্থানে উপনীত হইয়া জোহরের (অপরাহ্নিক) নামাজ আদায় করিলেন।

ওদিকে কোরেশগণ হজরতের আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দলবদ্ধ হইল এবং পরামর্শ করিল যে, মুসলমানদিগকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। পরে তাহারা মক্কার নিকটস্থিত অপরাপর কতকগুলি দলের সহিত মিলিত হইয়া হজরতের মক্কা প্রবেশ-পথ অবরোধ করিতে বহির্গত হইল এবং জেদ্দা গমনের পথপার্শ্বে বল্‌দা নামক স্থানে :শিবির স্থাপন করিল। তাহাদের মধ্যে অলিদের পুত্র খালেদ ও আক্‌রামা বিন আবুজহেল, অগ্রগামী সৈন্যগণের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিল। হজরত কোরেশদিগের অভিসন্ধি অবগত হইয়া শিষ্যগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত আবুবকর (রাজিঃ) বলিলেন, "আমরা

* এব্‌নে হেশাম, ৭৪০ পৃঃ, এব্‌নে অল-আসির, ২য় খণ্ড ১৫২ পৃঃ ; তাবারি, ৩য় খণ্ড ৮৪ পৃঃ।

ওমরা-ব্রত উদযাপন করিতে আসিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে ত যুদ্ধ করিতে আসি নাই কিন্তু যদি তাহারা আমাদিগকে হত্যা করিতে আসে, তাহা হইলে আমরাও আত্মরক্ষা করিব।” হজরত মোহাম্মদ, (সালঃ) হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) প্রস্তাবে অনু-মোদন করিলেন এবং বলিলেন, “খালেদ পথের বামপার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে, চল আমরা দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া গমন করি।” হজরত শিষ্যগণসহ অগ্রসর হইলেন, খালেদ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে মক্কায় পলায়ন করিল এবং কোরেশদিগকে হজরতের আগমন সংবাদ দিল। হোদায়বিয়ার নিকটে সায়না নামক স্থানে হজরতের উষ্ট্র কাসোয়া শয়ন করায় সকলে তথায় শিবির স্থাপন করিলেন। (১) এই স্থান মক্কার ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। মুসলমানগণ তথায় পানীয় অন্বেষণ করিতে করিতে একটী শুষ্ক কূপ প্রাপ্ত হইলেন। কথিত আছে যে, হজরত তাহাতে একটী তীর নিক্ষেপ করিলে, তাহা পানীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শিষ্যগণ সেই পানী ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে কোরেশদিগের পক্ষ হইতে ওয়ারাকা খোজাইর পুত্র বোদায়েল হজরতের নিকট আসিয়া তাঁহার আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হজরত বলিলেন, “আমরা ওমরা-ব্রত উদযাপন করিতে আসিয়াছি।” বোদায়েল বলিল, “কোরেশগণ বলদা নামক স্থানে আপনার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে।” হজরত

(১) হোদায়বিয়া একটী বৃক্ষের নাম, সেই বৃক্ষের নাম হইতে ঐ স্থানের “হোদায়বিয়া” নাম হইয়াছে।

তাহা শুনিয়া বলিলেন, "কোরেশগণ সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে অভিলাষী, সকল যুদ্ধেই তাহারা অগ্রগামী হয়, তাহাতে তাহাদের ধ্বংস ভিন্ন আর কিছুই লাভ নাই। যদি কোরেশগণ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব। তাহারা যেন অপর সময়ে আমাকে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেয়।" বোদায়েল কোরেশদিগের নিকট গিয়া বলিল, "মুসলমানগণ যুদ্ধ করিতে আসে নাই, ওমরা-ব্রত উদযাপন করিতে আসিয়াছে।" সে আরও তাহাদের নিকট হজরত মোহাম্মদের (ছালুঃ) প্রস্তাব বিবৃত করিল। তাহা শুনিয়া আক্‌রামা ও হকম প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আমরা আর মোহাম্মদের (সালঃ) কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না।"

তৎপরে কোরেশগণ আরোয়া নামক এক ব্যক্তিকে হজরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। সে হজরতের নিকট গিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হজরত পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। আরোয়া হজরতের সহিত কথোপকথন কালে দৈবাৎ তাহার হস্ত হজরতের শ্মশ্রুতে লাগিবার উপক্রম হইলে মগিরা (রাজিঃ) নামক হজরতের একজন শিষ্য তরবারি দেখাইয়া ভয় দেখাইল, তখন সে কোরেশদিগের নিকট গিয়া বলিল, "আমি সভাসদ-পরিবেষ্টিত মহাবল পারস্য সম্রাট খসরু (কেসরা) ও তুরস্কের সম্রাট্ সিজার (কায়সার) এবং নেগাস্ (নাজ্জাসী) কে দেখিয়াছি, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) যেমন তাঁহার শিষ্যগণ

কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও সম্মানিত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন, এরূপ কোন সম্রাট্‌কে কখনও দর্শন করি নাই। তাঁহার শিষ্য-গণ তাঁহার একটী কেশ প্রাপ্ত হইলে তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখে” ইত্যাদি নানা কথা বলিল।* কিন্তু কোরেশগণ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

এইরূপে কোরেশগণ প্রেরিত কয়েক জন দূত ক্রমান্বয়ে হজরতের নিকট আসিয়াছিল। অবশেষে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হেরাসকে একটী উষ্ট্রসহ মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। হেরাস তথায় উপনীত হইলে কোরেশগণ তাহার উষ্ট্রটীকে বধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। তৎপরে হজরত, খেত্তাবের পুত্র হজরত ওমর (রাজিঃ)কে কোরেশদিগের নিকট যাইতে বলেন। কিন্তু হজরত ওমর (রাজিঃ) বলেন, “মক্কায় আমার কেহ আত্মীয় নাই, আমি তথায় গেলে কোরেশ-গণ আমাকে হত্যা করিবে। আপনি ওসমান (রাজিঃ)কে পাঠাইয়া দেন। মক্কাস্থ বনি আদি বংশীয় লোকগণ ওসমানের (রাজিঃ) আত্মীয়, তাহারা ওসমান (রাজিঃ) কে ভাল বলিয়া জানে, অধিকন্তু তাহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে।” হজরত ওমরের (রাজিঃ) কথানুসারে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হজরত ওসমান (রাজিঃ)কে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। হজরত ওসমান (রাজিঃ) তথায় উপস্থিত হইলে সয়িদের পুত্র আবান

* এবনে হেশাম ৭৪৫ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১৫৪ পৃঃ, তাবারী ৩য় খণ্ড ৮৭ পৃঃ এবং আবুল ফেদা ৬১ পৃঃ।

তাঁহাকে যত্ন সহকারে স্বীয় উষ্ট্রোপরি লইয়া কোরেশদিগের নিকট উপনীত হইল। হজরত ওসমান (রাজিঃ) আবুসোফিয়ান প্রভৃতি কোরেশদিগের নিকট হজরতের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহারা সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিল না। তাহারা হজরত ওসমান (রাজিঃ)কে বলিল, "তুমি কাবায় উপাসনা করিয়া যাও, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই।" হজরত ওসমান (রাজিঃ) তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে দুষ্টগণ হজরত ওসমানকে বন্দী করিয়া রাখিল।

এদিকে মুসলমানগণ হজরতকে বলিতে লাগিলেন, "ওসমান (রাজিঃ) ব্রত উদযাপন করিয়া আসিবেন, কেবল আমরাই তাহাতে বঞ্চিত রহিলাম।" এতৎ শ্রবণে হজরত তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ওসমান কখনও একাকী ব্রত উদযাপন করিবে না।"

অতঃপর হজরত ওসমান (রাজিঃ) কোরেশগণ কর্তৃক হত হইয়াছেন, এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে মুসলমানগণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন।* তখন হজরত হোদায়বিয়া বৃক্ষে পৃষ্ঠ ঠেস দিয়া বসিয়া শিষ্যগণকে আহ্বান করিলেন এবং কোরেশদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলিলেন। তাঁহারাও কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি পলায়ন করিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কোরআন শরিফে উক্ত হইয়াছে, "সত্য সত্যই বিশ্বস্রষ্টা তখন বিশ্বাসিদিগের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, যখন তাহারা তরুতলে তোমার

* এব্‌নে হেশাম, ৭৪৬ পৃঃ।

(হে মোহাম্মদ (সালঃ)) সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, অনন্তর তাহাদের অন্তরে যাহা আছে, তিনি তাহা জানিয়াছেন, পরে তাহাদের প্রতি সান্ত্বনা অবতারণ করিয়াছেন এবং সন্নিহিত বিজয় তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়াছেন।" তখন হজরত শিষ্যগণকে বলিলেন, "আল্লাহতালা তোমাদিগের প্রতিজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তোমরা কেহই নরকগামী হইবে না।" এই প্রতিজ্ঞাকে "বায়াতোর রেজোয়ান" বলে; "বায়াত" শব্দের অর্থ বিক্রয়।

কোরেশগণ মুসলমানদিগের এইরূপ প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া হজরতের সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ ওমরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বক্তা সোহেলকে হজরত ওসমানের (রাজিঃ) সমভিব্যাহারে হোদায়বিয়াতে পাঠাইয়া দিয়াছিল; কারণ তাহারা বিবেচনা করিয়াছিল যে, যাঁহার প্রভুত ক্ষমতা দিন দিন দেশ মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং যিনি পরমভক্ত শিষ্যগণের দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁহার সহিত বিবাদ করা উচিত হইতেছে না। সোহেলের সঙ্গে হাফ্সের পুত্র বেক্রেজ্ ও আবদুল ওজ্জার পুত্র হোয়াতবও আসিয়াছিল। হজরত ওমর-বেন-খেত্তাব (রাজিঃ) সোহেলের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এমন এক সময় উপস্থিত হইবে, যখন সোহেলের বক্তৃতায় ইস্লাম-ধর্ম্মের অনেক সুফল ফলিবে।"

সোহেল মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হন। হজরতের পরলোক গমনের পর যখন মুসলমানগণের অন্তর ধর্ম্মবিষয়ে

আন্দোলিত হইতেছিল, তখন তিনি একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন; তাহা শ্রবণ করিয়া সকলের অন্তর হইতে ভ্রম বিশ্বাস দূর হইয়াছিল। তৎপরে হজরত আবুবকর (রাজিঃ) এর খলিফা পদারূঢ় হইবার সময়ে যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও সোহেলের বক্তৃতায় সুমীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল।

সোহেল কোরেশদিগের সন্ধির প্রস্তাব হজরতের নিকট উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "এ বৎসর আপনি মদীনায় ফিরিয়া যান, আগামী বৎসরে আসিয়া ওমরা-ব্রত উদযাপন করিবেন, কিন্তু তিন দিনের অনধিক কাল মক্কায় বাস করিতে পারিবেন না। সেই সময়ে কেবল ভ্রমণোপযোগী অস্ত্রের মধ্যে তরবারি সঙ্গে আনিতে পারিবেন।* আপনার সহিত কোরেশদিগের দশ বৎসরের জন্য এই সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সময়ে উভয় পক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিবে, আপনিও নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন এবং যদৃচ্ছা গমনাগমন করিয়া বাণিজ্য করিতে পারিবেন। আমাদের নিকট হইতে যে সমস্ত লোক আপনার নিকটে পলাইয়া যাইবে, আপনি তাহাদিগকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আপনার নিকট হইতে যাহারা আমাদের নিকট আসিবে, আমরা তাহাদিগকে আপনার নিকট অর্পণ করিব না।" হজরত কোরেশদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎপরে

* এবনে হাশাম, ৭৪৭ পৃঃ; এবনে অল আসির, ২য় খণ্ড ১৫৬ পৃঃ; মেস্কাত ১ম খণ্ড ১৭শ অধ্যায় ১০ম পরিচ্ছেদ।

সোহেল সন্ধিপত্র লিখিতে বলিলে হজরত আলী (কঃ-অঃ) লিখিতে বসিলেন, হজরত মহম্মদ লেখ্য বিষয়গুলি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্ তায়ালার ধর্ম্ম-প্রচারক মোহাম্মদ (সালঃ) সন্ধির এই সকল নিয়ম করিলেন।" ইহা শুনিয়া সোহেল হজরতকে বলিলেন, "যত্তপি আমরা আপনাকে আল্লাহতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে কখন আপনার সহিত বিবাদ কিংবা সন্ধি করিতাম না। আপনি আপনার পিতাম নাম লেখাইয়া দিন্।" হজরত তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হইয়া গেল। কেহ কেহ বলেন যে, ৪ বৎসরের জন্য এই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। যাহা হউক, হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) কোরেশ-গণের সহিত উপরোক্ত রূপে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলে, মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। হজরত তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "আমি খোদাতালার অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন।

তৎপরে হজরত এই স্থানে ওমরা-ব্রত ভঙ্গের নিয়মানুসারে মস্তক মুণ্ডন ও উষ্ট্র কোরবানী করেন। তাঁহার শিষ্যগণও তদনুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাঁহারা ২০ দিন পর্য্যন্ত হোদায়বিয়ায় ছিলেন; তথা হইতে মদীনায় প্রত্যাগমনকালে জহিয়ান নামক স্থানে উপনীত হইলে হজরতের নিকট "ইন্না-ফাতানা" সূরা অবতীর্ণ হয়। তখনই তিনি শিষ্যগণকে সূরাটী পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

হজরত মদীনায় ফিরিয়া আসিলে মক্কাস্থ অনেক বিধর্ম্মী তাঁহার নিকট আসিয়া মুসলমান হইল। আবু-বসির নামক একজন ক্রীতদাস মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া হজরতের নিকট আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে; হজরত সন্ধির নিয়মানুসারে তাহাকে কোরেশদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, কিন্তু সে পথিমধ্য হইতে পলায়ন করিয়া লোহিত সাগরের তীরে বাস করে।

এই সময়ে মুসলমানগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সত্য হইল না, আমরা কাবা প্রদক্ষিণ ও ওমরা-ব্রত উদযাপন করিতে পারিলাম কৈ?" তখন হজরতের নিকট কোর-আন শরিফের এই আয়েত অবতীর্ণ হইল, "সত্য সত্যই খোদাতায়ালা স্বীয় প্রেরিত পুরুষের প্রতি যথার্থ স্বপ্ন প্রমাণিত করিয়াছেন, যদি খোদাতায়ালা ইচ্ছা করেন, তবে অবশ্য তোমরা মস্তকমুণ্ডন করতঃ নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে মস্‌জেদ অল্‌-হারামে প্রবেশ করিবে।" ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ আহ্লাদিত হইলেন।

সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলী।

খায়বারের যুদ্ধ।

মদীনা হইতে ৩।৪ দিনের দূরবর্ত্তী "খায়বার" নামক স্থানে কতকগুলি ক্ষমতাশালী য়িহুদী সম্প্রদায় বাস করিত। সে স্থানটী মদীনার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সেই স্থানে য়িহুদি-দিগের কতিবা, নায়েম, সায়াব, শেখ, কমুস, নাতাত, সাতি ও

সালাম নামক আটটী সুদৃঢ়ও অজেয় দুর্গ ছিল। সেই সকল দুর্গকেই খায়বার বলিত; "খায়বার" শব্দের অর্থ দুর্গবেষ্টিত স্থান। এই স্থানে মদীনা হইতে নির্ব্বাসিত বনি-নজির ও বনি-কোরায়জা দলস্থ য়িহুদিগণ আসিয়া বাস করিতেছিল। খায়বারের পূর্ব্ব বাসেন্দা য়িহুদিগণ হজরতের চিরশত্রু ছিল। বনি-নজির ও বনি-কোরায়জা দলস্থ য়িহুদিগণ তাহাদের সহিত যোগ দেওয়াতে, হজরতের উপর তাহাদের বিদ্বেষানল অধিকতর প্রবল ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বনি-নজির দলপতি আবু হকিক, বনি-গাৎফান বংশীয় যাযাবার (ভ্রমণকারী) য়িহুদি সম্প্রদায়ের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল এবং বনি-সায়াদ-বেন-বকর ও অন্যান্য দলস্থ যে সকল য়িহুদি পরিখার যুদ্ধে উপস্থিত ছিল, তাহারাও খায়বারের য়িহুদিগণের সহিত মিলিত হইল। অবশেষে খায়বারস্থ ওসায়ের-বেন-জারিম, বনি-ফেজারা ও বনি মুরাঃ দলস্থ য়িহুদিগণকে হজরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। ইহারা বহুদিন হইতে মদীনা আক্রমণের চেষ্টায় ছিল এবং সময়ে সময়ে মদীনাবাসি-দিগকে আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করিত।

এই সময়ে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) য়িহুদিগণের যুদ্ধ-সজ্জার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যগণকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে বলিলেন। এবনে এস্‌হাক বলেন যে, হজরত ১৪০০ শিষ্য, ২০০ অশ্ব ও বহু সংখ্যক উষ্ট্র সমভিব্যাহারে খায়বারস্থ য়িহুদিগের ষড়্‌যন্ত্র নিষ্ফল করিয়া দিবার জন্য সপ্তম

হিজরীর মহ্‌রম মাসের প্রথম ভাগে মদীনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য ২০ জন ধাত্রীও তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি গোরফাতার পুত্র বোসাকে (রাজিঃ) মদীনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া যান। মাহাসান আসাদির পুত্র ওকাসা (রাজিঃ) অগ্রগামী সৈন্যগণের এবং ওমর-বেন-খেত্তাব (রাজিঃ) সৈন্যগণের বামপার্শ্বের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত শিষ্য-গণকে বলিলেন, "যাহাদের লুণ্ঠন-আশা বলবতী, তাহারা যেন এই যুদ্ধে যোগদান না করে।" হজরতের এই কথা শ্রবণ করিয়া মোনাফেকদিগের দলপতি আবদুল্লা-বেন-ওবাই সোলুন যুদ্ধ গমনে নিরস্ত হইল, পরন্তু সে খায়বারস্থ য়িহুদিদিগকে হজরতের যুদ্ধসজ্জার বিষয় সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বলিল।

খায়বারস্থ য়িহুদিগণ হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া গাৎফান দলস্থ য়িহুদিদিগকে সংবাদ দিয়া মহাসমারোহে যুদ্ধসজ্জা করিল। গাৎফান দলস্থ লোকগণ খায়বারে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে একটী শব্দ শুনিতে পাইয়া মনে করিল যে মুসলমানগণ তাহাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছে, এই আশঙ্কায় তাহারা স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু বাসস্থানে গিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। ওদিকে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) খায়বারে উপস্থিত হইয়া তথাকার অভেদ্য দুর্গ দর্শন করিয়া করুণাময় খোদাতালার নিকট জয়লাভ কামনা

করিয়া প্রার্থনা করিলেন এবং শিষ্যগণকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। তাঁহারা মন্‌জেলা নামক স্থানে উপনীত হইয়া নামাজ পড়িলেন। তথায় কতিপয় কৃষিজীবী য়িহুদী মুসলমানদিগকে দেখিতে পাইয়া খায়বারস্থ য়িহুদিদিগের নিকট সংবাদ দিল। নামাজ পড়া শেষ হইলে মুসলমানগণ "আল্লাহু আক্‌বর, আল্লাহু আক্‌বর, লাএলাহা ইল্লাল্লাহ" এই পবিত্র কলেমা উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

য়িহুদিগণ মুসলমানদিগের আগমন দর্শন করিয়া দুর্গ সমূহের দ্বার বন্ধ করিয়া যুদ্ধসজ্জা করিল। তাহাদের দলপতি সালাম-বেন-মস্‌কাম সকলকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করিল; স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে কতিবা দুর্গে এবং খাদ্যদ্রব্যাদি নায়েম ও সায়াব নামক দুর্গদ্বয়ে বন্ধ করিয়া রাখিয়া সৈন্যগণকে নাতাত দুর্গে আসিয়া একত্রিত হইতে বলিল। এই যুদ্ধসজ্জার সময়ে সালাম হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) খায়বারের নিকট-স্থিত রজি নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া নাতাত দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ক্রমাগত কয়েকদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধকার্য্য চলিল। সেই সময়ে জনাব বেন মন্‌জের (রাজিঃ) হজরতকে বলিলেন, "য়িহুদিগণের সন্তান তুল্য খর্জ্জুর বৃক্ষগুলি ছেদন করা যাউক।" হজরত তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। রাত্রে হজরত ওমর-বেন-খেত্তাব (রাজিঃ) এর হস্তে নাতাত দুর্গের আক্রমণ-ভার অর্পিত ছিল, সেই রাত্রে একজন য়িহুদী মুসলমানদিগের হস্তে পতিত

হয়। সে হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে হজরত ওমর (রাজিঃ) তাহাকে হজরতের নিকট আনিলেন। মুসলমানগণ তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু হজরত তাহা করিতে দেন নাই। সে হজরতকে বলিয়াছিল, "এই রাত্রে য়িহুদিগণ নাতাত দুর্গ ত্যাগ করিয়া শেখ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, নাতাত দুর্গে যে সকল দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়া যাইবে, আমি আগামী কল্য তাহা আপনাদিগকে দেখাইয়া দিব।" এই ব্যক্তি সেই রাত্রিতে মুসলমান হইয়াছিল। পরদিন য়িহুদিগণ নাতাত দুর্গ ত্যাগ করিলে মুসলমানগণ দুর্গ অধিকার করিলেন। এই দুর্গ জয় করিতে গিয়া ৫০ জন মুসলমান আহত হন।

তৎপরে মুসলমানগণ সায়াব দুর্গ আক্রমণ করেন। এই সময়ে তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যাদি নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা কষ্ট পাইতেছিলেন। তজ্জন্য হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) শিষ্য-গণের আহারীয় দ্রব্যের জন্য খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর জনাব—বেন-মন্জের (রাজিঃ) পবিত্র পতাকা গ্রহণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর সায়াব দুর্গ জয় করেন এবং তন্মধ্যে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যাদি প্রাপ্ত হন।

ইহার পর তাঁহারা অতীব সুদৃঢ় ও অজেয় কমুস দুর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রথম দিন হজরত ওমর (রাজিঃ) পর দিন হজরত আবুবকর (রাজিঃ) দুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কেহই কৃত-কার্য্য হইতে পারিলেন না। দ্বিতীয় দিন হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) শিষ্যগণকে বলিলেন "আমি আগামী কল্য যাহার হস্তে পতাকা

দিব, সেই ব্যক্তিই আল্লাহতায়ালার কৃপায় দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইবে।" ইহা শুনিয়া সায়াদ-বেন-আবি আক্কাস (রাজিঃ) ও হজরত ওমর-বেন-খেত্তাব (রাজিঃ) প্রভৃতি প্রধান প্রধান মুসলমানগণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি আগামী কল্য পতাকা প্রাপ্ত হইবে, সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান্।"

বীরবর হজরত আলি (কঃ-অঃ) চক্ষের পীড়াবশতঃ হজরতের সঙ্গে খায়বারে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু হজরতের মদীনা ত্যাগের কয়েক দিন পর তিনি একাকী মদিনায় না থাকিয়া খায়বারে উপস্থিত হন। হজরত সেই রাত্রেই হজরত আলীর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি প্রাতে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। হজরত আলী চক্ষের পীড়ায় এত অস্থির হইয়াছিলেন যে সালাম-বেন-অকবা (রাজিঃ) তাঁহার হাত ধরিয়া হজরতের নিকট আনিলেন। ফলতঃ হজরতের অনুগ্রহে সেই মুহূর্তেই হজরত আলীর চক্ষু নিরাময় হইয়া গেল। তৎপরে হজরত তাঁহার হস্তে জোলফোক্কার নামক তরবারি ও পবিত্র পতাকা দিয়া বলিলেন, "অদ্য তোমার হস্তে দুর্গ জয় হইবে।"

হজরত আলী (রাজিঃ) সৈন্যগণ সহ কমুস দুর্গের প্রাচীরের নিকটস্থিত প্রস্তরখণ্ড সমূহোপরি পবিত্র পতাকা স্থাপন করিয়া য়িহুদিদিকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। য়িহুদি দলপতি হারেস নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু সে হজরত আলীর (রাজিঃ) তরবারির এক আঘাতেই শমন সদনে নীত হইল। হারেসের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা অতুল বলবিক্রমশালী দীর্ঘকায় মারহাব ভ্রাতৃ-হন্তার বধসাধনার্থ দুইখানি শিরস্ত্রাণ ও দুই খানি উরস্ত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক প্রত্যেক যুদ্ধাস্ত্র দুই দুই খানি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে হজরত আলীকে (রাজিঃ) বলিল, আমার নাম মারহাব, আমি সর্ব্ববিধ যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।" হজরত আলী (রাজিঃ) তৎশ্রবণে বলিলেন, "আমার নাম আলী, আমি ভূমিষ্ঠ হইলে আমার জননী আমার নাম 'আলী-অল-হায়দর' অর্থাৎ সিংহ রাখিয়াছিলেন।"

তৎপরে মারহাব হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রতি প্রচণ্ড প্রতাপে বল্লম নিক্ষেপ করিল; কিন্তু হজরত আলী (রাজিঃ) অতুল বীরত্ব সহকারে মারহাবের লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়া, স্বকীয় জোলফোক্কার তরবারির এক আঘাতে তাহার অভেদ্য শিরস্ত্রাণ ভেদ করিয়া, মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন; তাল তরুবৎ মারহাবের দীর্ঘ দেহ ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল। এইরূপে হজরত আলী (রাজিঃ) শত্রুপক্ষীয় সাত জন প্রধান পুরুষকে নিহত করিলেন। তখন য়িহুদিগণ হজরত আলীর (রাজিঃ) পরাক্রম দর্শন করিয়া দুর্গ মধ্যে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কমুস ও অন্যান্য দুর্গের য়িহুদিগণ হজরত আলীর নিকট আসিয়া

বলিল, "আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন (আল আমান)।" হজরত আলী, হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)এর আদেশানুসারে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা নিজের কোন দ্রব্যাদি লুক্কায়িত না রাখিয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া যাও।" য়িহুদিগণ তাহাই করিল। হজরত খায়বার জয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দয়াময় খোদাতালাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন এবং হজরত আলী (রাজিঃ) কে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

আবু হকিকের পুত্র কানানা কমুস দুর্গের অধিপতি ছিল। মুসলমানগণ সেই দুর্গে ১০০ বর্ম্ম, ৪০০ তরবারি, ১০০০ বল্লম, ৫০০ ধনুক ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে হজরত মোহাম্মদ কানানাকে বলেন, "তোমার আর অর্থ কোথায় আছে?" সে বলিল, "সমুদয় অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে।" হজরত বলিলেন, "যদি আর কোন ধনসম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়া থাক, তাহা হইলে আমান (রক্ষা) পাইবে না।" তৎপরে হজরত দৈবশক্তি প্রভাবে ধনের সন্ধান পাইয়া জোবের (রাজিঃ) কে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁড়িতে বলিলেন এবং তথায় প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে য়িহুদিদিগের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইল। কিন্তু হজরত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।* অবশেষে নাতাত দুর্গে সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করা হইলে, তিনি তাহার

* এবনে হেশাম, ৭৬৪ ও ৭৭৩ পৃঃ; এবনে-অল-আসির ২য় খণ্ড ১৬৯ পৃঃ; গুপ্ত ধন বাহির করিয়া দিবার জন্য কানানাকে উৎপীড়ন করা হইয়াছিল বলিয়া যে বর্ণনা আছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিলেন, আর অবশিষ্ট দ্রব্যাদি শিষ্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে ৬৪ জন মুসলমান ও ৯৩ জন য়িহুদি হত হইয়াছিল।

হজরত মহম্মদের বিষ পান।

খায়বার অধিকৃত হইলে মুসলমানগণ কয়েকদিন পর্য্যন্ত কমুস দুর্গে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। একদিন তথায় হজরত মোহাম্মদ ও বশর এক সময়ে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। বশর অবলীলাক্রমে আহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু হজরত এক খণ্ড মাংস মুখে দিয়াই বলিলেন, "এই মাংস বলিতেছে যে, আমাতে বিষ আছে।" তৎক্ষণাৎ তিনি আহার না করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু বশর উক্ত মাংস ভক্ষণ করার ৩।৪ দিন পরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। অনন্তর অনেক অনুসন্ধানের পর হজরত অবগত হইলেন যে, হজরত আলী (রাজিঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে মারহাব নামক যে দীর্ঘকায় বীরপুরুষকে বধ করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতা হারেসের কন্যা জয়নাব এই মাংস রন্ধন করিয়াছিল। তখন জয়নাব হজরতের নিকট আনীত হইল। হজরত তাহাকে মাংসে বিষ প্রয়োগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমি আপনাকে হত্যা করিবার জন্য ঐ মাংসে অধিক পরিমাণে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম, যদি আপনি ধর্ম্মপ্রচারক হন, তাহা হইলে আপনার

বিপদ্ আপনিই জানিতে পারিবেন, আর যদি বীরপুরুষ হন, তাহা হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন।* হজরত তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। (১)

ওমরাতল কাজা। [১]

বিবি ময়মুনার সহিত হজরতের বিবাহ।

হজরত মোহাম্মদ খায়বার হইতে মদীনায় প্রত্যাগমন করিয়া "ওমরাতল কাজা" সম্পন্ন করিবার জন্য শিষ্যদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিয়া বলিলেন, † "যাহারা হোদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে সকলকেই এবার ওমরাব্রত উদযাপন করিতে যাইতে হইবে।" তদনুসারে ২০০০ শিষ্য ওমরা-ব্রত উদযাপন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা ১০০ অশ্ব এবং কোরবানী প্রদানার্থ ৬টী উষ্ট্র সঙ্গে লইলেন। হজরত আবুরোহম গাফ্ফারি (রাজিঃ) কে মদীনায় আপনার প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করিয়া

---

* এই বিষ ভক্ষণে হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শেষ জীবনে এই বিষের অপকারিতা তিনি বিশেষরূপে ভোগ করিয়াছিলেন। তাবারী ৩য় খণ্ড—১০৪ পৃঃ; এবনে-অল-আসির ২য় খণ্ড ১৭০ পৃঃ।

(১) সিরাতুন্নবী ১ম খণ্ড ৩৬১ পৃঃ।

---

(১) একবার ওমরাব্রতের এহ্রাম (ওমরার সংকল্প) বন্ধনপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিতে গিয়া পথিমধ্যে হইতে ফিরিয়া আসিয়া পর বৎসর তাহা সম্পন্ন করাকে "ওমরাতল কাজা" বলে।

† কোর-আন শরিফ,৪৮ সুরা—২৭ আয়েত

শিষ্যগণসহ মক্কা-যাত্রা করিলেন (৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে)। তিনি মক্কার নিকটস্থ. জোলহলিফা নামক স্থানে উপনীত হইয়া মোহাম্মদ-বেন-মোস্‌লেমার নিকট অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি দিয়া অগ্রে মক্কাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহারা সেই স্থানে এহ্‌রাম (ওমরার সংকল্প) বাঁধিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহম্মদ-বেন-মোসলেমা মাররোজাহারাণ নামক স্থানে উপনীত হইলে কোরেশগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কোরেশগণ মোহাম্মদ-বেন-মোস্‌লেমাকে জিজ্ঞাসা করিল, " মোহাম্মদ (ছালঃ) কোথায় ?" তিনি বলিলেন, "হজরত মোহাম্মদ আগামী কল্য আসিবেন।" পরে হজরত শিষ্যগণসহ বতনেনাজ্জে নামক স্থানে উপনীত হইলে, কোরেশগণ তাঁহার আগমন সংবাদ জানিতে পারিল। তখন তাহারা মোহাম্মদ-বেন-মোসলেমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা অশ্ব ও যুদ্ধাস্ত্রাদি সঙ্গে আনিয়াছ কেন ?" মোহাম্মদ-বেন-মোসলেমা বলিলেন, "আমরা আত্মরক্ষার্থ ঐ সকল আনিয়াছি, তোমাদের সহিত আমাদের সন্ধি ভঙ্গ হয় নাই।" হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) আওস-বেন-খাওয়ালি আন্‌সারিকে বলিলেন, "তুমি এই স্থানে ২০০ লোক লইয়া দ্রব্যাদি রক্ষা কর, আমরা মক্কায় চলিয়া যাই।" আওস তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎপরে হজরত কাসোয়া উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক অপরাপর শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া তালবিয়া* পড়িতে পড়িতে মক্কানগরে

* এই বচনসমূহকে তালবিয়া বলে—"লব্বয়কা আল্লাহুম্মা লব্বায়কা লব্বয়কা লাশারিকা লাকা লব্বয়কা, ইন্নাল্ হাম্‌দা নেহমাতে লাকা লব্বয়কা, আলমোলকো লাশারিকা লাকা ;"

প্রবেশ করিলেন। কোরেশগণ তাঁহাদের আগমনে নগর ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিল।

মক্কা নগর সেই সময়ে একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল, কেবল শূন্য গৃহগুলি পড়িয়াছিল। মুসলমানগণ বহুদিন পরে জন্মভূমিতে পদার্পণ করিয়া স্ব স্ব শূন্য আবাসগৃহগুলি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। হজরত ওমরাব্রতের নিয়মানুসারে কাবায় উপাসনা কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া মারওয়া পাহাড়ে উষ্ট্র কোরবানী ও মস্তকমুণ্ডন প্রভৃতি ব্রত কার্য্য শেষ করিলেন। তৎপরে তিনি একদল শিষ্যকে বতনে-নাজ্জে দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তথাকার লোকদিগকে মক্কায় আসিয়া ওমরাব্রত উদযাপন করিতে বলিয়া দিলেন।

এই সময় মক্কাবাসিগণ হজরতের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার উদারস্বভাব প্রভৃতি গুণে মোহিত হইয়া অনেকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই সময়ে হারেসের কন্যা ময়মুনার সহিত হজরতের বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ কালে বিবি ময়মুনার (রাজিঃ) বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর ছিল। বিবি ময়মুনা বিখ্যাত বীর খালেদ-বেন-অলিদের মাতৃস্বসা ছিলেন। হজরত মোহাম্মদ হোদায়াবিয়ার সন্ধি অনুসারে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিয়া চতুর্থ দিনে তথা হইতে মদীনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কথিত আছে যে চতুর্থ দিন প্রাতে কোরেশগণ বলিয়া পাঠাইয়াছিল "আপনি শীঘ্র আমাদের নগর হইতে চলিয়া যান।" হজরত তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি অদ্যই চলিয়া যাইব, কিন্তু তোমাদিগকে আমার

আবাসে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করি।” তাহা শুনিয়া তাহারা বলে, “আমাদিগকে ভোজন করাইবার আবশ্যক নাই, আপনি শীঘ্রই চলিয়া যান।” পথভ্রান্ত কোরেশদিগের নীরস কথায় হজরত আর কোন আপত্তি না করিয়া মক্কা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহাবীর খালেদের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ।

বীরবর খালেদ বলিয়াছেন, “যখন হোদায়বিয়ায় আমাদের (কোরেশদিগের) সঙ্গে হজরতের সন্ধি স্থাপিত হইল, তখন আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, আমাদের কোন ক্ষমতা নাই, আমরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি এবং হজরতের ক্ষমতা ও ধর্ম্মবল দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সময় আমি একবার মনে ভাবিলাম যে, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর নিকট যাই, কিন্তু শুনিলাম যে তিনি মুসলমান হইয়াছেন। তৎপরে রুমের সম্রাট্ হের্‌কেলের নিকট গিয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু আবার মনে ভাবিলাম, আর কিছুদিন অপেক্ষা করি। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পর বৎসর হজরত ওমরাতলকাজা সম্পন্ন করিতে মক্কায় আসিয়া আমার অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আমি মক্কায় ছিলাম না। আমার সহোদর অলিদ তখন মুসলমান হইয়াছিল। সে আমাকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছিল,—“হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) আপনার অন্বেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

'বোধ হয়, এতদিন পর্য্যন্ত খালেদের নিকট ইস্‌লামধর্ম্মের সত্যতা অবিদিত নাই। যদি সে ধর্ম্মের জন্য স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল।' অতএব ভ্রাতঃ! শীঘ্র এই ধর্ম্ম গ্রহণ করুন, অনেক পুণ্য কার্য্য আপনার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছে।" এই পত্র পাঠ করিয়া আমার অন্তর মধ্যে ক্রমে ক্রমে ইস্‌লামধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে লাগিল।

"তৎপরে আমি ওমাইয়ার পুত্র সাফোয়ানের নিকট গিয়া বলিলাম, 'সাফোয়ান! এক্ষণে আমাদের পতন সময় উপস্থিত। হজরত মোহাম্মদের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; চল আমরা তাঁহার নিকট গিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করি; তাঁহার ক্ষমতায় আমাদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হইবে।' সাফোয়ান আমার কথা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া আমাকে এক চপোটাঘাত করিল। আমি সাফোয়ানের নিকট অবমানিত হইয়া আবু জহলের পুত্র আক্‌রামার নিকট গিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ বলিলাম। সেও আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিল না। অবশেষে আমি তাল্‌হার পুত্র ওস্‌মানের নিকট গমন করিলাম এবং আমার মনোগত ভাব প্রকাশ করিলাম সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর আমরা উভয়ে একত্রিত হইয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণার্থ মদীনা-যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে হাদা নামক স্থানে আসের পুত্র আমরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনিও ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণার্থ আমাদের সহিত যোগ দিলেন। তথা হইতে আমরা তিনজনে মদীনায় হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) নিকট গমন করি-

লাম। হজরতের নিকট উপনীত হইয়া আমি বলিলাম, 'আস্‌সা-লামো আলায়কা ইয়া রসুলুল্লাহ্'। তখন্ তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; আমিও কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইলাম, তিনি আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন।" ফলতঃ খালেদ বিন্ অলিদ (রাজিঃ) মুসলমান হইয়া ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া ছিলেন। হজরত ওমরের (রাজিঃ) খেলাফত সময়ে ২১ হিজরীতে তিনি শামে (শিবিকায়) মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মুতার যুদ্ধ।

স্থুরিয়ার অন্তর্গত বালকার নিকটে মুতা নামক একটী স্থান আছে। তথায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী রোমক সম্রাটের শাসনাধীনে শারহাবিল-বেন-আমর- গাচ্ছানি নামক এক জন শাসনকর্ত্তা ছিল। যখন হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) ওমায়েরের পুত্র হারেস (রাজিঃ)কে বস্রার শাসনকর্ত্তার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তখন হারেস বস্রায় গমন কালে এক দিন মুতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শারহাবিল তথায় হারেস(রাজিঃ)কে হত্যা করিয়াছিল। হজরত মোহম্মদ হারেসের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

তৎপরে হজরত মোহম্মদ (সালঃ) শারহাবিলের দমনা শিষ্যগণকে যুদ্ধসজ্জা করিতে বলিলেন। তদনুসারে ৩০০০ শিষ্য জোরফ নামক স্থানে একত্রিত হইলেন। হজরত মোহাম্মদ সমবেত শিষ্যগণের মধ্য হইতে হারেসের

পুত্র জয়দ(রাজিঃ)কে সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন এবং সকলকে বলিয়া দিলেন, "যদি জয়দ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে আবিতালেবের পুত্র জাফরকে তোমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ করিও; যদি জাফরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে রোয়াহার পুত্র আবদুল্লাকে তোমাদের নেতা করিও। অবশেষে আবদুল্লার মৃত্যুর পর তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে প্রধান পুরুষকে মনোনীত করিয়া উক্ত পদে অভিষিক্ত করিও।" ইহা বলিয়া তিনি জয়দের হস্তে পতাকা দিয়া বলিলেন, "যেখানে শারহাবিল হারেসকে হত্যা করিয়াছে, তোমরা সেইখানে গিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান কর। কিন্তু নির্দ্দোষ লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিও না ; স্ত্রীলোক, শিশুসন্তান ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে যত্নের সহিত রক্ষা করিও। তথাকার অধিবাসিদিগের গৃহ, আহারীয় দ্রব্য, ফলবান্ বৃক্ষ ও খর্জ্জুর বৃক্ষাদি ধ্বংস করিও না।"

জয়দ সৈন্য ও অধিনস্থ সেনাপতিগণ সমাভিব্যাহারে মুতাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। শারহাবিল তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহাসমারোহে যুদ্ধসজ্জা করিল এবং একদল সৈন্যকে জয়দের জন্য সম্মুখীন হইবার প্রেরণ করিল। মুসলমানগণ মায়ান নামক স্থানে উপনীত হইয়া অগণ্য শত্রুসৈন্য দেখিতে পাইলেন। শারহাবিলের ভ্রাতা সদুস ৫০ জন সৈন্য লইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু মুসলমানগণের বিক্রমে সেই যুদ্ধে সদুসের মৃত্যু হয় এবং তাহার সৈন্যগণ ভয়ে ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। শারহাবিল ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ

প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিত হন এবং অন্য এক ভ্রাতাকে সম্রাট্ হের্‌কেলের নিকট সাহায্য প্রার্থনার্থ পাঠাইয়া দেন। সম্রাট্ হেরকেলও শার-হাবিলের সাহায্যার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইল, তদ্ব্যতীত আরবদেশস্থ কাফেরগণ শারহাবিলের সঙ্গে মিলিত হইল এক্ষণে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ সৈন্যের নেতা হইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানগণ অগণ্য শত্রুসৈন্য দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া হজরেতর নিকট সাহায্যার্থ পত্র লিখিলেন।

এই সঙ্কট সময়ে রোয়াহার পুত্র আবদুল্লা (রাজিঃ) মুসলমান-গণকে আহ্বান করিয়া নানা প্রকারে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা ত অধিক সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া যুদ্ধে জয়ী হই নাই। বদরের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আমরা কয়টী লোক ছিলাম? ইস্‌লামধর্ম্মের প্রভাবেই আমরা সে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলাম। অতএব সকলে অগ্রসর হও, হয় জয়ী হইব, না হয় শহিদ (ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগ) হইব।" আবদুল্লার জ্বলন্তোৎসাহ বাক্যে মুসলমানগণ উত্তেজিত হইয়া অগণ্য শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ)বলেন, আমি মুতান যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে শত্রু সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র ও বহুমূল্য রেসমী বস্ত্রাদি দর্শন করিয়া আমার চক্ষু ঝল্‌সিয়া গিয়াছিল। তখন সাবেত-বেন-আকোয়াম-আন্‌সারি (রাজিঃ) আমাকে বলিয়া ছিলেন "আবুহোরায়রা! তুমি বদরের-যুদ্ধে উপস্থিত ছিলে না, সেখানে আমরা অল্পসংখ্যক হওয়াতেও আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে জয়ী করিয়াছিলেন।"

এক্ষণে উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হওয়াতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে জয়দ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে জাফর তৎক্ষণাৎ পতাকা ধারণপূর্ব্বক পদব্রজে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন শত্রুগণ তাঁহার দক্ষিণহস্ত কাটিয়া ফেলিল, তখন তিনি বামহস্তে পতাকা ধারণ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে সে হস্তেও শত্রুগণ আঘাত করিল, তখন তিনি সেই রক্তাক্ত হস্তে পতাকা ধরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শত্রুগণ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করায় যুদ্ধ-কার্য্যের অবসান হইল।* ওমরের পুত্র আবদুল্লা (রাজিঃ) এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "জাফরের মৃত্যুর পর দেখিলেন যে, তাঁহার দেহে তরবারির ৫০টী আঘাত লাগিয়াছে।" আবদুল্লা-বেন-রোয়াহা (রাজিঃ) তিন দিন অনাহারের পর জাফরের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া পতাকা গ্রহণ করিলেন এবং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে তিনিও শহিদ হইলেন। আবদুল্লার মৃত্যুর পর আহ্‌জনের পুত্র সাবেত (রাজিঃ) খালেদ-বিন-অলিদকে পতাকা দিবার প্রস্তাব করিলে সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে খালেদ তাহা গ্রহণ করিলেন। খালে-দের হৃদয়গ্রাহী ও উৎসাহ-সূচক বাক্যে ভয়-বিহ্বল মুসলমান সৈন্যগণ স্থিরভাব ধারণপূর্ব্বক দৃঢ়পদে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং অসাধারণ বলবিক্রমশালী খালেদ অগণ্য শত্রুসৈন্যের অভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন। যুদ্ধশেষে মহাবীর

* এব্‌নে-অল আসির, ২য় খণ্ড ১৭৮—১৮০ পৃঃ।

খালেদ বলিয়াছিলেন, "অদ্য আমার ৯ খানি তরবারি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

সেই দিন সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় উভয় পক্ষীয় সৈন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। মহাত্মা খালেদ (রাজিঃ) পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রগামী সৈন্যগণকে পশ্চাতে আর পশ্চদ্‌গামী সৈন্যগণকে অগ্রে স্থাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তদ্দর্শনে শত্রুগণ মনে করিল যে, বোধ হয় মুসলমানদিগের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য আসিয়াছে। এই বিবেচনায় তাহারা খালেদের (রাজিঃ) প্রথম আক্রমণেই যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। খালেদ মুতাস্থ একটী দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা সকলে মদীনায় প্রত্যাগমন করেন।

যে সময়ে মুতায় যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) মদীনার মস্‌জেদে বসিয়া শিষ্যগণের সমক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাগুলি বিবৃত করিতেছিলেন। যখন খালেদ (রাজিঃ) মুতায় পতাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হজরত শিষ্য-গণকে বলেন, "এইবার আল্লাহতালার একখানি তরবারি (সয়-ফোল্লা) অর্থাৎ খালেদ-বেন-অলিদ পতাকা গ্রহণ করিয়াছে, ইঁহার হস্তে শত্রুগণ পরাজিত হইবে।" সেই সময় হইতে হজরত খালেদ (রাজিঃ) "সয়ফোল্লা" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

মক্কা-বিজয়।

হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে মক্কার নিকটস্থ বনিবকর দলস্থ লোকগণ কোরেশদিগের অধীনে এবং বনি-খায়াজা দলস্থ লোক-গণ হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) অধীনে ছিল। এই দুই দল পূর্ব্বে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত। যখন হজরতের সহিত কোরেশদিগের বিবাদ হয়, তখন তাহারা উভয় দল পরস্পর যুদ্ধ ভুলিয়া গিয়া কোরেশদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং হজরতের বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর আবার তাহারা উভয় দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইল।

একদিন বনি-বকর দলস্থ এক ব্যক্তি বনি-খায়াজা দলস্থ লোকগণের নিকট হজরতের কুৎসা করিতেছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া বনি-খায়জা দলস্থ এক ব্যক্তি তাহাকে নিষেধ করে; কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত না করায়, সেই ব্যক্তি তাহাকে আঘাত করিয়াছিল। তখন বনি-বকর সম্প্রদায়স্থ বন্ধু-নাফাসা উপদলটী বনি-খাজায়া দলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং বনি-মোদ্‌লেজ্‌ দলের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল; কিন্তু তাহারা সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল। তৎপরে তাহারা কোরেশ-দিগের নিকট সাহায্য চাহিল। হজরতের চিরশত্রু আবুজহলের পুত্র আক্‌রামা, ও ওমাইয়ার পুত্র সাফোয়ান ও ওমরের পুত্র সোহেল তাহাদের পক্ষালম্বনপূর্ব্বক রাত্রে গুপ্তভাবে বনি-খায়াজা সম্প্রদায়স্থ লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ২০ জনকে নিহত করিল। প্রসিদ্ধি আছে যে হজরত মোহাম্মদ জিব্রিলের

নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। পরে বনি-খায়াজা সম্প্রদায়স্থ লোক-গণ হজরতের নিকট গিয়া কোরেশদিগের নামে অভিযোগ করিল। হজরত চারি মাস কাল পর্য্যন্ত কোরেশদিগকে কিছুই বলিলেন না।

চারি মাস অতীত হইয়া গেলে কোরেশগণ জানিতে পারিল যে, হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সন্ধিভঙ্গের বিষয় অবগত হইয়াছেন। তখন তাহারা পুনঃ সন্ধি স্থাপনের জন্য আবুসোফিয়ানকে মদীনায় হজরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। আবুসোফিয়ান মদিনায় আসিয়া প্রথমে তাহার কন্যা ওম্মে-হাবিয়ার (রাঃ-আঃ) গৃহে গিয়া হজরতের আসনে উপবেশন করিতে গেল, ওম্মে-হাবিয়া (রাঃ-আঃ) বলিলেন, "পিতঃ! আপনি পবিত্র পুরুষের আসনে বসিবেন না।" আবু-সোফিয়ান ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া কন্যার গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং হজরতের নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল, কিন্তু হজরত তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। তখন সে তথা হইতে হজরত আবুবকর (রাজিঃ), হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত ওমর (রাজিঃ) এর নিকট গেল, কিন্তু কোন স্থানেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। অবশেষে সে বিবি ফাতেমার (রাঃ-আঃ) নিকট গিয়া বলিল, "তোমার ভগিনী জয়নাব (রাঃ-আঃ) যেমন আবুল আসকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেইরূপ তুমি আমার পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক হজরতের নিকট গিয়া আমাদের সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন কর।" বিবি ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, "হজরতের উপর আমাদের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি স্বীয়

অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন।” এতৎশ্রবণে আবু-সোফিয়ান হাতশ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এদিকে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) কোরেশদিগের বিপক্ষে শিষ্যগণকে যুদ্ধসজ্জা করিতে বলিলেন। তদনুসারে আস্‌লাম, গেফার, জাহনিয়া আস্‌জা ও সলিম প্রভৃতি দলস্থ মুসলমানগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) এবনে-ওম্মে-মকতুম (রাজিঃ) কে, কেহ কেহ বলেন, আবুজার গাফ্‌ফারি (রাজিঃ) কে মদীনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া, ১০ই রমজান বুধবার মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন। এবার তাঁহার সঙ্গে ১০,০০০, কেহ বলেন ১২,০০০ সৈন্য গিয়াছিল। তিনি সৈন্যগণসহ “কাদিদ” নামক স্থানে উপনীত হইয়া শিষ্য-গণকে রোজা (১) ভঙ্গ করিতে বলেন,—কারণ যুদ্ধকালে রোজা ভাঙ্গিলে পাপ হয় না।

তৎপরে তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে “সাফোয়া” নামক স্থানে * মক্কা নগরস্থ বহুসংখ্যক লোক হজরতের নিকট আসিয়া পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে হজরতের পিতৃব্য আব্বাস, (রাজিঃ) হারেসের পুত্র আবুসোফিয়ান ও ওমাইয়ার পুত্র আবদুল্লাও ছিলেন। আব্বাস

(১) সূর্য্যোদয়ের প্রায় ১ঘণ্টা পূর্ব্ব অর্থাৎ সোবে-সাদেকের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোন জিনিষ আহার, পান, কিম্বা স্ত্রীসহবাস করা ইত্যাদি কাজ হইতে বিরত থাকার নাম “রোজা”।

* কেহ বলেন, “জাহাকা” নামক স্থানে, কেহ বলেন, “জোলহলিফা” নামক স্থানে।

(রাজিঃ) হজরতের নিকট আসিলে হজরত বলিলেন, "আপনি যেমন শেষ উপনিবেশকারী, আমিও সেইরূপ শেষধর্ম্ম প্রচারক।" হজরত আব্বাস (রাজিঃ) সপরিবারে মুসলমান হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারাদি মদীনায় পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে হজরতের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) মক্কার ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী "মাররোজাহারাণ" নামক স্থানে উপনীত হইয়া শিবির স্থাপন করতঃ রাত্রিতে শিষ্যগণকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে বলেন। এক্ষণে এই স্থানটী "ওয়াদি-ফাতেমা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মহাত্মা আব্বাস (রাজিঃ) যদিও হজরতের সঙ্গে ছিলেন, তথাপিও তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, যদি কোরেশগণ হজরতের নিকট আত্ম-সমর্পণ না করিয়া বিদ্রোহাচরণ করে, তাহা হইলে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইবে। তজ্জন্য তিনি সেই রাত্রে একটী অশ্বতর-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক শিবিরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সেই সময়ে হজরতের প্রধান শত্রু আবু সোফিয়ান, হাকিম-বেন-খারাম ও বোদেল-বেন-আরকাকে সঙ্গে লইয়া হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) আসিতেছেন কি না তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিল। তাহারা মাররোজাহারাণে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মহাত্মা আব্বাস (রাজিঃ)ও তাহাদের অশ্বের পদশব্দ শ্রবণে অগ্রসর হইলেন; আবুসোফিয়ানের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আবু-সোফিয়ানকে স্বীয় অশ্বতরোপরি লইয়া হজরত ওমরের (রাজিঃ)

নিকট গেলেন এবং হাকিম ও বোদেল মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হজরত ওমর (রাজিঃ) আবুসোফিয়ান কে দেখিয়াই হজরতের নিকট গিয়া বলিলেন, "আবুসোফিয়ান বন্দী হইয়াছে, তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।" হজরত তাঁহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। পরে মহাত্মা আব্বাস (রাজিঃ) আবুসোফিয়ানকে লইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। হজরত মোহাম্মদ, পিতৃব্য হজরত আব্বাস (রাজিঃ) কে বলিলেন, "অদ্য রাত্রে আবু-সোফিয়ানকে আপনার শিবিরে রাখুন। আগামী কল্য প্রাতে আমার নিকট আনিবেন।" পরদিন প্রাতে যখন আবুসোফিয়ান হজরতের নিকট আনীত হইল, তখন হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) আবুসোফিয়ানকে বলিলেন, "ভাল আবুসোফিয়ান! আজিও কি সে সময় উপস্থিত হয় নাই যে, তুমি একমাত্র অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার কর।" আবুসোফিয়ান বলিল, "হাঁ, আমি একমাত্র আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার করি।" হজরত পুনঃ বলিলেন, "আমাকে কি খোদাতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করিবার সময় আজিও উপস্থিত হয় নাই?" আবু-সোফিয়ান বলিল, "প্রিয়তম মোহাম্মদ (সালঃ)। তদ্বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে।" সেই সময়ে মহাত্মা আব্বাস (রাজিঃ) আবুসোফিয়ানের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মের উপদেশসমূহ বিশেষরূপে বিবৃত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং হজরতের ব্যবহারে মোহিত হইলেন।

আবুসোফিয়ান পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) মহাত্মা আব্বাস(রাজিঃ)কে বলিলেন, "আপনি আবুসোফিয়ানকে সঙ্গে লইয়া মক্কাগমন-পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকুন, মুসলমান সৈন্যগণ কিরূপে নগর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা আপনি তাঁহাকে দর্শন করান।" তদনুসারে হজরত আব্বাস (রাজিঃ) আবুসোফিয়ানকে সঙ্গে লইয়া মক্কা প্রবেশের পথপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথমে মহাবীর খালেদ বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ) একদল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। সৈন্যগণ আবুসোফিয়ানের সম্মুখে উপনীত হইয়া উচ্চৈস্বরে তক্‌বির (আল্লাহো আকবার) পড়িতে লাগিলেন। তৎপরে হজরত জোবায়েরল (রাজিঃ) ৫০০ বীরপুরুষ সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। এইরূপে বিভিন্ন দলস্থ দলপতিগণ সৈন্য লইয়া এক এক করিয়া আবুসোফিয়ানের সম্মুখভাগ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা আব্বাস (রাজিঃ) প্রত্যেক দলের দলপতিগণের নাম এক এক করিয়া আবু-শফিয়ানের নিকট বলিতে লাগিলেন। অবশেষে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) কাসোয়া উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক ৫০০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়া হজরত আবুবকর (রাজিঃ) ও সায়েদ-বেন-হোজায়েরের (রাজিঃ) সহিত কথোপকথন করিতে করিতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবুসোফিয়ান এই সকল দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন এবং মহাত্মা আব্বাস (রাজিঃ) কে বলিতে লাগিলেন, "তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র বাস্তবিকই ক্ষমতাশালী এবং তাঁহার রাজ্যও সুদৃঢ়।" তখন হজরত আব্বাস আবুসোফিয়ানকে বলিলেন, "আবু-

সোফিয়ান! তোমার ভুল হইতেছে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের এ পার্থিবরাজ্য নয় ইহা তাঁহার ধর্ম্ম রাজ্য।"

হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) "মাররোজাহারণ" নামক স্থান হইতে মক্কা প্রবেশ কালে প্রথম সৈন্যদলকে নগরের সম্মুখভাগস্থ পথ দিয়া যাইতে বলিলেন এবং অন্যান্য সৈন্যদিগকে নগরের চতুর্দ্দিক্ দিয়া প্রবেশ করিতে বলিলেন। হজরত জোবায়েরের (রাজিঃ) সঙ্গে মহাজেরদিগকে দিয়া বলিলেন, "জোবায়ের! তুমি 'কাদা' নামক গিরিবর্ত্ম দিয়া 'হজুন' নামক স্থানে গিয়া শিবির স্থাপন পূর্ব্বক আমার অপেক্ষা করিও।" এবং আবু ওবায়েদা (রাজিঃ) কে বলিলেন, "তুমি 'বতনেওয়াদির' পথ দিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ কর" এবং খালেদ বিন-অলিদ (রাজিঃ) কে মক্কার নিম্নভাগস্থ 'কোদা' নামক স্থানে গমন করিয়া পতাকা উড্ডীন করিতে বলিলেন। "কিন্তু কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ করিও না, যদি কেহ তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে আত্মরক্ষা করিও।" এই উপদেশটি তিনি সকলকে বিশেষরূপে বলিয়া দিলেন এবং সর্ব্বশেষে তিনি নিজেই কাসোয়া উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক মক্কায় প্রবেশ করিলেন।

কোরেশদিগের মধ্যে আবুজহলের পুত্র আক্‌রমা, ওমাইয়ার পুত্র সাফোয়ান ও ওমরের পুত্র সোহেল, বনি হারেস ও বনি হোজায়েল দলস্থ লোকগুলিকে সঙ্গে লইয়া মহাবীর খালেদের (রাজিঃ) সম্মুখীন হইল এবং যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। 'খান্দামা' নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। কোরেশগণ ক্ষণকাল

যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিল। মহাবীর খালেদ (রাজিঃ) 'হাজাওয়া' (আজাওয়া) নামক স্থান পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ২০ জন কোরেশ ও দুইজন মুসলমান হত হয়। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) খালেদের (রাজিঃ) যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি খালেদকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন সে যুদ্ধ করিল? শত্রুগণ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কেবল আত্মরক্ষা করিলেই পারিত।" তৎপরে তিনি খালেদ (রাজিঃ) কে নরহত্যা করিতে নিষেধ করিলেন। সেই সময়ে শত্রুগণ কেহ পাহাড়ে, কেহ বা স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিল, মুসলমান সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করিলেন।

প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) মক্কা নগরে প্রবেশ করিয়া কাবার নিকটে আসিয়া তক্‌বির পড়িতে লাগিলেন, শিষ্যগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তক্‌বির পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে মক্কানগরী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর তিনি কাবায় স্থাপিত ৩৬০টী দেবমূর্ত্তি হইতে কাবাকে মুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন।* ইতিবৃত্তলেখকগণ বলেন যে, হজরত একখানি যষ্টী লইয়া দেবমূর্ত্তিগুলির সম্মুখে গেলেন এবং সেই যষ্টির অগ্রভাগের আঘাতে দেবমূর্ত্তিগুলি ভূপতিত হইতে লাগিল। হজরত সেই সময়ে "সত্য উপস্থিত হইয়াছে, অসত্য লোপ পাইয়াছে, নিশ্চয়ই

অসত্য লুপ্ত হয়" (কো ১৭শ সুরা, ৮১ আয়েত)* এই আয়েত পড়িতে লাগিলে (১)। এব্‌নে আব্বাস (রাজিঃ) বলেন, "যে দিন হজরত মোহাম্মদ মক্কা জয় করেন, সেই দিন তিনি ৩৬০টী দেবমূর্ত্তি ,ধ্বংস করিয়াছিলেন। আরববাসিগণ ঐ সকল দেবমূর্ত্তির পূজা করিত এবং তাহাদের নিকট পশু বলি দিত।"

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) ক্রমেঃ ক্রমে হবল, নায়েলা, এসাফ প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিলেন। এসাফ ও নায়েঁলা মূর্ত্তি বণি জরহাম বংশের দুইজন লোকের প্রতিমূর্ত্তি। হবল ধ্বংস হইলে জোবায়ের (রাজিঃ) আবু সোফিয়ানকে বলেন, "আবুসোফিয়ান! তোমরাই না ওহোদ যুদ্ধক্ষেত্রে হবল দেবের কত প্রশংসা করিয়াছিলে?" আবু সোফিয়ান বলিলেন, আমাকে আর তিরস্কার করিও না, যদি হজরত মোহাম্মদের আল্লাহতায়ালা ভিন্ন অপর আল্লাহতায়ালা থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্য আমাদিগকে সাহায্য করিতেন।"

এব্‌নে সায়াদ (রাজিঃ) বলেন, "তালহার পুত্র ওস্‌মান বলিয়াছেন যে, ইস্‌লামধর্ম্ম আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে সোম ও বৃহস্পতিবার ভিন্ন কাবার দ্বার খোলা হইত না। এক দিন হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) আমাকে নির্দ্ধারিত দিন ব্যতীত অন্য এক দিন কাবার দ্বার খুলিতে বলায় আমি তাহা খুলি

* এব নে-অল্‌-আসির, ২য় খণ্ড, ১৯২ পৃঃ।
(১) সিরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃঃ।

নাই, অধিকন্তু আমি তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে বলিয়াছিলেন, ওস্‌মান! এমন একদিন উপস্থিত হইবে, যে দিন তুমি কাবার কুঞ্চিকা আমার হস্তে দেখিতে পাইবে এবং আমি ইচ্ছানুসারে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উক্ত কুঞ্চিকা প্রদান করিব।” অনন্তর মক্কা জয়ের পর হজরত আমাকে কাবার কুঞ্চিকা আনিতে বলেন। আমি কুঞ্চিকা আনিলে হজরত তাহা গ্রহণপূর্ব্বক কাবার দ্বার খুলিয়া পুনরায় উহা আমার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, “যদি অন্য কেহ বলপূর্ব্বক এই কুঞ্চিকা গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ইহা চিরকাল তোমার বংশধরের হস্তে থাকিবে। হে ওস্‌মান! আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, একদিন এই কুঞ্চিকা আমার হস্তে আসিবে, তখন আমি ইহা যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিব।” তৎশ্রবণে ওস্‌মান (রাজিঃ) হজরতকে বলিয়াছিলেন, “আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, আপনি বাস্তবিকই ধর্ম্ম-প্রচারক।” ওস্‌মানের পুত্রাদি ছিল না, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সায়বা উক্ত কুঞ্চিকা গ্রহণ করেন এবং অদ্যাবধি ঐ কুঞ্চিকা সায়বা বংশীয়দের হস্তেই আছে।

প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) ওস্‌মান (রাজিঃ) ও বেলাল (রাজিঃ) কে লইয়া কাবার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ওস্‌মানকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতে বলিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাবার মধ্যে থাকিয়া

প্রার্থনা করিলেন। পরে দ্বারদেশে আসিয়াও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোরেশবংশীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিল। হজরত তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে কোরেশবংশীগণ! আমি তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব, তৎসম্বন্ধে তোমরা কিরূপ মনে করিতেছ?" তাহারা বলিল, "হে মহানুভব ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি আমাদের উপর দয়ালু ব্যবহার করিবেন।"* তাবারি বলেন যে, হজরত মোহাম্মদ ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "হজরত ইয়ুসোপ যেমন তাঁহার ভ্রাতাদিগের প্রতি উপদেশ দিয়াছিলেন, আমিও তোমাদের প্রতি তদ্রূপ উপদেশ দিব। অদ্য আমি তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না, আল্লাহতায়ালা তোমাদিকে ক্ষমা করিবেন, কারণ তিনি পরম দয়ালু।" † তৎপরে তিনি একটী নীতিগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন; কোরেশগণ যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল এবং যে জাত্যভিমান করিত, তাহার দোষ তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "মানবজাতি আদম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার আদম মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। অতএব মানব জাতির মধ্যে সকলেই সমান, কাহার সহিত কাহারও প্রভেদ নাই। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মভীরু, তাহারাই সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র। কোরআন শরিফে উক্ত হইয়াছে, 'হে লোক সকল। নিশ্চয়

* এবনে হেশাম, ৮২১ পৃঃ; তাবারী, ৩য় খণ্ড—১৩৪ পৃঃ।

† কোরআন শরিফ, ১২শ সুরা—৯২ আয়েত।

আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে সৃজন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বহু সম্প্রদায়ে ও বহু পরিবারে বিভক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনিয়া লও; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মভীরু, তাহারা খোদাতায়ালার নিকট গৌরবান্বিত, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা জ্ঞানী ও তত্বজ্ঞ'।" হজরতের সারগর্ভ উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া কোরেশগণ দলে দলে তাঁহার নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দিন প্রচারান্তে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) আবিতালেবের কন্যা ওম্মেহানির গৃহে গিয়া স্নান করিলেন এবং আট রেকাত নফল নামাজ পড়িলেন।

জোহরের (অপরাহ্নিক) নামাজের সময় উপস্থিত হইলে হজরত মোহাম্মদ বেলাল (রাজিঃ)কে কাবার ছাদোপরি উঠিয়া আজান দিতে বলিলেন। আজান শ্রবণ করিয়া কাফেরদিগের মধ্যে ওসায়েদের পুত্র খালেদ, হেসামের পুত্র হারেস ও আসের পুত্র হকম প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি বেলালের প্রতি নানা অকথ্য-ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। তখন হজরত মোহাম্মদ, হজরত জেব্রিলের নিকট ইহার সংবাদ পাইয়া খালেদ, হারেস ও হকমকে ডাকাইয়া ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন যে, কোরআন শরিফে উক্ত হইয়াছে "এবং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার দিকে লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছে, এবং বলিয়াছে যে, নিশ্চয় আমি মুসলমানদিগের একজন, বাক্যানুসারে তাহা অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ?" তৎপরে হারেস ও সায়েদের পুত্র এতাব ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে।

সেই দিন হজরত মোহাম্মদ সাফা পাহাড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক একটী প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিলেন। সেই সময় হজরত ওমর-বেন-খেত্তাব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সেই দিনের দৃশ্য কি সুন্দর! এরূপ পবিত্র সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে কেহ কখনও দর্শন করেন নাই। সেই শুভদিনে লোক সকল দলে দলে আসিয়া হজরতের নিকট ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল এবং সকলেই তাঁহার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, "তাহারা আল্লাহতায়ালা ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিবে না; তাহারা পরদার গমন ও শিশু সন্তান হত্যা প্রভৃতি অবৈধ কার্য্য সকল করিবে না, কখন মিথ্যা কথা বলিবে না এবং স্ত্রীলোকদিগের নিন্দা করিবে না।" * কোরআন শরিফে উক্ত হইয়াছে, যখন আল্লাহতায়ালার সাহায্য উপস্থিত হইবে এবং জয় (মক্কা) হইবে, তখন তুমি লোক সকলকে দলে দলে পবিত্র ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে দেখিবে, অতএব আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা কর, নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকারী।" এক্ষণে কোরআন শরিফের সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। †

হজরত মক্কা নগরীস্থ লোকদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া, মদীনাবাসিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "হজরত মোহাম্মদ মক্কার লোকদিগের প্রতি দয়ালু ব্যবহার

* এবনে অল আসির, ২য় খণ্ড—১৯২ পৃঃ।

† কোরআন শরিফ, সুরা নসর। ক্যাশ্যাকের মেশরের সংস্করণ ২য় খণ্ড ৪৯০—৪৯১ পৃঃ।

করিতেছেন এবং আপন বংশীয় লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন, বোধ হয় আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, কোরেশগণ হজরতের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহাতে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে উপযুক্ত রূপ দণ্ড দিবেন কিংবা হত্যা করিবেন।" কিন্তু সরলচেতা মদীনাবাসিগণ বুঝিতে পারেন নাই যে, প্রতিহিংসা লওয়া পার্থিব রাজার কার্য্য হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) পৃথিবীতে কেবল শান্তি স্থাপন করিতে এবং পথভ্রান্তদিগকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন। ফলতঃ হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হজরত জেব্রিলের নিকট মদীনা-বাসিগণের কথোপকথনের বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা তাহা স্বীকার করিলে, হজরত তাঁহাদিগকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন।

মহামান্য হজরত মোহাম্মদ দ্বিতীয় দিনে একটী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি মক্কা যে অতি পবিত্র নগরী, তাহার বিষয় লোকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়ে মক্কাবাসী অপরাপর লোকগণ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ কখন কাহারও সেজদা গ্রহণ কিংবা কাহারও উপর আধিপত্য করিতেন না। এই সময়ে একজন লোক ভয়-বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার নিকট আসিতেছিল, হজরত তাহা দেখিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, "কেন

তুমি কাঁপিতেছ? কি জন্যই বা ভয়-বিহ্বল হইয়াছ? অমি ত রাজা নহি।" এই দিবস আবুসোফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা—যিনি ওহোদক্ষেত্রে মহাবীর হামজা-বধের মূলীভূত কারণ ছিলেন, তিনি ও হজরতের প্রধান শত্রু আবদুল্লা এবং আকরামাও ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

হজরত মোহাম্মদ মক্কায় অবস্থান কালে মহাবীর খালেদ (রাজিঃ)কে নখল নামক স্থানের 'ওজ্জা' দেবমূর্ত্তিকে ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন। মহাবীর খালেদ (রাজিঃ) ওজ্জা ধ্বংস করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মক্কার তিন মাইল দূরস্থিত হোজল বংশের উপাস্য সোয়া দেবমূর্ত্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য আমর (রাজিঃ) প্রেরিত হন। আমর সোয়া ধ্বংস করিলে তাহার পুরোহিত ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে। তৎপরে হজরতের আদেশে জয়দের পুত্র সায়াদ (রাজিঃ) কর্ত্তৃক মোস্‌লল্ নামক স্থানস্থ খজরজ, আওস ও গচ্ছান বংশীয় লোকগণের উপাস্য মনাৎ দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট হয়।

অতঃপর হজরত মোহাম্মদ মক্কানগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মরু—প্রদেশবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিবার জন্য শিষ্যগণকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদিগকে নিম্ন-লিখিত রূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, "শান্তি ও ভ্রাতৃভাব প্রচার করিবে, যখন কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে, তখন তোমরা কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিবে, কোন অবস্থাতেই অগ্র-আক্রমণকারী হইও না।" তাঁহার উপদেশানুসারে সর্ব্বত্র কার্য্য

হইতে লাগিল। কেবল মহাবীর খালেদ-বেন-অলিদ (রাজিঃ) একস্থানে তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন।

খালেদ-বেন-অলিদ (রাজিঃ) বনি জজিমা সম্প্রদায়ের মধ্যে ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। তিনি তাহাদিগকে বিদ্রোহী সম্প্রদায় মনে করিয়া তাহাদের কতিপয় লোককে হত্যা করিতে আরম্ভ করেন, তখন অন্যান্য মুসলমানেরা তাহাতে বাধা প্রদান করেন। হজরত মোহাম্মদ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং এই বলিয়া খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করেন, "হে খোদাতায়ালা! খালেদ যাহা করিয়াছে, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।" তিনি তৎক্ষণাৎ হজরত আলী (রাজিঃ)কে প্রচুর অর্থসহ উক্ত সম্প্রদায়ের ক্ষতি-পূরণ ও সন্তোষবিধানার্থ প্রেরণ করেন। হজরত আলী (রাজিঃ) তাহাদের নিকট উপনীত হইয়া মহাবীর খালেদ (রাজিঃ) যাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাদের সামাজিক অবস্থাদের বিষয় অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উপযুক্তরূপ অর্থ প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট অর্থগুলি হত্যাকারিদিগের আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) এইরূপ উদার ও দয়ালু ব্যবহারে উক্ত সম্প্রদায়স্থ প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে হজরত

মোহাম্মদ তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।*

২০শে রমজান তারিখে মক্কা বিজয় কার্য্য হয়। হজরত ৬ই শওয়াল পর্য্যন্ত মক্কায় ছিলেন, সেই সময়ে তিনি হাওয়াজেন ও সাকিফদলস্থ লোকদিগের বিপক্ষে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন।

হোনেনের যুদ্ধ।

হোনেন একটী প্রান্তরের নাম, এই প্রান্তরটী মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এইস্থানে হাওয়াজেন, সাকিফ প্রভৃতি ভ্রমণশীল সম্প্রদায় বাস করিত এবং ইহার নিকটে বনি সায়াদ বংশীয় লোকগণের বাসস্থান ছিল; হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) শিশুকালে উক্ত বনি সায়াদ বংশীয়া হালিমা বিবির নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। হোনেন বাসিগণ অসাধারণ বলবান্ ও অতুলৈশ্বর্য্যশালী ছিল এবং তায়েফের ন্যায় ইহাদেরও নগরটী সুদৃঢ় দুর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ ঘোর পৌত্তলিক ছিল, তাহারা আরবের প্রসিদ্ধ লাৎ দেবীর পূজা করিত। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মক্কা বিজিত হইলে হাওয়াজেন ও সাকিফ সম্প্রদায় পরস্পর মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল, "মক্কার অধিবাসিগণ যুদ্ধবিদ্যায়

---

* এবনে হেশাম, ৮৩৪, ৮৩৫ পৃঃ; এবনে অল আসির, ২য় খণ্ড—১৯৫ পৃঃ; তাবারী, ৩য় খণ্ড ১৪১ পৃঃ।

সম্যক্ পারদর্শী নয় বলিয়া, মোহাম্মদ (সাঃ) তাহাদিগকে জয় করিয়াছে, যদি আমাদের সহিত মুসলমানগণের যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহারা আমাদের বীরত্ব দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইবে। অতএব চল, আমরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া আকস্মিক ভাবে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করি, তাহা হইলে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে পারিব।" পরামর্শানুসারে হাওয়াজেন দলপতি মালেক-বেন-আওফ ও সাকিফ দলপতি কানানা-বেন-আবু-ফিয়ালিল্ যুদ্ধ-সজ্জা করিল এবং নিকটস্থ অন্যান্য দলস্থ লোকগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইল, ইহাতে তাহাদের সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৪০০০ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে মালেক সৈন্যদিগকে বলিয়া দিল যে, তোমরা সকলেই স্ব স্ব পরিবার ও পশ্বাদিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে চল। ভ্রমণশীল সৈন্যগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ সহকারে স্ব স্ব পরিবার ও পশ্বাদি সঙ্গে লইল। সেই যুদ্ধসভায় বহুদর্শী বিজ্ঞ দুরীদ-বেন-সেম্মাঃ উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১২০ বৎসর, মতান্তরে ১৬০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি মালেককে বলেন, "তোমরা সপরিবারে পশ্বাদিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিও না, কেননা যদি পরাজিত হও, তাহা হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইবে।" কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তৎপরে তিনি হাওয়াজেন দলস্থ লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হাওয়াজেন বংশীগণ! তোমরা মালেকের পরামর্শানুযায়ী স্ব স্ব পরিবার ও পশ্বাদি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে উদ্যত হইয়াছ। শেষে

দেখিতে পাইবে যে, মালেক তোমাদের স্ত্রী পুত্র ও দ্রব্যাদি শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়া নিজে পলায়ন করিবে।"

দুরীদের কথা শ্রবণ করিয়া হাওয়াজেন দলস্থ লোকগণ ভীত হইল এবং যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকৃত হইল। মালেক সৈন্যগণের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিল, "যদি তোমরা আমার প্রস্তাবে অনুমোদন না কর, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।" সৈন্যগণ মালেকের কথা শুনিয়া ভীত হইল, কেননা যদি মালেক আত্মহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাদের দলপতি হইবার আর উপযুক্ত লোক কোন নাই। তজ্জন্য সকলে মালেকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল এবং মক্কার ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণস্থ হোনেন উপত্যকায় গিয়া শিবির স্থাপন করিল। এই যুদ্ধের অপর এক নাম "হাওয়াজেনের যুদ্ধ।"

হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হাওয়াজেন ও সাকিফ দলস্থ লোকদিগের যুদ্ধসজ্জার সংবাদ পাইয়া ৭ই শওয়াল শনিবারে মক্কা হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার ১২০০০ সৈন্য গিয়াছিল। সৈন্যগণের মধ্যে ২০০০ মক্কার আর ১০০০০ মদীনার অধিবাসী ছিলেন। এই যুদ্ধকালে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) সায়াদের পুত্র এতাব (রাজিঃ) কে মক্কায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

১০ই শওয়াল মঙ্গলবার হজরত সসৈন্যে হোনেন-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে একজন মুসলমান সহর্ষে

বলিয়াছিলেন, "আমাদের সৈন্যবল অধিক, আমরা কখনই বিপক্ষ সৈন্য দ্বারা পরাজিত হইব না।" হজরত ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন; কারণ পূর্ব্বে একবার এইরূপ অহঙ্কার করায় তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এই যুদ্ধের প্রথমেই মুসলমানগণ পরাজিত হন। কোরআন শরিফের ৯ম সুরার ২৫ আয়েতে উক্ত হইয়াছে "সত্য সত্যই আল্লাহ্ তায়ালা নানা স্থানে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং হোনেনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের লোকাধিক্য তোমাদিগকে প্রফুল্ল করিয়াছিল, তখন তাহা তোমাদিগের কিছুই উপকার করে নাই। বিস্তৃতি সত্বেও ভূমি তোমাদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, তৎপরে তোমরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলে।"

মুসলমানগণ হোনেনে আসিবার পূর্ব্বেই মালেক তথায় আসিয়া স্বকীয় সৈন্যগণকে বলিয়াছিল, "তোমরা জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাক, মুসলমানগণ আসিলেই অতর্কিতভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে।" তাহার সৈন্যগণ তদনুসারে জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিল। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) আপনার সৈন্যগুলিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিলেই শত্রুগণ তাঁহাদের উপর অবিরল ধারায় তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর খালেদ-বেন-অলিদ (রাজিঃ) বনি সলিম দলস্থ লোকগুলিকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহাদের গাত্রে বর্ম্ম ছিল না বলিয়া তাঁহারা আঘাত প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। খালেদের (রাজিঃ) সঙ্গে ৮০ জন অল্পবিশ্বাসী মুসলমান ছিল, তাহারা শত্রুদিগের তীরের আঘাত প্রাপ্ত হইতে না হইতেই পলায়ন করিল এবং তৎসঙ্গে অপরাপর সৈন্যগণও পলায়ন করিল। কেবল মাত্র হজরতের নিকট কতকগুলি সৈন্য রহিল। সেই সময়ে হজরত অগ্রসর হইয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, "আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে জয়ী করিবেন, তোমরা অগ্রসর হও।" যাহারা অল্পবিশ্বাসী ছিল, তাহারা হজরতের কথা শুনিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার উপহাস করিল। অবশেষে হজরত মোহাম্মদ আব্বাস (রাজিঃ) কে বলিলেন, "আপনি শিষ্যগণকে আহ্বান করুন।" আব্বাস (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া মুসলমানগণকে বলিলেন, "হে আনসারগণ, হে মহাজেরগণ! হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তোমরা সকলে তাঁহার নিকট আগমন কর।" মুসলমানগণ আব্বাস (রাজিঃ) এর আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে হজরতের চতুর্দ্দিকে আসিয়া সমবেত হইলেন। হজরত তাঁহাদিগকে পুনঃ যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। আবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময়ে হজরত স্বয়ং শত্রুগণের দিকে এক মুষ্টি বালুকা নিক্ষেপ করিলেন এবং শিষ্যদিগকে সবেগে আক্রমণ করিতে বলিলেন। তাহাতে শত্রুগণ পরাজিত হইল।* ইহার বিষয়

* এবনে হেশাম, ৮৪৬ পৃঃ; এবনে অল্‌-আসির, ২য় খণ্ড—২০০, ২০১ পৃঃ।

কোরআন শরিফের ৯ম সুরার ২৬ আয়েতে এইরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছে, "অতঃপর খোদাতায়ালা তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাসিদিগের প্রতি আপনার সান্ত্বনা প্রেরণ করিলেন এবং সৈন্য পাঠাইলেন—তোমরা তাহা দেখ নাই এবং কাফের-দিগকে শাস্তিদান করিলেন, খোদাদ্রোহিদিগের ইহাই বিনিময়।" এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় ৭০ জন আর মুসলমানদিগের ৪ জন লোক হত হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসানে শত্রুগণের মধ্যে অনেক লোক মুসলমান হইল; এবং অবশিষ্ট শত্রুগণ পলায়ন করিল। তাহাদের মধ্যে মালেক এক দল সৈন্য সঙ্গে লইয়া তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) এই ঘটনার ৮৷৯ বৎসর পূর্ব্বে একবার এই তায়েফে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে তথাকার অধিবাসি-গণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে আবমাননা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। একদল শত্রু তথাকার 'বতনে নখলা' নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট শত্রুরা 'আওতাস' উপত্যকোপরি স্ব স্ব দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে গমন করিল। যুদ্ধকালে একস্থানে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) তথায় গিয়া উপস্থিত হন এবং দেখেন যে, খালেদ (রাজিঃ) একটী স্ত্রীলোককে বধ করিয়াছেন। হজরত তাহা দর্শন করিয়া দুঃখিত হইলেন এবং মহাবীর খালেদ (রাজিঃ) কে বলিলেন, "যুদ্ধের সময় স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা বধ করা নিষিদ্ধ।" তৎপরে

তিনি ঐ হত্যাকাণ্ডের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অনন্তর হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) আবু আমের অনসারি (রাজিঃ) কে আওতাস উপত্যকোপরি শত্রুদিগকে আক্রমণার্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু তথায় আবু আমের (রাজিঃ) শত্রুগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আবু মুসা (রাজিঃ) সৈন্যাধক্ষ্যপদে অভিষিক্ত হন। আবু মুসা (রাজিঃ) অসমসাহসিকতা সহকারে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। জোবের-বেন-আওয়াম (রাজিঃ) এই যুদ্ধক্ষেত্রে ডুরীদ-বেন-সেমমাকে বধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, আবু মুসা (রাজিঃ) বহুসংখ্যক বন্দী, অসংখ্য পশু ও দ্রব্যাদি লইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) জয়লব্ধ দ্রব্যগুলি 'আওতাসের' নিকটস্থ 'জেয়েরাণা' নামক স্থানে একত্রিত করিতে বলিলেন।

এই যুদ্ধে সায়াদ বংশীয় কতিপয় পুরুষ ও রমণী মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হারেসের কন্যা শীমা অন্যতম। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে উক্ত হারেসের স্ত্রীর নাম হালিমা বিবী। ইনি হজরত মহম্মদ (সালঃ) কে শিশুকালে ধাত্রীরূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একজন মুসলমান শীমাকে কষ্ট দেওয়ায় সে বলিয়াছিল, "আমি তোমাদের হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) ভগিনী।" তদনন্তর হজরতের নিকট আনীত হইলে সে হজরতকে বলিলেন,

"হালিমার সম্বন্ধে আমি আপনার ভগিনী।" হজরত বলিলেন, "তুমি যে হালিমার কন্যা, তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব?" তখন সে হজরতকে শিশুকালের কয়েকটী চিহ্ন দেখাইল, সেই সকল চিহ্ন দর্শন করিয়া হজরত তাহাকে বসিবার জন্য নিজের চাদর বিছাইয়া দিলেন, শীমা তাহাতে উপবেশন করিলেন। পরে হজরত তাহার নিকট হালিমা বিবী ও তাঁহার পরিবারস্থ লোকগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শীমা বলিলেন, "মাতা হালিমা প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছে।" হজরত তৎশ্রবণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার নিকট থাকিতে পার, আর যদি বাসস্থানে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যাইতে পার।" শীমা স্বীয় বাসস্থানে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করাতে, হজরত তাহাকে এক জন দাসী, তিন জন চাকর ও কতকগুলি মেষ দিয়া বিদায় দিলেন।

তৎপরে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) তায়েফে মালেককে আক্রমণ করেন। কয়েকদিন দুর্গ অবরুদ্ধ করার পর তিনি মনে করিলেন যে, তায়েফবাসিগণ যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহারা শীঘ্রই অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। তদনন্তর তিনি তায়েফ হইতে চলিয়া আসিলেন এবং জেয়েরানা নামক স্থানে আসিয়া সাবেতের পুত্র জয়দ (রাজিঃ)কে বলিলেন, "জয়দ! এখানে যত মুসলমান উপস্থিত আছে, তুমি তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত কর।" জয়দ (রাজিঃ) তালিকা প্রস্তুত করিলেন। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) জয়লব্ধ ৬০০০ বন্দী,

২৪০০০ উষ্ট্র, ৪০০০০ মেষ ও ৪০০০ অয়কিয়া রৌপ্য সমবেত মুসলমানগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে বসিলেন,। প্রত্যেক অশ্বারোহীকে ১২টী উষ্ট্র ও ১২০টী মেষ এবং প্রত্যেক পদাতিক সৈন্যকে ৪টী উষ্ট্র ও ৪০টী মেষ দিলেন। তখন আবু-সোফিয়ান হজরতকে বলিলেন, "হে প্রেরিত মহাপুরুষ! আপনি এক্ষণে এই সমুদয় দ্রব্যের অধিকারী, অন্যান্য লোক অপেক্ষা আমি কি কিছু অধিক দ্রব্য পাইব না?" হজরত তাহা শুনিয়া বেলালকে বলিলেন, "বেলাল! আবুসোফিয়ানকে ১০০ উষ্ট্র ও ৪০ অয়কিয়া রৌপ্য দাও।" বেলাল আদেশ পালন করিলেন। পরে আবু-সোফিয়ান স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র এজিদ * কনিষ্ঠ পুত্র মায়াভিয়া ও কোরেশ বংশীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান লোকগণের প্রত্যেকের জন্য ১০০ উষ্ট্র ও ৪০ অয়কিয়া রৌপ্য লইলেন, অধিকিন্তু মক্কা-বাসী নূতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলেন। মক্কাবাসিগণ হজরতের উদারভাব দর্শন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু আন্‌সারগণ যৎসামান্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলেন। মক্কাবাসিগণ দ্রব্যাদি পাইয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, আন্‌সারগণও ততোধিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সময়ে পরস্পর বলিতেছিলেন, "হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) জন্মভূমির লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে প্রায়

* এই হজরত এজিদের (রাজিঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ হজরত মায়াভিয়ার (রাজিঃ) পুত্র দুর্ব্বৃত্ত এজিদ তদীয় পিতার পরলোকগমনের পর খলিফা পদারূঢ় হইয়াছিলেন।

সমুদয় জয়লব্ধ দ্রব্য দিলেন, কেবল আমরাই যৎসামান্য প্রাপ্ত হইলাম।"

হজরত মোহাম্মদ (সাল্লঃ) আন্‌সারদিগের দুঃখিত হইবার কারণ অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলে শিবির মধ্যে সমবেত হইলে, হজরত শিবিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, শিবিরে আন্‌সারগণ ব্যতীত আর কেহই রহিল না। তৎপরে তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আন্‌সারগণ! তোমরা পরস্পর যাহা বলিতেছিলে, আমি তাহা অবগত হইয়াছি।" আন্‌সারগণ বলিলেন, "আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক যৌবনস্বভাব-সুলভ চাপল্য-বশতঃ ঐ সকল কথা বলিয়াছে।" হজরত তৎশ্রবণে বলিলেন, "আন্‌সারগণ! যখন আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তোমরা কুসংস্কাররূপ অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছিলে, খোদা-তায়ালা তোমাদিগকে আলোক-পথে ভ্রমণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন,—তোমরা কষ্ট পাইতেছিলে, খোদাতায়ালা তোমা-দিগকে সুখী করিয়াছেন;—তখন তোমাদের মধ্যে ঘোর শত্রুতার আধিপত্য ছিল এবং মঙ্গলময় তোমাদের অন্তর হইতে ঈর্ষাবৃত্তি স্থানান্তরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে, তোমাদের অন্তরে ভ্রাতৃস্নেহ ও বন্ধুতার বীজ রোপণ করিয়াছেন। ইহা কি সত্য নয়, তাহা আমাকে বল?" আন্‌সারগণ বলিলেন, "হে মহানুভব ধর্ম্ম-প্রচারক! আপনি আপনার ও আল্লাহ্‌তায়ালার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য।" তৎপরে হজরত পুনঃ বলিতে লাগিলেন,

"তোমরা আমাকে এইরূপ বলিতে পার, যখন লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলিত, সেই সময়ে তুমি আমাদের নিকট আসিয়াছিলে এবং আমরা তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম ; তুমি আমাদের নিকট নিঃসহায় অবস্থায় আসিয়াছিলে, এবং আমরা তোমাকে সাহায্য করিয়াছিলাম এবং দরিদ্র ও আশ্রয়হীন অবস্থায় তোমাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এবং আমরা সর্ব্বদা তোমাকে সান্ত্বনা করিতাম।" হে আন্‌সারগণ! কেন তোমরা এই পার্থিব দ্রব্যাদির জন্য দুঃখিত হইতেছ ? মক্কাবাসী লোকগণ উষ্ট্র ও মেষাদি লইয়া গৃহে যাইবে, আর তোমরা আমাকে লইয়া নিজ গৃহে যাইবে ইহাতে কি তোমরা সন্তুষ্ট হইতেছ না ? বল দেখি, কাহাদের অধিক লাভ হইল ? যদি সমুদয় মানবজাতি এক দিকে যায়, আর আন্‌সারগণ অন্য দিকে যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি আন্‌সারদিগের সঙ্গে যোগদান করিব। এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি তাহাদের মধ্যেই থাকিব। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট এবং তিনি তাহাদের এবং তাহাদের পুত্র পৌত্রাদির প্রতি কৃপা বিতরণ করিবেন।"

হজরতের এই কথা শুনিয়া আন্‌সারগণ অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং সকলেই একেবারে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আমরা সকলেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।" অতঃপর তাঁহারা সকলে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। *

* এবনে হেশাম, ৮৮৬ পৃঃ ; এবনে অল আসির, ২য় খণ্ড—২০৮ পৃঃ ; আবুল ফেদা, ৮২ পৃঃ।

জয়লব্ধ দ্রব্যাদি বিভাগ হইয়া গেলে, হাওয়াজেন বংশস্থ এক দল লোক হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইল। তাহারা বলিল যে, আরও অনেকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণার্থ আপনার নিকটে আসিতেছে। তৎপরে হালিমার স্বামী হারেসের ভ্রাতা আবু-বোরকান ও জোবের-বেন-সরদ হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইল এবং তাহাদের দ্রব্যাদি ও আত্মীয়স্বজনগণকে বন্দী হইতে মুক্ত করিয়া দিতে বলিল। আবুবোরকান বলিল যে, ঐ সকল বন্দীর মধ্যে হালিমা বিবীর ও হারেসের ভগ্নীদ্বয় আছেন। হজরত তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি জয়লব্ধ দ্রব্যাদি ও বন্দীদিগকে আমার শিষ্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছি। তোমরা দ্রব্যাদি লইতে ইচ্ছা কর, না তোমাদের আত্মীয়স্বজনগণকে লইতে ইচ্ছা কর?" তাহারা বলিল "আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজনগণকে পাইতে ইচ্ছা করি।" তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, "আমার ও আবদুল মোত্তালেব বংশীয় লোকদিগের অংশে যাহারা পড়িয়াছে, তাহাদিগকে এখন মুক্ত করিয়া দিতে পারি; কিন্তু অন্যান্য বংশীয় লোকদিগের অংশে যাহারা পতিত হইয়াছে, তাহাদের প্রাপ্তির জন্য আগামী কল্য জোহরের (মধ্যাহ্নিক) * নামাজের সময়ে আমার নিকট আসিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিও "আমরা খোদাতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন তাঁহার শিষ্যগণকে আমাদের বংশীয় স্ত্রীলোক ও

* তাবারী বলেন যে, ফজরের নামাজ (প্রাতঃকালীন উপাসনা) ৩য় খণ্ড ১৫৫ পৃঃ।

শিশুসন্তানদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দেন এবং মুসলমান ভ্রাতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমাদের উপর দয়া প্রকাশপূর্ব্বক, হজরত মোহাম্মদের (সাল্লঃ) মতানুসারে কার্য্য করেন।”

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবুবোরকান ও জোবের হজরতের নিকট আসিয়া তাঁহার উপদেশানুরূপে প্রার্থনা করিল। তখন হজরত মুসলমানগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “মুসলমানগণ! হাওয়াজেন বংশীয় লোকগণ ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা তোমাদের নিকট তাহাদের বন্দী আত্মীয়-স্বজনগণকে চাহিতেছে। যদি তোমরা তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হও, তাহা হইলে সন্তোষ সহকারে স্ব স্ব অংশস্থ বন্দি-গণকে ছাড়িয়া দাও। যাহারা দিতে অসম্মত, আমি তাহাদিগকে প্রত্যেক বন্দীর পরিবর্ত্তে দ্রব্যাদি দিব। তৎক্ষণাৎ মুসলমানগণ স্ব স্ব অংশস্থ বন্দিগণকে হাওয়াজেন বংশীয় লোকদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। আন্‌সার ও মহাজেরগণ হজরতকে বলিলেন, “আমাদের সমুদয় দ্রব্য ও জীবনই আপনার, আপনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন” এই বলিয়া তাঁহারা স্বীয় অংশস্থ বন্দি-গণকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু বনি তমিম দলপতি আক্‌রা-বেন-হারেস ও বনি ফাজারা দলপতি আয়না-বেন-আসিন স্ব স্ব অংশস্থ বন্দিগণকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন না। হজরত তাঁহাদিগকে বলিলেন, “আমি তোমাদের প্রত্যেক বন্দীর পরিবর্ত্তে ৬টী উষ্ট্র দিব, তোমরা বন্দিগণকে ছাড়িয়া দাও।” তখন

তাঁহারা তদনুসারে কার্য্য করিলেন। এইরূপে হাওয়াজেন বংশীয় লোকগণ স্ব স্ব আত্মীয়স্বজনগণকে পুনঃ প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ ছয় হাজার বন্দী মুক্তি লাভ করিল। * হজরত বন্দিগণকে বস্ত্রাদি দিয়া তাহাদের বাসস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। পরে তিনি হাওয়াজেন বংশীয় দূতদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালেক-বেন-আওফ কোথায়? যদি সে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে তাহার নিজের দ্রব্যাদি ও ২০০ উষ্ট্র প্রাপ্ত হইবে।" মালেক উক্ত দূতদ্বয়ের প্রমুখাৎ হজরতের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার অমায়িকতা ও উদারতা দর্শন করিয়া মুসলমান হইলেন এবং হজরতের প্রশংসা-সূচক একটী কবিতা লিখিয়া লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মালেক মুসলমান হইয়া সাকিফ বংশীয় লোকদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে এই উভয় দলস্থ লোকগণ লাৎ দেবীর পূজা ত্যাগ করিয়া সত্য-স্বরূপ আল্লাহতায়ালার অর্চ্চনায় রত হইল।

অনন্তর হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) তথা হইতে মদীনায় প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, জেল্‌কদ মাসের আর কেবল ১২ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন মনে করিলেন যে, একেবারে ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া মদীনায় প্রত্যাগমন করা ভাল। তজ্জন্য তিনি সেই দিন রাত্রে তথা হইতে এহরাম বাধিয়া একাকী মক্কায় ওমরাব্রত উদ্‌যাপন

* এবনে হেশাম, ৮৭৭ পৃঃ; এবনে-অল-আসির, ২য় খণ্ড—২০৬ পৃঃ; তাবারী, ৩য় খণ্ড—১৫৫ পৃঃ।

করিতে গমন করিলেন এবং রাত্রের মধ্যেই ব্রত সমাপন করিয়া জেয়ের-রাণায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি শিষ্য-গণসহ তথা হইতে মদীনায় যাত্রা করিলেন। তিনি এতাব (রাজিঃ) কে মক্কায় খলিফা করিয়া এবং মক্কাবাসিদিগকে কোর-আন শরিফ ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের রীতিনীতি শিক্ষা দিবার জন্য আবু-মুসা-আস্‌য়াসি (রাজিঃ) ও মায়াজ-বেন-জবল (রাজিঃ)কে রাখিয়া আসিয়া ছিলেন। হজরতের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এতাব (রাজিঃ) মক্কায় খলিফা ছিলেন। যে বৎসর হজরত আবুবকর (রাজিঃ) খলিফা-পদারূঢ় হইয়াছিলেন, সেই বৎসর এতাবের (রাজিঃ) মৃত্যু হইয়াছিল।

তবুকের যুদ্ধ।

তবুক একটী স্থানের নাম। এই স্থানটী দেমেস্ক ও মদীনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। আজকাল ইহা হেজাজ রেল্‌ওয়ের একটী বৃহৎ ষ্টেশন। কেহ কেহ বলেন যে, তবুক একটী দুর্গের নাম। এই স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া, এই যুদ্ধকে তবুকের যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধের অপর এক নাম "গজ্‌য়াতোল ওস্‌রাৎ" অর্থাৎ কষ্টের যুদ্ধ। ইহাকে কষ্টের যুদ্ধ বলিবার কারণ এই যে, মুসলমান সৈন্যগণ তবুকে গমন কালে পথিমধ্যে সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে ও জলাভাবে ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে আরবদেশবাসী কতিপয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, রুমের সম্রাট্ হেরকেলের (হিরাকিয়স্) নিকট গিয়া বলে, "আমাদের দেশে যে ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার শিষ্যগণের মধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে আর তাহাদের অনেক সম্পত্তিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনি এই সময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে সহজে জয় করিতে পারিবেন।" সেই সময় সম্রাট্ হেরকেল পারস্য দেশ জয় করিয়া স্বকীয় বিজয়-পতাকা আরবদেশে প্রোথিত করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানগণের দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইয়া এবং রুমের কতকগুলি প্রধান লোকের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আরবদেশ আক্রমণার্থ ৪০,০০০ সৈন্য আরবদেশের প্রান্তভাগস্থ 'কোবাদ' নামক স্থানে সমবেত হইতে বলিলেন। এই সময় একদল স্থলবণিক্ সুরিয়া হইতে মদীনায় আসিয়া হজরতকে রোমক সম্রাট্ হেরকেলের সৈন্য-সজ্জার কথা বলে। হজরত তাহাদের আক্রমণ হইতে আরবদেশ রক্ষা করিবার জন্য মুসলমানদিগকে যুদ্ধসজ্জা করিতে বলিলেন এবং প্রত্যেক মুসলমান সম্প্রদায় হইতে সৈন্য সংগ্রহার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। সুশিক্ষিত রোমক সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করা সহজ কার্য্য নয়, মনে করিয়া হজরত বহুসংখ্যক সৈন্য ও বহুদূর গমনোপযোগী প্রচুর পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য (রসদ) সংগ্রহ করিলেন। তিনি শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে যুদ্ধে ব্যয়ার্থ যাহা দান করিবে,

তাহাতে তোমাদের পুণ্য সঞ্চয় হইবে।” শিষ্যগণ উহা শ্রবণ করিয়া সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী অর্থ দিলেন। ইহাতে হজরত ওমর (রাজিঃ) নিজ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ এবং হজরত আবুবকর (রাজিঃ) সমুদয় সম্পত্তি হজরতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হজরত আবুবকর (রাজিঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার পরিবারগণের ভরণপোষণো-পযোগী কি অবশিষ্ট রাখিয়াছ?” ইহাতে হজরত আবুবকর (রাজিঃ) বলিলেন, “আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারককে রাখিয়াছি।” ইহা শুনিয়া হজরত পরম প্রীত হইলেন। এইরূপে তবুক যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইল।

ঐ সমুদয় অর্থ দ্বারা তিনি সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করিলেন এবং সকলকে পাদুকা পরিধান করিতে বলিলেন। সৈন্যগণ যথানিয়মে সজ্জিত হইলে তিনি সকলকে বলিলেন, “তোমরা সকলে মদীনার বহির্ভাগস্থ ‘সানিয়াতল-ভেদা’ নামক স্থানে গিয়া একত্র মিলিত হও।” তদনুসারে হজরত আবু-বকর (রাজিঃ) সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া সানিয়াতল-ভেদায় গমন করিলেন। আবদুল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল স্বদলস্থ লোক-গণকে ‘জোবাব’ নামক স্থানে একত্র করিয়া বলিল, “হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) সুশিক্ষিত রোমক সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করা সহজ কার্য্য মনে করিয়াছেন, তজ্জন্য উত্তপ্ত সূর্য্যকিরণ ও জলকষ্ট প্রভৃতিতে হেয় জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছেন। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, এই যুদ্ধে

মুসলমানগণ বন্দী হইবে এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। আবতুল্লার কথা শ্রবণ করিয়া কতকগুলি অল্পবিশ্বাসী মুসলমান ভীত হইয়া হজরতের সহিত যোগ দিতে বিরত হইল। হজরত, আবতুল্লার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "যদি তার ইমান (ধর্ম্মে বিশ্বাস) থাকিত, তাহা হইলে সে কখন এরূপ কথা বলিত না।"

সায়াদ-বেন-আবি ও আক্কাস (রাজিঃ) বলেন, "এই সময়ে হজরত মোহাম্মদ, (সালঃ) হজরত আলী (রাজিঃ) কে মদীনার ও আপনার পরিবারগণের মধ্যে খলিফা (প্রতিনিধি) পদে নিযুক্ত করিয়া যান। কিন্তু হজরত আলী, হজরতের সমভিব্যাহারে যাইতে না পারিয়া তুঃখিত হইয়া বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আমি প্রত্যেক যুদ্ধে আপনার অনুগমন করিয়াছি, এবার কেন আপনি আমাকে কতকগুলি বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছেন?" তখন হজরত মোহাম্মদ, (ছালঃ) হজরত আলী (রাজিঃ)কে বলিলেন, "হজরত মুসা সম্বন্ধে হজরত হারুণ (আলঃ) যেরূপ, আমার সম্বন্ধে তুমিও সেইরূপ, কিন্তু হজরত হারুণের সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তিনি পয়গম্বর ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, কিন্তু তুমি তাহা নও। যখন হজরত মুসা (আলাঃ) তুর পাহাড়োপরি গমন করেন, তখন তিনি হজরত হারুণ (আলাঃ)কে তাঁহার পরিবারের মধ্যে খলিফা করিয়া গিয়াছিলেন। আমিও সেইরূপ তোমাকে স্বীয় পরিবারের মধ্যে খলিফা করিয়া যাইতেছি। ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ না?"

হজরত আলী (রাজিঃ) হজরতের এই সকল কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং মদীনায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (ইহা বোখারি ও মোস্‌লেমের ইতিবৃত্তানুসারে লিখিত হইল।)

তৎপরে হজরত মোহাম্মদ সানিয়া-তল-তেদায় গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ১০,০০০ অশ্বারোহী ও ২০,০০০ পদাতিক সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, সৈন্যগণের দ্রব্যাদি বহনোপযোগী ১২০০০ উষ্ট্রও সংগৃহীত হইয়াছে। তখন হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) হস্তে প্রধান পতাকাটী দিলেন। বীরবর খালেদ (রাজিঃ) অগ্রগামী সৈন্যগণের, তালহা-বেন-ওবেদুল্লা (রাজিঃ) সৈন্যগণের দক্ষিণ পার্শ্বের আর আবদুর রহমান (রাজিঃ) সৈন্যগণের বাম পার্শ্বের ভার গ্রহণ করিলেন। এই স্থান হইতে এক দল অল্পবিশ্বাসী মুসলমান মদীনায় প্রত্যাগমন করিল। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) তথা হইতে সৈন্যগণসহ রজব মাসের মধ্যভাগে (৬৩০ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে) তবুকে যাত্রা করিলেন।* তাঁহারা সকলে 'জোরফ নামক স্থানে উপনীত হইলে আবদুল্লা-বেন-ওবাই স্বদলস্থ লোকগুলিকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) শিষ্যগণসহ মরুভূমিস্থ প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে দগ্ধীভূত হইয়া কয়েক-দিন গমনের পর তবুকে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কূপাদি শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে মুসলমানগণ পথিমধ্যে পানীর অভাবে

* এব্‌নে হেশাম, ৯০৪ পৃঃ; এব্‌নে-অল-আসির, ২য় খণ্ড—২১৫ পৃঃ; আবুলফেদা, ৮৫ পৃঃ।

অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তবুকে ২০ দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। †

মুসলমানগণ তবুকে শিবির স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া সম্রাট্ হের্‌কেল বনি গচ্ছান বংশোদ্ভব একজন বিজ্ঞ লোককে তাঁহাদের শিবিরে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন—"তুমি মুসলমানদিগের শিবিরে গমনপূর্ব্বক হজরত মহম্মদের (সালঃ) আচারব্যবহার ও যুদ্ধের আয়োজনাদি অনুসন্ধান করিয়া আইস এবং তওরাত ও ইঞ্জিলে শেষ ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাব হইবার বিষয় যাহা উল্লিখিত আছে, তাহার সহিত হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) কোন সৌসাদৃশ্য আছে কি না, তাহাও দেখিয়া আইস।" সে ব্যক্তি তাবুকে আসিয়া হজরতের সমুদয় আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া সম্রাট্ হেল্‌কেলের নিকট গিয়া সবিশেষ বর্ণনা করিল। তখন হের্‌কেল হজরতকে শেষধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং রুমের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাগান্বিত হইয়া উঠিল। এমন কি তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সংকল্প করিল। তদর্শনে হের্‌কেল ভয়ে তাহাদের মতে মত দিলেন, কিন্তু যুদ্ধের কোনরূপ আয়োজন করিলেন না।

---

† কেহ বলেন, ১২ দিন; কেহ বলেন, ২ মাস কাল তাঁহারা তবুকে ছিলেন। কসিন ডি পার্সিভাল বলেন, ৬৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে তবুকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ আসিয়া হজরতের নিকট ইস্‌লাম গ্রহণ করে। এব্‌নে অল আসির, ২য়, খণ্ড—২১৫ পৃঃ।

এদিকে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) কয়েকদিন পর্য্যন্ত তবুকে অবস্থানপূর্ব্বক সম্রাটের যুদ্ধ-সজ্জার কোনরূপ চিহ্নাদি দেখিতে না পাইয়া আন্সার ও মহাজেরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না ?" হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, "আপনি যদি কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা আপনার সঙ্গে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত আছি।" হজরত বলিলেন, "যদি আমি আদিষ্ট হইতাম, তাহা হইলে তোমাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতাম না।" তখন হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, "রুমের সম্রাটের সৈন্য-সামান্ত অসংখ্য, তাহার তুলনায় আমাদের সৈন্য-সংখ্যা অতি অল্প। যখন তাহারা অগ্রসর হইতেছে না, তখন তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, খোদাতায়ালা তাহাদের অন্তর মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, আর এদেশের সমুদয় লোক আপনার মাহাত্ম্যের বিষয় অবগত আছে, তজ্জন্য তাহারাও আপনাকে অক্রমণ করিতে ভীত হইতেছে। অতএব এ বৎসর প্রত্যাগমন করাই ভাল। কিন্তু আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন।" হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) ও হজরত ওমরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মদীনায় প্রত্যাগমন করিতে মনস্থ করিলেন।

এই স্থানে আয়লার খৃষ্টিয়ান শাসনকর্ত্তাই উহান্না বেন-রুইয়া এবং জারবা ও আজরোখ নামক স্থানদ্বয়ের লোকগণ হজরতের নিকট আসিয়া জজিয়া প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল এবং সন্ধি স্থাপন করিল। দুমতল জান্দালের খৃষ্টিয়ান শাসনকর্ত্তা

ওকায়সার-বেন-আবদুল-মালেকও হজরতের নিকট আসিয়া সন্ধি স্থাপন করিল, আর ২০০০ উষ্ট্র ও ৮০০ অশ্ব উপঢৌকন দিল, তৎপরে হজরত হৃষ্টচিত্তে শিষ্যগণসহ মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হজরত মদীনায় প্রত্যাগমন-কালে পথিমধ্যে যে যে স্থানে নামাজ পড়িয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে এক একটী মস্জেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। মদীনায় এক ঘণ্টার পথস্থিত কোবার সন্নিকটস্থ জিঃআওয়ান নামক স্থানে অল্প-বিশ্বাসী মুসলমানগণের জেরার নামক একটী মস্জেদ ছিল; হজরত সেই মস্জেদে উপাসনা করিতে গেলে, একটী স্বর্গীয় আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে, এই মস্জেদটী অল্পবিশ্বাসী মুসলমানগণ কোবার মস্জেদের অনুকরণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে। হিংসার উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত, অতএব ইহাতে উপাসনা করা উচিত নয়। তজ্জন্য তিনি দোকতামের পুত্র মালেক (রাজিঃ) ও আদীর পুত্র মায়না (রাজিঃ)কে ঐ মস্জেদটী ভূমিসাৎ করিতে বলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উহা ভূমিসাৎ করিলেন।

হজরত আবু বকরের হজব্রত উদযাপনার্থ মক্কায় গমন।

এই বৎসর হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হজরত আবুবকর (রাজিঃ)কে মক্কায় হজব্রত উদযাপন করিতে পাঠাইয়া দেন।

কেহ বলেন, জেলকদ্ মাসে; কেহ বলেন, জেলহজ্জ মাসে; কেহ বলেন, জেলকদ মাসের সংক্রান্তির দিনে হজরত আবুবকর (রাজিঃ) মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া হজব্রত উদযাপনার্থ মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। হজরত এই বৎসরে হজ্জ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। অধিকন্তু আবার দেখা যাইতেছে যে, এই নবম বৎসরে হজের বৈধ-সূচক [ফরজ-সূচক] আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) ষষ্ঠ হিজরীতে হজব্রত উদযাপন করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হন।

এই বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ লোকগণ হজরতের নিকট আসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি স্বয়ং হজ্জ করিতে যাইতে পারেন নাই; হজরত মোহাম্মদ হজরত আবুবকর (রাজিঃ)কে "আমিরে-হজ্জ" অর্থাৎ তীর্থযাত্রিগণের নেতা করিয়া ৩০০ মুসলমান সঙ্গে দিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন এবং কোরবানীর জন্য ২০টী উষ্ট্র প্রদান করেন। তিনি হজরত আবুবকর (রাজিঃ)কে বলিয়া দেন, "তুমি তথায় মুসলমানদিগকে হজ্জ করিবার নিয়মাদি শিক্ষা দিও এবং কোরআন শরিফের বারাত সুরার প্রথম হইতে ৪০ আয়েত পর্য্যন্ত পড়িয়া শুনাইও।" আবিআক্কাসের পুত্র সায়াদ, (রাজিঃ) আফের পুত্র আবদুর রহমান (রাজিঃ) ও আবুহোরায়রা (রাজিঃ) প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান সাহবা ও হজরত আবুবকরের

(রাজিঃ) সঙ্গে হজ্জে গিয়াছিলেন। হজরত আবুবকর (রাজিঃ) জোল্‌হলিফার মসজেদে এহরাম বাধিয়া মক্কা যাত্রা করেন।

এদিকে হজরত জেব্রিল হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) নিকট আসিয়া বলিলেন, "তুমি কিংবা আলী (রাজিঃ) ভিন্ন অন্য কেহ যেন লোকের নিকট খোদাতায়ালার সুসমাচার প্রচার না করে।" কেহ কেহ বলেন যে, হজরত জেব্রিল বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ্‌তায়ালার সুসমাচার লোকের নিকট প্রচার করা, তোমার ও তোমার আত্মীয় (এক রক্ত-সম্ভূত) ভিন্ন অন্য কাহারও উচিত নহে।" হজরত মোহাম্মদ, হজরত জেব্রিলের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হজরত আলী (রাজিঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আলি! তুমি আবুবকরের পশ্চাদ্‌গামী হও, এবং তাঁহার নিকট কোরআন শরিফের বারাত সুরার যে কয়েকটী আয়েত আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া হজ্জের দিন সমবেত মুসলমানমণ্ডলীকে শ্রবণ করাইও; এবং এই চারিটী আদেশ সকলকে বলিয়া দিও,—বিশ্বাসী (মোমেন) ভিন্ন অন্য কেহ স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না, হজরতের সহিত যাহাদের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তাহদের সহিত সেই সন্ধি নির্দ্ধারিত কাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। বিধর্ম্মিগণ চারি মাসের মধ্যে স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করুক, ঐ চারি মাসের পর তাহাদের সহিত মুসলমানগণের আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে

না। পরন্তু যাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, কেবল তাহাদের সহিত মুসলমানগণের সম্বন্ধ থাকিবে।” * হজরতের এই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া হজরত আলী (রাজিঃ) হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) আজবা নামক উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক মক্কায় গমন করিলেন।

আবদুল্লার পুত্র জাবের (রাজিঃ) বলিয়াছেন, “আমি হজ্জ করিবার জন্য হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) সমভিব্যাহারে মক্কায় গিয়াছিলাম। যখন আমরা ‘আর্জ্জ’ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রাতঃকালীন নামাজ পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, তখন হজরত আলী (রাজিঃ) আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। হজরত আবুবকর (রাজিঃ) তাঁহাকে হঠাৎ উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমিরোণ আও মামুরোণ’ অর্থাৎ তুমি কি নেতা হইয়া আসিয়াছ? আর আমি কি পদচ্যুত হইয়াছি? না তুমি আমার অধীনে আসিয়াছ? হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, ‘মমুরোণ’ অর্থাৎ আমি আপনার অধীন হইয়া আসিয়াছি, নেতার কার্য্যাদি আপনার উপরই ন্যস্ত আছে; কেবল আমি সুরা বারাতের আয়েত সমূহ পড়িতে এবং অন্য চারিটী আদেশ লোকদিগের নিকট

* এবনে হেশাম, ৯২১—৯২২ পৃঃ; এবনে অল-আসির, ২য়—খণ্ড ২২২ পৃঃ; আবুল ফেদা, ৮৭ পৃঃ।

প্রচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।” পরে আমরা নামাজ পড়িয়া মক্কায় যাত্রা করিলাম। তথায় গিয়া হজব্রত শেষ হইলে, হজরত আবুবকর (রাজিঃ) একটী খোৎবা (বক্তৃতা) পড়েন এবং সমবেত লোকদিগকে হজব্রত উদযাপন করিবার নিয়মাদি শিক্ষা দেন। হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) বক্তৃতা শেষ হইলে হজরত আলী (রাজিঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বারাত সুরার আয়েত সমূহ পড়িলেন এবং উপরোক্ত চারিটী আদেশ সকলকে শ্রবণ করাইলেন। এইরূপে সমুদয় কার্য্য শেষ হইলে আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।”

তাঁহারা মদীনায় প্রত্যাগমন করিলে হজরত আবুবকর (রাজিঃ) হজরতের নিকট গিয়া বলিলেন, “হে ধর্ম্মপ্রচারক! আপনি কি দোষে আমাকে সুরা পাঠ করিতে দেন নাই?” তখন হজরত বলিয়াছিলেন, “তোমার কোন দোষ নাই, তুমি গহ্বরে আমার সঙ্গী ছিলে এবং হাওজ কাওসর তীরে আমার সঙ্গী হইবে। কিন্তু তোমরা মক্কায় যাত্রা করিলে জেব্রিল আমার নিকট আসিয়া বলেন, ‘কোর-আন-শরিফের আয়েতসমূহ তুমি ও তোমার আত্মীয় (একরক্তসম্ভূত) ভিন্ন অন্য কাহারও প্রচার করা উচিত নয়।’ তজ্জন্যই আমি আলীকে উহা প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।” হজরত আবুবকর উহা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

কোর-আন-শরিফের বারাত স্থরার আয়েতসমূহ প্রচারিত হইলে প্রায় অধিকাংশ বিধর্ম্মী ও অল্পবিশ্বাসী মুসলমান প্রকৃত (বিশ্বাসী বা খাঁটি) মুসলমান হয়।

হজরত আলী [রাজিঃ] ও খালেদ [রাজিঃ]কে ধর্ম্ম-প্রচারার্থে প্রেরণ।

হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) নাজরাণের অধিবাসী আবদুল মাদান দলস্থ লোকগণের নিকট মহাবীর খালেদ (রাজিঃ) কে ধর্ম্ম প্রচারার্থে পাঠাইয়া দেন। বীরবর খালেদ তথায় গিয়া তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

হজরত মোহাম্মদ হজরত আলীর (রাজিঃ) সমভিব্যাহারে ৩০০ লোক ইমেনে ধর্ম্ম প্রচারার্থ পাঠাইবার সময় তাঁহাকে বলেন, "আলি! তুমি ইমেন প্রদেশে যাও। যদি তথাকার অধিবাসিগণ অগ্রে তোমাকে আক্রমণ না করে, তাহা হইলে তুমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিও না। তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিও; যদি তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নামাজ পড়িতে ও জাকাত দিতে বলিও। যদি তাহারা জাকাত দেয়, তাহা হইলে সেই সকল জাকাতের দ্রাব্যাদি তথাকার ভিক্ষুকদিগকে দান করিও।" হজরত আলী (রাজিঃ)

এতৎশ্রবণে হজরতকে, বলিলেন "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আপনি আমাকে ইমেন প্রদেশে পাঠাইতেছেন, তথাকার অধিবাসিগণ আহলে-কেতাব অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। আমি যুবক, ধর্ম্মনীতি ও বিচারশক্তি বিষয়ে আমার তত পারদর্শিতা নাই; আমি তাহাদের নিকট গিয়া কেমন করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে তর্কবিতর্ক করিব।" তখন হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হজরত আলীর (রাজিঃ) বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আল্লা হোম্মা সাব্বেৎ লেসানাহু অ আহ্‌দে কাল্‌বাহু" অর্থাৎ "হে খোদাতায়ালা! ইহার বাক্যকে ঠিক রাখ এবং ইহার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন কর।" তদবধি হজরত আলী (রাজিঃ) একজন সূক্ষ্মদর্শী বিচারক বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি ইমেনে গমনপূর্ব্বক তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীকে ও বনি হামদান দলস্থ সমুদয় লোককে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) ইমেনে অবস্থান কালে হজরত হজ্জ্ করিবার জন্য মক্কায় গমন করেন, হজরত আলী (রাজিঃ)ও ইমেন হইতে মক্কায় গিয়া হজরতের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

হাজ্জতল ভেদা।

এই বৎসরের শেষভাগে হজরত রসুলে আকরম মোহাম্মদ (সালঃ) মক্কায় হজ্জ্‌ব্রত উদযাপন করিতে যাইবেন বলিয়া আরবের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। প্রত্যেক স্থানের মুসলমানগণ হজরতের হজ্জ্‌ব্রত উদযাপন করিবার সংবাদ পাইয়া দলে দলে মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই হজ্জ্‌ব্রত উদযাপন করাকে "হাজ্জতল-ভেদা কিংবা "হাজ্জতল-ইস্‌লাম" বলে। ইহাকে হাজ্জতল ভেদা বলিবার কারণ এই যে, হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হজের দিনে সমবেত মুসলমানগুলীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, "মুসলমানগণ! এই বৎসর তোমরা আমার নিকট হজের নিয়মাদি শিক্ষা কর। আমি জানি না যে, আগামী বৎসরে আমি তোমাদের সহিত একত্রিত হইয়া হজ্জ্‌ব্রত উদযাপন করিতে পারিব কি না, কিংবা জীবিত থাকিব কি না।" "ভেদা" শব্দটীর অর্থ বিদায় অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) এই হজের সময় সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। ইহাকে হাজ্জ্‌তল-ইস্‌লাম বলিবার কারণ এই যে, এই হজের সময়ে হজরত মোহাম্মদ মুসলমানদিগকে বহুল পরিমাণে ইসলাম-ধর্ম্মের রীতিনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

জেলকদ মাসে শেষঃ হইবার পূর্ব্বেই অসংখ্য মুসললান হজরতের সহিত যোগ দিবার জন্য মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেহ বলেন এই সময়ে ১২৪০০০ মুসলমান, কেহ

বলেন, ৯০,০০০, কেহ বলেন, ১৪০০০ মুসলমান তাঁহার সঙ্গে হজ করিতে গিয়াছিলেন।* সেই সময়ে মদীনার চতুর্দ্দিকে অগণ্য নরমুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ২৫শে জেলকাদ (৬৩২ খৃঃ অব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি) শনিবারে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) গোসল (স্নান) করিয়া কেশবিন্যাস পূর্ব্বক তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা স্বীয় দেহ ও বস্ত্রাদি সুবাসিত করিলেন এবং জোহরের নামাজ পড়িয়া শিষ্য-গণসহ এহ্‌রামের বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক মদীনা হইতে বহির্গত হইলেন। পরে কয়েকদিন গমনের পর তাঁহারা 'জোলহলিফা' নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া আসরের নামাজ পড়িবার সময় কসর † পড়িলেন। তৎপরে এহ্‌রাম বাঁধিয়া লাব্বায়কা (এক প্রকার প্রার্থনা) পড়িয়া কাসোয়া নামক উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক আবার লাব্বায়কা পড়িলেন। তিনি গমনকালে পথিমধ্যে কোন উচ্চস্থানে উঠিলে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া (এক প্রকার প্রার্থনা) পড়িতেন, শিষ্যগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া পড়িতেন। যখন সেই সকল লোক একত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেন, তখন বোধ হইত যেন মরুভূমি বাকশক্তি

---

* এবনে হেশাম, ৯৬৬ পৃঃ; এবনে অল-আসির, ২য় খণ্ড—২৩০ পৃঃ।

† প্রবাসী ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আপন গৃহে প্রত্যাগত না হয়, কিম্বা কোন নগরে বা গ্রামে পনর দিন বা ততোধিক কাল থাকিবার মনন (নিয়ত বা সঙ্কল্প) না করে, সে পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি ফরজ চারি রেকাতের স্থলে দুই রেকাত নামাজ পড়িবে। এইরূপ নামাজ পড়াকে "কসর" বলে।

প্রাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র সেই পবিত্র ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনা যাইত। এইরূপে কয়েকদিন গমনের পর, তিনি ৪ঠা জেলহজ্জ শনিবারে পবিত্র মক্কা নগরীর প্রবেশদ্বারের নিকট উপনীত হইলেন এবং তথায় স্নান করিলেন। সেই দিন প্রাতে তিনি 'জহন' নামক সমাধিক্ষেত্র ও 'কাদা' নামক পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া মক্কা নগরে প্রবেশ করিলেন এবং 'বাব্-সসালাম' নামক বনি শায়বার দ্বারদেশে উপনীত হইয়া কাবা দর্শন করিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। পরে হজরোল আসোয়াদের নিকট গিয়া তাঁহাকে স্পর্শ ও চুম্বন করিলেন এবং সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন। এই প্রদক্ষিণ করাকে "তওয়াফে কদুম" বলে। কাবা প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তিনি "মোকামে ইব্রাহিমের" * নিকট গিয়া দুই রেকাত নামাজ পড়িলেন এবং নামাজ পড়া শেষ হইলে পুনরায় হজরোল আসোয়াদের নিকট আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ ও চুম্বন করিলেন। তৎপরে তথা হইতে 'সাফা' পাহাড়োপরি গিয়া তাহার সর্ব্বোচ্চ শিখরোপরি আরোহণ করিলেন। যখন কাবা মস্‌জেদ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তখন তিনি তক্‌বির পড়িয়া তহলিল্ (এক প্রকার প্রার্থনা) পড়িতে লাগিলেন। প্রার্থনা শেষ

* কাবা মস্‌জেদের একপার্শ্বে একখণ্ড প্রস্তরের উপর মহাত্মা ইব্রাহিমের (আলাঃ) পদচিহ্ন আছে। সেই প্রস্তর খণ্ডকে "মোকামে ইব্রাহিম" বলে। কথিত আছে যে, কাবা নির্ম্মাণ সময়ে মহাত্মা ইব্রাহিম (আলাঃ) এই প্রস্তরখণ্ডোপরি উপবেশনপূর্ব্বক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেন। সেই সময়ে এই প্রস্তরখণ্ডটী তাঁহার মঞ্চের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল।

হইলে তিনি তথা হইতে নিম্নে আসিয়া 'মারওয়া' পাহাড়ে গমন করিলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে সাতবার গমনাগমন করত নির্দ্ধারিত ধর্ম্ম কর্ম্ম যথানিয়মে সম্পন্ন করিলেন। এই সময়ে হজরত আলী (রাজিঃ) ইমেন হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। এইরূপ অবস্থায় চারি দিন মক্কায় অতিবাহিত হইলে তিনি বৃহস্পতিবারে শিষ্যগণসহ মিনায় গমন করিলেন এবং সেখানে জোহর ও আসরের নামাজ পড়িয়া রাত্রি যাপনান্তে পর দিন সূর্য্যোদয় হইলে আর্‌ফাতে আসিলেন আগমন কালে পথিমধ্যে কেহ তক্‌বির কেহ বা তলবিয়া পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু ছারওয়ারে কায়েনাৎ হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) কাহাকেও তদ্বিষয়ে নিষেধ করেন নাই।

আরফাতের নিকটস্থ 'নমের্‌রাঃ' নামক স্থানে মুসলমানগণ শিবির স্থাপন করেন। হজরত তথায় ফজরের নামাজ পড়িয়া উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক 'বতনেওয়াদি' নামক স্থানে গিয়া একটী হৃদয়গ্রাহী ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি মুসলমানগণকে ইস্‌লামধর্ম্মের রীতিনীতি, ইস্‌লামধর্ম্ম আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে আরববাসিগণের রীতিনীতির দোষ বর্ণন এবং পরস্পরকে হত্যা করা ও চুরি করা যে হারাম (নিষিদ্ধ), তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি কাহারও উপর কাহার প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সে ইচ্ছা তোমরা ত্যাগ কর।" বিশেষতঃ সকলকে সুদ-গ্রহণের অবৈধতা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া তাহা

গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে লোক সকল, আমার উপদেশগুলি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর, যেহেতু আমি জানি না যে, আমি পুনরায় তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারিব কিনা। যাহা হউক, তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, তোমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম তোমাদের স্ত্রীর উপর এবং তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম তোমাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীর প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিও, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালাকে সাক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা যেরূপ দ্রব্যাদি আহার কর এবং যেরূপ বস্ত্র পরিধান কর, তোমাদের ক্রীতদাসদাসীগণকেও সেইরূপ দ্রব্যাদি আহার ও বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দিও। যদি তাহারা কোন অপরাধ করে এবং তোমরা যদি তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা না কর, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিও; জানিও যে, তাহারা ও তোমরা সকলেই খোদাতায়ালার দাস, সুতরাং তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অনুচিত। আমি তোমাদের মধ্যে যাহা রাখিয়া যাইতেছি, যদি তোমরা তাহা অবলম্বন করিয়া থাক, তাহা হইলে পথভ্রান্ত হইবে না।" এই বক্তৃতার পর তিনি আবার শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি, এই কথা কেয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন যখন তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে, তখন তোমরা কি উত্তর দিবে?" তাঁহারা বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আমাদিগকে

খোদাতায়ালার আদেশসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন এবং আপনার দৌত্য কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, আর আপনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন।” তৎপরে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) তিন বার অঙ্গুলি ঘুরাইবার সময়ে প্রত্যেক বার নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিলেন,—“আল্লা হোম্মা এস্‌হাদ্।” আবার তিনি শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে মুসলমানগণ! তিনটী বিষয় অন্তঃকরণকে পবিত্র করে;—১ম, কার্য্যে সততা প্রদর্শন করা;—২য়, মুসলমান ভ্রাতাগণের উন্নতি সাধন করা;—৩য়, মুসলমান সমাজ ত্যাগ না করা।” এই সময়ে আব্বাসের পুত্র আবদুল্লার জননী ওম্মে-ফজল (রাঃ আঃ) হজরতকে দুগ্ধ পান করিতে দিলেন। হজরত তাহা পান করিলেন। ইহাতে সকলে জানিতে পারিলেন যে, সেই সময়ে হজরত রোজাদার নহেন। পরে উষ্ট্রের পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি বেলাল (রাজিঃ)কে আজান দিতে বলিলেন,। বেলাল আজান দিলে তিনি আসর ও জোহরের নামাজ পড়িলেন। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তিনি সেই স্থানে রহিলেন। সেই সময়ে কোরআন শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতটী অবতীর্ণ হয়;—“অদ্য আমি তোমার জন্য তোমার দীনকে (ধর্ম্মকে) পূর্ণ করিয়াছি এবং তোমার উপর আমার নিয়ামত (অনুগ্রহ) শেষ করিয়াছি * * *)

উপরোক্ত আয়েতটী শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু হজরত আবুবকর (রাজিঃ) সন্তুষ্ট না হইয়া অশ্রুপাত করিতে

লাগিলেন, কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) আর অধিক দিন পৃথিবীতে থাকিবেন না। সেই দিন সন্ধ্যার সময় হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) জয়দের পুত্র ওসামাকে স্বীয় উষ্ট্রোপরি লইয়া মৃদু মৃদু গমনে মিনার বাজারাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং শিষ্যগণকে ধীরে ধীরে আসিতে বলিলেন। তিনি মিনায় আসিয়া ১০০ উষ্ট্র কোরবানী দিলেন এবং অল্প পরিমাণ উষ্ট্রের মাংস রন্ধন করিয়া তিনি ও হজরত আলী (রাজিঃ) একত্রে ভোজন করিলেন। পরে তিনি মস্তকমুণ্ডন করিলেন; শিষ্যগণ তাঁহার স্মরণচিহ্ন রাখিবার জন্য সেই পবিত্র কেশগুচ্ছ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইলেন। পরে তথা হইতে বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে তিনি মক্কায় আসিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন। এই প্রদক্ষিণকে 'তোয়াকে জেয়ারৎ' বলে। অনন্তর তিনি আবার মিনায় গিয়া জোহরের নামাজ পড়িলেন এবং তথায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। তিনি প্রাতে হজের অবশিষ্ট কার্য্যাদি শেষ করিয়া মক্কায় আসিলেন এবং কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন। এই প্রদক্ষিণ করাকে "তোয়াফেভেদা" অর্থাৎ বিদায় কালীন প্রদক্ষিন বলে। পরে জমজম্ কূপের নিকট গিয়া একটু পানী তুলিয়া পান করিলেন। পুনরায় তিনি কাবার নিকট গিয়া বিদায়কালীন প্রার্থনা করিবার সময়ে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতে ফজরের নামাজ পড়িয়া মদীনায় যাত্রা করিলেন। তৎপরে কয়েক দিন গমনের

পর তিনি মদীনায় উপনীত হইয়া তিন বার তকবির ও তালবিয়া পড়িলেন।

হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) মক্কা হইতে মদীনায় আগমন কালে পথিমধ্যে 'গদিরখম' নামক স্থানে শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা কি জান না যে, আমি তোমাদের স্ব স্ব আত্মা অপেক্ষাও তোমাদের হিতৈষী বন্ধু?" শিষ্যগণ বলিলেন, "হে রসুলে করিম! আপনি আমাদের আত্মা অপেক্ষাও আমাদের প্রিয় সুহৃদ।" তৎপরে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে মুসলমানগণ! খোদাতায়ালা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আমিও তাঁহার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। তোমরা জানিও যে, আমি তোমাদের মধ্যে দুইটী বস্তু রাখিয়া যাইতেছি—কোরআন শরিফ ও আহলেওবায়েৎ (আমার আত্মীয়গণ)। তোমরা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিও। তোমরা জানিও যে, খোদাতায়ালা আমার প্রভু, আর আমি বিশ্বাসিগণের (মোমেনিন্) প্রভু।" পরে তিনি হজরত আলীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে আল্লাহতায়ালা! আমি যাহার প্রভু, আলীও তাহার প্রভু। হে খোদাতায়ালা! যাহারা আলীকে ভাল বাসিবে, আমিও তাহাদিগকে ভালবাসিব।"

সত্য-ধর্ম্ম ও পবিত্র এস্লামের জয়।

যখন মহামান্য শেষ ও শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) ধর্ম্মোপদেশে আরবের কুসংস্কার ও ভ্রান্তবিশ্বাস

বিলুপ্ত হইল, তখন মানবগণ দলে দলে কুসংস্কার বিবর্জ্জিত পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন কোন মানবীয় ক্ষমতাই সত্যের গতিরোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে ইস্‌লামধর্ম্মের বিপক্ষগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে মহানবী হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) প্রেরিতত্ব লাভের পর হইতে হিজরীর ষষ্ঠ অব্দ পর্য্যন্ত য়িহুদী ও পৌত্তলিকগণ সত্যধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিবার ও বনিয়াদ খুড়িয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সফলমনোরথ হইতে পরে নাই। কিন্তু অবশেষে যখন পৌর্ণমাসী শশধরের বিমল কিরণ সদৃশ পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতে লাগিল, তখন য়িহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকগণ দলে দলে সেই জ্যোতিঃর অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নবম ও দশম হিজরীতে যে সকল সম্প্রদায় হজরতের নিকট আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১। বনি আমের—ইহারা হাওয়াজেন বংশোদ্ভব; নজ্‌দ প্রদেশে ইহাদের বাসস্থান ছিল। ইহারা হোনেনের যুদ্ধে হাওয়াজেন দলস্থ অন্যান্য লোকের পক্ষাবলম্বন করে নাই।

২। বনি আবদল কাস—এই বংশ পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

৩। বনি আহমাস—ইহারা কহ্‌তান বংশোদ্ভব, ইমেনের অধিবাসী।

৪। বনি আনাজা—

৫। বনি আসাদ—এই দলস্থ দশজন লোক প্রথমে হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হয়, পরে স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বদলস্থ সকলকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করে।

৬। বনি আজ্‌দ্—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব, আমুনের অধিবাসী।

৭। বনি আজ্‌দ্—ইহারা কাহতান বংশোদ্ভব, ইমেনের অধিবাসী।

৮। বনি বহিলা—ইহারা গাৎফান বংশোদ্ভব।

৯। বনি বাহরা—ইহারা খায়াজা বংশোদ্ভব।

১০। বনি বাজিলা—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব, ইমেনের অধিবাসী। ইহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ 'কালাসা' দেবমূর্ত্তিকে ধ্বংস করে।

১১। বনি বাকা—ইহারা মধ্য আরবের বনি আমের বংশোদ্ভব।

১২। বনি বকর-বেন-অয়েল—ইহারা আরবের পূর্ব্বাংশে—পারস্যোপসাগরের তীরে বাস করিত।

১৩। বনি বালি—ইহারা কহ্‌তান বংশোদ্ভব, আরবের উত্তারাংশে সুরিয়ার নিকট বাস করিত।

১৪। বনি বারেক—ইহারা খায়াজা বংশোদ্ভব।

১৫। বনি দারী—

১৬। বনি ফারেয়া—ইহারা বনি জজাম বংশোদ্ভব, আম্মান

প্রদেশে ইহাদের বাসস্থান ছিল। ইহারা ৮ম হিজরীতে হজরতের নিকট আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে।

১৭। বনি ফারাজা—মহানবী হজরত মোহাম্মদ যখন তবুকে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ইহারা মুসলমান হইবার জন্য মদীনায় আইসে; হজরত মদীনায় প্রত্যাগমন করিলে ইহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে।

১৮। বনি গাফিক—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

১৯। বনি গনিম্—ইহারা ইমেনের অধিবাসী।

২০। বনি গাচ্ছান—

২১। বনি হামাদান—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব, ইমেন্ প্রদেশের পূর্ব্বাংশে বাস করিত।

২২। বনি হানিফা—ইহারা বনি বকর বংশোদ্ভব, 'জামামা' প্রদেশে ইহাদের বাসস্থান ছিল। ইহারা পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

২৩। বনি হারেস—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব, 'নজিরান' প্রদেশে বাস করিত ইহারা পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

২৪। বনি হেজাল-বেন-আমের—ইহারা গাৎফান বংশোদ্ভব ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

২৫। বনি হিমিয়ার—ইহাদের বাসস্থান ইমেনে ছিল। ইহাদের মধ্যে রোয়েন, মুয়াফের, হামাদান ও বাজান নামক চারিজন রাজপুত্র ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (সালঃ)কে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। ইহারা পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

২৬। বনি জায়াদ—ইহারা বনি আমের বংশোদ্ভব।

২৭। বনি জাফের-বেন-কেলাব-রাবিয়া—ইহারা বনি আমের বংশোদ্ভব।

২৯। বনি জেফার-বেনল্‌-জালান্দি—ইনি অমানের রাজা ছিলেন; ইনি স্বীয় প্রজাবর্গসহ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

২৯। বনি জনিহা—

৩০। বনি জুফি—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব। ইমেনে ইহাদের বাসস্থান ছিল।

৩১। বনি কাল্‌ব—ইহারা হিমিয়ার বংশোদ্ভব, আরবের উত্তরাংশে বাস করিত।

৩২। বনি খস্‌ম্‌-বেন-আন্‌মার—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব; ইমেনের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত।

৩৩। বনি খাওলান—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব; ইমেনের সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত।

৩৪। বনি কেলাব—ইহারা হাওয়াজেন বংশোদ্ভব।

৩৫। বনি কেনানা—ইহাদের দলপতি ওয়াসেলা হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইয়াছিলেন এবং স্বদলস্থ সকলকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

৩৬। বনি কেন্দা—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব। এই দল অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিল।

৩৭। বনি মহরা—ইহারা খাজায়া বংশোদ্ভব।

৩৮। বনি মোহরের—ইহারা গাৎফান বংশোদ্ভব।

৩৯। বনি মোরাদ—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

৪০। বনি মোন্‌তাকেক্‌—ইহারা বনি আমের বংশোদ্ভব।

৪১। বনি মোরাঃ—ইহাদের দলস্থ ১৩ জন লোক প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) নিকট আসিয়া প্রথমে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে তাঁহারা স্বকীয় বাসস্থানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বদেশবাসী সকলকে মুসলমান করেন।

৪২। বনি নাখা—ইহাদের দলস্থ ২০০ জন লোক হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) নিকট আসিয়া প্রথমে মুসলমান হয়।

৪৩। বনি নহদ্‌—ইহারা হিমিয়ার বংশোদ্ভব।

৪৪। বনি ওজয়া—ইহারা খাজায়া বংশোদ্ভব, সুরিয়ায় বাস করিত।

৪৫। বনি রাহা—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

৪৬। বনি রাওয়াসা—ইহারা বান আমের বংশোদ্ভব।

৪৭। বনি সাদ-হোজেম—ইহারা খাজায়া বংশোদ্ভব।

৪৮। বনি সাদেফ—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

৪৯। বনি সত্নম্‌—ইহারা বনি হানিফা বংশোদ্ভব।

৫০। বনি-সহিম—ইহারা বনি সয়বান বংশোদ্ভব।

৫১। বনি-সকিফ—ইহারা হাওয়াজেন বংশোদ্ভব। ইহারা প্রসিদ্ধ লাৎ দেবীর উপাসনা করিত। ইহাদের দলপতি আরোয়া মদীনায় আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সকলকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে হত্যা

করে। তিনি মৃত্যুকালে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশপূর্ণ কথা বলিয়া যান, তাঁহার সেই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া সাকিফ দলস্থ লোকগণের অন্তর মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। তখনই তাহাদের মধ্য হইতে ২০ জন লোক হজরতের নিকট আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সকলকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করে।

৫২। বনি সালামানি—ইহারা খাজায়া বংশোদ্ভব। 'সালামান' নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাসস্থান ছিল।

৫৩। বনি সয়বান—ইহারা বনি বকর-বেন-অয়েল বংশোদ্ভব

৫৪। বনি সোয়াদা—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

৫৫। বনি তগ্‌লেব—ইহারা মেসোপটেমিয়ায় (ইরাকে-আরব) বাস করিত। ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

৫৬। বনি তাজিম—ইহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ১৩ জন লোকের হস্তে আপনাদের জাকাতের দ্রব্যাদি দিয়া হজরতের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। তাহারা হজরতের নিকটে আসিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা এই সকল জাকাতের দ্রব্যাদি তোমাদের দেশীয় ভিক্ষুকদিগকে দান করিও।" ইহারা কেন্দা বংশোদ্ভব।

৫৭। বনি তামিম—ইহারা সুরিয়ার (শাম) নিকট বাস করিত।

৫৮। বনি তাই—ইহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল, পরে হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হয়।

৫৯। বনি জোবায়েদ—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

এইরূপে অচিরকাল মধ্যেই সমুদয় আরবদেশবাসী জড়োপাসক, খৃষ্টান ও য়িহুদিগণ আগ্রহাতিশয় সহকারে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পয়গম্বর আখেরজ্জমান হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) প্রেরিতত্ব লাভের ৩য় বৎসর হইতে হিজরীর ষষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় ষোড়শ বৎসর কাল তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক নানা অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াও একমাত্র অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার উপাসনা মানবজাতির মধ্যে প্রচারে ব্রতী হইয়া সমুদয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক সমগ্র আরবদেশকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ঐশী বলে বলীয়ান্ হইয়া প্রসিদ্ধ জড়োপাসাক, য়িহুদী ও খৃষ্টানমণ্ডলীর মধ্যে সত্যস্বরূপ আল্লাহ্-তায়ালার উপাসনা প্রচলিত করেন। আরবদেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগণকে ধর্ম্ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে একতার পবিত্র বীজ বপন করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন আরবদেশবাসিগণের দেবোপাসনা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কার্য্যকলাপ বিলোপ করিবার জন্য অবিরত চেষ্টা করিয়া সর্ব্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সকল-মনোরথ হইয়াছিলেন। পৃথিবীতে এরূপ অসাধারণ ও অনুপম সাফল্য লাভ, পূর্ব্ববর্ত্তী অপর কোন পয়গম্বরের অদৃষ্টে ঘটে নাই। পৃথিবীর শত শত জাতীয় ৪০।৪৫ কোটী মনুষ্য

"লায়েলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদুর রসুলোল্লাহ্" এই পবিত্র কালেমা উচ্চারণ করিয়া পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছে। য়িহুদী খৃষ্টীয়ান, পৌত্তলিক, অগ্নি-পূজক, জড়বাদি ভূত-প্রেত পূজক, বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি পূজক, নাস্তিক প্রভৃতি বহু অলীক ও অসার ধর্ম্মবাদী মনুষ্যগণ আজ ইস্লামের সুস্নিগ্ধ আশ্রয় ছায়ায় পরম সুখে জীবনাতিবাহিত করিতেছে।

হজরতের আদেশে জয়দের পুত্র ওসামার [রাজিঃ] যুদ্ধসজ্জার বিষয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এক সময়ে সুরিয়ার (সামের) খৃষ্টানগণ হজরত মোহাম্মদ (সাল্‌ঃ)এর প্রেরিত একজন দূতকে হত্যা করিয়াছিল। হজরত তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদানার্থ ২৬শে সফর সোমবারে জয়দের পুত্র ওসামার (রাজিঃ) অধীনে সৈন্য দিয়া 'ওবনা' নামক স্থানে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে মুসলমান সৈন্য একত্রিত হইল। কিন্তু তিনি ২৮শে সফর বুধবারে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তথাপি পরদিন প্রাতে তিনি ওসামাকে সৈন্যগণের নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে পবিত্র পতাকা দিলেন। ওসামা সেই পতাকা পথিমধ্যে হোসায়েবের পুত্র বুরিদার (রাজিঃ) হস্তে অর্পণ করেন। পরে তিনি মদীনার নিকটস্থ 'জোরফ' নামক স্থানে সৈন্য সংগ্রহার্থ শিবির স্থাপন

করেন। এদিকে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) মহাজের ও আনসারদিগের মধ্য হইতে হজরত আবুবকর (রাজিঃ), হজরত ওমর (রাজিঃ), হজরত ওসমান (রাজিঃ), সায়াদ-বেন-আবি-আকাস (রাজিঃ) ও আবু-ওবেদা-বেন-জারাঃ (রাজিঃ) প্রভৃতি প্রধান প্রধান সাহাবাদিগকে ওসামার (রাজিঃ) সমভিব্যাহারে যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু হজরত আলী (রাজিঃ)কে যাইতে বলিলেন না। তিনি ওসামাকে আমিরত্ব (নেতৃত্ব) পদ প্রদান করায় অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, একজন ক্রীতদাসের পুত্রকে আনসার ও মহাজের-দিগের উপর আমীরত্ব পদ প্রদান করা অনুচিত হইয়াছে। হজরত সেই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন এবং জ্বর ও শিরঃপাড়া সত্বেও মস্‌জেদে গিয়া মেম্বরোপরি উপবেশনপূর্ব্বক একটী বক্তৃতা করিয়া সকলকে বলিলেন, "প্রিয় মুসলমানগণ! তোমরা ওসামার সম্বন্ধে কি বলিতেছ? আমি জয়দকে মুতার যুদ্ধে আমির (নেতা) করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধেই বা কি বলিতেছ? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, জয়দ ও ওসামা আমীরের যোগ্য, অধিকন্তু আমার স্নেহপাত্র। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, 'তোমরা ওসামাকে তোমাদের আমীর বলিয়া গ্রহণ কর; সে তোমাদের মধ্যে একজন সৎলোক'।" এই বলিয়া তিনি গৃহে চলিয়া গেলেন, মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া ওসামার (রাজিঃ) পতাকার চতুর্দ্দিকে একত্রিত হইতে লাগিলেন।

এই রাত্রে হজরতের পীড়া পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। ১০ই রবিয়ল আউয়ল তারিখে ওসামা (রাজিঃ) হজরতের নিকট বিদায় লইবার জন্য মদীনায় আগমন করেন, কিন্তু হজরতের পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে সেদিন তিনি ওসামার সঙ্গে কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক ওসামার স্কন্ধোপরি নিক্ষেপ করিলেন। ওসামা (রাজিঃ) মনে করিলেন যে, হজরত তাঁহাকে অশীর্ব্বাদ করিতেছেন। সেদিন তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আবার পরদিন প্রাতে তিনি হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সেই দিন হজরত একটু সুস্থ ছিলেন বলিয়াই ওসামার সহিত কথোপকথনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

পরদিন ১২ই রবিয়ল আউয়ল তারিখে ওসামা (রাজিঃ) শিবির হইতে 'ওবনায়' যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার জননী ওম্মে আয়মন তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, হজরত মোহাদ (সালঃ) মুমূর্ষাবস্থাপন্ন হইয়াছেন। ওসামা (রাজিঃ) এই মর্ম্মবিদারক সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রধান প্রধান সেনাপতি ও সৈন্যদলসহ মদীনায় প্রত্যাগমন করিলেন, বুরিদা পবিত্র যুদ্ধ পতাকাটী হজরতের গৃহদ্বারে স্থাপন করিলেন।

হজরতের পরলোক গমন।

(হৃদয় বিদারক শোকাবহ ঘটনা!)

হজরত মোহাম্মদ (সাল:) প্রত্যেক বৎসর একবার সমুদয় কোরআন শরিফ পাঠ করিয়া হজরত জেব্রিলকে শুনাইতেন, কিন্তু এই বৎসর তিনি তাঁহাকে দুইবার কোরআন শরিফ শ্রবণ করাইয়াছিলেন; ইহা তাঁহার আসন্ন স্বর্গারোহণের একটী চিহ্ন। তিনি প্রত্যেক বৎসর একবার এতেকাফ (১) করিতেন, কিন্তু এই বৎসর দুইবার এতেকাফ করেন; ইহাও তাঁহার তিরোভাবের আর একটী লক্ষণ।

আবুসয়িদ খাদ্রি (রাজি:) বলিয়াছেন, "একদিন হজরত মোহাম্মদ (সাল:) মসজেদে মেম্বরোপরি বসিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলেন, "মুসলমানগণ! আল্লাহতায়ালা তাঁহার ভৃত্যদিগের মধ্যে একজনকে এরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন যে, জীবিত থাকিয়া পার্থিব এবং পারলৌকিক সুখসম্ভোগকরণ, এই দুইটার মধ্যে সে একটী মনোনীত করিতে সক্ষম। কিন্তু সেই ভৃত্য পরকালের সুখ-সম্ভোগ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, পার্থিব সুখে

---

(১) যে মসজেদে বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া নামাজ পড়ে, সেই মসজেদে কোন সংকল্প করিয়া রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে এক বা ততোধিক দিন বাস করাকে "এতেকাফ" কহে। হজরত মোহাম্মদ (সাল:) প্রত্যেক বৎসর রমজান মাসের শেষ ১০ দিন পর্য্যন্ত মসজেদে এতেকাফ করিতেন, কিন্তু একাদশ হিজরিতে ২০ দিন পর্য্যন্ত এতেকাফ করিয়াছিলেন।

প্রলোভিত হয় নাই।" হজরত আবুবকর (রাজিঃ), হজরতের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অন্যান্য সকলে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, 'হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) কোনও একজন লোকের কথা বলিয়াছেন, তজ্জন্য হজরত আবুবকর (রাজিঃ) কেনই বা ক্রন্দন করিতেছেন?' কিন্তু অল্পবুদ্ধি মানবগণ সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) স্বীয় অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। হজরত আবুবকর (রাজিঃ) সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও হজরতের একান্ত ভক্ত ছিলেন বলিয়া হজরতের কথার ভাবার্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরে হজরত বলিলেন, 'পৃথিবীর মধ্যে আবুবকরের (রাজিঃ) নিকট আমি সর্ব্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞ। যদি খোদাতায়ালা ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতাম, তাহা হইলে আবুবকরের (রাজিঃ) সঙ্গেই বন্ধুত্ব করিতাম।' পরে তিনি বলিলেন, 'মসজেদের মধ্যে আবুবকরের (রাজিঃ) জানালা ভিন্ন আর যেন কোন জানালা খোলা না থাকে।' যদিও হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) স্পষ্টরূপে কাহাকেও আপনার প্রতিনিধি (খলিফা) নিযুক্ত করিয়া যান নাই, তথাপিও উপরোক্ত কথাগুলিতে (হাদিসে) স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহার মৃত্যুর পর হজরত আবুবকর (রাজিঃ) খলিফা হন, ইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল। উপরোক্ত কথাগুলি হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন।"

পীড়িতাবস্থায় একদিন রাত্রে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) 'জিন্নাত-অল-বাকি' নামক সমাধি-ক্ষেত্রের পরলোকগত লোকগুলির আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভৃত্য মোয়ায়হেবাকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপনীত হইয়া সকলের আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তৎপরে তিনি মোয়ায়হেবাকে আহ্বান করিয়া বলেন, "মোয়ায়হেবা! পৃথিবীতে অধিক কাল জীবিত থাকিয়া পার্থিব সুখসম্ভোগ করা আর শীঘ্রই খোদাতায়ালার নিকট প্রত্যাগমন করা, এই দুইটীর মধ্যে খোদাতায়ালা আমাকে একটী মনোনীত করিয়া লইতে বলিয়াছেন; আমি শেষটী মনোনীত করিয়াছি।" তৎপরে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

হজরতের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে শুনিয়া বিবী ফাতেমা জোহরা (রাঃ আঃ) একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বিবী আয়েশা (রাঃ আঃ) বলিয়াছেন, "ফাতেমা (রাঃ আঃ) হজরতের নিকট আসিলে, তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পার্শ্বদেশে বসাইলেন। পরে তিনি তাহার কাণে কাণে কয়েকটী কথা বলিলেন, ফাতেমা (রাঃ আঃ) তাহা শুনিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। হজরত তাঁহার মানসিক কষ্ট দেখিয়া আবার তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন, তাহা শুনিয়া ফাতেমার বদন প্রফুল্ল হইল। তখন আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ক্রন্দনের পরেই হাস্য ও দুঃখের পরেই সুখ যে এত

নিকট, ইহা আমি ত কখন দেখি নাই। বল ইহার অর্থ কি ?”
ফাতেমা (রাজিঃ) উত্তর করিল, ‘আমি সে কথা এক্ষণে প্রকাশ করিতে পারিব না।’ ফলতঃ বিবী ফাতেমা (রাঃ আঃ) হজরতের জীবিতাবস্থায় উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই ; কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণের পর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, “হজরত আমাকে প্রথমে বলেন যে, প্রত্যেক বৎসর জেব্রিল আমার সঙ্গে একবার কোরআন শরিফ পাঠ করিতেন, কিন্তু এ বৎসর দুই বার কোরআন শরিফ পাঠ করিয়াছেন, ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, আমার মৃত্যু নিকট।” এই কথাই ক্রন্দনের কারণ। পরে তিনি আমাকে বলেন, “আমার আত্মীয়গণের মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রথমে আমার সহিত মিলিত হইবে, এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি হাসিয়াছিলাম।” যাহা হউক, হজরতে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। হজরতের স্বর্গারোহণের ছয় মাস পরে ৩রা রমজান তারিখে বিবী ফাতেমা (রাঃ আঃ) মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং স্বর্গধামে পরম শ্রদ্ধাস্পদ ওয়ালেদ মাজেদের সহিত সম্মিলিত হন।

একদিন হজরত একটু সুস্থ হইলে মস্‌জেদে গিয়া উপাসনান্তর মেম্বরোপরি উপবেশনপূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “যদি তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় দোষ জানিতে পার, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট বল, আমি তাহার ক্ষমার জন্য খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করি।” ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি—যিনি এতদিন পর্য্যন্ত আপনাকে ভক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ

মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন—দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে প্রতারক ও দুর্ব্বল শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন হজরত ওমর (রাজিঃ) চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খোদাতায়ালা যাহা গুপ্ত রাখেন, আপনি কেন তাহা প্রকাশ করিতেছেন?" তখন হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হজরত ওমর (রাজিঃ)কে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হে ওমর! পরজগতে কষ্ট সহ্য করা অপেক্ষা ইহজগতে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা শ্রেয়।" ইহা বলিয়া তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিলেন, "হে দয়াময় খোদাতায়ালা! তাহাকে অকপট ও ধর্ম্মপরায়ণ কর এবং যাহাকে হিতাহিত জ্ঞান বলে, তাহা তাহার অন্তরে সমর্পণ কর, আর তাহার অন্তর হইতে মানসিক দুর্ব্বলতা হরণ কর।"

অনন্তর তিনি সকলকে বলিলেন, "এখানে এমন কি কেহ আছ, আমি যাহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়াছি? এক্ষণে সে তজ্জন্য আমাকে তিরস্কার করুক। এখানে এমন কি কেহ আছ, আমি যাহার নিকট হইতে উৎকোচ কিম্বা ঋণ গ্রহণ করিয়াছি? এক্ষণে সে আমার নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করুক।" তখন এক ব্যক্তি হজরতকে স্মরণ করাইয়া দিল, "আপনি এক সময়ে আমার নিকট হইতে তিন দেরহাম লইয়া একজন দরিদ্রকে দান করিয়াছিলেন, তাহাই আমি আপনার নিকট পাইব।" হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই অর্থ দিয়া বলিলেন, "ইহ-জগতে ইহা অতি সহজে সম্পন্ন

হয়। কিন্তু পর-জগতে চিরকাল ইহার ভার বহন করিতে হয়।” পরে তিনি ওহোদ প্রভৃতি যুদ্ধে হত লোকদিগের আত্মার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

অনন্তর তিনি মহাজের ও আনসারদিগকে নানা উপদেশ দিয়া বলিলেন, “সমুদয় আরব দেশে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিও, নূতন ধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগকে তোমাদের মধ্যে স্থান দান করিও এবং তোমরা সর্ব্বদা ধর্ম্ম কর্ম্মে রত থাকিও।” তদনন্তর তিনি তথা হইতে বিবী আয়েশার (রাজিঃ) গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন হইতে আবার তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইল।

হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) পীড়িতাবস্থাতেও শিষ্যগণ সমভি-ব্যাহারে মস্‌জেদে নামাজ পড়িতেন। কিন্তু স্বর্গারোহণের তিন দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি আর মস্‌জেদে গিয়া নামাজ পড়িতে পারেন নাই। তাঁহার আদেশানুসারে ঐ দিনত্রয় হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া নামাজ পড়িয়া-ছিলেন।

৯ই রবিয়ল আউওল শুক্রবারে তাঁহার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইল। সেই দিন বেলাল (রাজিঃ) আজান দিয়া হজরতকে নামাজ পড়িবার জন্য ডাকিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, বেলাল। তুমি আবুবকর (রাজিঃ)কে এমামের (আশ্চার্য্যের) “কার্য্য করিতে বল, আর তোমরা সকলে তাঁহার সহিত নামাজ পড়।” তখন বেলাল (রাজিঃ) মস্‌জেদে গিয়া হজরত আবু-বকর (রাজিঃ)কে বলেন, “প্রেরিত মহাপুরুষ আপনাকে এমাম

হইয়া সকলকে লইয়া নামাজ পড়িতে অনুমতি দিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া হজরত আবুবকর (রাজিঃ) দুঃখিত হইলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন হজরত সেই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিবী ফাতেমা (রাজিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফাতেমা! কি জন্য লোকে ক্রন্দন করিতেছে ?" বিবী ফাতেমা (রাঃ আঃ) বলিলেন, "আপনাকে মস্‌জেদে দেখিতে না পাইয়া ক্রন্দন করিতেছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি হজরত আলী (রাজি) ও ফজলকে ডাকিলেন। তিনি তাঁহাদের স্কন্ধোপরি ভর দিয়া মস্‌জেদে গেলেন এবং হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) পশ্চাতে বসিয়া নামাজ পড়িলেন। হজরত আবুবকর (রাজিঃ) এমামের কার্য্য করিলেন। নামাজ পড়া শেষ হইলে তিনি সমবেত মুসলমানমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মুসলমানগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম্মপ্রচারকের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া কেন ক্রন্দন করিতেছ ? আমার পূর্ব্বে কি কোন ধর্ম্ম-প্রচারক চিরকাল জীবিত ছিলেন ? এবং তোমরা কি মনে কর যে, আমি কখন তোমাদিগকে ত্যাগ করিব না। খোদাতায়ালার ইচ্ছানুযায়ী সকল কার্য্যই সম্পন্ন হয় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকল জীব জন্তুই দেহ ত্যাগ করে ফলতঃ যাহা কোন প্রকারেই পরিবর্ত্তিত হয় না, এমন কার্য্যের জন্য তোমরা দুঃখ প্রকাশ করিও না। আমি তোমাদের ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছি এবং আমার শেষ উপদেশ এই "তোমরা একত্রিত হইয়া দলবদ্ধ থাকিও, পরস্পরকে ভালবাসিও, সম্মান

করিও এবং শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিও। তোমরা ধর্ম্মপ্রচারে রত থাকিও এবং দৃঢ় বিশ্বস্ততাসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া ধর্ম্মকার্য্যাদি সম্পন্ন করিও। নিশ্চয় জানিও যে, মানবগণ কেবল ইহার সাহায্যেই উন্নতিশীল হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আমি আল্লাহতালার আদেশে তোমাদের পূর্ব্বে চলিয়া যাইব এবং তোমরাও আমার পশ্চাৎগামী হইবে। জানিও যে, মৃত্যু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিও। আমার আর একটী অনুরোধ এই যে, যেরূপ পূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রচারক-গণের লোকান্তর গমনের পর তত্তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের কবরকে স্ব স্ব উপাসনার স্থান করিয়াছে, তোমরা আমার কবরকে সেরূপ উপাস্য স্থান করিও না।" অবশেষে তিনি কোর-আন শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতটী পাঠ করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন,—এই পারলৌকিক আলয়, যাহারা পৃথিবীতে উচ্চতা ও উপদ্রব আকাঙ্ক্ষা করে না, আমি তাহাদের জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিতেছি, এই ধর্ম্মভীরুদিগের জন্যই (শুভ) পরিণাম।" পরে তিনি হজরত আলী (রাজিঃ) ও ফজলের (রাজিঃ) স্কন্ধে ভর দিয়া বিবী আয়েসার (রাঃ আঃ) গৃহে গমন করিলেন।

তাঁহার পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে বিবী ফাতেমা (রাঃ-আঃ) সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন। সেই সময়ে তিনি জামাতা হজরত আলীকে ডাকিয়া বলিলে, "আলি! আমার অন্তিম সময় উপস্থিত, আমি অমুক য়িহুদীর নিকট কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তুমি

তাহা পরিশোধ করিও। আমার মৃত্যুর পর পৃথিবীতে তোমার অনেক বিপদ উপস্থিত হইবে, কিন্তু তখন তুমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহা সহ্য করিও।" হজরতের এই হৃদয় বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরবর হজরত আলী (রাজিঃ) মর্ম্মাহত হইয়া অনিমেষ লোচনে হজরতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সহসা কি এক অশান্তি ঝটিকা প্রবাহিত হইল। তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। এই সময়ে হজরত আবার প্রিয়তম দৌহিত্র এমাম হাসান (রাজিঃ) ও হোসায়েন (রাজিঃ) কে নিকটে ডাকিলেন এবং স্নেহ গদগদ ভরে আহ্বান করিয়া মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন গৃহস্থিত নরনারী ও বালকবালিকা সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। সকলেরই অন্তর হজরতের ভাবী বিরহে আকুল হইয়া উঠিল। হজরতের মুখকান্তি কিন্তু প্রফুল্ল কমল সদৃশ অম্লান ও চিন্তালেশ শূন্য! তখন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ খোদাতায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহার হৃদাকাশ তখন খোদাতায়ালার জ্যোতিঃর বিহার ক্ষেত্র হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিম্ব জ্যোতিঃ-জলধিতে নিমিলীন হইবে বলিয়া আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সহসা সম্মিলন —সেই জ্যোতির্ম্ময় পবিত্রমূর্ত্তি সহসা স্থির ধীর প্রশান্তভাব ধারণ করিল বিশ্বকর্ত্তা আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে প্রাণান্তকারী ফেরেশ্‌তা আজরাইল হজরতের উপর তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য

সম্পাদন করিলেন। হায়, বলিতে বিদীর্ণ হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে, লেখনী অচল হইতেছে, একাদশ হিজরীর ১২ই রবিয়ল আউওল সোমবার (৬৩২ খৃঃ, ৮ই জুন) দিবসে জগতের শান্তিদাতা, ন্যায়-নিষ্ঠা-সদাচারাদি গুণের সর্ব্বৈব নিকেতন, প্রেরিত পুরুষ-প্রভাকর হজরত মোহাম্মদ মস্তফা (সাল্‌ঃ) আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। যে দিবস জন্ম, ৬৩ বৎসর ধরাধামে অবস্থানের পর ঠিক সেই দিনেই স্বর্গারোহণ! কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তাঁহার পবিত্রাত্মার বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে সুরভিত হইল। লোক ঘ্রাণবিমুগ্ধ হইয়া অবাক হইয়া রহিল। বিবী ওম্মে সালেমা (রাঃ-আঃ) বলিয়াছেন, "আমরা সেই গৃহে অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই অপার্থিব সৌরভের ঘ্রাণানুভব করিয়াছিলাম।"

মুহূর্ত্তমধ্যে হজরতের স্বর্গারোহণের সংবাদ আরবের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। যে শুনে সেই স্তম্ভিত—সেই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় অবাক্, অবশাঙ্গ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! সকলের হৃদয়ে যেন বিষমুখী শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। অন্দরে বাহিরে হাহাকার—পথে প্রান্তরে হাহাকার, হাটে বাজারে হাহাকার গভীর শোকধ্বনির উচ্চনাদে আরবের গগনমণ্ডল শব্দায়মান হইয়া উঠিল। আবালবৃদ্ধবনিতার মুখমণ্ডল আজ মলিন—অন্তর সুখশান্তিহীন। ভক্ত মুসলমানগণ হায় কি হইল বলিয়া অশ্রু-প্লাবিত বদনে দলে দলে আসিয়া হজরতের শবের চতুর্দ্দিকে

বেষ্টন করিয়া উচ্চরোলে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ক্রন্দন কোলাহলে যেন তথায় মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। সকলেই শোকার্ত্ত, সকলেই মুহ্যমান; কে আর কাহাকে প্রবোধ দিবে? হজরতের প্রাণাধিক দুহিতা বিবী ফাতেমার (রাঃ-আঃ) শোকের অবধি নাই। পিতার অন্তর্দ্ধানে তাঁহার মুখমণ্ডল অতিশয় মলিন ভাব ধারণ করিল, সে মলিন ভাব তাঁহার জীবিত কালে ক্ষণকালের জন্য ও তিরোহিত হয় নাই— তাঁহার সে পবিত্র বদনমণ্ডলে আর কখনও হাস্যরেখা বিকশিত হয় নাই। উঃ পিতৃ-বিয়োগজনিত শোক কি দুর্ব্বিষহ! আর সেই সর্ব্বলোক বরণীয়া পুণ্যশীলা মহিলা বিবী আয়েসা? তাঁহার শোকসিন্ধু আজ স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেও ধরিতেছে না! তিনি কাতরকণ্ঠে শোকাশ্রুপ্লাবিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! যিনি ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা দরিদ্রতাকেই প্রিয় মনে করিতেন; যিনি স্বীয় ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পাপক্ষমার জন্য অহোরাত্র প্রার্থনা করিতেন; যিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং নানা বিপদগ্রস্ত হইয়াও কখন তাহাদিগকে অভিশাপ দেন নাই বরং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতেন; যিনি সর্ব্বদা দীন দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দান করিতেন; শত্রুগণের প্রস্তরাঘাতে যাঁহার দন্ত ভগ্ন ললাটদেশ রক্তাক্ত হইয়াছিল, যিনি কখন প্রচুর পরিমাণে যবের রুটিও ভক্ষণ করিতে পাইতেন না; সেই ধর্ম্মপ্রচারকের বিষয়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" অন্যান্য ওম্মোত মোমেনিনগণও শোকে একান্ত অধৈর্য্য ও কাতর হইয়া পড়িলেন, তাহাদের আশ্রয় স্বরূপ মহা-

নিটপি আজ ভূপতিত হওয়াতে আজ সকলেই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

ফলতঃ হজরতের শোকে মদীনার মুসলমানগণ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। হজরত ওমরের (রাজিঃ) এতদূর চিত্ত-বৈকল্য ঘটিয়াছিল যে, তিনি শোকাকুলিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "হজরতের মৃত্যু হয় নাই। যেমন হজরত মুসা (আলাঃ) তুর পাহাড়োপরি খোদাতায়ালার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইরূপ ইনিও অচৈতন্য হইয়া আছেন।" এই উন্মত্ততা বশতঃ তিনি একখানি তরবারি হস্তে লইয়া গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "যে কেহ হজরতের মৃত্যু হইয়াছে বলিবে, আমি এই তরবারির আঘাতে তাহাকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিব।" ইহা যে হজরত-প্রীতি ও তৎপ্রতি প্রগাঢ় ভক্তির অদ্বিতীয় নিদর্শন এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের চরম ফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে স্থিরবুদ্ধি সুধীর গম্ভীর হজরত আবুবকর (রাজিঃ) ধৈর্য্যাবলম্বনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি আত্মহারা হন নাই। তিনি হজরতকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া শোক প্রকাশ পূর্ব্বক গৃহের বাহিরে আসিলেন এবং হজরত ওমর (রাজিঃ)কে শান্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু হজরত ওমর (রাজিঃ) তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ওমর! ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যু হইয়াছে; তুমি শ্রবণ কর নাই যে, খোদাতায়ালা তাহার ধর্ম্মগ্রন্থে (কোর-আনে) বলিয়াছেন, তুমি

মোহাম্মদ (সালঃ) তাঁহার প্রেরিত' ও মৃত্যুর অধীন আর তাহারাও মৃত্যুর অধীন।' তবে কেন ওমর, তুমি বলিতেছ যে, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই ?"

পরে হজরত আবুবকর (রাজিঃ) মসজেদে গিয়া মেম্বরোপরি উপবেশন পূর্ব্বক শোকার্ত্ত জনগুলীকে আহ্বান করিয়া একটী প্রাণ মাতানো সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে তিনি আল্লাহতায়ালার ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "যাহারা হজরত মোহাম্মদের অনুকরণ করিত, তাহারা অবগত হউক যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; আর যাহারা খোদাতায়ালার উপাসনা করিত, তাহারা অবগত হউক যে, খোদাতায়ালা জীবিত আছেন, কখন তাঁহার মৃত্যু হয় না।" পরে তিনি কোর-আন শরিফের নিম্ন-লিখিত আয়েত পাঠ করিলেন, মোহাম্মদ খোদাতায়ালার প্রেরিত বই আর কিছুই নয়, তাঁহার পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রচারকগণ সকলেই চলিয়া গিয়াছে। তবে যদি এই ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যু হয়, কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহা হইলে তোমারা কি চলিয়া যাইবে (অর্থাৎ ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে) ?" প্রবীণ পুরুষ, পরম ধার্ম্মিক ও হজরতের পরম ভক্ত হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) এই সকল সারগর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া হজরত ওমর (রাজিঃ) চৈতন্য লাভ করিলেন। অন্যান্য শিষ্যগণও তৎসহ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন আদর্শ ধর্ম্মাত্মা, জ্ঞানবৃদ্ধ হজরত আবুবকর (রাজিঃ) সকলকে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলেন।

হজরত আবুবকর (রাজিঃ)এর প্রবোধবাক্যে মুসলমানগণ

ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। তখন সেই পবিত্র পুরুষকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। হজরত আবুবকর (রাজিঃ) হজরতের আত্মীয়গণকে মৃতদেহ গোসল করাইতে বলিলেন। কেননা হজরত পীড়িতাবস্থায় একদিন বলিয়াছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয় স্বজন ভিন্ন অন্য কেহ যেন আমাকে গোসল না করায়।" সেই আজ্ঞানুসারে হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত আব্বাসপ্রমুখ (রাজিঃ) ব্যক্তিগণ তাঁহার মৃতদেহ গোসল করাইলেন। গোসল কার্য্য শেষ হইলে শব সুগন্ধি-দ্রব্য দ্বারা সিক্ত করা হইল। পরে তিন খানি বস্ত্রদ্বারা মৃতদেহ আচ্ছাদিত করা হইল। এই তিন খানি বস্ত্রের মধ্যে দুইখানি শ্বেতবর্ণ, অপর খানি ইমেন প্রদেশের চাদর। তৎপরে জানাজার নামাজ (১) পড়া হইল। জানাজার নামাজ পড়িবার সময়ে সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া নামাজ পড়িলেন। সর্ব্বাগ্রে পুরুষগণ, পরে স্ত্রীলোকগণ ও অবশেষে বালকবালিকাগণ নামাজ পড়িলেন। (২)

এক্ষণে কোন্ স্থানে কবর দেওয়া হইবে, তদ্বিষয়ে নানা গোলোযোগ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, যে গৃহে হজরত অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, সেই গৃহে; কেহ বলিলেন, মসজিদে

(১) শব সম্মুখে রাখিয়া অন্তিম প্রার্থনা।

(২) কেহ কেহ বলেন যে,প্রথমে হজরতের আত্মীয় হজরত আলী(রাজিঃ) ও হজরত আব্বাস (রাজিঃ) প্রভৃতি বনি হাশেম বংশীয়গণ, পরে মহাজের ও আনসারগণ এবং সর্ব্বশেষে অন্যান্য মুসলমানগণ জানাজার নামাজ পড়িয়াছিলেন।

(মদীনার মস্‌জিদে) ; কেহ বলিলেন, বাকি সমাধিক্ষেত্রে ; কেহ বলিলেন, মক্কায় ; কেহ বা বয়তল মোকদ্দসে (জেরুজেলেম)—হজরতের কবর হওয়া উচিত, বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। বয়তল মোকদ্দসে কবর দেওয়ার কথা বলিবার কারণ এই যে, সেই স্থানে অনেক ধর্ম্মপ্রচারকের কবর আছে। কিন্তু পরিশেষে হজরত আবুবকর (রাজিঃ) বলিলেন, আমি এক সময়ে হজরতের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে যিনি যে স্থানে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, সেই স্থানেই তাঁহার কবর দেওয়া হইয়াছে"। (১) হজরত আবু বকরের এই কথাতেই সমস্ত মীমাংসা হইয়া গেল। হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হজরত আয়েশা বিবির (রাঃ আঃ) গৃহস্থিত যে খাটোপরি দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, সেই খাটের নিম্নদেশেই তাঁহার কবর দেওয়া হইল।

মস্‌জেদের অতি নিকটেই সংলগ্ন, বিবী আয়েশার (রাঃ আঃ) বাস গৃহ, এই বাসগৃহের প্রাচীর তখন মৃত্তিকা নির্ম্মিত এবং খর্জ্জুর পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানটী চতুর্ভুজের ন্যায় স্তম্ভাবলিতে পরিবৃত ; ইহার দৈর্ঘ ১৬৫ পদবিক্ষেপ স্থান আর প্রস্থ ১৩০ পদবিক্ষেপ স্থান। অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক স্থান ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চারিটী দ্বার আছে, ভিতরে নানাবিধ আকৃতিবিশিষ্ট অতি

(২) বাহিরে কবর দেওয়া হইলে অন্যান্য নবীর ওম্মতের ন্যায় কবর "পূজার স্থান" করিয়া লইবে, এইজন্য হজরত আয়েশার (রাঃ আঃ) হুজরায় দফন করা হয়।

সুন্দর সুন্দর চিত্রিত বহুসংখ্যক নেত্র-বিমুগ্ধকর স্তম্ভ শোভা পাইতেছে।

মস্‌জেদের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে একটী প্রশস্ত স্থান আছে, তাহা লৌহ-শলাকা দ্বারা বেষ্টিত। ঐ লৌহ-শলাকাগুলি সবুজবর্ণ রঞ্জিত, এই স্থানকে হোজ্‌রা বলে। এই স্থানে হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) হজরত আবুবকর (রাজিঃ) হজরত ওমরের (রাজিঃ) কবর আছে। এই স্থানের মধ্যস্থলে একটী গুম্বজ আছে, সেই গুম্বজের চতুর্দ্দিকে কতিপয় স্তম্ভ আছে। তীর্থযাত্রিগণ দূর হইতে ঐ সকল স্তম্ভ দর্শনপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মগুরু পবিত্রাত্মা হজরত মোহাম্মদের (সালঃ) কবর বলিয়া দরূদ পাঠ করিতে থাকেন।

এস্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে হজরত আলীর (বহু) আদর্শ পত্নী রছুল-নন্দিনী হজরত ফাতেমার জোহরার তদানিন্তন অবস্থা প্রসঙ্গ ক্রমে নিম্নে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল।

হজরত রেছালতমাবের (ছালঃ) ওফাতে (পরলোক গমনে), হজরত আলী (রাজিঃ) অত্যন্ত শোকাকুলিত হইয়াছিলেন। সেই মহাবীরের বীর হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল; তিনি শৈশবে পিতামাতাকে ছাড়িয়া যে মহা পুরুষের আশ্রয়ে স্নেহ করুণায় লালিত পালিত হইয়াছিলেন, তিনি ছায়ার ন্যায় যাঁহার অনুসরণ করিতেন, পিতার অপেক্ষায়ও অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন; অবশেষে যাঁহার স্নেহ পুত্তলী, স্বর্গের রাণী সুবর্ণ প্রতিমা, নারী কুলের আদর্শ দুহিতা-রত্ন হজরত ফাতেমাজোহরা (রাঃ আঃ) কে তাহার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে বন্দীভূত করিয়া

স্নেহের বন্ধন আরও দৃঢ়তর করিয়াছিলেন, সেই অতুলনীয় মানব-কুল-তিলক দিন দুনিয়ার মালেক পিতৃস্থানীয় হজরতকে হারাইয়া মহাবীর ও মহা সাধক হজরত আলী (কঃ অঃ) সমস্ত সংসার অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন। আবার পিতৃগত প্রাণ, পিতার স্নেহের অদ্বিতীয় আঁধার,হজরত ফাতেমা জোহরা (রাজিঃ আঃ)কে পিতৃ-শোকে একান্ত অভিভূত ও মৃতকল্প দেখিয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রাণের শান্তি, হৃদয়ের বল, শারিরীক শক্তি ইত্যাদি সমস্তই যেন বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি সমস্ত জগত অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন। মাতামহের শোকে অভিভূত এমামদ্বয়ের মুখের দিকে, তাকাইলে তাঁহার বীর হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইত। এই ভাবে তাঁহার দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ওদিক পিতৃ-শোকাভিভূতা হজরত খাতুনে জেন্নাত (রাঃ আঃ) দিন দিন এমনই কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাহার পক্ষে চলা ফেরা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। পিতৃ-শোকে তাঁহার কোমল হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি অনেক সময় পবিত্র রওজা মবারকে (হজরতের পবিত্র সমাধি অর্থাৎ কবর শরীফে) গিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। হজরত বিবী ফাতেমা জোহরার (রাজিঃ) কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি লাভের এই অবলম্বন ছিল যে, হজরত রেছালত মাব রোগ শর্য্যায় কন্যারত্নকে বলিয়াছিলেন, "অয়ি ফাতেমা' তুমি সর্ব্বাগ্রে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হইবে। পিতার পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই সৈয়দার পবিত্র হৃদয় পার্থিব-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার প্রাণের শান্তি দূর হইয়া গিয়াছিল। তিনি সহধর্ম্মিণী ও মাতা হওয়ার কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব খুবই বুঝিতেন; মৃত্যু কামনা করা যে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য, তজ্জন্য তিনি সেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামনা কখনও করিতেন না। সেই পিতৃগত প্রাণ কন্যার, হজরত রেসালত মাবের প্রতি কিরূপ অসাধারণ ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভাল বাসা ছিল, তাহা অন্যের অনুমানের বহির্ভূত। শৈশবে মাতৃ-হীনা হইয়া পিতা এবং মাতার উভয়ের সমগ্র স্নেহ রাশি স্বীয় আদর্শ পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠা বলিয়া স্নেহের পরিমাণ আরও অগাধ ও অপরিসীম ছিল। হজরত জ্যেষ্ঠা কন্যাদিগকে যথা সময়ে বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহারা ইতি পূর্ব্বে পরলোক গমনও করিয়াছিলেন, মহা পুরুষের পুত্র সন্তান কেহ জীবিত ছিলেন না। সুতরাং হৃদয়ের সমগ্র স্নেহ রাশি তিনি এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা কন্যারত্নের প্রতি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সে স্নেহের কোনও সীমা পরিসীমা ছিল না। আবার সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র, সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত পিতৃব্য পুত্র, শৈশবে যাঁহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছিলেন; সেই পরম সাধু পুরুষ অদ্বিতীয় বীর পুরুষ মহাপুরুষ গত প্রাণ হজরত আলীর (কঃ অঃ) হস্তেই শ্রেষ্ঠ স্নেহের পুত্তলিকে সম্প্রদান করিয়া হৃদয়ে অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে এই স্নেহ-লতার পরিচর্য্যায় মহা পুরুষ কতই সুখানুভব এবং শান্তি অনুভব করিতেন। স্বামী গত প্রাণ আদর্শ পত্নী মহামাননীয়া হজরত খোদায়জাতুল কোব্‌রার স্মৃতি তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে সর্ব্বদা

জাগরূক রাখিত। সেই মহীয়সী আদর্শ সতীর স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত হইলে তিনি আকুল প্রাণে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। ইহাতে কন্যা রত্নের প্রতি স্নেহের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইত। তিনি সর্ব্বদা ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রচার, ইস্‌লাম ধর্ম্ম রক্ষা, শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চিন্তায়, মুসলমানদিগের সর্ব্ববিধ সুখ-শান্তির কামনায়, অদ্বিতীয় আল্লাহতালার উপাসনা আরাধনায় মানব জাতির মঙ্গল কামনায় ব্যাপৃত থাকিলেও, স্নেহের পুত্তলী কন্যা রত্নের কথা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। অনবরত যুদ্ধ হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকিয়াও কন্যা-রত্নের বদন কমল দর্শনে সকল অশান্তি মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যাইতেন। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা-রত্নকে সম্প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে দুইটী দৌহিত্র-রত্ন জন্ম গ্রহণ করিলে আবার নূতন স্নেহের স্রোত প্রবাহিত হইল। যেন চক্ষের দুইটী তারা তিনি লাভ করিলেন। অনন্ত কর্ম্ম-কোলাহল হইতে একটু অবসর পাইলেই জামাতৃ গৃহে উপস্থিত হইয়া কন্যারত্ন ও দৌহিত্র-রত্ন দ্বয়ের দর্শন লাভও তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপে অনুপম আনন্দ লাভ করিতেন। কন্যা ও জামতাকে কত সদুপদেশ বাণী শুনাইতেন। দৌহিত্র দ্বয় ও দৌহিত্রীদিগকে লইয়া কত নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতেন। কন্যা-রত্নের প্রতি স্নেহের যে প্রবল ধারা প্রবাহিত হইত, এক্ষণে তাহা নূতন নূতন ধারা বিশিষ্ট হইয়া হৃদয়ে নূতন নূতন আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিত। এজন্য তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ আল্লাহ্‌তালার দরগায় কতই না শোকর-গোজার

হইতেন। সৃষ্টি কর্ত্তার প্রতি পবিত্র ভক্তি স্রোত শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উথলিয়া উঠিত। তখন কৃতজ্ঞতাভরে তিনি আনন্দে আত্ম-হারা হইতেন। দৌহিত্র দ্বয় ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন। তখন হজরতের পরম শত্রু মক্কার সমগ্র কোরেশ জাতি পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে ; আরবের অসংখ্য বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন সম্প্রদায় পবিত্র ইস্‌লামের সুশীতল আশ্রয়চ্ছায়ায় আসিয়া শান্তি লাভ করিয়াছে। আরবের বিভিন্ন অংশ হইতে "লায়লাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদোর রসুলোল্লাহ" এই পবিত্র ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া পবিত্র একেশ্বর বাদের জয় ঘোষণা করিতেছে, বিশাল আরব দেশের মধ্যে হজরতের প্রতিদ্বন্দ্বী—ইস্‌লামের শত্রু আর কেহ নাই। উত্তরে সুদূর সিরিয়া প্রান্তে রোমকগণ, ইরাক-সীমান্তে পারসিকগণ তখন বহিঃ শত্রুরূপে বিরাজ করিতেছিল। প্রেরিত মহাপুরুষ তখন নিশ্চিন্ত মনে ইস্‌লামের পবিত্র রীতি নীতি সম্বন্ধে শিষ্য-দিগকে উপদেশ দান এবং পবিত্র কোর-আন শরীফের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তাহাদিগকে শুনাইয়া প্রাণে অনুপম শান্তি অনুভব করিতেন। আর অবসর সময় স্নেহের পুত্তলীদিগকে লইয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু তাহাদিগকেও সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া কৃতার্থ করিতেন। পরম করুণাময় আল্লাহতালার পবিত্র আদেশের এক বিন্দুও যেন অন্যথা না হয়। তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন। সর্ব্বদা বেহেশ্‌তের (স্বর্গের) সুসংবাদ এবং দোজখের (নরকের) ভীতি

প্রদর্শন করিতেন। দরিদ্রতায় ছবর ও শোকর করিতে সন্তুষ্ট থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেও বিরত থাকিতেন না। পৃথিবীর অস্থায়িতা ও পরলোকের অসীমতা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। পৃথিবীতে এরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কোনও মহাপুরুষের ইতি পূর্ব্বে আবির্ভাব হয় নাই, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সেরূপ আদর্শ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে না। এ হেন মহাপুরুষের দ্বারা শিক্ষিতা দীক্ষিতা কন্যা রত্ন যে কত উচ্চাদর্শ সম্পন্ন ছিলেন, তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এরূপ অতুলনীয় মহাপুরুষরূপ আদর্শ পিতার তিরোধানে সৈয়দার (হজরত ফাতেমা জোহরা রাজি আল্লাহ আন্‌হার) হৃদয় কি ভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। বিনা মেঘে যেন বজ্রাঘাত হইয়া মহামাননীয়া সৈয়দার হৃদয় শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এত শীঘ্র তাঁহাকে পিতৃ-স্নেহ বঞ্চিত হইতে হইবে; মহাপুরুষ অকস্মাৎ মহাপ্রস্থান করিলেন। পিতৃ-বিয়োগে তিনি সংসার অন্ধকার দেখিলেন, পিতার সুমধুর আহ্বান, সুমধুর বাণী যেন তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল। স্নেহ-পরায়ণ পিতা যে মহা-প্রস্থান করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিতেও তাঁহার হৃদয় মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অধীর হইতে লাগিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় পিতার সুপবিত্র বদনমণ্ডল দর্শন করিবার জন্য তাঁহার কোমল প্রাণ একান্তই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পিতৃ-বিয়োগের পরবর্ত্তী কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার কোমল দেহ-লতা দারুণ শোক ভারে এলাইয়া

পড়িল। এই অবস্থায়ও তিনি স্বামী সেবা, সন্তানগণের লালন-পালন, সর্ব্ব প্রকার গৃহ-কর্ম্ম যথানিয়মে সম্পন্ন করিতে বিমুখ ছিলেন না। সন্তানদিগকে স্নান করান, বস্ত্রাদি পরিধান করান, যথা-সময়ে নাশ্‌তা ও আহার করান সকলই পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কিন্তু পবিত্র বদন-চন্দ্রিমা বিষাদ মেঘে আচ্ছন্ন। নিশিযোগে পিতার কবরস্থানে গিয়া কবরের পার্শ্বে বসিয়া অবিরল ধারে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন, এবং এশার নামাজের পর সেখানে বসিয়াই খোদাতালার আরাধনায় নিমগ্ন হইতেন।

এসময় মহামাননীয়া সৈয়দার—খাতুনে জান্নাতের (রাঃ আঃ) যে অবস্থা ছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পৃথিবীতে এরূপ পিতৃ-শোকের আদর্শ দেখা যায় না। সৈয়দার উপর যেন বিপদের একটা বিরাট পাহাড় চাপিয়া পড়িয়াছিল। সকলে মনে করিতেন, দুনিয়ার সাধারণ নিয়মানুসারে দিন যতই গত হইবে, শোকের ভার ক্রমশঃ লাঘব হইতে থাকিবে। কিন্তু সৈয়দা সম্বন্ধে অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার নিদারুণ শোক দিন দিন বাড়িয়া চলিল, পবিত্র দেহ-লতা ভাঙ্গিয়া গেল। আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিলেন। হায়! আহা! প্রভৃতি শোক-সূচক শব্দ ও তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তাঁহার জীবনের সঙ্গী হইল। স্নেহের কুসুম পুত্র এবং কন্যাদিগকে যদিও যথা-নিয়মে লালনপালন করান, তাহাদের সম্বন্ধে জননীর কর্ত্তব্য পালনে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেন না। কিন্তু তাহার

সে দগ্ধ হৃদয়ে কিছুতেই শান্তি বারি সিঞ্চিত হইতেছে না। পবিত্র বদন মণ্ডল সর্ব্বদাই বিষাদ-কালিমা মাখা। স্বামী এবং পুত্র কন্যাগণ স্ত্রী এবং জননীর শোকাপনোদের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না। সে অদম্য শোকানল ভীষণ দাবানলের ন্যায়, সৈয়দার কোমল হৃদয়খানি দগ্ধ করিতেছিল। মহামাননীয় রসুল নন্দিনী ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা কিছু মাত্র কার্য্যকরী হইতেছিল না। অবিরল ধারে তাহার নয়ন-অশ্রু প্রবাহিত ছিল। ক্রন্দনে উচ্চ-শব্দ নাই, অস্ফুট রোদনে হৃদয়ের শোক ভার লাঘব করিবার চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। হজরতের ওফাতের ৩ সপ্তাহও গত হইয়া ছিল না, একদিন হজরত খাতুনে জান্নাত তাহাজ্জদ নামাজে 'মশ্‌গুল' ছিলেন, আর সেদিন ঘরে কোনও খাদ্য দ্রব্যও পাক হইয়াছিল না, হজরত আলী (রাজিঃ) ও বালক বালিকা অনাহারে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন; আর সেই স্বর্গীয়া দেবী তখন পরম করুণাময় আল্লাহতালার মহাদরবারে উপাসনায় দণ্ডায়মান; নিদারুণ শোক ও অনাহারে ক্লিষ্টা দেহখানি আর স্থির থাকিতে পারিল না। হঠাৎ তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি সেই দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সজোরে ভূপতিত হইলেন। এমন জোরে পড়িয়া গেলেন যে, সেই দুর্ব্বল দেহে দারুণ আঘাত লাগিল! আহা! জীবনে কোনও দিন চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় নাই। এমন কি,

আঘাত পাইলে একটু হলুদ-চূণেরও ব্যবস্থা হইত না, সৈয়দার পতন শব্দে হজরত আলীর (রাজিঃ) ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, স্বর্গের দেবী মহামাননীয়া সৈয়দাতন্নেসা অচৈতন্যাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি মহাব্যথিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ প্রদীপ জ্বালিলেন ; সৈয়দার চক্ষে পানী ছেটাইয়া দিতে লাগিলেন ; কিয়ৎকাল পরে সৈয়দার চৈতন্য সম্পাদিত হইল, ঐ সময় হজরত আলীর (রাঃ) অশ্রুমালা সৈয়দার দেহে পড়িতেছিল। তদ্দর্শনে সেই নারীকুল-ভূষণা নিতান্ত অস্থির হইলেন, এবং স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, স্বামীন্ ! আপনি কেন রোদন করিতেছেন ?

হজরত আলী মরতুজা (রাজিঃ) কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমি খোদার কোদরত (মহিমা) দেখিতেছি। ঐ কোদরত এই যে, আজ দুবেলা আমাদের কাহারও মুখে অন্ন যায় নাই, এজন্য তোমার মাথার চক্কর আসিয়াছে (মস্তক ঘুরিয়াছে), এবং তুমি পড়িয়া গিয়াছ। এই কষ্টের বদলা (ফল) আমাদিগকে খোদাতালা জন্নতে (বেহেশত বা স্বর্গে) দিবেন। মহামাননীয়া সৈয়দা স্বামীর এই উক্তি শ্রবণে আকাশের দিকে চাহিলেন, আর খোদাতালার সোকরিয়া আদায় (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই রাত্রির আঘাতই ব্যায়রামের সূত্রপাত হইল। এক্ষণে তাঁহাকে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে, এবং চলাফেরা করিতে কষ্ট বোধ হইতে

লাগিল। এই অবস্থায় হজরতের রওজা মবারকে (কবর শরীফে) যাতায়াতও কমিয়া গেল। পিতৃ সমাধিতে যাতায়াত কম হওয়াতে মনের অশান্তি আরও বাড়িয়া গেল। হজরত রছুলুল্লার একটী পিরাহান (কুরতা) সর্ব্বদা হস্তে রাখিতেন, উহা কখনও মাথায় রাখিতেন; কখনও চক্ষে লাগাইতেন, আর কখনও বা উহার ঘ্রাণ লইতেন; এবং রোদন করিতেন। প্রিয়তমা পত্নীর এই অবস্থা দর্শনে হজরত আলীর (রাজিঃ) পেরেশানী (অশান্তি অর্থাৎ মানসিক যাতনা) আরও বৃদ্ধি পাইত। তিনি তাঁহাকে কত বুঝাইতেন; কত প্রবোধ দিতেন, কত প্রকারে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু পিতৃগত প্রাণ সৈয়দা পিতৃ বিয়োগ জনিত ছদমা (যাতনা) এখন ছিল না, যাহা নিবারিত হয়; যে মহাশোক তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন। যখন অবস্থা আরও সাঙ্ঘাতিক—আরও শোচনীয় হইয়া আসিল, তখন সৈয়দা হজরত আলী (রাজিঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, স্বামিন! জীবনের আশা নাই—যেন্দেগীর ভরসা নাই, আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয়তর হইয়া আসিতেছে, আমাকে একবার লইয়া গিয়া শ্রদ্ধেয় পিতার কবর জেয়ারত করাইয়া আনান। ইতিহাসের এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, স্বর্গ রাণীর এ সময় আর চলিবার শক্তি ছিলনা. ধরিয়া লইয়া না গেলে কবর শরীফ পর্য্যন্ত যাইতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। সৈয়দা ইহাও বলিলেন, পিতার মজার শরীফে যাইবার জন্য আমার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আমি বড়ই অধীর হইয়া

পড়িয়াছি; এবার কিছু বিলম্ব পর্য্যন্ত পবিত্র মজার শরীফে থাকিতে ইচ্ছা করি। ইহাও আশা করি যে, পাক মজারের পবিত্র মৃত্তিকা আমার মানসিক যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব করিবে। হজরত আলী মরতুজা (রাজিঃ) প্রিয়তমা পত্নীর এই আবেদন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া হজরতের পাক মজার শরীফে আগমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া সৈয়দার বে-চয়নী (অধৈর্য্যতা ও মানসিক যন্ত্রণা) আরও বৃদ্ধি পাইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মজার লেপ্টাইয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন, এবং মজারের পবিত্র মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে ও বদনমণ্ডলে মাখাইতে লাগিলেন। যখন মানসিক যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ লাঘব হইল, তখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঐ সময় তাঁহার মনে পরকালের চিন্তা উদয় হইল, এবং মনে এই খেয়াল আসিল যে, আল্লাহতালার মহাদরবারে হাজের হইবার জন্য আমি কি তহফা (ভেট বা নজর) লইয়া যাইতেছি? এই খেয়াল ও এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আবার নূতন ভাবে বিবনিত হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত শোক তাপ, এত চিন্তার একত্র সমাবেশ, ইহা কি সামান্য ব্যাপার। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ত ইহা কল্পনাতীত। আদর্শ মহিলা পয়গম্বর নন্দিনীর কঠোর প্রাণ বলিয়া এ সকল দুর্নিবার যন্ত্রনা এতাবৎকাল সহ্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ধৈর্য্য, ও সহিষ্ণুতার কোন সীমা পরিসীমা নাই। সৈয়দা যখন পরকাল সম্বন্ধে উপরোক্ত কথা স্বামীর সম্মুখে বলিয়াছিলেন, তখন হজরত আলী (রাজিঃ) তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অয়ি ফাতেমা

তোমার সম্বন্ধে হজরত রছুলুল্লাহ্ (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, খাতুনে জন্নত (স্বর্গের রাণী), এ অবস্থায় কেন পেরেশান (দুর্ভাবনাযুক্ত) হইতেছ? উত্তরে সৈয়দা বলিলেন, হাঁ, খাতুনে জন্নত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত জীবনের 'জওয়াব দেহী' করিতে হইবে।

হজরত সৈয়দা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাও করিতেন না। তিনি এই কোশেষ (চেষ্টা)ও করিতেন যে পিতা হজরত রসুলোল্লার (ছালঃ) পরলোক প্রাপ্তির কঠিন ছদমা (শোক জনিত ভীষণ আঘাত জনিত মর্ম্ম বেদনা) তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে বিলুপ্ত হয়। তিনি জানিতেন, এমামদ্বয়ের ন্যায় পুত্ররত্নদ্বয় মাতৃহীন হইবে। তাহাদের মন রক্ষার জন্য মনঃকষ্ট দুর করিবার জন্য আমি যেরূপ চেষ্টা পাইতেছি, উহা আমার জীবন পর্য্যন্তই আছে, আমার পরে এমন কে আছে, উহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিবে, গায় হাত বুলাইয়া নিদ্রাভিভূত করিবে, গায়ের ধুলা বালি ঝাড়িয়া দিবে, যথা সময়ে স্নানাহার করাইবে, মলিন মুখ দেখিলে সান্ত্বনা প্রদান করিবে? এক দিকে পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ পিতার জুদাই (বিচ্ছেদ) অন্য দিকে হজরত আলীর (রাজিঃ) ন্যায় স্বামী, হাসনায়েন অর্থাৎ এমামদ্বয়ের ন্যায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্ররত্নদ্বয়, যয়নব ও কুলসুমের (রাজিঃ) ন্যায় বালিকাকন্যাদ্বয়; তাঁহার জীবনের পক্ষে ইহা এক মহা-সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু খোদাতালার ইচ্ছা এই ছিল যে, সৈয়দার স্নেহচ্ছায়া তাঁহার স্নেহ-কুসুম সন্তানগণের উপর বেশী

দিন থাকিবে না, আর বেশী দিন তিনি তাঁহার আদর্শ স্বামীর সেবা করিতে সক্ষম হইবেন না। এই অবস্থা হজরত খাতুনে জন্নত (রাজিঃ-আঃ) নিজের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা দ্বারা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই, তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, কোনও না-মহরেম ব্যক্তি আমার জানাজায় যেন হাত না লাগায়। আজ পর্য্যন্ত কোনও না-মহরেম পুরুষের দৃষ্টি আমার চেহেরার উপর পতিত হয় নাই, এই খেয়াল যখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল, তখন তিনি হজরত আলী (কঃ-ওঃ)কে বলিলেন, আমার জানাজায় যেন কোনও না-মহরেম ব্যক্তি হাত না লাগায়; আর আমাকে রাত্রিযোগে দফন (কবরস্থ) করিবেন। এই ঘটনাকে অনেক লোক অন্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, খেলাফৎ সম্বন্ধে তাঁহার মনে এই ধারণা ছিল যে, খেলাফতের প্রকৃত অধিকারী তাঁহার স্বামী হজরত আলী (রাজিঃ) ছিলেন। যাঁহারা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)কে খলিফা মনোনীত করিয়া ছিলেন, খলিফা এবং নির্ব্বাচক প্রধান প্রধান পুরুষদিগের উপর তাঁহার জাতক্রোধ ছিল, এজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পার্থিব সম্পদ লাভের বিষয় হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ-আঃ) মনে ক্ষণকালের জন্যও স্থান দেন নাই। এরূপ শিক্ষা তিনি লাভ করেন নাই। তাঁহার জীবনের কোনও কার্য্য-কলাপেই এবিষয়

প্রমাণিত হয় নাই। "শোকর" এবং "ছবর" তাহার জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। যিনি স্বর্গের রাজ্ঞী, পার্থিব বিষয়-বিভবের কোনও মূল্যই তাঁহার নিকট ছিল না। তাঁহার চরিত্র তদীয় মহান্ পিতার আদর্শেই সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল।

হজরত পীড়িত অবস্থায় যে বিরাট বাহিনী রোমক সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ১৭ বৎসর বয়স্ক যুবক হজরত ওসামা-বিন্-জয়েদ (রাজিঃ)কে তাহার সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন, আর প্রধান প্রধান সাহাবা (রাজিঃ)দিগকে সেই সেনাদলের সঙ্গে যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন; যথা—হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), হজরত ওস্মান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ), হজরত আলী (রাজিঃ), হজরত আব্বাস (রাজিঃ), প্রভৃতি। কিন্তু হজরত রেসালতমাব স্বীয় পীড়ার অবস্থা বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া, সেবা শুশ্রূষার জন্য হজরত ওসামা (রাজিঃ)কে বলিয়া, হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত আব্বাস (রাজিঃ) কে আপনার নিকটে রাখিলেন। হজরত ওফাত পাইলে (পরলোক গমন করিলে) হজরত আলী (রাজিঃ), হজরত আব্বাস (রাজিঃ) ও হজরত ফজল-বিন্ আব্বাস (রাজিঃ) এবং হজরত ওসামা (রাজিঃ) তাঁহাকে গোছল দেওয়াইয়াছিলেন। যখন সকিফা-বনু সায়দায় খলিফা নির্ব্বাচন করা হয়, তখন উপরোক্ত মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আন্ছারগণ যখন তাড়াতাড়ি

আপনাদের মধ্য হইতে খলিফা নির্ব্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং একদল সাহাবা আন্‌ছার দল হইতে একজন খলিফা এবং কোরেশ (মহাজ্বের) দল হইতে একজন খলিফা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন ; সেই সংবাদ শুনিয়া হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), এবং হজরত আবু-ওবায়দা-বিন্ জার্‌রহ্ (রাজিঃ) প্রমুখ প্রধান প্রধান সাহাবা (মহাজ্বের)গণ তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা যথা সময়ে উপস্থিত না হইলে হয় ত আন্‌ছার ও মহাজ্বেরগণের মধ্য হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খলিফা নির্ব্বাচিত হইতেন ; এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে একটা ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হইত। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), প্রমুখ প্রধান প্রধান মহাজ্বেরগণ যখন সকিফা বনু সায়দায় উপস্থিত হইলেন, তখন অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইল। মর্ত্তবায় (সম্মানে) যে মোহাজ্বেরগণই শ্রেষ্ঠ, আন্‌সারগণকে একথা স্বীকার করিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) হস্তে বায়েত করাতে, উপস্থিত সাহাবা মণ্ডলীর সকলেই তাঁহার হস্তে বায়েত করিলেন। এই ব্যাপারে হজরত আলী (কঃ-অঃ) কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন ; কারণ বনি হাশেমের অনুপস্থিতিতে এই খলিফা-নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। হজরত আলী (রাজিঃ) তখন তখনই বায়েত না করিয়া, কিছুকাল পরে হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) হস্তে বায়েত

করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মনে আর কোনও রূপ ভাবান্তর ছিল না।

তিনি প্রয়োজন মতে খলিফার দরবারে উপস্থিত হইতেন; মন্ত্রাণা-সভায় যোগ দিয়া স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতেন। "বয়তুলমাল" হইতে নিয়মিতরূপে অংশ প্রাপ্ত হইতেন। অনেকে বলিয়া থাকে, হজরত আলী এই খেলাফৎ ব্যাপারে নিতান্তই 'নারাজ' এবং মনক্ষুণ্ণ ছিলেন, একথা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

ইহার পর আরও ৫।৬ দিন গত হইয়া গেল। সৈয়দার এসময় ভালরূপে চলিবার ফিরিবার মতন শক্তি ছিল না। বালকবালিকাগণ (পুত্র-কন্যাগণ) এসময় তাঁহার বুকে জড়াইয়া থাকিতেন। তিনি সন্তানগণের ভবিষ্যৎ অবস্থা খেয়াল করিয়া, স্নেহাবেশে একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেন। এই পুত্র-কন্যাগণ মাতৃহীন হইলে ইহাদের কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া এ রোগ ক্লিষ্ট অবস্থায় অধিকতর ব্যাকুল হইতেন। একদিনের অবস্থা এই যে, হজরত আলী (রাজিঃ) বাহিরে 'তসরিফ' লইয়া গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, একখানি বাসনের কাছে খানিকটা মাটী গোলা রহিয়াছে; সদ্য ধোয়া কাপড় আলগনির (লটকানো দড়ি বা রসির) উপর রাখা আছে। আর সৈয়দা চাক্কিতে আটা পিষিতেছেন, এবং রোদন করিতেছেন। এই অবস্থা দর্শনে হজরত আলী (রাজিঃ) আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় যেন

বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন, ফাতেমা! তোমার ভগ্ন দেহ ত একাজের উপযুক্ত নহে। পরম ভক্তি-ভাজন ও পরম প্রণয়াস্পদ স্বামীর কথা শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে যেন এক প্রবল তুফাণের সৃষ্টি হইল। তিনি রোদন সম্বরণ করা দূরে থাকুক, পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে কাঁদিতে লাগিলেন! প্রবল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন হজরত আলী (রাজিঃ) সৈয়দার মস্তক স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন, সৈয়দা সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রিয়তম স্বামীন্! গত রাত্রিতে আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা হজরত রসুলুল্লাহ্ (ছালঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছি। আমার এইরূপ বোধ হইতেছিল, তিনি যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বলিলাম, হে শ্রদ্ধেয় পিতঃ! হে রসুলোল্লাহ্! আপনার জুদায়ী (বিচ্ছেদ) আমার পক্ষে কেয়ামত বলিয়া বোধ হইতেছে। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, অয়ি ফাতেমা! আমি তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। তুমি উঠ, চল, পুত্র-কন্যাদিগকে আল্লাহ্‌তালার হস্তে সমর্পণ কর; এবং জন্নতের (স্বর্গ বা বেহেশ্‌তের) ভ্রমণ-সুখ উপভোগ কর। স্বামিন্! আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, আমার মৃত্যুকাল অতি নিকটবর্ত্তী। মাটী এইজন্য গুলিয়া রাখিয়াছি, বাচ্চা-দিগকে (ছেলেমেয়েগণকে) আর একবার স্বহস্তে স্নান করাইব, কাপড় এজন্য ধুইয়া রাখিয়াছি, ঐ কাপড় নিজের হাতে উহাদিগকে পরাইব, যও (যব) পিষিয়া এজন্য আটা প্রস্তুত করিতেছি

যে, আমার মৃত্যু হইলে আপনি ও সন্তানগণ যেন অনাহারে না থাকেন। স্বপ্নের কথা শুনিয়া হজরত আলী (রাজিঃ) নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, ফাতেমা! তুমি কি বলিতেছ? এখনও হজরত রসুলোল্লার (ছালঃ) ছদমা (শোকের আঘাত) তোমার হৃদয়ে তাজাঃ (টাট্‌কা) রহিয়াছে, এজন্য তুমি এরূপ কথা বলিতেছ।

অতঃপর তিনি ছেলেমেয়েদিগকে নিকটে ডাকিয়া লইলেন, তাঁহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গলায় লাগাইলেন, এবং রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে প্রিয় সন্তানগণ! যাও, তোমাদের পরম ভক্তিভাজন নানার মজার শরীফে (সমাধি বা কবরে) গমন কর; আর আমার জন্য মগ্‌ফেরাতের (মুক্তি প্রাপ্তির)জন্য দোওয়া করিয়া আইস। মাতার বাক্য শ্রবণে দুই ভ্রাতা (এমাম ভ্রাতৃদ্বয়) তৎক্ষণাৎ রওজা মবারকে (হজরতের সমাধি-স্থানে) গমন করিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে তিষ্ঠিলেন না, যাইয়াই একটু পরে ফিরিয়া আসিলেন। সৈয়দা আবার বালক-দ্বয়কে গলায় লাগাইলেন, এবং বলিলেন, তোমরা কেন এত তাড়াতাড়ি রওজা মবারক হইতে ফিরিয়া আসিলে? মায়ের স্নেহ-মাখা কথা শুনিয়া উভয় ভ্রাতা তাঁহার গলা জড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন,মুহূর্ত্তের জন্যও মায়ের গলা ছাড়িতে ছিলেন না। হজরত আলী (রাজিঃ) তাঁহাদিগকে কিছু পানী পান করাইলেন, এবং উভয় ভ্রাতাকে বলিলেন, তোমরা কেন রওজা মবারক হইতে এত শীঘ্র চলিয়া আসিলে? তখন উভয় ভ্রাতা এক বাক্যে

বলিলেন, আমরা রওজা 'আকদছে' যাইবামাত্র শুনিতে পাইলাম, যেন কেহ এই কথা বলিতেছেন, হোসনায়েন (এমাম ভ্রাতৃদ্বয়) হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোসায়েন (রাজিঃ) ! তোমাদের মাতা সত্বরেই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, কয়েক দণ্ডের মাত্র তিনি মেহমান (অতিথি)। তোমরা এ সময় গিয়া তাঁহার খেদমতে হাজের থাক ; আর তাঁহার পবিত্র বদনমণ্ডল দর্শনে পরিতৃপ্ত হও—যাহা অল্পকাল পরেই আর দেখিতে পাইবে না। এই কথা শুনিয়া সৈয়দা স্বীয় মৃত্যু সুনিশ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন হজরত আলী (রাজিঃ)কে বলিলেন, স্বামিন ! আমি আপনার খেদমতে ৩টী প্রার্থনা জানাইতেছি, আপনি ইহা কবুল (মঞ্জুর—স্বীকার) করুন। ১ম, আমার সমস্ত অপরাধ আপনি মার্জ্জনা করুন। ২য়, আমার জানাযা রাত্রিকালে উঠাইবেন,—রাত্রিকালেই দাফন করিবেন, কোনও গায়ের-মহরেম ব্যক্তিকে আমার দেহ স্পর্শ করিতে দিবেন না। ৩য়, এই মাতৃহীন বালকবালিকাদিগের দেল-দারিতে, (মন যোগাইতে) ত্রুটী করিবেন না। উহাদের মাথার উপর হইতে মায়ের ছায়া চলিয়া যাইতেছে। উহাদের 'দেল কম জোর' (হৃদয় দুর্ব্বল), ইহাদের আশা উৎসাহ ও পস্ত, শরীর দুর্ব্বল। কিন্তু ইহাদের কথা সরলতাপূর্ণ ; উহাদের জেদ (হট্—আবদার) আপনি রক্ষা করিবেন। সৈয়দার কথা শুনিয়া হজরত আমীর আলায় হেচ্ছালাম (হজরত আলী [রাজিঃ]) রোদন করিতে লাগিলেন ; এবং বলিলেন, তুমিও

আমার ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করিয়া দাও। তৎপর সৈয়দা হজরত আলী (রাজিঃ)কে বলিলেন, আপনি ছেলেদিগকে লইয়া "রওজা আকদছে" একবার গমন করুন। তদনুসারে তাঁহারা হজরতের সমাধিস্থলে চলিয়া গেলেন। সৈয়দা এই অবসরে অজু করিলেন, পরিধানের কাপড় বদলাইলেন; এবং আছমাকে (সম্ভবতঃ এই মহিলা তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন) বলিয়া দিলেন; হজরত আলী (রাজিঃ) কে বলিয়া দিও, তিনি যেন এই অবস্থায়ই আমাকে গোছল দেন (স্নান করান); দেহ যেন আবরণ শূন্য করা না হয়। এই সময় অবস্থা একেবারেই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তদীয় পবিত্র মুখ কেবলাভিমুখে (কাবার দিকে—দক্ষিণ দিকে) ছিল। তিনি ঐ অবস্থায়ই মনাজাত করিতেছিলেন। ৩রা রমজানুল মবারক মঙ্গল বার মগরেব ও এশার নমাজের মধ্যবর্ত্তী সময়ে, স্বর্গের সম্রাজ্ঞী, নারীকুলের আদর্শ, আদর্শ-স্বামী-পরায়ণা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, হজরত রছুলের (ছালঃ) প্রিয়তমা দুহিতা, হজরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ-আঃ) পবিত্র দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গ-লোক আলোকিত করিলেন (ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাযেউন)। মদীনায় আবার শোকের প্রবাহ ছুটিল। "জিন্নতুল বাকি" নামক পবিত্র কবরস্থানে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত হইয়াছিল।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, দুর্দ্ধর্ষ ওহাবিগণ "জিন্নতুল বাকি" কবর স্থানের সমুদয় পবিত্র কবরই ধ্বংস করিয়াছে। এই কবরস্থানে ৩য় খলিফা হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ), হজরত এমাম

হাসান (রাজিঃ), ওম্মোল মুমেনিন এবং আহ্‌লে বয়েতের বহু নর-নারীর পবিত্র কবর বিদ্যমান ছিল। সেই সকল কবর পবিত্র 'জেয়ারতগাহ্‌' রূপে বিরাজ করিত। অনেক কবরে সুদৃশ্য গুম্বজ, কোব্বা প্রভৃতি ছিল। ঐ সমস্ত ধ্বংস করিয়া ওহাবী বর্ব্বরগণ মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। সুতরাং খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমা জোহরার (রাঃ-আঃ) কবরও যে তাহারা ধ্বংস করিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই এজিদের অনুচরগণ আপনাদিগকে খাঁটি শরা-পরস্ত মুসলমান বলিয়া দাবী করে। আরবে এ দেশের ন্যায় কবর পূজা করিতে পারে না। লোকে কবের ফাতেহা ও দরূদ শরীফ্‌ পড়ে মাত্র। তবে এদেশীয় কোনও গোমরাহ মুসলমান সেজদাদি করিলেও লোক চক্ষুর অগোচরেই করিয়া থাকে। জেয়ারতকারীদের সঙ্গে জেয়ারত করাইবার জন্য, জেয়ারত করান কার্য্যে নিযুক্ত উপযুক্ত লোক সকল উপস্থিত থাকে, সুতরাং কোনও রূপ বেদ-আত হওয়ার আশঙ্কা নাই বলিলেই চলে।

হজরত সৈয়দার (রাঃ-আঃ) পরলোক গমনে মহাবীর হজরত আলীর (রাজিঃ) বীর হৃদয় কিরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার পবিত্র গৃহ কিরূপ 'বে-চেরাগ' ও অন্ধকার হইয়াছিল, শাহ্‌জাদা ও শাহ্‌জাদিগণ কিরূপ শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা খেয়াল করিতে গেলে হৃদয় বিষম ব্যথিত এবং বেদনা ভারাক্রান্ত হয়। তের শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা আজও স্মরণ করিলে প্রকৃত মুসলমান শোকে অধৈর্য্য ও আত্মহারা হইয়া

থাকেন। এই সময় হজরত আলী মর্ত্তুজা (রাজিঃ) সম্ভবতঃ কোনও বিষয়-কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করেন নাই, মহামান্য খলিফার দরবারে ও মন্ত্রণা-সভায়ও যোগ দেন নাই। তিনি যে কতকাল শোকাভিভূত থাকিয়া পরে শোকাপনোদন করিতে ও প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

স্বর্গের সম্রাজ্ঞী হজরত বিবী ফাতেমা জোহরার (রাঃ-আঃ) জন্মের সন তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ৬০৫ খৃঃ অব্দেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হজরতের নবুয়তের ১০ম বৎসরে, হেজরতের ৩ বৎসর পূর্ব্বে ওম্মোল মুমেনিন হজরত খোদেজাতুল কোবরার (রাঃ আঃ) পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। হজরতের ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সৈয়দার (রাঃ-আঃ) জন্ম হয়, সুতরাং নবুয়ত লাভের ৫ বৎসর পূর্ব্বে সৈয়দার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ২য় হিজরীতে, মদীনা তৈয়বায় হজরত আলীর (রাজিঃ) সহিত সৈয়দার (রাঃ-আঃ) শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহ কালে সৈয়দার (রাঃ-আঃ) বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসর হইয়াছিল; এবং ২৭।২৮ বৎসর মাত্র বয়সে তিনি পবিত্র দেহ ত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহার বিবাহিত জীবনের পরিমাণ ১০।১১ বৎসর মাত্র। পূর্ণ যৌবন কালেই তিনি এই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সুতরাং হজরতের পরলোক প্রাপ্তির কিঞ্চিৎ ন্যূন ৬ মাস (৫ মাস ২০।২১ দিন) পরেই স্বর্গ-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন

তখন হজরত এমাম হাসানের (রাজিঃ) বয়ঃক্রম ৯ বৎসর ও এমাম হোসায়নের (রাজিঃ) বয়স মাত্র ৮ বৎসব হইয়াছিল। দুহিতা রত্নসাহ্‌জাদী দ্বয় আরও কম বয়স্কা ছিলেন।

হজরত রেছালত মাব (সালঃ)এর পরলোক গমনের পর হইতে, হজরত আলীর রাজি আল্লাহ আনহুর খেলাফৎ আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত চান্দ্র মাসের হিসাবে তেইশ বৎসর দশ মাস বা সাড়ে দশ মাস অতীত হইয়া গিয়াছিল; সৌর মাসের হিসাবে উহাব পরিমাণ কম-বেশ তেইশ বৎসর। এই সময় মধ্যে প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও তৃতীয় খলিফা হজরত ওস্‌মান জিন্নুরায়েনের (রাজিঃ) খেলাফৎ কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার বয়স সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে, কেহ ৬৩ বৎসর, কেহ ৫৭ বৎসর, কেহ ৫০ বৎসর, কেহ ৬৫ বৎসর, কেহ ৬৮ বৎসর, লিখিয়াছেন; কিন্তু বিখ্যাত ইতিহাস-বেত্তা ওয়াকেদীর মতে ৬৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল; অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমই ঠিক, তাহা হইলে তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হজরত রছুলে আকরম মোহাম্মদ মোস্তাফা—আহ্‌মদ মজতবা ছাল্লাল্লাহ আল্লায়হে-অছাল্লাম এন্তেকাল ফরমাইয়াছিলেন; এবং ৩৪ বৎসর ৬ মাস বয়ঃক্রমকালে তাঁহার আহ্‌লিয়া (সহধর্ম্মিনী) মহামাননীয়া খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ-আঃ) পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই ২৩

বৎসরের ঘটণা তেমন বিস্তৃতভাবে জানিবার উপায় নাই। তবে এই মাত্র জানা যায়, তাঁহার যৌবনের শেষ সীমা ও প্রৌঢ় বয়সের মধ্যে তিনি আর কোনও জেহাদ বা যুদ্ধে গমন করিয়া তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ ও অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তিনি খলিফাদিগের মন্ত্রণাসভার সদস্য ও পরামর্শদাতারূপে মদীনা তৈয়বায়ই অবস্থিতি করিতেছিলেন। বয়তুল মাল হইতে যে অংশ পাইতেন, তদ্বারাই সুখ-স্বচ্ছন্দে তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তিনি স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র-পৌত্রী প্রভৃতি লইয়া সুখের সংসার পাতিয়াছিলেন। রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি মহামান্য খলিফাদিগকে সময়োচিত পরামর্শ দান করিতেন; অনেক সময় ধর্ম্ম-বিষয়ক ব্যবস্থাও দিতেন; আর সঙ্গে সঙ্গে কঠোর উপাসনা আরাধনা, মোরাকাবার মোশাহেদয় সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি মহামান্য হজরত সিদ্দিক আকবরের (রাজিঃ) নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে শিক্ষা গুরু বলিয়া খুবই মান্য করিতেন। হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) হজরতের শ্বশুর, সুতরাং সেই সম্পর্কে তাঁহার নানা-শ্বশুর ছিলেন। হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ) তাঁহার জামাতা এবং হজরত ওস্‌মানগণি (রাজিঃ) তাঁহার ভায়রা ভাই ছিলেন।

হজরত রেসালত মাবের পরলোক গমনের পর, হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) খেলাফৎ পদে অধিষ্ঠিত হইলে, যখন আরব দেশের বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন জন-পদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ইস্‌লামের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন

করিল, কেহ পয়গম্বরীর দাবী করিল, কোনও সম্প্রদায় জাকাৎ দেওয়া বন্ধ করিল, কোনও প্রদেশবাসী প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, বিপ্লববাদিতা সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিল, মদীনা তৈয়বার অতি নিকটবর্ত্তী স্থানেও বিপ্লববহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, অনেক বিদ্রোহী ও বিপ্লববাদীর দল মদীনা আক্রমণের ভয় দেখাইতে লাগিল; হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) বিদ্রোহ দমন জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন অঞ্চলে উপযুক্ত সেনাপতিদিগের অধীনে বিভিন্ন সৈন্যদল পাঠাইলেন, তখন তিনি মদীনা শরীফের হেফাজত (তত্ত্বাবধান বা রক্ষা) জন্য একদল যোদ্ধ, পুরুষ মস্‌জেদে নববীর সম্মুখে সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ), হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) এবং হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-মস্‌উদ (রাজিঃ) কে মদীনার চতুর্দ্দিকে পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি কোনও বিদ্রোহী বা বিপ্লববাদী সম্প্রদায় মদীনা তৈয়বা আক্রমণ করে, তবে যেন তৎক্ষণাৎ মহামান্য খলিফাকে সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে। 'মোরতেদ' অর্থাৎ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম ত্যাগকারী বিধর্ম্মীদল ইস্‌লামের ভিত্তি-মূল খুঁড়িয়া ফেলিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল। 'আব্‌রক' নামক স্থানে 'আবস্‌' সম্প্রদায়, 'যিল কছাহ' নামক স্থানে 'যিবান' সম্প্রদায় মহামান্য খলিফার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল, বনু-আসদ ও বনু-কেনানাঃ সম্প্রদায়েরও কতিপয় লোক উহাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিল।

আবস ও যিবান সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন জানিতে পারিল যে, এ সময় মদীনা মনুওয়ার অতি অল্প সংখ্যক মাত্র মোসলমান উপস্থিত আছেন, আর যাকতে মা-ফ্ করা (ছাড়িয়া দেওয়া) সম্বন্ধে খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) সম্পূর্ণরূপ অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তখন তাহারা একমতাবলম্বী হইয়া মদীনা তৈয়বা আক্রমণ করিল; কিন্তু হজরত আলী (রাজিঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ), হজরত তাল্হা (রাজিঃ), হজরত এবনে মস্উদ (রাজিঃ) মদীনার বাহিরেই তাহাদের আক্রমণ রোঁধ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হজরত সিদ্দিক আবু-বরের (রাজিঃ) নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবা-মাত্র তিনি যতদূর পারিলেন, যোদ্ধৃ পুরুষদিগকে সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। মোসলমানগণ ভীম তেজে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে "যিখশব" পর্য্যন্ত উহাদিগকে পশ্চাতে হঠাইয়া দিলেন। তাহারা শোচনীয়রূপে পরাজিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই উহারা দফ্ ও অন্যান্য বাজনা বাজাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, ঐ সকল বাদ্য বাজা শুনিয়া মোসলমানদিগের উটগুলি ভয় পাইয়া পলায়ন করিল এবং মদীনা নগরে প্রবেশ করিয়া শান্তির নিশ্বাস ফেলিল। এই স্থানে হজরত আলী (রাজিঃ)কে আমরা যোদ্ধৃবেশে দেখিতে পাই।

হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) পরলোক গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ব্যাকুল

হইয়া পড়িলেন। কারণ তিনি বেশ জানিতেন বিশাল মোসলমান জগতের খলিফা এমন উপযুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই, যিনি একদিকে ধার্ম্মিকতার সঙ্গে অন্য দিকে দৃঢ় হস্তে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতে পারেন। হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) সম্পূর্ণরূপ পদানুসরণকারী ব্যক্তিই খলিফা হওয়ার যোগ্য। তিনি এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির এবং পরামর্শ গ্রহণ জন্য সর্ব্ব প্রথমে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-অওফ্ (রাজিঃ)কে আহ্বান করিলেন, তিনি আসিলে মহামান্য খলিফা বলিলেন, খেলাফৎ নির্ব্বাচনে ওমর (রাজিঃ) সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? তিনি বলিলেন, হজরত ওমরের (রাজিঃ) মেযাজে কঠোরতা বেশী, খলিফা ফরমাইলেন, ওমরের (রাজিঃ) কঠোরতার কারণ এই যে, আমি অতি নরম দেল ছিলাম। আমি বিশেষভাবে চিন্তা ও অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছি, যে বিষয়ে আমি অতি কোমল ব্যবহার করিতাম, ওমর (রাজিঃ) তাহাতে কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। আমার বিশ্বাস, খেলাফতের ভার তাঁহার মস্তকে অর্পিত হইলে তিনি নরম দেল (কোমল হৃদয়) এবং অতিরিক্ত কঠোরতা পরিহারকারী হইবেন। অতঃপর তিনি হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) কে ডাকিয়া খলিফা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে হজরত ওমরের (রাজিঃ) কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি বলিলেন, হজরত ওমরের (রাজিঃ) প্রকাশ্য (বাহ্য) অবস্থা অপেক্ষা গোপনীয় (আভ্যন্তরীণ) অবস্থা অনেক উন্নত; এ বিষয়ে আমরা কেহ মর্ত্তবায় তাঁহার সমকক্ষ

নহি। তৎপর হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুকে ডাকিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও ঐ উত্তরই প্রদান করিলেন।

হজরত আলী (রাজিঃ), হজরত ওমর (রাজিঃ) সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন, "যখন তোমরা "সালেহীন"দিগের উল্লেখ করিবে; তখন হজরত ওমরের (রাজিঃ) কথা ভুলিও না।" একদা হজরত আলী (রাজিঃ) হজরত ওমর (রাজিঃ) কে বস্ত্রাচ্ছাদিত (কাপড়ে ঢাকা) অবস্থায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহ আমার অধিক প্রিয় পাত্র নহেন।" এক ব্যক্তি হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হজরত ওমর (রাজিঃ) সম্বন্ধে আপনার কি মত? উত্তরে তিনি বলিলেন, "হজরত ওমরের (রাজিঃ) হৃদয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়, বুদ্ধিমত্তায়, সাহসে এবং বীরত্বে পরিপূর্ণ।"

হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ) এর খেলাফৎ কালে পারস্যের যুদ্ধে যখন একবার মোসলমানদিগের পরাজয় ঘটিয়াছিল, অগণ্য পারসিক সৈন্যের সঙ্গে মুষ্টিমেয় মোসলমান সৈন্য যখন আঁটিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না, তখন মহামান্য খলিফা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন; শাসনকর্ত্তাদিগকে সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং যেহাদ ফি ছবিলিল্লার জন্য মোসলমানদিগকে আহ্বান করিতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক, পবিত্র হজ্জ কার্য্য সম্পাদন জন্য

মক্কা-মোয়াজ্জমায় গমন করিলেন। হজ্জ-কার্য্য সমাধান্তে মদীনা তৈয়বায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে যোদ্ধৃপুরুষগণ আসিয়া মদীনা-তৈয়বার পার্শ্ববর্ত্তী ময়দান সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহামান্য খলিফা হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ)কে অগ্রগামী সেনাদলের সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। হজরত যোবায়ের-বিন্‌-আওয়াম (রাজিঃ)কে দক্ষিণ বাহুর এবং হজরত আবদুর রহমান-বিন্‌-অওফ্‌ (রাজিঃ)কে বাম বাহুর সেনাপতি পদ প্রদান করিলেন। আর স্বয়ং প্রধান সেনাপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। হজরত আলী করমুল্লাহ্‌ ওয়াজহুকে ডাকিয়া মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর মহামান্য খলিফা এই বিশাল সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইলেন। যখন তিনি চশমাঃ যরাযে অবস্থিতি করিতে ছিলেন; তখন সৈন্যদিগের মধ্যে যুদ্ধের প্রবল উত্তেজনা দৃষ্ট হইল। কেন না, এই প্রথম ঘটনা যে, স্বয়ং আমিরুল-মুমেনিন খলিফাতুল-মোস্‌লেমিন সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেছিলেন। এই সময় হজরত ওস্‌মান-বিন্‌-আফ্‌ফান (রাজিঃ) আসিয়া মহামান্য খলিফাকে বলিলেন, "আপনার স্বয়ং এরাক গমন করা সঙ্গত বোধ হইতেছে না।" তচ্ছ্রবণে মহামান্য খলিফা একটী বিরাট সামরিক মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিলেন এবং এ সম্বন্ধে সকলের মতামত জানিতে চাহিলেন। অধিকাংশ সাহাবা, সেনাপতি এবং সামরিক পুরুষ মহামান্য খলিফার

স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু হজরত আবদুর-রহমান্-বিন্-অওফ্ (রাজিঃ) এই মতের সমর্থন না করিয়া বলিলেন,—"মহামান্য খলিফার মদীনা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করা বিপদের আশঙ্কা হইতে খালি নহে। কারণ, যদি কোনও সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হন, তবে খলিফা তাহার কোনও প্রকার প্রতিকার করিতে পারেন; কিন্তু খোদা না করুন; যদি স্বয়ং খলিফা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কোনওরূপে অকৃতকার্য্য হন, তবে মোসলমান-দিগের পক্ষে সামলান দায় হইবে।" আমিরুল মুমেনিন ইহা শুনিয়া হজরত আলী রাজি আল্লাহ্ আনহুকেও মদীনা হইতে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি আসিয়াও হজরত আব-দুর-রহমান-বিন্-অওফের মত সমর্থন করিলেন। তখন খলিফা হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ) সমাগত সৈন্য ও যোদ্ধৃ মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া ফরমাইলেন, আমি স্বয়ং তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু সাহাবায় কারা-মের মধ্যে প্রধান প্রধান পুরুষগণ আমার যাওয়া না পছন্দ করিতেছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে আর কোনও আপত্তি করিলেন না। এক্ষণে কাহাকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করা হইবে, তাহা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর নাম লওয়াতে তিনি তাহাতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে মহাবীর হজরত ছায়াদ-বিন্-অবিওক্কাছ (রাজিঃ)কে প্রধান সেনাপতি পদে মনোনীত করা হইল।

মোসলমানগণ পারস্য দেশে যুদ্ধে জয়ী হইয়া, পারস্য সম্রাটের বহু মূল্যবান্ আসবাব-পত্র মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। সে সকল আড়ম্বরপূর্ণ আসবাব-পত্র দেখিয়া মদীনাবাসিগণ স্তম্ভিত হইলেন। একটী অতি মূল্যবান্, বিবিধ রত্নরাজি-ভূষিত অনুপম আসনে বসিয়া সম্রাট্ সুরা পান করিতেন; তাহা দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। উহার মূল্য-নির্ণয় করা অসম্ভব ছিল। সমুদয় মূল্যবান্ আসবাব-পত্র মদীনা-বাসীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল; অবশেষে হজরত আলীর (রাজিঃ) মতানুসারে মহামান্য খলিফা সেই বিচিত্র, অপূর্ব্ব ও বহু মূল্য আসনটীও কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করিয়া দিলেন। হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর ভাগে যে টুকরা টুকু পড়িয়া ছিল, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্ না হইলেও, ৩০ হাজার দিনার মূল্যে তিনি উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন।

যখন বয়তুল-মোকদ্দস্ মোসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইল, এবং দীর্ঘকাল অবরোধের পরে নগরবাসিগণের যুদ্ধ করিবার যখন আর শক্তি রহিল না, তখন নাগরিক খৃষ্টিয়ান-গণ মোস্‌লেম-সেনাপতির সঙ্গে সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল। সেনাপতি সাদা-সিদে সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু তত্রত্য খৃষ্টীয়ানগণ এক খাস সর্ত্ত এই রাখিবার জন্য বিশেষভাবে জেদ করিতে লাগিলেন যে, স্বয়ং খলিফা এখানে

আসিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। বয়তুল মোকাদ্দসের প্রধান ধর্ম্ম-যাজক ইতিমধ্যে পলায়ন করিয়া মিসরে চলিয়া গিয়াছিলেন। যদিও খৃষ্টীয়ানদিগের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু প্রধান সেনাপতি হজরত আবু ওবায়দাহ্-বিন্-জার্'াহ্ (রাজিঃ) সন্ধি স্থাপিত হইলে আর শোণিতপাত করা উচিত নহে মনে করিয়া, মহামান্য খলিফার খেদমতে বয়তুল মোকাদ্দস্‌বাসীদিগের সন্ধির সর্ত্তগুলি লিখিয়া পাঠাইলেন; ইহাও লিখিলেন যে, আপনি এখানে আগমন করিলে বিনাযুদ্ধে বয়তুল মেকাদ্দস্ আমাদের হস্তগত হইতে পারে। এই পত্র পাইয়াই মহামান্য খলিফা মস্‌জেদে নববীতে এক সভার অধি-বেশন করিলেন এবং প্রধান প্রধান সাহাবা (রাজিঃ) দিগকে ঐ সভায় আহ্বান করিয়া, এতৎ সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত ওস্‌মান গণি (রাজিঃ) বলিলেন, "খৃষ্টীয়ানগণ এক্ষণে পরাজিত হইয়াছে; উহাদের মধ্যে যুদ্ধ করিবার সাহস ও শক্তি আর নাই, এ অবস্থায় আপনার কষ্ট করিয়া বয়তুল মোকাদ্দসে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন, খোদাতাল্লা খৃষ্টীয়ানদিগকে আরও বেশী যলিল (অপদস্থ) করিবেন, উহারা বিনা সর্ত্তে নগর মোসলমান-দিগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইবে।" কিন্তু হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহু ফরমাইলেন যে, "আমার মতে আপনার যাওয়া একান্ত আবশ্যক।" মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন এই মত খুব পছন্দ করিলেন; এবং মোকাদ্দসে গমন করিলেন।

২৯ হিজরীতে মহামান্য খলিফা হজরত ওস্‌মানগণি রাজি

আল্লাহ্ আন্‌হু যখন হজ্জ করিয়া মক্কা শরীফ হইতে দারস্-মোলতানৎ মদীনা তৈয়বায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন জয় সম্প্রদায়ের একটী স্ত্রীলোককে বিচারার্থ মহামান্য খলিফার হুজুরে পেশ করা হইল। এই স্ত্রীলোকটী প্রথমে বিধবা ছিল, পরে সে আক্‌দ্ ছানী (দ্বিতীয় নেকাহ্) করে; এই বিবাহের ছয় মাস পরেই তাহার একটী সন্তান জন্মে। হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) ঐ স্ত্রীলোককে রজম (ছঙ্গেছার—প্রস্তরাঘাতে বধ) করিবার আদেশ দেন। যখন এই আদেশের সংবাদ হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট পঁহুছিল, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ খলিফার দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আন্‌হুকে বলিলেন,—"কোর-আন মজিদে আল্লাহ্‌তালা ফরমাইয়াছেন,—"ওহামলহু ও ফেছালহু ছানাছুনা শহেরা"—যদ্দারা জানা যায় যে, হামেল (গর্ভ) ও দুগ্ধ পান করাইবার মুদ্দত (সময়) ত্রিশ মাস নির্দ্দিস্ট করা হইয়াছে। আর রেজায়াতের মুদ্দত সম্বন্ধে কোর-আন পাকের অন্য এক স্থানে উল্লিখিত আছে,—"ওয়াল ওয়ালেদাতে ইওর, দে-না আওলাদাহুন্না হাওলাইনে কামে লাইনে।" এতদ্দারা দৃষ্ট হইতেছে যে, দুগ্ধ পানের মুদ্দত দুই বৎসর অর্থাৎ চব্বিশ মাস। ত্রিশ মাস হইতে চব্বিশ মাস বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ছয় মাস। এরূপ ক্ষেত্রে এই স্ত্রীলোকের উপর যেনা (ব্যভিচার) একিনির সঙ্গে (অভ্রান্ত ভাবে) প্রমাণীকৃত হয় নাই।" হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) হজরত আলীর (রাজিঃ) এই উক্তি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোকটীর বধ কার্য্য

বন্ধ করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু লোক পঁহু-ছিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ছঙ্গেছার করা হইয়াছিল। সুতরাং এ সম্বন্ধে মহামান্য খলিফা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) মনে বড়ই দুঃখ ও অনুতাপ হইল।

বিপ্লবাদিগণ যখন মহামান্য খলিফা হজরত ওস্‌মান গণির (রাজিঃ) গৃহ অবরোধ করে, তখন হজরত আলী (রাজিঃ) তাঁহার দ্বারদেশে অন্যান্যের সঙ্গে হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোসায়েন (রাজিঃ) কে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা দ্বারদেশে থাকিয়া বিপ্লববাদিদিগকে মহামান্য খলিফার গৃহে প্রবেশ করিতে বাধা দিতেছিলেন; কিন্তু বিপ্লববাদিগণ পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহের ভিতর দিয়া খলিফার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, কোরআন পাক তেলাওতের অবস্থায় তাঁহাকে শহিদ করে।

বিদ্রোহীগণ শহিদ খলিফার জানাযাঃ পড়ান এবং দফন কার্য্যেও বাধা দিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছিল; অবশেষে হজরত আলীর (রাজিঃ) ধমকানীতে উহারা সে কার্য্যে নিরস্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত তিন খলিফার খেলাফৎ কালে উপরোক্ত ঘটনা সমূহে হজরত আলী করমুল্লাহ্‌ ওয়াজহুর উপস্থিতি এবং উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর তাঁহার খেলাফৎ কাল হইতে ধারাবাহিক রূপে তদীয় জীবন-চরিত লেখা যাইতেছে।

হজরত আলীর জীবনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

হজরত আলীর খেলাফৎ।

হজরত আলীর খেলাফৎ।

৩য় খলিফা হজরত ওসমানগণির (রাজিঃ) শাহাদতের (শহিদ হওয়ার) এক সপ্তাহ পরে, ৩৫ হিজরীর ২৫শে যেলহজ্জ তারিখে হজরত আলী করমল্লাহ ওজহুর হস্তে মদীনা মনুওরায় আমবয়েত (সাধারণ নেতৃত্ব স্বীকার বা খলিফা বলিয়া মানিয়া লওয়া ব্যাপার) সম্পন্ন হইল। হজরত ওসমান রাজি-আল্লাহ্ আনহুর শাহাদতের পর সেখানে তদীয় হত্যাকারীদিগের বড়ই জোরশোর ছিল। তাহারা প্রথমতঃ মদীনাবাসীদিগকে ধমকাইয়া ও ভীতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক খলিফা নির্ব্বাচন কার্য্যে বাধ্য করিতে ছিল। অধিকাংশই লোকই হজরত আলীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। মদীনার অধিবাসীদিগের মধ্যেও তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্ত দলের সংখ্যা অধিক ছিল। লোকেরা যখন হজরত আলীর (রাজিঃ) খেদমতে উপস্থিত হইতে লাগিল; এবং বায়েত গ্রহণ জন্য আরজ করিল, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা ত আমাকে খলিফা নির্ব্বাচন করিতেছ, কিন্তু তোমরা খলিফা নির্ব্বাচন করিলে কি হইবে, যে পর্য্যন্ত আছহাবে বদর (বদর যুদ্ধে যাহারা হজরতের সঙ্গী ছিলেন) আমাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা আছহাবে বদরগণের নিকট গমন করিল, এবং তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব অনুনয় বিনয়ে বাধ্য করিয়া হজরত আলীর নিকট লইয়া আসিল। সর্ব্ব প্রথমে মহাবীর মালেক আশতর হজরত আলীর হস্তে বায়েত করিলেন। ইহার

পর অন্যান্য লোকেরা বায়েতের জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। তখন হজরত আলী (কঃ অঃ) ফরমাইলেন, (হজরত) তাল্‌হা এবং (হজরত) জোবায়রের (রাজি) নিয়েত (সঙ্কল্প)ও জানা আবশ্যক। তখন মালেক আশতর (হজরত) তাল্‌হার (রাজিঃ) নিকট এবং হকিম-বিন্‌-জাবলাহ্‌ (হজরত) জোবায়রের (রাজিঃ) নিকট গমন করিলেন; এবং উভয়কে বলপূর্ব্বক হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট লইয়া আসিলেন। তখন হজরত আলী (রাজিঃ) তাহাদিগের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যিনি খেলাফত গ্রহণে ইচ্ছুক, আমি তাঁহার হস্তে বায়েত করিতে প্রস্তুত আছি। ইহারা উভয়েই খেলাফত গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। তৎপর উপস্থিত জন-মণ্ডলী ইহাদের উভয়কেই বলিলেন, যদি আপনারা খলিফার পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তবে হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্তে বায়েত হউন। তচ্ছ্রবনে ইহারা উভয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কিছু ভাবিতে লাগিলেন। তখন মালেক আশতর তরবারি বাহির করিয়া হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ)কে বলিলেন, এখনই আপনার দফা রফা করিয়া দেওয়া হইবে। হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) এই অবস্থা দর্শনে, হজরত আলী (রাজিঃ)কে বলিলেন, আমি এই সর্ত্তে আপনার হস্তে বায়েত করিতেছি যে, আপনি আল্লাহর কেতাব এবং রসুলোল্লার সুন্নত অনুযায়ী আদেশ জারী আর শরার হুকুম অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। অর্থাৎ হজরত ওসমানের (রাজিঃ) কাতেল (হত্যাকারী) দিগকে সমুচিত শাস্তি দিবেন। হজরত আলী (রাজিঃ) তাহার প্রস্তাবে

সম্মতিদান করিলে, হজরত তাল্‌হা বায়েতের জন্য স্বীয় কাটা হস্ত বাড়াইলেন। ওহদের যুদ্ধে বহু জখমে ইহার হস্ত বেকার হইয়া গিয়াছিল। ঐ সভায় উপস্থিত কোনও কোনও লোক হজরত তাল্‌হার (রাজিঃ) কাটা হস্ত সর্ব্বাগ্রে বায়েতের জন্য প্রসারিত করিতে দেখিয়া এই ঘটনাটীকে "বদফালি (মনহুছ—অশুভকর") বলিয়া মনে করিলেন। তৎপর হজরত জেবায়ের (রাজিঃ) সম্বন্ধে ও ঐরূপ ঘটনাই ঘটিল। তিনিও হজরত তাল্‌হার ন্যায় সর্ত্ত পেশ করিয়া এবং হজরত আলী (রাজিঃ) কর্ত্তৃক মঞ্জুর করাইয়া বায়েত করিলেন। হজরত ছায়াদ-বিন-আবিওক্কাছ (রাজিঃ)কেও বায়েত করিবার জন্য বলা হইল; তিনি স্বীয় গৃহ দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, যখন সকল লোকের বায়েত করা শেষ হইয়া যাইবে, তখন আমি বায়েত করিব। ইহাও বলিলেন, আমার সম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দেহ করিও না। হজরত আলী (রাজিঃ) তাঁহাকে তাঁহার অবস্থার প্রতি ছাড়িয়া দিলেন; অর্থাৎ তাঁহাকে আর কিছুই বলা হইল না। হজরত আব্দুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) হজরত ছাদ (রাজিঃ)এর ন্যায় বায়েত করিতে বিলম্ব করাতে, মালেক আশতর তরবারি বাহির করিয়া বলিলেন, ইহাকে কতল করিয়া ফেলিতেছি, হজরত আলী (রাজিঃ) তাহাকে বাধা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, আবদুল্লা-বিন-ওমরের যামেন (প্রতিভূ) আমি স্বয়ং। ইহার পর হজরত আবদুল্লা-বিন-ওমর ওমরাব্রত উদযাপনার্থে মক্কায় চলিয়া গেলেন। তাহার এই যাত্রার সংবাদ হজরত আলী (রাজিঃ) অবগত

হইলেন; লোকেরা বলিল, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। হজরত আলী (রাজিঃ) তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য লোক পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ইতিমধ্যে তাহার কন্যা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)এর সহধর্ম্মিনী হজরত ওম্মে-কলছুম (রাজিঃ আঃ) আসিয়া পিতাকে বুঝাইয়া বলিলেন, আবদুল্লা-বিন-ওমর (রাজিঃ) আপনার কোনও রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। তিনি কেবল মাত্র ওমরা-ব্রত সম্পাদনার্থই মক্কায় গমন করিয়াছেন, তচ্ছ্রবনে হজরত আলী (রাজিঃ) তাহার সম্বন্ধে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত মোহাম্মদ মোসলেমা (রাজিঃ) ওসামা-বিন-যায়দ (রাজিঃ) হেছান-বিন-ছাবেত (রাজিঃ), কায়াব-বিন-মালেক (রাজিঃ), আবু সয়ীদ খদরী (রাজিঃ), নওমান-বিন-বসির (রাজিঃ) যয়েদ-বিন-ছাবেত (রাজিঃ), হজরত মাবিয়া-বিন-শায়াবা (রাজিঃ) আবদুল্লা-বিন-ছালাম (রাজিঃ) প্রভৃতি জলিলনকদর (অতি সম্মানিত) ছাহাবা গণও বায়েত করিলেন না। তদ্ব্যতীত আরও অনেক লোক বিশেষতঃ ওম্মিয়া বংশীয় লোকেরা বায়েত করিলেন না কজে মদীনা হইতে শামে (সিরিয়ায়)—হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এর নিকট তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। আরও অনেকে বায়েত করিবার অনিচ্ছায় মক্কা মোয়াজ্জমায় প্রস্থান করিলেন। যে সকল লোক তখন মদীনা তৈয়বায় থাকিয়া বায়েত করিয়াছিলেন, না, হজরত আলী (রাজিঃ) তাহাদিগকে ডাকিয়া বায়েত না করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, এখনও

মুসলমানদিগের মধ্যে শোনিত পাতের কারণ বিদ্যমান আছে, বিপ্লবের এখনও অবসান হয় নাই, ইহার পর হজরত আলী (রাজিঃ) মারওয়ান-বিন-আল-হাকমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোথাও খুজিয়া পাওয়া গেল না। হজরত লায়েলার (রাজিঃ আঃ—হজরত ওসমান রাজিঃ আল্লাহতালার সহধর্ম্মিনী) নিকট হত্যাকারীদিগের নাম জানিতে চাহিলেন; তিনি তন্মধ্যে কেবল মাত্র দুই ব্যক্তির হুলিয়া (আকার প্রকার) বলিলেন, কিন্তু আর কাহারও নাম বা আকার প্রকার বলিতে পারিলেন না। মোহাম্মদ-বিন-আবিবকর (রাজিঃ)এর সম্বন্ধেও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি এই হত্যাকারীদিগের মধ্যে ছিলেন কিনা? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হজরত ওসমান (রাজিঃ)কে শহিদ করিবার পূর্ব্বে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ওম্মিয়া বংশীয় কোনও কোনও ব্যক্তি হজরত ওসমান (রাজিঃ)এর সহধর্ম্মিনী হজরত লায়েলার (রাজিঃ) কর্ত্তিত অঙ্গুলী ও শোনিত মণ্ডিত কুরতা লইয়া শাম প্রদেশে (সিরিয়ায়) হজরত মোয়াভিয়া-বিন-আবি-সুফিয়ান (রাজিঃ)এর নিকট চলিয়া গেল।

খেলাফতের ২য় দিবস।—এই দিন হজরত তালহা ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) হজরত আলী করমুল্লাহে ওজহুর নিকট আগমন করিলেন, এবং বলিলেন যে, আমরা আপনার হস্তে এই সর্ত্তের উপর বায়ত করিয়াছি যে, আপনি হজরত ওসমান (রাজিঃ)এর হত্যাকারীদিগের প্রতি উপযুক্ত দণ্ড বিধান

করিবেন ; যদি আপনি হত্যাকারদিগের দণ্ড বিধানে বিলম্ব করেন, তবে আমাদের বায়েত বাতিল হইয়া যাইবে। তদুত্তরে হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, আমি হজরত ওসমান (রাজিঃ)এর হত্যাকারীদিগের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিব ; আর এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপ এনছাফ (বিচার) করিব, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বিপ্লব বাদীদিগের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। আমার খেলাফৎও এযাবৎ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমি সকল দিক দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে এবিষয়ে মনোযোগী হইব। অকস্মাৎ এ বিষয়ে কিছু করা যাইতে পারে না। হজরত তালহা ও হজরত জোবায়ের (রাজিঃ) এই কথা শুনিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু লোকদিগের মধ্যে এতৎ সম্বন্ধে কাণা ঘুসা ও নানা কল্পনা জল্পনা চলিতে লাগিল। হজরত ওসমানের (রাজিঃ) হত্যাকারী ও বিপ্লব বাদীগণের মধ্যে এই আতঙ্কের সঞ্চার হইল যে, যদি কেছাছ (হত্যার বদলা বা প্রতিশোধ) লওয়া হয়, তবে আমাদের আর নিস্তার নাই। আর যাহারা হজরত ওছমান (রাজিঃ)এর অতি নির্দ্দয়ভাবে হত্যাকাণ্ড (শাহাদৎ) অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন, এবং হত্যাকারীদিগের প্রতি বিশেষ ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন, এই দুর্দ্দান্ত হত্যাকারীর দল যদি তাহাদের অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ না করে, তবে তাহারা উল্লাস ভাবে নর্ত্তন ও কুর্দ্দন করিতে থাকিবে। লোকের মনে এইরূপ ধারণা হওয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) খেলাফতের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক ছিল। পক্ষান্তরে ইহার

প্রতিকার করিবার কোন উপায় তাহার পক্ষে ছিলনা। তিনি হজরত তালহা (রাজিঃ) ও হজরত জোবায়ের (রাজিঃ)কে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত অন্য প্রকার উত্তর প্রদানও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা। হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ আনহুর-শাহাদত-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই খেলাফতের শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছিল। রাজধানী মদীনা তৈয়বার অশান্তি ও বিপ্লবের বিষাক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। পূর্ব্বতন তিন খলিফার আমলে (হজরত ওসমান (রাজিঃ)এর খেলাফতের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত) মহামান্য সাহাবা মণ্ডলী এবং জন সাধারণ এক মাত্র খলিফার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা যেমন মান্য করিয়া চলিতেন ; হজরত আলীর (রাজিঃ) এই নূতন খেলাফৎ সেরূপ সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে স্বীকৃত হয় নাই। কাজেই হজরত আলী (রাজিঃ) অনেক পরিমাণে নিরুপায় ছিলেন।

হজরত আলীর (রাজিঃ) খেলাফতের তৃতীয় দিন তিনি আদেশ প্রদান করিলেন যে, কুফা, বস্রা, মিসর প্রভৃতি দেশ ও জনপদ হইতে যে সকল লোক মদীনায় আসিয়াছে, তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করুক। এই আদেশ শ্রবণে কপটাচারী ও বিপ্লব পন্থী দলের নেতা আবদুল্লা-বিন-সাবা ও উহার দল ভুক্ত লোকেরা মদীনা তৈয়বা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করিল। অন্যান্য বিপ্লব বাদীরাও তাহার পদানুসরণ করিল। হজরত আলী করমুল্লাহ ওজহুর খেলাফতের পক্ষে ইহা একটি কুলক্ষণ ছিল যে, যে সকল লোক তাঁহার

একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত বলিয়া দাবী করিত, তাহারাই তাঁহার আদেশ পালনে সর্ব্ব প্রথমে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। অতঃপর হজরত আনহা (রাজিঃ) ও হজরত কোবায়ের, হজরত আলীর (রাজিঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, আমাদিগকে কুফা ও বস্রায় পাঠাইয়া দিন, ঐ উভয় স্থানের বহু সংখ্যক লোক আমাদিগের ভক্ত, আমরা সেখানে গিয়া বিভিন্ন খেয়ালের লোকদিগকে এক মতাবলম্বী করিব। তাঁহাদের কথায় খলিফার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি তাঁহাদিগকে মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন।

হজরত আলী করমুল্লাহ ওজহু স্বীয় খেলাফতের ৪র্থ দিবসে হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ আনহুর আমলের সমুদয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত করিয়া, ঐ সকল স্থানে নূতন নূতন শাসনকর্ত্তা নিয়োগের পরওয়ানা বাহির করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে নব-নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাদিগকে স্ব স্ব শাসন প্রাপ্ত প্রদেশ সমূহে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে হজরত মসিবা-বিন-সায়াবা (রাজিঃ) যিনি অতি বুদ্ধিমান এবং রাজনীতি বিশারদ ব্যক্তি এবং হজরত আলীর (রাজিঃ) খুব নিকট সম্পর্কীত আত্মীয়ও ছিলেন, হজরত আলীর (রাজিঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি যে তালহা (রাজিঃ) ও কোবায়ের (রাজিঃ) এবং অন্যান্য কোরেশকে মদীনা হইতে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার প্রতিক্রিয়া এই হইবে যে, কোরেশগণ আপনার খেলাফৎকে আপনাদের

জন্য ক্লেশকর মনে করিবেন। আবার হজরত ওসমানের (রাজিঃ) নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত করিয়া সেই সেই স্থানে নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা কার্য্যটিও অতি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়াছেন। আমার মতে আপনি নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাদিগকে ফিরাইয়া আনা, এবং আপততঃ পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তাদিগকেই স্ব স্ব পদে থাকিতে দিন. কেবল মাত্র তাঁহাদের নিকট হইতে বায়েত গ্রহণ ও অধীনতা স্বীকার করিবার দাবী করিয়া পাঠান। খলিফা হজরত মগিরার (রাজিঃ) উক্তি শ্রবণে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে স্পষ্ট ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পরদিন হজরত মগিরাঃ (রাজি) আবার খলিফার দরবারে উপস্থিত হইলেন ; ঐ সময় হজরত আলীর (রাঃ) পিতৃব্য পুত্র হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-আব্বাস (রাজিঃ) ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; ঐদিন হজরত মগিরা (রাজিঃ) খলিফাকে বলিলেন, শহিদ খলিফা হজরত ওসমানের (রাজিঃ) নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাদিগকে খুব সত্বরতার সহিত পদচ্যুত করাই কর্ত্তব্য। যখন হজরত মগিরা (রাজিঃ) খলিফার সভা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, তখন হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-আব্বাস (রাজিঃ) তাঁহাকে বলিলেন, (হজরত) মগিরা গতকল্য আপনাকে নছিহত (উপদেশ দান) করিয়াছিলেন ; কিন্তু আজ আপনাকে ধোকা দিয়া গেলেন। তখন হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, এখন কি করা কর্ত্তব্য ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হজরত ওসমানের শাহাদৎ কালে

আপনার মক্কায় চলিয়া যাওয়াই উচিত ছিল, তাহা ত হয় নাই। বর্ত্তমানে হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাদিগকে বাহাল রাখা উচিত। যে পর্য্যন্ত আপনার খেলাফৎ দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান উচিত নহে। যদি আপনি তাড়াতাড়ি পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত করেন তবে ওম্মিয়া বংশীয় লোকেরা সর্ব্ব সাধারণকে এই বলিয়া ধোকা দিবে যে, আমরা খলিফা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকারীদিগের নিকট হইতে খুনের বদলা লইতে চাই—যেমন মদীনার লোকেরাও দাবী উপস্থিত করিয়াছে। এই ব্যাপারে জনসাধারণ তাহাদের মতানুবর্ত্তী ও দলভুক্ত হইয়া পড়িবে। তদ্বারা আপনার খেলাফতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, আমি মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে কেবল মাত্র তরবারি বলে সোজা করিব, তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রতি কোনও রূপ 'রেয়ায়েত' করিব না। হজরত এবনে আব্বাস (রাজিঃ) বলিলেন, আপনি মহাবীর পুরুষ সন্দেহ নাই; কিন্তু হজরত রসুলে মকবুল (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন الحرب خدعة। যদি আপনি আমার মতানুসারে কাজ করেন, তবে আমি আপনাকে এমন তদ্‌বির বলিয়া দিব যে, বনুওম্মিয়া চিন্তা করিতে করিতেই থাকিয়া যাইবে; আর তাহারা বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াও কিছু করিতে পারিবে না। হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইলেন

আমার মধ্যে না তোমার মতন স্বভাব আছে, না মোয়াভিয়ার মতন। হজরত ইব্নে আব্বাস (রাজিঃ) বলিলেন, আমার মতে আপনি নিজের মাল আস্বাব (সামগ্রী সম্ভার) লইয়া ইয়াম্বু চলিয়া যাউন; এবং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকুন। আরবগণ এদিক্ ওদিক্ করিয়া খুব 'পেরেসান' (ব্যতিব্যস্ত) হইবে, কিন্তু আপনার ন্যায় নেতা তাহারা পাইবে না। যদি আপনি হজরত ওস্মানের (রাজিঃ) হত্যাকারীদিগের পৃষ্ঠ পোষক হন, তবে আপনাকে লোকে হজরত ওস্মানের হত্যাকারী দলভুক্ত বলিয়া অপবাদ দিবে। হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, আমি তোমার এইরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারি না; বরঞ্চ তুমি আমার মতের পোষকতা কর। তখন হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) বলিলেন, অবশ্য আপনার আদেশ পালন করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। তখন হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইলেন, আমি মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) স্থলে তোমাকে শামের (সিরিয়ার) শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিতে চাই। হজরত ইব্নে আব্বাস (রাজিঃ) বলিলেন, মোয়াভিয়া (রাজিঃ) হজরত ওস্মানের (রাজিঃ) একই পিতামহের পৌত্র, ভাই; আর আপনার সঙ্গে আমার করাবত সম্বন্ধ (অর্থাৎ পরস্পর চাচাত ভাই); এরূপ ক্ষেত্রে আমি শামে (সিরিয়ায়) প্রবেশ করামাত্র আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে; কিংম্বা বন্দী করিবে। অতএব মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সঙ্গে পত্র ব্যবহার করুন; আর যে কোনও রূপে

হউক, তাহা হইতে বায়েত গ্রহণ করুন। হজরত আলী (রাজিঃ) তাঁহার পরম হিতৈষী পিতৃব্য পুত্রের এ প্রস্তাবও পছন্দ করিলেন না; এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিতে স্পষ্ট অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মগিরা-বিন্ শায়বাঃ (রাজিঃ) যখন জানিতে পারিলেন, হজরত আলী (রাজিঃ) তাঁহার ও হজরত ইব্‌নে আব্বাসের (রাজিঃ) পরামর্শও গ্রহণ করিলেন না। তখন তিনি নারাজ হইয়া মদীনা হইতে মক্কায় চলিয়া গেলেন।

হজরত আলী করমুল্লাহ অজ্‌হু বস্রায় ওস্‌মান-বিন-হানিফ (রাজিঃ)কে, কুফার-এমরা-বিন্-শাহাবা (রাজিঃ)কে, এমনে হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ)কে, মিশর কায়স্-বিন-সায়াদ (রাজিঃ)কে, শামে (সিরিয়ায়) সহিল-বিন্-হানিফ (রাজিঃ)কে নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ওস্‌মান-বিন্-হানিফ্ (রাজিঃ) যখন বস্রায় পৌঁছিলেন, তখন কতক লোক তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। কতক লোক বলিল, আমরা সম্প্রতি নীরব থাকিব, ভবিষ্যতে মদীনাবাসীগণ যে পথ অবলম্বন করেন, আমরাও সেই পন্থার অনুসরণ করিব। তাঁহারা যাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিবেন, আমরাও তাঁহাকেই খলিফা বলিয়া মানিয়া লইব। কুফার দিকে এমারাঃ-বিন্-শাহাবা (রাজিঃ)কে রওয়ানা করা হইয়াছিল, তিনি কুফায় পঁহুছার পূর্ব্বেই পথি মধ্যে তলিহা-বিন্-খোয়েলদ্ (রাজিঃ)এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল,

তলিহা (রাজিঃ) এমার (রাজিঃ)কে বলিলেন, আমার মতে তোমার পক্ষে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য। কুফাবাসীগণ আবু মুছা আশারি (রাজিঃ)এর স্থলে অন্য শাসনকর্ত্তা নিয়োগ পছন্দ করিবে না। যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে আমি এখনই তোমার মস্তক চেছদন করিব। এতচ্ছবণে এমারাঃ (রাজিঃ) নীরবে মদীনার দিকে ফিরিয়া চলিলেন। হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাসের (রাজিঃ) এমন পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তত্রত্য পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা লায়লি-বিন্-ময়েনা মক্কার দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন; সুতরাং হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) নির্ব্বিবাদে এমনের শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কায়স্-বিন্-সায়াদ মিসরে পঁহুছিলে, তত্রত্য বহু সংখ্যক লোক তাঁহার প্রধান্য স্বীকার করিল, আর বহু সংখ্যক লোক নিরবতা অবলম্বন করিল। কেহ কেহ বলিল, যে পর্য্যন্ত আমাদের ভ্রাতৃগণ মদীনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিবে, তত্তাবৎ কাল আমরা কিছুই করিব না। সহিল-বিন্-হানিফ—যিনি শামের (সিরিয়ার) শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া তদাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তিনি তবকে পঁহুছিলে কতিপয় অশ্বারোহীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ঐ অশ্বারোহীগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি শামের আমীর (শাসনকর্ত্তা) নিযুক্ত হইয়া তথায় যাইতেছি, অশ্বারোহীগণ তাঁহাকে বলিল, যদি হজরত ওস্মান (রাজিঃ) ব্যতীত অপর কেহ তোমাকে আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া থাকেন, তবে

তোমার পক্ষে ইহাই মঙ্গল জনক যে, তুমি মদীনায় ফিরিয়া চলিয়া যাও। এই কথা শুনিয়া সহিত (রাজিঃ) মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যখন মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন অপরাপর নব-নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। জবির-বিন্-আবদুল্লা আল-জবলী হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) শাহাদত কালে হামদান (পারস্য) এর শাসনকর্ত্তা ছিলেন; হজরত আলী (রাজিঃ) তাঁহাকে লিখিলেন, তুমি নিজের সুবার লোকদিগের নিকট হইতে আমার নামে বায়েত গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে মদীনায় চলিয়া আইস। তদানুসারে তিনি খলিফার আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক মদীনায় চলিয়া আসিলেন।

হজরত আলী করমুল্লাহ ওজহু মায়াবদ আসলমির হস্তে এক এক খানি পত্র আবুমুশা আসয়ারির (রাজিঃ) নিকট পাঠাইলেন। প্রত্যুত্তরে আবুমুশা আসয়ারি (রাজিঃ) লিখিলেন; কুফার অধিবাসিগণ আপনার হাতে আপনার নামে বায়েত করিয়াছে। অধিকাংশ লোকই স্বেচ্ছায় বায়েত করিয়াছে; কেহ কেহ কিছু অনিচ্ছার সঙ্গে। এই সংবাদে খলিফা কুফা সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। যখন আবুমুশা আসারির (রাজিঃ) নামে পত্র পাঠান হয়, ঐ সময়ই জরির-বিন-আবদুল্লাও ছবরহ জহনমীর হস্তে একখানি পত্র হজরত আমীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নামে দেমেস্কে রওয়ানা করিয়াছিলেন। তিন মাসের মধ্যে দেমেস্ক (দামাস্কস) হইতে সেই পত্রের কোন উত্তর আসিল না। আমীর

মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এই সুদীর্ঘ ৩ মাসকাল দূতদ্বয়কে বিদায় করিলেন না, তৎপর একখানি পত্র নিজের কাসেদ (দূত) কবিসা ইসির হস্তে দিয়া জরির-বিন-আবদুল্লার সঙ্গে মদীনায় পাঠাইলেন। এই পত্রের লেপাফার উপর হজরত আলীর নাম পরিষ্কাররূপে লেখা ছিল। অর্থাৎ من معاوية الى على এই পত্র লইয়া উভয় কাসেদ (এলচি বা দূত) ৩৬ হিজরী রবিওল-আউওল মাসের শেষ ভাগে মদীনায় পহুছিলেন। দূতদ্বয় হজরত আলীর সমীপে উপস্থিত হইয়া হজরত মোয়াভিয়ার পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। হজরত আলী লেপাফা খুলিয়া তন্মধ্যে কোনও পত্র পাইলেন না। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া দূতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কাসেদ বলিল, আমি দূত মাত্র, আমার জীবন রক্ষা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত, কারণ দূত অবধ্য। হজরত আলী বলিলেন, তুমি সত্য সত্যই অবধ্য; তোমাকে আমান দিতেছি; ব্যাপার কি বল। দূত বলিলেন, শামে (সিরিয়ায়) কেহই আপনার বায়েত করিবে না (আপনাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিবে না)। আমি দেখিয়াছি, ষাট হাজার শেখ হজরত ওসমান (রাজিঃ)এর শোনিত মাখা কামিজ (পিরাহান বা কুরতা) দেখিয়া উচ্চ ক্রন্দনে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিতেছে। লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য ঐ কামিজ দেমেস্কের জামে মসজেদের মিম্বরোপরি রাখা হইয়াছে। হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইলেন, ঐ সকল লোকেরা কি আমার নিকট হজরত ওসমানের হত্যার বদলা চাহিতেছে? বাস্তবিক তাঁহার হত্যা-

কাণ্ড সম্বন্ধে আমি মুক্ত (অর্থাৎ ঐ হত্যাকাণ্ডে আমার কোনও রূপ যোগ ছিল না)। হজরত ওসমানের হত্যাকারীদিগের সম্বন্ধে খোদাতালা ন্যায় বিচার করিবেন। এই কথা বলিয়া তিনি দূতকে হজরত মোয়াভিয়ার নিকট ফেরৎ পাঠাইলেন। বিপ্লব-কারীগণ এবং এবনে শাবার দল এই দূতকে নানা প্রকার ভৎর্সনা করিয়া মারিতে উদ্যত হইলে, মদীনার কতিপয় অধিবাসী তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে দিলেন না ; দূত মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া দেমেস্কে গিয়া পঁহুছিল। বিপ্লব বাদীদিগের নেতাগণ জরির-বিন-আবদুল্লা সম্বন্ধে বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তিও হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, কারণ ইনি এত দীর্ঘকাল শামে (সিরিয়ায়) বসিয়া থাকিলেন কেন ? তাঁহার অবিলম্বে চলিয়া আইসা উচিত ছিল। জরির এই অপবাদ শ্রবণে মর্ম্মান্তিক কষ্টানুভব করিলেন, এবং মদিনা হইতে কর-কিছার দিকে চলিয়া গেলেন। রাজনীতি বিশারদ হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এই সংবাদ পাইয়া একজন দূত প্রেরণ পূর্ব্বক তাহাকে আপনার নিকট ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নিকট দূতগণের গমনাগমন এবং তাঁহাদের পরস্পরের মনোবাদ ও সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার সংবাদ মদিনা বাসিগণ জানিতে পারিয়া মনে করিলেন, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়া না বিপুল শোনিত পাত হয়। মদীনা বাসিগণ হজরত আলীর মনোভাব ও ভবিষ্যৎ কার্য্য কলাপের বিষয় অবগত হইবার

ও তাহাদিগকে তদ্বিষয় জানাইবার জন্য যেয়াদ-বিন-হনজলা তমিমিকে হজরত আলীর (রাজিঃ) সভায় প্রেরণ করিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) যেয়াদকে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রস্তুত হও। তিনি বলিলেন, কোন কার্য্যের জন্য আপনি প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন? তদুত্তরে হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, শাম দেশ আক্রমণ করিবার জন্য। তচ্ছ্রবণে যেয়াদ বলিলেন, নম্রতা এবং মেহেরবানীর সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত ছিল। হজরত আলী (রাজিঃ) তদুত্তরে বলিলেন, তা নয়, বিদ্রোহীদিগকে দমন করা কর্ত্তব্য। মদীনাবাসিগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, হজরত আলী নিশ্চয়ই শাম দেশ আক্রমণ করিবেন তখন হজরত তালহা (রাজিঃ) ও হজরত জোবায়ের (রাজিঃ) হজরত আলীর সমীপে উপস্থিত হইয়া এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, আমরা ওমরাব্রত উদযাপনার্থে মক্কা মোয়াজ্জমায় যাইতে চাই; আপনি আমাদিগকে যাইতে অনুমতি প্রদান করুন। হজরত আলী (রাজিঃ) উহাদিগকে বেশী দিন মদীনায় আবদ্ধ ও নজর বন্ধ রাখা উচিত মনে করিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে মক্কা মোয়াজ্জমায় যাইতে অনুমতি দিলেন। অতঃপর ঘোষনা প্রচার করিলেন যে, শাম দেশ আক্রমণ জন্য সকলে প্রস্তুত হও; এবং প্রবাসের উপযোগী সাজ-সজ্জা সংগ্রহ কর। তদনন্তর একখানি পত্র ওসমান-বিন-হানিফের নিকট বস্রায়, একখানি পত্র হজরত আবুমুসা আশারির নিকট কুফায়, একখানি পত্র কয়েম-বিন-সাদের নিকট এই মর্ম্মে পাঠাইলেন যে, যতদূর

সম্ভব, স্ব স্ব শক্তি সঞ্চয় কর। এবং যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সজ্জিত রাখ। আর যখনই আমি আদেশ পত্র পাঠাইব, ঐ নব গঠিত সেনাদল আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। যখন অধিকাংশ মদীনাবাসী হজরত আলীর (রাজিঃ) আদেশানুসারে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল, তখন তিনি কছম-বিন-আব্বাস (রাজিঃ)কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বীয় পুত্র মোহাম্মদ-বিন-হানিফার (রাজিঃ) হস্তে এই বিরাট সেনাদলের পতাকা প্রদান করিলেন, ডান দিকের সেনাপতি হজরত আবদুল্লা-বিন-আব্বাস (রাজিঃ), বাম দিকের মযসরার সেনাপতি ওমরু-বিন-আবুসলমা, মোকদ্দমাতুল জয়েশের (অগ্রগামী সেনাদলের) সেনাপতি হজরত আবুলেয়লী-বিন-জার্‌রাহ (হজরত আবু ওবায়দা বিন-জাবরাহ [রাজিঃ]এর ভ্রাতা) নিযুক্ত হইলেন।

এখনও বিপ্লববাদীদিগের একটা প্রকাণ্ড দল মদীনায় উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের নেতাদের কাহাকেও কোন সৈন্যদলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হইল না। হজরত আলী (রাজিঃ) সেনাদলের সেনাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সেনাদল সম্পূর্ণভাবে গঠিত হইয়া সিরিয়াভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিল না, ইতিমধ্যে মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে খলিফার নিকট সংবাদ পহুছিল যে, সেখানে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা হইতেছে। এতচ্ছ্রবণে তিনি সিরিয়ার যুদ্ধযাত্রা আপাততঃ মুলতবি (স্থগিত) রাখিলেন।

মক্কায় হজরত ওম্মোল মুমেনিন আয়শা-সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আনহার যুদ্ধ সজ্জা।—যখন বিপ্লব বাদীগণ হজরত ওসমান রাজিঃ আল্লাহ আনহুর গৃহ অবরোধ করিয়াছিল, তখন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ আঃ) হজ্জে গমন করেন। হজ্জ সমাপনান্তে তিনি যখন মদীনা তৈয়বায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন পথিমধ্যে "ছরফ" নামক স্থানে মহামান্য খলিফার সাহাদৎ প্রাপ্তির সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। এই দুঃসংবাদ শ্রবণে তিনি মক্কায় ফিরিয়া গেলেন। এই সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই সংবাদও পাইলেন যে, হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্তে মদীনা বাসীগণ বায়েত করিয়াছেন। যখন তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার এই আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ জানিবার জন্য বহু সংখ্যক লোক তাঁহার সওয়ারির (যে উষ্ট্রে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই উষ্ট্রের) আশে-পাশে সমবেত হইল। তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আল্লার শপথ, উৎপীড়িত (হজরত) ওসমান মারা গিয়াছেন (সহিদ হইয়াছেন), আমি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইব। আক্ষেপের বিষয়, বিভিন্ন শহর ও জনপদের বিপ্লব পন্থী লোকেরা এবং মদীনার ক্রীতদাসগণ মিলিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহারা (হজরত) ওসমানের (রাজিঃ) বিরুদ্ধাচরণ এই জন্য করিয়াছিল যে, তিনি যুবকদিগকে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণও এইরূপই করিয়াছিলেন। এই বিপ্লববাদিগণ

আপনাদের দাবী দাওয়া অর্থাৎ অভিযোগ সম্বন্ধে যখন দলিল প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিল না, তখন (হজরত) ওসমানের (রাজিঃ) বিরুদ্ধাচরণে আত্ম-নিয়োগ করিল ; এবং প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহী হইল। মুসলমানদিগের মধ্যে যেরূপ শোণিত-পাতকে আল্লাতালা হারাম (অবৈধ) করিয়াছেন, তাহারা সেইরূপ শোণিত-পাত করিয়াছে ; যে পবিত্র নগরীকে আল্লাহতালা হজরত রছুলের (দঃ) দারল হেজরত (হেজরতের স্থান) করিয়াছিলেন, বিপ্লব পন্থীগণ সেই স্থানে এই অন্যায় হত্যাকাণ্ড করিয়াছে। আর যে মাসে নরহত্যা ও শোণিত-পাত করা নিষিদ্ধ, বিপ্লব পন্থিরা সেই মাসে এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড করিয়াছে। আর যে মাল (অর্থ সম্পদ) লুণ্ঠন করা মহাপাপ, বিপ্লববাদীগণ সেই অবৈধ লুণ্ঠন কার্য্যও করিয়াছে। আল্লার শপথ, (হজরত) ওসমানের একটী অঙ্গুলী সমগ্র পৃথিবীর ঈদৃশ বিপ্লববাদীদিগের প্রাণ অপেক্ষা আফজল (উত্তম)। যে অভিযোগ আনয়ন পূর্ব্বক এই সকল লোকেরা হজরত ওস্‌মানের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তিনি সেই সময় অভিযোগ হইতে পাক (পবিত্র)—অর্থাৎ নির্দ্দোষ ছিলেন।

মক্কা মোয়াজ্জমায় খলিফা হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)এর পক্ষ হইতে আবদুল্লা-বিন-আমের হজরমী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাজিঃ) উক্তি শ্রবণে বলিলেন, হজরত ওসমানের (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার প্রথম ব্যক্তি আমি। তচ্ছ্রবণে বনি-ওম্মিয়ার যে সকল

লোক খলিফার হত্যাকাণ্ডের পর মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, আমরা একার্য্যে আপনার সঙ্গী। ঐ দলের মধ্যে সয়ীদ-বিন-আল-আছি ও অলিদ-বিন-ওকবা (এই শোষোক্ত ব্যক্তি অতি ক্রুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ) প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। আবদুল্লা-বিন-আমের বস্রা হইতে নূতন খলিফা হজরত আলী (রাজিঃ) কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া মক্কাভিমুখে আসিতেছিলেন, এমনের পূর্ব্ববতন শাসনকর্ত্তা লায়লী-বিন-মনছিয়া ছয়শত উষ্ট্র ও রাজকোষের ছয় লক্ষ দিনার লইয়া আসিয়াছিলেন; এক্ষণে এই পরামর্শ স্থির হইতে লাগিল যে, হজরত ওসমানের (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইতেই হইবে।

যখন তালহা (রাজিঃ) ও হজরত জোবায়ের (রাজিঃ) মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া মক্কা মোয়াজ্জমায় পঁহুছিলেন, তখন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ) তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনারা এখানে কিরূপে আসিলেন? তাঁহারা বলিলেন, মদীনা শরীফ ও ধার্ম্মিক লোকদের উপর গ্রাম্য বদ্দু (যাযাবর) ও বিপ্লব বাদিগণ 'গালেব' হইয়াছে। আমরা ভয়ে এখানে চলিয়া আসিয়াছি। তখন ওম্মোল মুমেনিন বলিলেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে আমার সঙ্গে উহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইবে। তাহারা এ বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মক্কার অধিবাসীগণ সকলেই ওম্মোল মুমেনিনেরও আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন।

বস্রার পূর্ব্ববতন গবর্ণর আবদুল্লা-বিন্-আমের, এমনের পূর্ব্ববতন গবর্ণর লায়লী-বিন্-মনছিয়া ইলনা, হজরত তাল্হা (রাজিঃ),

হজরত যোবায়ের [রাজি] এই চারিজন ওম্মোল মুমেনিনের সেনাদল মধ্যে বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও বীর পুরুষ ছিলেন। ফলতঃ এই চারিজন সেনাপতি পদ লাভ এবং সৈন্য পরিচালনের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। প্রথমতঃ কোনও ব্যক্তি এই পরামর্শ দিলেন যে, মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া মদীনা হইয়া আমাদিগকে শামে যাওয়া চাই। তচ্ছ্রবণে আবদুল্লা-বিন্-আমের বলিলেন, শামে আমীর মোয়াভিয়া [রাজিঃ] বর্ত্তমান আছেন ; শাম দেশ রক্ষার জন্য তিনিই যথেষ্ট, তদুপযুক্ত শক্তি সামর্থ তাঁহার বিলক্ষণ আছে। আমি ইহাই কর্ত্তব্য মনে করি যে, আমাদের বস্রাভিমুখে অভিযান করা চাই। সেখানে আমার বন্ধু ও আমার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এক বিরাট দল আমরা পাইব। আমি এখনও তথাকার শাসনকর্ত্তারূপে বিদ্যমান আছি। বিশেষতঃ বস্রার অধিবাসিগণ হজরত তাল্‌হার [রাজিঃ] অত্যন্ত ভক্ত-অনুরক্ত। সুতরাং বস্রায় গেলে আমাদের উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করি। এই উপায়ে একটী বৃহৎ সুবা এবং এক বিশাল বাহিনী আমাদের হস্ত গত হইবে। একজন বলিলেন, আমরা কেন মক্কায় থাকিয়া বিরুদ্ধ বাদীদলের সঙ্গে বল পরীক্ষা প্রবৃত্ত হই না ? তদুত্তরে আবদুল্লা-বিন্-আমের বলিলেন, মক্কার অধিবাসিগণ ত আমাদের মতানুবর্ত্তী আছেনই এবং আমাদের সহযোগী হইবেন ; কিন্তু তাঁহাদের এমন শক্তি নাই যে, মদীনার বিপ্লববাদিগণ আসিয়া মক্কা আক্রমণ করিলে তাহাদের আক্রমণ

রোধ করিতে পারে। আমরা যদি এখান হইতে শক্তি সঞ্চার করিয়া বস্রায় যাইতে পারি, তবে মক্কাবাসিগণ আমাদের মতাবলম্বী ও সহযোগী হইয়াছেন, সেইরূপ বস্রার অধিবাসিগণও আমাদের মতাবলম্বী ও সাহায্যকারী হইবে। তখন আমরা বিশেষ শক্তিশালী হইব, এবং বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারিব সঙ্গে সঙ্গে খলিফা হজরত ওস্‌মানের [রাজি] হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হইব।

এই পরামর্শ সকলেরই মনঃপুত হইল। এক্ষণে সকলেই বস্রা গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অতঃপর সকলের এই মত হইল যে, হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-ওমর [রাজিঃ] মক্কায় উপস্থিত আছেন, তাঁহাকেও আমাদের সঙ্গী করিয়া লওয়া হউক; এমন কি, তাঁহাকে আমাদের নেতার পদ প্রদান করা উচিত। এই প্রস্তাবানুসারে হজরত ইব্‌নে ওমর [রাজিঃ]কে ডাকিয়া পাঠান হইল, এবং নেতৃগণ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি হজরত ওস্‌মানের [রাজিঃ] হত্যাকারীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি মদীনাবাসীদিগের সঙ্গে আছি; তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিবেন, আমিও সেই পথ অবলম্বন করিব। তাঁহার উত্তর শ্রবণে কেহ আর কোনও রূপ প্রতিবাদ করিলেন না। ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আনহার সঙ্গে অন্যান্য ওম্মোল মুমেনিনগণও হজ্জ কার্য্য সম্পাদনার্থে মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারাও হজরত আয়েশা ছিদ্দিকার [রাজিঃ আঃ]

সঙ্গে বস্রায় যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, ওম্মোল মুমেনিন হজরত হাফ্‌জা [হজরত ওমর রাজির কন্যা]ও ঐ সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-ওমর বস্রায় যাইতে নিষেধ করিলেন, সুতরাং তাঁহার যাওয়া স্থগিত হইল। মগিরা-বিন-শায়াবাও মক্কায় পঁহুছিয়াছিলেন, তিনিও এই অভিযান-কারীদিগের সঙ্গী হইলেন।

ওম্মোল মুমেনিনের মক্কা হইতে বস্রা যাত্রা।—আবদুল্লা-বিন-আমের ও আয়লী-বিন-মনছিয়া বস্রা ও এমন হইতে রাজস্বাদি হইতে বহু টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন; সুতরাং ওম্মোল মুমেনিনের অভিযান সম্পর্কীয় সামগ্রী সমস্ত ক্রয় করিতে লাগিলেন। প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র ও রসদাদি সংগৃহীত হইল। যাত্রার পূর্ব্বে, পূর্ব্বোক্ত দুইজন পদচ্যুত শাসনকর্ত্তা মক্কায় ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাজিঃ আঃ) হজরত তাল্‌হা ও হজরত জোবায়ের (রাজিঃ) বস্রাভিমুখে গমন করিতেছেন; যাঁহারা ইস্‌লামে সহানুভূতি সম্পন্ন, যাঁহারা খলিফা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকারী-দিগের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁহারা আসিয়া এই সেনাদলে যোগদান করুন। তাঁহাদিগকে সওয়ারি (অশ্ব উষ্ট্র প্রভৃতি) ইত্যাদি দেওয়া যাইবে। এই ঘোষণানুসারে অনেকেই এই অভিযানে যোগদান করিলেন। মোট যোদ্ধার সংখ্যা ১৫০০ দেড় হাজার হইল। ইহাদের যাত্রার সময় বিপ্লবের প্রধান নায়ক ও কূটবুদ্ধি সম্পন্ন মারওয়ান-বিন-আল্‌-হাকম

এবং সয়ীদ-বিন্-অল্-আছও মক্কায় আসিয়া পঁহুছিলেন; এবং তাহারাও এই যোদ্ধাদলে যোগদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে যোদ্ধৃ পুরুষের সংখ্যা ৩০০০ তিন হাজার হইল। ওম্মে ফজল-বিন্তে আল্-হরস্থ (রাজিঃ)ও হজরত আবদুল্লা-বিন্ আব্বাস (রাজিঃ) ঘটনা ক্রমে এই সেনাদলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা বনানিয়াঁ বংশীয় একজন লোককে উজরত (পারিশ্রমিক) দিয়া একখানি পত্র সহ হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত পত্রে এই সেনাদল গঠন, ইহাদের অভিসন্ধি, বস্রার দিকে অভিযান প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার সংবাদই লেখা হইয়াছি। অবশিষ্ট ওম্মোল মুমেনিন (রাজিঃ আঃ)গণ হজরত আয়েশা সিদ্দিকার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া ছিলেন; কিন্তু "যাত্ আরক" নামক স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া তাঁহারা হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাজিঃ) নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায় গ্রহণ কালে সকলে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন।

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মারওয়ান-বিন্-আল্-হকমও এই সেনাদলের সঙ্গে গমন করিতেছিলেন। মারওয়ান-বিন্-আল্-হকম ঐ ব্যক্তি—যাঁহার কার্য্য-কলাপেই খলিফা হজরত ওস্মান (রাজিঃ)এর কার্য্যে লোকে ত্রুটী বিচ্যুতি ধরিবার সুযোগ লাভ করে। এই কুচক্রী ও কুটীল ব্যক্তিই হজরত ওস্মান (রাজিঃ)কে মুসলমানদিগের সাধারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কার্য্য করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহার প্রতি জন-সাধারণের ঘৃণা ছিল।

বিপ্লবের সময় খলিফা হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) যদি মারওয়ানকে বিপ্লব-পন্থীদিগের প্রার্থনানুসারে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিতেন, তবে খলিফার হত্যাকাণ্ডরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। বিপ্লবাদিগণ অবশ্য মারওয়ানকে হত্যা করিত; এবং এই স্থানেই বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটিত; কিন্তু বিধির বিধান এক্ষেত্রে অন্যরূপ ছিল। খলিফা হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) বিপ্লব-পন্থীদিগের প্রর্থনানুসারে মারওয়ান-বিন্‌-হাকমকে কিছুতেই তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে রাজী হইলেন না। অবশ্য মারওয়ান যেরূপ দুষ্কার্য্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে খলিফা তাহাকে বিপ্লববাদীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাহাকে নিশ্চয়ই হত্যা করিত। মারওয়ান-বিন্‌-আল্‌-হকম ঐ ব্যক্তি, যাহাকে হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) মিথ্যা কথা বলার জন্য মদীনা তৈয়বা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। স্থূল কথা, মারওয়ান একজন সুচতুর, ধূর্ত্ত ও ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তি ছিলেন। এই সেনাদলের সঙ্গে থাকিয়াও তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ চতুরতা, ধূর্ত্ততা ও বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটাইতে ক্রটী করেন নাই। যাহার যে স্বভাব, তাহা কিছুতেই সংশোধিত হয় না। হজরত রছুলের (দঃ) পবিত্র সংশ্রবে থাকিয়াও যাহার চরিত্র সংশোধিত হয় নাই, কুটীলতা ও ধূর্ত্ততা যেমন তেমনই থাকিয়া গিয়াছিল, তাহার চরিত্র সংশোধিত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। মক্কা হইতে এই সেনাদল যাত্রা করিবার পর যখন প্রথম নামাজের সময় উপস্থিত হইল; তখন মারওয়ান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আজান দিলেন। তৎপর

হজরত তাল্হা (রাজিঃ)ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে কে নামাজে এমামতি করিবেন করুন। ইহাদের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হজরত ইব্‌নে যোবায়ের (রাজিঃ) বলিয়া উঠিলেন, আমার পিতা এমামতি করিবেন। ওদিকে হজরত তাল্হার (রাজিঃ) পুত্র বলিলেন, না, না আমার পিতা জামাতের এমামতি করিবেন। যখন এই সংবাদ হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাজিঃ আঃ) শুনিতে পাইলেন, তখন মারওয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, মারওয়ান উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, তুমি কি আমার উদ্যোগ আয়োজন পণ্ড করিতে চাও ? আমার ভগিনী পুত্র আবদুল্লা-বিন্-যোবায়ের (রাজিঃ) এমামতি করিবে।

এই কাফেলা আর কয়েক দিনের পথ অগ্রসর হইলে একদা মারওয়ান-বিন্-আল-হাকম, হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আপনারা এই যুদ্ধে জয়ী হন, তবে কাহাকে খলিফার পদে অভিষিক্ত করিবেন ? তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, আমাদের উভয়ের মধ্যে যাঁহাকে লোকেরা নির্ব্বাচন করিবে, তিনিই খলিফা পদে অভিষিক্ত হইবেন। এতচ্ছ্রবণে সয়ীদ-বিন্-আল্-আছ বলিলেন, আপনারা ত কেবল মাত্র হজরত ওস্মান (:রাজিঃ)এর অন্যায় হত্যাকাণ্ডের (শাহাদতের) বদলা (প্রতিশোধ) লইতে যাইতেছেন , খেলাফৎ হজরত ওস্মান (রাজিঃ) এর পুত্রকে দেওয়া চাই। তখন উপরোক্ত উভয় মহাত্মা উত্তর করিলেন, তুমি যদি আর কাহারও

নাম লইতে তবেও হইত; কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, মোহাজেরিনদিগের বৃদ্ধ এবং বোজর্গ লোকেরা থাকিতে কোনও অল্প বয়স্ক বালককে খলিফা পদে অভিষেক করা যায়। সয়ীদ-বিন্-আল্-আছ বলিলেন, যদি ইহাই আপনাদের উদ্দেশ্য হয়' তবে আমি আপনাদের সঙ্গী হইতে পারি না। এই কথা বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সয়ীদ-বিন্-আল্-আছ প্রত্যাবর্ত্তন করাতে আবদুল্লা-বিন্-খালেদ-বিন্-আমিদ এবং মগিরা-বিন্-শাবাও তাঁহার অনুগামী হইলেন। ইহাদের সঙ্গে সকিফ্ দলের বহু লোকও চলিয়া গেল। হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) অবশিষ্ট সৈন্যদল সহ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন। অতঃপর তাঁহারা হোয়াব নামক চশ্মার (ঝরণা অর্থাৎ নির্ঝরিনীর) নিকট গিয়া পঁহুছিলেন। ওম্মোল মুমেনিনের সেনাদল উপরোক্ত নির্ঝরিনীর নিকট পহুছিলে স্থানীয় কুকুরগুলি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তত্রত্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, এই চশ্মার নাম হোয়াব। এই কথা শ্রবণ মাত্র ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাজিঃ আঃ) বলিয়া উঠিলেন, আমাকে শীঘ্র ফিরাইয়া লইয়া চল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কেন একথা বলিতেছেন? তখন তিনি বলিলেন, একবার হজরতের নিকট বিবিগণ (তন্মধ্যে তিনিও ছিলেন) বসিয়াছিলেন, হজরত ঐ সময় ফরমাইলেন, "আমি জানিতে পারিলাম, তোমাদের মধ্যে কাহাকে দেখিয়া

হোয়াবের কুকুর সকল চীৎকার করিয়া উঠিবে।” এই কথা বলিয়া হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ আঃ) উষ্ট্রের গর্দ্দানে হাত মারিলেন (জোরে হস্ত দ্বারা আঘাত করিলেন), উষ্ট্র ঐ স্থানে বসিয়া পড়িল। কাফেলা একদিন একরাত্রি সেই স্থানেই রহিয়া গেল। সমগ্র সেনাদল শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সেনাদলের মধ্যে এই শোর গোল উঠিল যে, তোমরা সত্বর প্রস্থান কর, হজরত আলী (কঃ-অঃ) সসৈন্যে তোমাদের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। এতচ্ছ্রবণে সৈন্যগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া শিবির উত্তোলন পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি বস্রার দিকে অগ্রসর হইল। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ আঃ) ও ঐ সঙ্গে রওয়ানা হইলেন। কারণ ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কোনও ব্যক্তি ভ্রম ক্রমে এই চশ্‌মার নাম হোয়াব বলিয়া দিয়াছে। বাস্তবিক ইহা হোয়াব নামক চশ্‌মা নহে। আর সেই চশ্‌মা এপথে থাকিতেও পারে না ; উহা অন্য পথে অবস্থিত। এই রূপ হোয়াব নামক চশ্‌মার কেনারে অবস্থান করা পরিসমাপ্তি ঘটিল।

এই সেনাদল যখন ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বস্রার নিকট পঁহুছিল, তখন ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ আঃ) আবদুল্লা-বিন্-আমেরকে বস্রাবাসীদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে বস্রার প্রধান প্রধান লোকদিগের নামে পত্রও পাঠাইলেন। তিনি স্বীয় সেনাদল সহ পত্রের অপেক্ষায়

পথিমধ্যেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বস্রার বর্ত্তমান গবর্ণর ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফ যখন হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ-আঃ) সসৈন্যে আগমন সংবাদ পাইলেন, তখন বস্রার কতিপয় ক্ষমতাশালী প্রধান প্রধান লোককে এল্‌চি (দূত) স্বরূপ তাঁহার খেদমতে পাঠাইলেন। তাঁহারা ওম্মোল মুমেনিনের (রাঃ আঃ) শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, সাধারণ বিপ্লববাদী (দাঙ্গা হাঙ্গামাকারী)গণ; এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপ্লব পন্থিগণ একটা মহাহাঙ্গামা ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, এতদ্বারা মুসলমানদিগের জমিয়তের (একতাবদ্ধ দল সমষ্টির) ক্ষতি —সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামেরও ক্ষতি সাধন হইবার সম্পূর্ণ— আশঙ্কা। আমি মুসলমানদিগের দল লইয়া এজন্য এখানে আগমন করিয়াছি যে, এখানকার লোকদিগকে প্রকৃত ঘটনার বিষয় অবগত করাইব। আমার এই অভিযানের উদ্দেশ্য নিখিল মুসলমান সমাজের সংস্কার ও মঙ্গল সাধন ব্যতীত আর কিছুই নাই। প্রেরিত প্রধান প্রধান লোকেরা সেখান হইতে উঠিয়া হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। বস্রার প্রেরিত দূতগণ আবার বলিলেন, আপনারা কি হজরত আলী-বিন্‌-আবিতালেবের (রাজিঃ) হস্তে

বায়েত করেন নাই? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন হাঁ, আমরা বায়েত করিয়াছি; কিন্তু এই সর্ত্তের উপর বায়েত করিয়াছি যে, হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকারীগণ হইতে খুনের বদলা লইতে হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, যখন আমাদের নিকট হইতে বায়েত গ্রহণ করা হইতেছিল, তখন আমাদের মস্তকের উপর উন্মুক্ত তরবারি ছিল; দূতগণ তথা হইতে রওয়ানা হইয়া বস্রার শাসনকর্ত্তা ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফের নিকট আগমন পূর্ব্বক সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। ওস্‌মান তচ্ছ্রবণে "ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাযেউন" পড়িলেন; এবং বস্রার উপস্থিত প্রধান প্রধান লোকদিগকে বলিলেন, এক্ষেত্রে তোমাদের এরাদা (সঙ্কল্প) কি? তাঁহারা বলিলেন, এক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করুন। ওস্‌মান বলিলেন, আমি হজরত আলীর (রাজিঃ) আগমন কাল পর্য্যন্ত ইহাদের গতিরোধ করিব। বস্রার প্রধানগণ শাসনকর্ত্তার দরবার হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক চুপ চাপ বসিয়া রহিলেন। শাসনকর্ত্তা ওস্‌মান বস্রাবাসীদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে ও মস্‌জেদে সমবেত হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। যখন লোকেরা মস্‌জেদে সমবেত হইল, তখন শাসনকর্ত্তা ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফ্‌ বস্রার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সুবক্তা কায়স্‌কে বক্তৃতা প্রদান জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে জনমণ্ডলি! হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত

যোবায়ের (রাজিঃ) এখানে জীবন রক্ষার জন্য বা আত্ম-রক্ষার জন্য আসিয়া থাকিলে সে কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ মক্কাশরীফে ত পাখীদিগেরও জীবন নিরাপদ। সেখানে কেহ কাহারও উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে পারে না। আর যদি ইহারা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যার প্রতিশোধ লইতে আসিয়া থাকেন, তবে তাহাও একটা বৃথা অভিযোগ মাত্র। কারণ আমাদের মধ্যে কেহই হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) কাতেল (হত্যাকারী) নহি। সুতরাং তাঁহারা যে দিক্ হইতে এখানে আসিয়াছেন; তাঁহাদিগকে সেই দিকেই ফিরাইয়া দেওয়া (প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য করা) উচিত। এই বক্তৃতা শুনিয়া আমুদ-বিন্-সরিয়্ সা-দী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ইঁহারা আমাদিগকে হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকারী মনে করিয়া এখানে আইসেন নাই; বরং হজরত ওস্‌মানের হত্যাকারীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সমবেত লোকদিগের মধ্যে অনেক পূর্ব্বোক্ত বক্তা কায়সের প্রতি কঙ্কর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সভাও ভাঙ্গিয়া গেল। শাসনকর্ত্তা ওস্‌বান-বিন্-হানিফ্ বুঝিতে পারিলেন, বস্রায় হজরত তাল্‌হা ও হজরত যোবায়েরের (রাজিঃ) প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন লোকের অভাব নাই।

ওদিকে ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ আঃ) স্বীয় সেনাদল সহ "মদির" নামক স্থানে পঁহুছিলেন।

বস্রার শাসনকর্ত্তা ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফ্‌ও সসৈন্যে নগর হইতে বাহির হইয়া সমাগত সেনাদলের সম্মুখে সুসজ্জিত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। ওম্মোল মুমেনিনের সৈন্যদলের দক্ষিণ ভাগে হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ছিলেন; আর বাম ভাগের সেনাপতি পদে হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন উভয় সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন হইল, তখন হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) দক্ষিণ দিকস্থ সেনাদল হইতে অগ্রসর হইয়া প্রথমে হাম্‌দ্‌ (খোদাতালার প্রশংসা) নাত্‌ (হজরতের প্রশংসা) বর্ণনা করিয়া, হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) এর ফজিলত সকল বলিতে লাগিলেন, এবং সেই মহাত্মার অন্যায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য লোকদিগকে উত্তেজিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) বাম দিকস্থ সেনাদল হইতে অগ্রবর্ত্তী হইয়া হজরত তাল্‌হার (রাজিঃ) বাক্যের 'তস্‌দিক (সম্মতি) করিলেন। ইহার পর হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাজিঃ আঃ) ও সমাগত সেনাদলকে লক্ষ্য করিয়া কিছু উপদেশ প্রদান করিলেন। এই সকল ব্যাপারে ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফের সেনাদলের মধ্যেই মতভেদ উপস্থিত হইল। একদল ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল; অন্য দল হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) এর সঙ্গে যুদ্ধ করা অন্যায় মনে করিল। হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাজিঃ আঃ), হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) যখন দেখিলেন, ওস্‌মান-বিন্‌-

হানিফের সেনাদলের মধ্যে যখন আপনা হইতে কুট্ পড়িয়া গিয়াছে (মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে), তখন তাঁহারা ময়দান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফ যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তিনি এই সময় জারিয়া-বিন্‌-কদামাকে হজরত ওম্মোল মুমেনিনের (রাজিঃ) খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন, জারিয়া হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাজিঃ) এর হুজুরে আসিয়া বলিলেন, অয়ি ওম্মোল মুমেনিন! হজরত ওস্‌মান গনির কত্‌ল (হত্যাকাণ্ড) অধিক প্রীতিপ্রদ ছিল, কি আপনি এই মালাউন (অভিসপ্ত) উষ্ট্রের উপর আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন ইহা প্রীতিপ্রদ। খোদাতালা আপনার জন্য পরদা ফজর করিয়াছেন। আপনি সেই পবিত্র পরদার হতক (অবমাননা) করিয়াছেন। যদি আপনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া থাকেন, তবে মদীনা মনুওরার দিকে ফিরিয়া চলিয়া যান, আর যদি অন্যের উত্তেজনায় আসিয়া থাকেন, তবে খোদাতালার সাহায্য প্রার্থনা করুন; এবং লোকদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলুন। জারিয়া-বিন্‌-কদামার বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফের সেনাপতি হাকীম-বিন্‌-জবলাঃ ওম্মোল মুমেনিনের সেনাদলকে আক্রমণ করিল। কিন্তু এই যুদ্ধে ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফ পরাজিত হইলেন। রাজধানী বস্রা হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) এর হস্তগত হইল। ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফ বন্দী হইয়া হজরত ওম্মোল

মুমেনিন (রাজিঃ)এর সম্মুখে আনীত হইল তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ওস্‌মান মুক্তি লাভ করিয়া হজরত আলী রাজিঃ আল্লাহ এর নিকট চলিয়া গেলেন। সুতরাং হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাজিঃ আঃ), হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ), হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) আপাততঃ বস্রার উপর প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই আধিপত্য ওস্‌মান-বিন্‌-হানিফের আধিপত্যের ন্যায়ই ছিল; কারণ বস্রায় তখন দুই মতাবলম্বী লোকই বিরাজ করিত। একদল ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ আঃ) প্রভৃতির পক্ষপাতী; একদল খলিফা হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষ অবলম্বনকারী।

আমিরুল মুমেনিন হজরত আলীর (কঃ অঃ) মদীনা হইতে যাত্রা।

হজরত আলী করমুল্লাহে অজ্‌হু যখন সংবাদ পাইলেন যে, মক্কাবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর, তখন তিনি শামে হজরত মা-বিয়ার (রাজিঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ পাইলেন, হজরত ওম্মোল মুমেনিন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ আঃ), হজরত তাল্‌হা (রাঃ আঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাঃ আঃ) একদল যোদ্ধৃপুরুষ সহ মক্কা হইতে বস্রা অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি সমগ্র মদীনাবাসিদিগের

নিকট সাহায্য চাহিয়া খোত্‌বা পাঠ করিলেন; এবং সকলকে যুদ্ধ যাত্রার জন্য আহ্বান করিলেন। মদীনাবাসিগণের মনে এই বলিয়া বড়ই বেদনা অনুভূত হইল যে, তাঁহাদিগকে হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ আঃ) হজরত তাল্‌হা (রাঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাঃ)এর বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ যাত্রা করিবে ? কিন্তু যখন হজরত আবুলহসেম বদরি (রাজিঃ), হজরত যেয়াদ-বিন্‌-খজবা (রাজিঃ), হজরত যযিমা-বিন্‌-ছাবেত (রাজিঃ), হজরত আবুকেতাদা (রাজিঃ) প্রভৃতি বড় বড় ছাহাবা (রাজিঃ) গণ যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন; তখন আর সকলেও তাহাদের অনুসরণ করিলেন। অবশেষে ৩৬ হিজরীর রবিয়স্‌-সানি মাসের শেষ ভাগে আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী (কঃ অঃ) মদীনা হইতে বাহির হইয়া বস্রাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মদীনাস্থিত কুফাবাসী ও মিশরবাসী মুসলমানগণও তাঁহার অনুগামী হইল। বিপ্লবপন্থিগনের অগ্রনী ভক্ত মুসলমান আবদুল্লা-বিন্‌-সবা ও তাহার গুপ্ত দল বল লইয়া এই সেনাদলে যোগদান করিয়াছিল। যখন হজরত আলী (রাজিঃ) মদীনা তৈয়বা হইতে রওয়ানা হইলেন, তখন পথিমধ্যে হজরত আবদুল্লা-বিন্‌ সালাম (রাজিঃ)এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; তিনি খলিফার অশ্বের বল্গা (লাগাম) ধরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বলিলেন, হে আমিরুল মুমেনিন! আপনি মদীনা পরিত্যাগ করিবেন না। আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি মদীনা হইতে চলিয়া গেলে মুসলমানদিগের আমীর আর এখানে

প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। লোকেরা গালি দিতে দিতে হজরত আবদুল্লা-বিন্-রাজি আল্লাহ আন্‌হুর দিকে ধাবিত হইল; হজরত আলী (রাজিঃ) লোকদিগকে বলিলেন, ইঁহাকে ছাড়িয়া দাও; হজরতের ছাহাবা (শিষ্য)গণের মধ্যে ইনি একজন ভাল লোক। অতঃপর ইঁহারা বস্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খলিফা রববায় নামক স্থানে পঁহুছিয়া সংবাদ পাইলেন যে, হজরত তাল্‌হা ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) বস্রায় প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি এই রব্‌বায়ই শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এখান হইতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকট উপযুক্ত লোকদিগকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য আদেশ লিপি সহ প্রেরণ করিলেন। হজরত মোহাম্মদ-বিন্-আবিবকর (রাজিঃ) ও হজরত মোহাম্মদ-বিন্-জাফর (রাজিঃ)কে কুফায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সেখান হইতে বহু সংখ্যক যোদ্ধৃ পুরুষ লইয়া আসিলেন। স্বয়ং রববায় অবস্থিতি করিয়া চতুর্দিকস্থ লোকদিগকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, কিয়দ্দিবস পরে মদীনা হইতে স্বীয় পরিবারবর্গ ও সামগ্রী সম্ভার আনাইয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) এর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনেকেই অনিচ্ছুক ছিলেন, এজন্য হজরত আলী (কঃ ওঃ) ফরমাইলেন, তাঁহারা যে পর্য্যন্ত আমাকে আক্রমণ করিতে বাধ্য না করেন, সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহাদিগকে স্বয়ং আক্রমণ করিব না। যতদূর সম্ভব, তাঁহাদিগকে সুপথে আনিতে চেষ্টা পাইব।

এখনও যবদা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন না; তয় বংশীয় একদল যোদ্ধৃ পুরুষ তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল। খলিফা তাঁহাদিগের প্রশংসা করিলেন। যবদা হইতে রওয়ানা হইবার সময় তিনি ওমরু-বিন্-আল্ জার্াহ (হজরত আবু ওবায়দা বিন্ জর্াহ (রাজিঃ)এর ভ্রাতাকে অগ্রগামী সেনাদলের সেনাপতি পদে বরিত করিলেন। ফিদ নামক স্থানে পঁহুছিলে তয় বংশীয় ও আসদ বংশীয় কতিপয় যোদ্ধৃ পুরুষও সঙ্গী হইবার জন্য খলিফার নিকট প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতির উপর অটল থাক, ইহাই আমি চাই, যুদ্ধ করিবার জন্য মোহাজেরিনগণই যথেষ্ট। এই স্থানে কুফা হইতে আগত এক জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে হজরত আলী (কঃ অঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন' আবুমুসা আশারি (রাজিঃ) সম্বন্ধে তোমার খেয়াল কিরূপ? সেই আগত লোক বলিলেন, যদি আপনি ছোলেহ্ (সন্ধি) ও ছাফাই (পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন)এর ইচ্ছায় আগমন* করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাল্হা (রাজিঃ) ও যোবের (রাজিঃ)এর সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিতে চান, তবে আবুমুসা আশারি (রাজিঃ) আপনার মতানুবর্ত্তী; আর যদি আপনি যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায়ই আসিয়া থাকেন, তবে তিনি আপনার মতের পোষকতা করিবেন না। খলিফা ফরমাইলেন, যে পর্য্যন্ত আমাকে কেহ আক্রমণ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই। অতঃপর খলিফা কায়দ হইতে

রওয়ানা হইয়া "সয়লবিয়া" নামক স্থানে পঁহুছিলে সংবাদ পাইলেন যে, যুদ্ধে হাকিম-বিন্-জলবা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, আর ওস্‌মান-বিন্-হানিফ্ পরাজিত ও বন্দী হইয়াছেন। সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া যখন "জিকার" নামক স্থানে পঁহুছিলেন, তখন বন্দিত্ব হইতে মুক্ত বস্রার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ওস্‌মান-বিন্-হানিফ আসিয়া খলিফার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন' তুমি তোমার বিপদ ও কষ্টের প্রতিদান পাইবে। তৎপর তিনি ফরমাইলেন, (হজরত) তাল্‌হা (রাজিঃ) ও (হজরত) যোবের (রাজিঃ) প্রথমতঃ আমার হস্তে বয়েত করিলেন, তৎপর তাঁহারা আমার সঙ্গে বদ্ আহ্‌দি (সন্ধি ভঙ্গ) করিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ইহারা হজরত আবুবকর (রাজিঃ), হজরত ওমর (রাজিঃ) ও হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)এর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেন, আর আমার সঙ্গে শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারা জানেন যে, আমি ইঁহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। এই কথা বলিয়া তিনি হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) এর জন্য বদ দোওয়া করিতে লাগিলেন।

মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর [রাজিঃ]

কুফায়।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ অঃ) কর্ত্তৃক হজরত মোহাম্মদ-বিন-আবুবকর (রাজিঃ) ও হজরত মোহাম্মদ-বিন্-জাফর কুফায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কুফায় পঁহুছিয়া, মহামান্য খলিফার পত্র স্থানীয় শাসনকর্ত্তা হজরত আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) হস্তে প্রদান করিলেন ; এবং হজরত আলীর (রাজিঃ) আদেশানুসারে কুফার অধিবসোদিগকে যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে কোনও প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিল না। যখন হজরত মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ উপরোধ করিলেন, তখন তাঁহারা শাসনকর্ত্তা হজরত আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) নিকট গিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হজরত আলীর (কঃ অঃ) সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করা উচিত কি না ? তিনি বলিলেন, যুদ্ধে যোগদান করা পার্থিব পথ, আর চুপ করিয়া থাকা পারলৌকিক পথ। এতচ্ছ্রবণে লোকেরা যুদ্ধে গমনে বিরত হইল। এই ব্যাপার দর্শনে হজরত মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ) ও

হজরত মোহাম্মদ-বিন-জাফর (রাজিঃ), হজরত আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ)কে কিছু রূঢ় কথা শুনাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)এর বায়েত আমার ও হজরত আলী (রাজিঃ) উভয়ের গরদানে আছে (অর্থাৎ আমরা উভয়ে তাহার হস্তে বায়েত হইয়াছিলাম) ; যদি যুদ্ধ করাই অভিপ্রেত হয়, তবে হজরত ওসমান (রাজিঃ)এর হত্যাকারিগণ যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করা উচিত। ব্যাপার প্রতিকূল দেখিয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রেরিত প্রতিনিধি-দ্বয় নিরাশ হইয়া কুফা হইতে প্রস্থান করিলেন। "যিকরি" নামক স্থানে পঁহুছিয়া তাঁহারা মহামান্য খলিফার খেদমতে সকল অবস্থা বর্ণনা করিলেন।

আশরে-বিন্‌-আব্বাস [রাজিঃ] কুফায়।

যখন হজরত আলী (কঃ অঃ) দেখিতে পাইলেন যে, হজরত মোহাম্মদ বিন-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত মোহাম্মদ-বিন-জাফর কুফা হইতে বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন, তখন তিনি আশ্‌রে-বিন-আব্বাস (রাজিঃ)কে বলিলেন, তুমি মোহাম্মদ-বিন্‌-আব্বাস (রাজিঃ)কে সঙ্গে লইয়া কুফায় যাও, এবং যেরূপ পার (হজরত) আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ)কে বুঝাইয়া সমঝাইয়া রাজী কর। ইহারা পুনরায় কুফায় গমন করিয়া হজরত আবুমুশা আশয়ারি

(রাজিঃ)কে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন ; তিনি কিছুতেই স্বীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি একই কথা বলিতে লাগিলেন, যে পর্য্যন্ত বিপ্লব প্রশমিত না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত আমি নীরবতা অবলম্বন করিয়াই থাকিব। অগত্যা আশ্‌তর এবং এব্‌নে আব্বাস (রাজিঃ) ব্যর্থ মনোরথ হইয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট ফিরিয়া আসিলেন ; এবং সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া জানাইলেন।

হজরত এমার-বিন্‌-এয়াছর [রাজিঃ] ও হজরত এমাম হাসনের [রাজিঃ] কুফার গমন।

যখন আশতর-বিন্‌-আব্বাস (রাজিঃ) অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন হজরত আলী (কঃ অঃ) স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এমাম হাসন (রাজিঃ) ও হজরত এমার-বিন-এয়াছর (রাজিঃ)কে কুফার প্রেরণ করিলেন। যখন ইহারা উভয়ে কুফা নগরে পঁহুছিলেন, তখন তাহাদের আগমন সংবাদ শ্রবণে হজরত আবু মুসা আশয়ারী (রাজিঃ) স্থানীয় জামে মস্‌জেদে আগমন পূর্ব্বক হজরত এমাম হাসন (রাজিঃ)এর সঙ্গে গলায় গলায় মিলিলেন ; এবং হজরত এমার-বিন্‌-এয়াছর (রাজিঃ)এর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তোমরা হজরত ওসমান গনির

(রাজিঃ) কোনওরূপ সাহায্য কর নাই, বরং তাহার হত্যাকারী-দিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছ। তদুত্তরে হজরত এমার (রাজিঃ) বলিলেন, কখনও নয়, আমরা এমন কার্য্য কখনই করি নাই, সঙ্গে সঙ্গে হজরত এমাম হাসন (রাজিঃ) বলিয়া উঠিলেন, লোকেরা এ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করে নাই, আর এছলাম (সংস্কার সাধন) করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনওরূপ উদ্দেশ্য নাই। আর আমিরুল মুমেনিন ওম্মতের সংস্কার কার্য্যে কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভয় করেন না। হজরত আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ) নিতান্ত আদরের সঙ্গে বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি ফেদা হউন, আপনি সত্যই বলিয়াছেন, কিন্তু হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন যে, অতি শীঘ্রই বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে। ইহাতে উপবেশন-কারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি হইবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তি হইবে, পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তি আরোহী ব্যক্তি হইতে বেহতের (ভাল) হইবে। সমুদয় মুসলমান আপসে পরস্পর ভ্রাতা। ইহাদের শোণিত এবং মাল (সম্পত্তি) হারাম। এতচ্ছ্রবণে এমার-বিন্-এয়াছর ক্রোধান্বিত হইয়া হজরত আবুমুসা আসয়ারির প্রতি গালি বর্ষণ করিলেন। হজরত আবুমুসা (রাজিঃ) গালি শ্রবণে চুপ হইয়া থাকিলেন। কিন্তু উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ গালির উত্তরে গালি দিল। কতকগুলি লোক এমার-বিন-আছের (রাজিঃ)কে প্রহার করিতে উদ্যত হইল;

কিন্তু হজরত আবুমুসা আসয়ারি (রাজিঃ) উত্তেজিত লোক-দিগকে উপদেশ দানে শান্ত করিলেন।

ঠিক ঐ সময়েই হজরত ওম্মোল মুমেনিন আয়েসা ছিদ্দিকা (রাজিঃ) বস্রা হইতে কুফাবাসী কতিপয় প্রধান প্রধান লোকের নামে পত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল পত্রে লিখিত ছিল যে, তোমরা এসময় কাহাকেও সাহায্য করিও না; স্ব স্ব গৃহে চুপ করিয়া বসিয়া থাক, কিংবা আমাকে সাহায্য কর। আমি হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যা কাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে বাহির হইয়াছি। যয়েদ-বিন-সোহান ওম্মোল মুমেনিনের (রাজিঃ) প্রেরিত পত্র মস্‌জেদে উপস্থিত লোকদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন। শাবত-বিন্‌-রবয়ি এই কথার উপর কটু কাটব্য কথা বলিলেন। তচ্ছ্রবণে সমবেত জনগণের মধ্যে এক উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। তাহারা ওম্মোল মুমেনিনের সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। হজরত আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ) এই উত্তেজনা থামাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তিনি বলি-লেন, বিপ্লবের অবসান হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাক; এবং আমার উপদেশানুযায়ী কার্য্য কর। আরব দেশের টিলা সমূহের ন্যায় এক টিলার আকার ধারণ কর (কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া স্থির হইয়া থাক)— যেন উৎপাড়িত লোকেরা তোমাদের আশ্রয়ে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে পারে। তোমরা স্ব স্ব বর্শাগুলির

অগ্রভাগ নিম্নমুখ করিয়া লও, এবং তরবারি সমূহ কোষ বদ্ধকর।

এতচ্ছ্রবণে যয়েদ-বিন সওহান দণ্ডায়মান হইয়া লোক-দিগকে আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী করমুল্লাহে অজহুর সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহার পর কুফাবাসী আরও কতিপয় ব্যক্তি এই সকল কথার তায়ীদ (সমর্থন) করিবার জন্য ক্রমান্বয়ে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং স্ব স্ব কর্ত্তব্য প্রকাশ করিলেন। ইহার পর এমার-বিন্-এযাছের (রাজিঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে কুফাবাসি ভ্রাতৃগণ! হজরত আলী (রাজিঃ) তোমাদিগকে হক্ (ন্যায়) কার্য্য দর্শন জন্য আহ্বান করিয়াছেন। চল, তোমরা তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক ন্যায় যুদ্ধে যোগদান কর। অবশেষে হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ) ফরমাইতে লাগিলেন, হে সমবেত জনগণ! আমাদের দাওত (আহ্বান) কবুল কর। আমাদের বশ্যতা স্বীকার কর। আর যে মছিবতে (বিপদে) তোমরা এবং আমরা মোব্‌তেলা (বেষ্টিত) হইয়া পড়িয়াছি; তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমাদের সাহায্য কর। আমিরুল মুমেনিন বলিতেছেন, যদি আমরা উৎপীড়িত ও বিপন্ন হইয়া থাকি, তবে তোমরা আমাদের সাহায্য কর। আর আমরা অত্যাচারী হইলে আমাদিগকে সমুচিত দণ্ড দাও। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) সর্ব্ব প্রথমে আব্বার

হস্তে বায়েত করিয়াছেন (খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন) আবার তাহারাই সর্ব্ব প্রথমে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। হজরত এমাম হাসান-বিন্-হজরত আলীর [রাজিঃ] হৃদয়োন্মাদিনী বক্তৃতায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর হৃদয় বিচলিত ও বিক্ষোভিত হইল। আমিরুল মুমেনিন হজরত আলীর [কঃ অঃ] প্রতি তাহাদের ভক্তিস্রোত উছলিয়া উঠিল, এক্ষণে সকলেই মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের সাহায্য করিতে অভিমত প্রকাশ করিল। এমার-বিন্-এয়াছর [রাজিঃ] ও হজরত হাসান [রাজিঃ]কে কুফার রওয়ানা করিবার পর হজরত আলী [কঃ অঃ] মহাবীর মালেক আশতরকেও তথায় পাঠাইয়াছিলেন। যখন হজরত এমাম হাসান [রাজিঃ] সভায় বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় মালেক আশ্‌তর সেইস্থানে উপস্থিত হন। মালেক আশ্‌তরের আগমন ও উপস্থিতিতে জনমত আমিরুল-মুমেনিনের সম্পূর্ণ অনুকূল হইল। অতঃপর হজরত আবু মুসা আসারির [রাজিঃ] কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না, তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্বীয়-মতে স্থির সংকল্প ছিলেন; এবং দৃঢ়তার সহিত বলিতে ছিলেন, তোমরা নিরপেক্ষতা অবলম্বন কর। মালেক আশ্‌তর কুফায় পেঁীছিয়া তত্রত্য সমগ্র অধিবাসীকেই স্বমতাবলম্বী করিয়া লইলেন; হজরত আবু মুসা আশারি [রাজিঃ]কে বলা হইল আপনি আগামী কল্য পর্য্যন্ত রাজধানী রাজপ্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যাহাহউক, হজরত এমাম হাসন-বিন্-আলী [রাজিঃ], এমার-বিন্-

এয়াছর [রাজিঃ] ও মালেক আশ্‌তর কুফা হইতে ৯০০০ নয় হাজার বিক্রান্ত বীর-পুরুষ সঙ্গে লইয়া আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মুস্‌লেমিন হজরত আলী করমুল্লাহ অজহুর সহিত যোগদান করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন; যখন ইহারা এই নব-গঠিত সেনাদল লইয়া মহামান্য খলিফার "যিকার" নামক স্থানে অবস্থিত শিবির শ্রেণীর নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন স্বয়ং হজরত আলী [কঃ-অঃ] অগ্রসর হইয়া ইহাদের অভ্যর্থনা করিলেন; এবং তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন। তিনি কুফাবাসী যোদ্ধৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে কুফা-বাসি মুসলমানগণ; আমি তোমাদিগকে এইজন্য তক্‌লিফ্‌ [কষ্ট] দিয়াছি যে, তোমরা আমার সঙ্গী হইয়া বস্রাবাসিদিগের সঙ্গে মোকাবেলা [যুদ্ধ] কর। যদি তাহারা আপনাদের মত পরিবর্ত্তন করে [যুদ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে], তবে ছোব্‌হান আল্লাহ্‌! ইহা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কিছুই হইতে পারে না। যদি তাহারা নিজেদের মত সম্বন্ধে জেদ করে, তবে আমি তাহাদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করিব,—যেন আমার পক্ষ হইতে জোলমের [অত্যাচার] সূত্রপাত না হয়। যে কোনও কার্য্যে কিছু মাত্র ফাছাদের [বিবাদের] সম্ভাবনা থাকে, আমি সে কার্য্যের সংশোধন না করিয়া নিরস্ত থাকিব না। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, কোনওরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-হাঙ্গামা করা হজরত আলীর [কঃ-অঃ] অভিপ্রেত ছিল না। কুফাবাসিগণ আমিরুল মুমেনির উক্তি শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন

করিল ; এবং ঐ স্থানেই তাহাদের শিবির শ্রেণী স্থাপিত হইল। দ্বিতীয় দিবস হজরত আলী (কঃ অঃ) কায়কার-বিন-ওমরু (রাজিঃ)কে বস্রায় পাঠাইয়া দিলেন। এই যিক্কার নামক স্থানেই বিখ্যাত তাবেয়ী ও তাপস কুল শিরোমণি হজরত আয়িস্ করনী (রাজি) আসিয়া হজরত আলীর (রাজি) হস্তে বায়েত করিলেন।

সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা।

হজরত কায়কার-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) কে হজরত আলী (কঃ অঃ) এই জন্য বস্রায় পাঠাইয়া ছিলেন যে, তিনি সেখানে গিয়া হজরত ওম্মোল মুমেনিন আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ), হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও যোবের (রাজিঃ)এর অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অবগত হন। আর যতদূর সম্ভব ইহাদিগকে মিলন ও সন্ধির দিকে আহ্বান করিয়া তাহার নামে বায়েত গ্রহণ করিতে রাজী (সম্মত) করিতে যেন চেষ্টা পান। হজরত কায়কার-বিন-ওমরু (রাজিঃ) একজন উৎকৃষ্ট বক্তা ; বুদ্ধিমান্, সকলের ভক্তি ভাজন, হজরত রেছালত মাব্ (ছালঃ)এর সংযোগ লাভে বহু জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন আছহাব ছিলেন। তিনি বস্রায় পঁহুছিয়া পূর্ব্বোক্ত বোজর্গ (সম্মানিত নর নারী) দিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাজিঃ-আঃ) খেদমতে আরজ করিলেন, আপনাকে কোন জিনিষ (বা বিষয়) এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল ? আর

আপনার প্রকৃত অভিপ্রায় কি ? ওম্মোল মুমেনিন বলিলেন, আমার ইচ্ছা কেবল মাত্র মুসলমানদিগের সংস্কার সাধন এবং তাহাদিগকে কোর-আনের আজ্ঞানুবর্ত্তী করা। হজরত তালহা (রাজিঃ) এবং হজরত যোবের (রাজিঃ)ও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকেও ঐরূপ প্রশ্ন করা হইল; তাঁহারাও ওম্মোল মুমেনিনের ন্যায়ই উত্তর প্রদান করিলেন। ইহা শুনিয়া হজরত কায়কার-বিন্‌-ওমরু (রাজিঃ) বলিলেন, যদি আপনাদের ইচ্ছা মুসলমানদিগের 'এছলাহ' (সংস্কার সাধন) এবং সকলকে কোর-আনের অনুগামী করা হয়, তবে আপনাদের উদ্দেশ্যত এই উপায়ে সাধন হইবে না— আপনারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, পবিত্র কোর-আন মজীদে কেছাছের (হত্যাকারীর প্রাণ দণ্ডের) আদেশ আছে; আমরা হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) এর হত্যার প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক, হজরত কায়কার-বিন ওমরু (রাজিঃ) তচ্ছ্রবণে বলিলেন, কেছাছ (হত্যার দণ্ড বিধান) কি এইরূপে করা হয়। প্রথমতঃ এমামত ও খেলাফৎ স্থাপন এবং উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করা একান্ত আবশ্যক, যেন মোল্‌কি এন্তেজামে (শাসন সম্পর্কীয় বন্দোবস্তে) কোন ত্রুটি না থাকে। শাসন সম্পর্কীয় সুবন্দোবস্ত ঠিক হইলে হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) কেছাছ অতি সহজেই লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন শান্তি শৃঙ্খলা, রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ কার্য্য ঠিক না থাকে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির কি সাধ্য যে

হত্যাকাণ্ডের কেছাছ গ্রহণ করে? দেখুন, এই বস্রাতেই আপনারা হজরত ওসমান (রাজিঃ)এর হত্যাকাণ্ডের কেছাছ গ্রহণের নামে বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ কার্য্যের একজন প্রধান নেতা হরকুছ-বিন-যহির আপনাদের হাতে আইসে নাই। আপনারা যখন তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিয়াছেন, তখন ৬০০০ লোক তাহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আপনারাও মছলেহাতান (অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া) তাহার অনুসরণে বিরত হইয়াছেন। এইরূপ হজরত আলী (কঃ অঃ) যদি 'মছলেহাতান' বিপ্লব নিবৃত্তির জন্য, এবং শান্তি ও সুযোগ লাভের জন্য বাধ্য হইয়া আপততঃ কেছাছ গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদিগেরও অপেক্ষা করা উচিত ছিল। আপনাদের পক্ষে ইহা কিরূপ ন্যায় সঙ্গত ছিল যে; আপনারা স্বয়ং কেছাছ গ্রহণের জন্য দণ্ডায়মান হন, এবং বিপ্লবাগ্নি আরও প্রবলভাবে প্রজ্বলিত করিয়া তুলেন? আপনাদের এইরূপ পন্থাবলম্বনেত বিপ্লব আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। মুসলমানদিগের মধ্যে শোণিত পাত হইবে; ফল এই দাঁড়াইবে যে, হজরত ওসমান (রাজিঃ)এর হত্যাকারিগণ দণ্ড ভোগ হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

এই সকল কথা বলিয়া হজরত কায়কার-বিন-ওমরু নিতান্ত দুঃখাক্রান্ত হৃদয়ে বলিলেন, হে বোজর্গগণ! এ সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সংস্কার আপসে সোলেহ করা (বিবাদ মিটাইয়া

ফেলা) যদ্দারা মুসলমানদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে ; তাহাদের দুর্ভাবনা দূর হইবে, আপনারা খোদার ওয়াস্তে আমাদিগকে বালা মছিবতে (বিপদ আপদে) নিক্ষেপ করিবেন না। অন্যথা স্মরণ রাখিবেন, আপনারা ও বিপদ্-জালে জড়িত হইয়া পড়িবেন। তদ্দারা মুসলমানগণ বড়ই বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আদর্শ ধর্ম্মবীর ও সুবক্তা হজরত কায়কার (রাজিঃ)এর এই সকল কথায়—উপদেশ বাক্যে হজরত উম্মোল মুমেনিন (রাঃ আঃ) হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) এর হৃদয়ে বড়ই প্রভাব বিস্তার করিল। তাঁহারা বলিলেন, হজরত আলীর (কঃ অঃ) যদি ইহাই খেয়ালাত (উদ্দেশ্য ও মত) হয়—যেরূপ আপনি বর্ণন করিলেন ; আর তিনি হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)এর হত্যাকারিগণের কেছাছ (হত্যাকাণ্ডের শাস্তি) প্রদান করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ এবং শত্রুতাচরণের কোন কারণই বাকী থাকিতে পারে না, আমরা ত এযাবৎ ইহাই বুঝিতেছিলাম যে, হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)এর হত্যাকারীদের সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি আছে ; এজন্যই হত্যাকারী-দল তাঁহার সেনাদলভুক্ত রহিয়াছে, এবং অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সমূহেও তাহাদের প্রাধান্য দৃষ্ট হইতেছে। হজরত কায়কার-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) তদুত্তরে বলিলেন, আমি যাহা বলিলাম, তাহা হজরত আলী (রাজিঃ)এর উক্তির তরজমা (বা পুনরুক্তি) মাত্র। তখন হজরত ওম্মোল মুমেনিন এবং

হজরত তালহা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) বলিলেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোনওরূপ শত্রুতা থাকিবে না।

এই সকল কথোপকথনের পর হজরত কায়ফার-বিন-ওমরু বস্রা হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আমিরুল মুমেনিন হজরত (রাজিঃ) সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গেই বস্রার প্রধান প্রধান লোকের দ্বারা গঠিত একটি দল, ওফদ্ (ডেপুটেশন) স্বরুপ হজরত আমিরুল মুমেনিনের খেদমতে গমন করিলেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে গমন করিলেন যে, হজরত আলী (রাজিঃ) ও কুফাবাসিগণের স্পষ্ট অভিপ্রায় অবগত হওয়া অর্থাৎ আমিরুল মুমেনিন প্রকৃত প্রস্তাবে মীমাংসা করনে ও সন্ধি স্থাপনে ইচ্ছুক কিনা? তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এই জনরব শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, হজরত আলী (কঃ অঃ) বস্রা জয় করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে হত্যা করিবেন, আর স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগকে ক্রীত দাস-দাসীরূপে গ্রহণ করিবেন। এইরূপ জনরব কপট-কুল-চুড়ামণি আবদুল্লা-বিন-সাবার দলের লোকেরা (যাহারা হজরত আলীর [রাজিঃ] সেনাদলে ছিল) বস্রাবাসীদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছিল।

যখন হজরত কায়ফার-বিন-ওমরু (রাজিঃ), হজরত আলী (রাজিঃ) আল্লাহ আনহুর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন, তখন মহামান্য খলিফা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ওদিকে বস্রার ওফদ অর্থাৎ প্রতিনিধিগণ

হজরত আলী (কঃ ওঃ)এর সেনাদলস্থ কুফাবাসীগণের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া জানিতে পারিলেন, তাহারাও সন্ধি এবং সম্মিলন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, শান্তির সহায়ক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। অতঃপর মহামান্য খলিফাও বস্রার প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া সর্ব্ব প্রকারে অভয় প্রদান করিলেন। তাঁহারাও হজরত আলী (রাজিঃ) ও তাঁহার প্রধান প্রধান সেনানীগণের অনুকূল মত অবগত হইয়া, উৎফুল্ল হৃদয়ে বস্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং সমগ্র বস্রাবাসীকে সন্ধি ও শান্তির সুসংবাদ শুনাইয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন করিলেন।

বিপ্লববাদিগণের গুপ্ত পরামর্শ।

সন্ধির প্রাথমিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর হজরত আলী (রাজিঃ) স্বীয় সমগ্র সেনাদলকে এক স্থানে সমবেত করিয়া একটী সুমধুর ও হৃদয়াকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। অবশেষে আদেশ প্রদান করিলেন যে, আগামী কল্য বস্রার অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু আমার বস্রার দিকে যাত্রা করা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নহে বরং সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের জন্য; এবং যুদ্ধানলের উপর পানী বর্ষণের নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও প্রচার করিলেন যে, যে সকল লোক হজরত ওস্মান (রাজিঃ)এর গৃহ অবরোধ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহারা যেন আমার সঙ্গে কুচ (যাত্রা) না করে। বরং তাহারা যেন আমার সেনাদল হইতে

আজোহেদা (স্বতন্ত্র) হইয়া যায়। খলিফার এই বক্তৃতা ও আদেশ শ্রবণে আবদুল্লা-বিন্-সাবা ও মিসর দেশীয় বিপ্লববাদিদিগের মনে বিষম দুশ্চিন্তা ও ভীতির সঞ্চার হইল।

হজরত আলী (রাজিঃ)এর সৈন্যদলে এই শ্রেণীর লোকের (যোদ্ধৃ পুরুষের) সংখ্যা ২—২॥০ হাজার আন্দাজ ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকে বেশ প্রতিপত্তিশালী এবং সুচতুর ও বুদ্ধিমান ছিল। ঐ দলের সর্দ্দার (দলপতি)দিগকে আবদুল্লা-বিন্-সাবা এক খাস সভায় (গুপ্ত সমিতিতে) আহ্বান করিল। এই খাস সভায় আবদুল্লা-বিন্-সাবা, এবনে মলজান, মালেক আশতর ও তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুগণ, আলিয়া-বিন্-আল্ হতিম, সালেম-বিন্-সায়াল বাহ, সবিহ-বিন-আওনি প্রভৃতি বিপ্লব বাদীদিগের নেতৃগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এতদিন ত তালহা (রাজিঃ) ও জোবের (রাজিঃ), হজরত ওস্মান (রাজিঃ)এর কাছাছের (হত্যার প্রতিশোধ) দাবী করিতেন, এক্ষণে ত স্বয়ং আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী [রাজিঃ]কেও তাঁহাদের হাম-খেয়াল (মতাবলম্বী) বলিয়া বোধ হইতেছে। আজ আমাদিগকে তাহার সেনাদল হইতে বিছিন্ন হইতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যদি আপসে তাহাদের মধ্যে সন্ধি বন্ধন হয়, তবে তাঁহাদের পরস্পর মিলনের পর আমাদের নিকট হইতে কেছাছ (হত্যার প্রতিশোধ) নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। আর আমাদিগের সকলেই উপযুক্তরূপ শাস্তি দিবেন। মালেক-বিন-আশতর বলিলেন, তাল্হা (রাজিঃ)

হউন, জোবের (রাজিঃ) হউন, আর হজরত আলী (রাজিঃ)ই হউন, আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের সকলেরই একমত। এক্ষণে তাঁহারা পরস্পর সন্ধি স্থাপন করিলে আমাদের শোণিতের পরিবর্ত্তেই সেই সন্ধি স্থাপিত হইবে। সুতরাং আমার নিকট ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে যে, আমরা তালহা (রাজিঃ) জোবের (রাজিঃ) ও আলী (রাজিঃ) ইহাদের ৩ জনকেই ওসমান (রাজিঃ)এর নিকট পহুছাইয়া দি (অর্থাহ তাঁহাদের হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করি)। এরূপ করিলে আপনা হইতেই দেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে। আবদুল্লা-বিন-সাবা এই গুপ্ত সভার সভাপতি পদে বরিত হইয়াছিল, সে বলিল, তোমাদের সংখ্যা (হজরত আলী [রাজিঃ]এর সমগ্র সেনাদল অপেক্ষা অনেক কম, আর হজরত আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে এসময় ২০ হাজার যোদ্ধৃ পুরুষ বিদ্যমান। এরূপে বস্রায় তালহা (রাজিঃ) ও জোবের (রাজিঃ)এর অধীনে যোদ্ধ পুরুষের সংখ্যা ৩০ হাজারের কম নহে। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ছালেম-বিন-সালবাহ বলিলেন, সন্ধি স্থাপন হওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগের দূরে চলিয়া যাওয়া উচিত। সরিহও এই মতের অনুমোদন করিলেন। কিন্তু আবদুল্লা-বিন-সাবহে বলিল, এই মতও দুর্ব্বল এবং অমঙ্গল জনক বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার পর সকলেই স্বাধীন-ভাবে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না ; অবশেষে সকলে মিলিয়া :-

আবদুল্লা-বিন-সাবাকে বলিলেন, এক্ষণে আপনি আপনার স্বাধীন মত ব্যক্ত করুন। হইতে পারে, আপনার মতই বা সকলের মনঃপুত হয়। অতঃপর ধূর্ত্তচূড়ামণি আবদুল্লা-বিন-সাবা বলিল, ভ্রাতৃগণ! আমার মতে আমাদের পক্ষে ইহাই মঙ্গল জনক যে, আমরা সকলেই হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলে মিশিয়া মিশিয়া থাকি। আর তাঁহার সেনাদল হইতে কোনও ক্রমেই বিচ্ছিন্ন না হই। একান্ত পক্ষে তিনি আমাদিগকে স্বীয় সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, কিংবা তাড়াইয়া দিলেও আমরা তাঁহার সেনাদলের কাছে কাছেই অবস্থান করি। আর ইহাও বলিয়া দেওয়া উচিত যে, আমরা এজন্য আপনার খুব কাছে কাছে থাকিতে চাই যে, যদি আপনাদের মধ্যে প্রস্তাবিত সন্ধি স্থাপন না হয়, এবং পরস্পারের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া যায় তখন আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সাহায্য করিব। হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলের সঙ্গে আসিয়াই হউক, কিংবা নিকটে আসিয়াই হউক, আমাদের এইরূপ চেষ্টা করা চাই যে, উভয় সেনাদল যখন পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন যে কোনও উপায়ে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাহাতে কোনও ক্রমেই সন্ধি স্থাপিত হইতে না পারে, তৎপক্ষে প্রাণপণে চেষ্টা করা চাই। এরূপ ব্যাপার সঙ্ঘটন করা অসম্ভব ব্যাপার নহে। দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া গেলে আমাদের বিপদ ও অনিষ্টের কোন কারণ বিদ্যমান থাকিবে না।

আবদুল্লা-বিন-সাবার এই প্রস্তাব সকলেরই মনঃপুত হওয়াতে গুপ্ত পরামর্শ সভায় এই প্রস্তাবই গৃহীত হইল।

জঙ্গে জমল—জমল যুদ্ধ।

প্রত্যুষে উঠিয়া হজরত আলী (কঃ অঃ) স্বীয় সেনাদলকে "কুচ" করিতে আদেশ দিলেন। বিপ্লব-বাদীদিগের যে সেনাদল মদীনা তৈয়বা হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারাও সঙ্গী হইল ; আর তাহাদের একদল মূল সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে নিকটবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিল। পথি-মধ্যে বকর-বিন-ওয়ায়েল এবং আবদুল কায়েছ প্রভৃতি সম্প্রাদয়ের যোদ্ধৃ পুরুষগণও হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলে আসিয়া যোগদান করিল। মহামান্য খলিফার সেনাদল অগ্রসর হইয়া বস্রার নিকটস্থ 'কছ্‌র্‌ আবদুল্লার' ময়দানে গিয়া পঁহুছিল ; এবং সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। ওদিক্ হইতে হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাজি আঃ), হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত জোবেয়ের (রাজিঃ) সৈন্যগণও ঐ ময়দানের অপর দিকে শিবির শ্রেণী স্থাপন করিল। তিন দিন পর্য্যন্ত উভয় সেনাদল পরস্পর সম্মুখীন ভাবে চুপ হইয়া রহিল। এই সময় মধ্যে হজরত যোবেয়ের সঙ্গী প্রধান প্রধান লোকের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, আমাদিগের যুদ্ধারম্ভ করা উচিত। হজরত

যোবের (রাজিঃ) বলিলেন, কায়কার-বিন-ওমরুর (রাজিঃ) দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছে, আমাদিগের উহার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। সন্ধির কথা-বার্ত্তা যে ক্ষেত্রে চলিতেছে, সে ক্ষেত্রে যুদ্ধারাম্ভ করা কোনও ক্রমেই সিদ্ধ নহে। ওদিকে হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনা-নায়ক ও দলপতিদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহাকে যুদ্ধারাম্ভ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, তিনিও তাঁহাদিগকে ঐরূপ উত্তরই দিলেন। একদিন এক ব্যক্তি হজরত আলী (রাজিঃ)কে প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি জন্য বস্রায় আগমন করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, বিপ্লব নিবারণ করিবার জন্য; আর মুসলমানদিগের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন জন্য। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি বস্রাবাসিগণ আপনার কথা না মানে, তাহারা সন্ধি বন্ধনের অনুরাগী না হয়, তবে সে অবস্থায় আপনি কি করিবেন? তদুত্তরে আমিরুল মুমেনিন বলিলেন, আমি তাহাদের অবস্থার উপর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিব। প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, আপনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা যদি আপনাকে না ছাড়ে, তবে সে অবস্থায় আপনি কি করিবেন? উত্তরে হজরত আলী (কঃ-অঃ) বলিলেন, আমি 'মোদা ফেরাত'—(আত্ম-রক্ষা) করিব। ইত্যবসরে আর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, হজত তল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত জোবের (রাজিঃ) প্রভৃতি প্রতিপক্ষ দলপতিগণ বলিতেছেন, আমরা খোদা-তালার রেজা-

মন্দি হাসেল (আদেশ প্রতিপালন) জন্য খরুজ (অভিযান) করিয়াছি, আপনার নিকট তাহাদের পক্ষে হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যার বদলা লইবার কোন দলিল আছে কি ? হজরত আলী (কঃ-অঃ) ফরমাইলেন, হাঁ, তাঁহাদের নিকট উহার দলিল আছে। আবার সেই প্রশ্নকারী বলিলেন, আপনার নিকট কি ইহার কোনও দলিল আছে, যে জন্য আপনি হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বিলম্ব করিতেছেন ? তদুত্তরে মহামান্য খলিফা বলিলেন, হাঁ, যখন কোনও বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, এবং প্রকৃত ঘটনা অবগত হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে, সে অবস্থায় সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা খুব সতর্কতা সহকারে ধীরে ধীরে—বুঝিয়া সুঝিয়া করা কর্ত্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে হঠাৎ তাড়াতাড়ি কোন কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত নহে। অবশেষে প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আগামী কল্য উভয় দলে সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, তবে আমাদের এবং তাহাদের কি অবস্থা হইবে ? উত্তরে হজরত আলী (কঃ অঃ) ফরমাইলেন, এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের ও আমাদের উভয় পক্ষে মক্‌তুলিন (নিহত ব্যক্তি)গণ স্বর্গলাভের অধিকারী হইবেন।

অতঃপর হজরত আলী (কঃ অঃ) হকম-বিন্‌-সালাম ও মালেক-বিন্‌-হবিবকে হজরত তালহা (রাজিঃ) ও হজরত জোবের (রাজিঃ)এর নিকট এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে, যদি আপনারা হজরত কায়ফার-বিন্‌-ওমরুর (রাজিঃ)

প্রস্তাবে রাজী থাকেন, তবে শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধে বিরত থাকুন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা আমাদের কথায় স্থির সঙ্কল্প আছি। ইহার পরে হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত জোবের (রাজিঃ) স্বীয় সেনাদল হইতে বাহির হইয়া উভয় সেনাদলের মধ্যবর্ত্তী ময়দানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাদিগকে ময়দানে আসিতে দেখিয়া ওদিক্ হইতে হজরত আলী (রাজিঃ)ও স্বীয় শিবির হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদ্বয়ের নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহারা পরস্পর এত নিকটবর্ত্তী হইলেন যে, তাঁহাদের আরোহিত অশ্বের মুখ পরস্পর সম্মিলিত হইল। আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ অঃ) হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি আমার বিরুদ্ধাচরণ ও আমার সঙ্গে শত্রুতা করা জায়েয্ (সিদ্ধ) প্রমাণ করিতে পারেন? আপনি কি আমার দিনী ভাই (ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রাতা) নহেন? আপনার প্রতি আমার এবং আমার প্রতি আপনার শোণিত পাত কি হারাম নহে? তদুত্তরে হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) বলিলেন, আপনি কি হজরত ওস্‌মান গণির (রাজিঃ) হত্যা-কাণ্ড সম্বন্ধীয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না? এতচ্ছ্রবণে হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইলেন, খোদাতালা দানা (সর্ব্বজ্ঞ) ও বিনা (সর্ব্ব-বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী); খোদাতালা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকারীদিগের প্রতি লায়ানত (অভিশাপ)

প্রদান করিবেন। হে তাল্‌হা (রাজিঃ) আপনি কি আমার হাতে বায়েত করিয়া ছিলেন না? হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি বয়েত করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার গরদানের (ঘাড়ের) উপর তলওয়ার ছিল, আমি নিরুপায় হইয়া বয়েত করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ উহাতে এই সর্ত্ত ছিল যে, হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকারীদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দিতে হইবে। ইহার পর হজরত আলী (রাজিঃ) হজরত জোবেয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনাকে ঐ দিনের কথা স্মরণ আছে কি? যে দিন হজরত (সালঃ) আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবে, এবং তুমি ঐ ব্যক্তির প্রতি জোলম করণে-ওয়ালা (অত্যাচার কারী) হইবে। এতচ্ছ্রবণে হজরত যোবের (রাজিঃ) বলিলেন, হাঁ সেই কথা আমার মনে পড়িতেছে; কিন্তু আপনি আমার মদীনা হইতে যাত্রার পূর্ব্বে এই কথাটী স্মরণ করাইয়া দেন নাই। যদি স্মরণ করাইয়া দিতেন, তবে আমি মদীনা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিতাম না। এক্ষণে আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার সঙ্গে আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না। এই সকল কথোপকথনের পর তাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্ব স্ব সেনাদলে প্রস্থান করিলেন। হজরত যোবের (রাজিঃ) স্বীয় সেনাদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হজরত ওম্মোল মুমেনিনের (রাজিঃ আঃ) খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, আজ হজরত আলী

(রাজিঃ) আমাকে এমন একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, যে জন্য আমি তাহার সঙ্গে কোনও অবস্থায়ই যুদ্ধ করিব না। আমার সঙ্কল্প এই যে, আমি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। হজরত ওম্মোল্ মুমেনিনের পূর্ব্ব হইতেই এই খেয়াল ছিল ; কারণ তাঁহাকেও চশমা হো-আবে হজরতের ভবিষ্যদ্বানী মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু হজরত ওম্মোল্ মুমেনিন (রাজিঃ আঃ) হজরত যোবের (রাজিঃ)এর কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হজরত আবদুল্লা বিন্ যোবের (রাজিঃ) স্বীয় পিতা হজরত যোবের (রাজিঃ)কে বলিলেন, আপনি যখন উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিয়াছেন, আর এক পক্ষকে অপর পক্ষের শক্রুতাচরণে উত্তেজিত করিয়াছেন, এই অবস্থায় আপনি সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এক্ষেত্রে আমার মনে হইতেছে, আপনি হজরত আলীর (রাজিঃ) বিপুল সেনাদল দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছেন ! আর আপনার মধ্যে ভীরুতা দেখা দিয়াছে। পুত্রের কথা শুনিয়া হজরত যোবের (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে উঠিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেন এবং একাকী হজরত আলীর (রাজিঃ) শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন, এবং হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনা দলে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক বিচরণ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) তাহাকে স্বীয় সেনাদলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সৈন্যদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন কেহ কোনওরূপ বাধা প্রদান না করে। কেহ

যেন তাঁহার সঙ্গে লড়াই ভিড়াই করিতে প্রবৃত্ত না হয়। তাঁহার আদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হইল ; কেহ তাঁহার সম্বন্ধে কোনওরূপ বে-আদবী করিল না। হজরত যোবের (রাজিঃ) প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় পুত্র হজরত আবদুল্লা (রাজিঃ)কে বলিলেন, যদি আমি হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদল দেখিয়া ভীত হইতাম, তাহা হইলে একাকী কখনই তাঁহার বিরাট বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতাম না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমি হজরত আলীর (রাজিঃ) সম্মুখে এই বলিয়া শপথ করিয়াছি যে, আমি কখন ও আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব না। হজরত আবদুল্লা (রাজিঃ) বলিলেন, আপনি শপথ করার দরুণ কাফফারা দিয়া দিন। একটী গোলাম (ক্রীতদাস) আযাদ (মুক্ত) করিয়া দিলেই কাফ্ফারা আদায় হইয়া যাইবে। হজরত যোবের (রাজিঃ) বলিলেন, আমি হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলে হজরত এমার (রাজিঃ)কে দেখিতে পাইলাম, তাঁহার সম্বন্ধে হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) ফরমাইয়া ছিলেন, এমারকে বিদ্রোহিগণ কতল (শহিদ) করিবে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে উভয় দলের নেতবর্গের মনে একটা বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল।

ইহার ফল এই হইল যে, হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহুর পক্ষ হইতে হজরত আবদুল্লা বিন্-আব্বাস (রাজিঃ), হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)এর খেদমতে এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে হজরত মোহাম্মদ-বিন্-তাল্‌হা হজরত

আলীর (রাজিঃ) খেদমতে উপস্থিত হইলেন। স্থূলকথা, সন্ধির সমুদয় সর্ত্ত তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া গেল। ইহাও স্থির হইল যে, আগামী কল্য প্রাতঃকালে সোলেহ্‌নামা (সন্ধিপত্র) লেখা-পড়া হইয়া তাহাতে উভয় পক্ষের নেতৃবর্গের দস্তখৎ (স্বাক্ষর) হইয়া যাইবে। উভয় সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া তিন দিন অবস্থিতি করিতেছিল। এই তিন দিনের মধ্যে কূটচক্রী আবদুল্লা-বিন্-সাবার দল ও বিপ্লব-বাদীদিগের দল আপনাদের অভিপ্সিত দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার কোনও সুযোগ লাভ করিতে পারিয়াছিল না। ঐ সেনাদল হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলের খুব নিকটেই স্বতন্ত্র খিমা (তাম্বু) সমূহে অবস্থান করিতেছিল। এক্ষণে তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, আগামী কল্য প্রাতঃকালে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে, তখন তাহারা বিষম চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। তাহারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য সারা-রাত্রি পরামর্শ করিতে লাগিল। অবশেষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই উহারা হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)এর সৈন্যদল অর্থাৎ অহেলে জমলকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। বস্রার বিশাল সেনাদলের যে অংশকে এই বিপ্লববাদী সেনাদল আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও তাড়াতাড়ি অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যখন সৈন্যগণের একাংশে যুদ্ধ বাধিয়া গেল, তখন উহার বিভিন্ন অংশেও ভীষণভাবে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সৈন্যগণের যুদ্ধ কোলাহল শ্রবণে

হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) শিবির হইতে বাহির হইয়া প্রকৃত ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে তাঁহার সৈন্যগণ বলিল, হজরত আলীর (রাজিঃ) সৈন্যগণ হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। তখন তাঁহারা বলিলেন, হজরত আলী (কঃ অঃ) অযথা শোণিত-পাত হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইবেন না। ওদিকে হজরত আলী (রাজিঃ) ও যুদ্ধের ভীষণ কোলাহল শ্রবণে স্বীয় তাবু হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; এবং সেই স্থানে আবদুল্লা-বিন্‌-সাবা পূর্ব্ব হইতেই তাহার কতিপয় চেলা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, তাল্‌হা (রাজিঃ) ও যোবের (রাজিঃ)এর সৈন্যগণ আমাদের সেনাদলের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিয়াছে, কাজেই আমাদের সৈন্যগণও বাধ্য হইয়া তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হজরত আলী (কঃ অঃ) বলিলেন, আক্ষেপ, হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও যোবের (রাজিঃ) শোণিতপাত হইতে বিরত হইবেন না। এই কথা বলিয়া স্বীয় সেনাদলের বিভিন্ন অংশে যুদ্ধের আদেশ প্রেরণ এবং শত্রুদলের সঙ্গে যুদ্ধের যথাযথ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই যুদ্ধ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। উভয় দলের সেনাপতিগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে যুদ্ধ সম্বন্ধে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে সকলেই 'না ওয়াকেফ্' (অনবগত) থাকিয়া গেলেন। এব্‌নে-সাবা ও বিপ্লববাদীদিগের ষড়যন্ত্র

দ্বারা যে এই বিষম যুদ্ধের অবতারণা হইল, তাহা তখন পর্য্যন্ত কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তথাপি দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ একবার ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যুদ্ধে পলায়মান যোদ্ধার কেহ পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিবে না, কেহ আহত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, প্রতি পক্ষের মাল আসবাব (সামগ্রী সম্ভার) কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। এইরূপ ঘোষণা যেমন এক দিকে হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষ হইতে হইয়াছিল ; সেইরূপ অপর দিকে হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) এর পক্ষ হইতেও হইয়াছিল। এতদ্বারা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় উভয় দলের মহামান্য নেতৃদলের মধ্যে মনোবাদ কিছু মাত্র বিদ্যমান ছিল না ; তাঁহারা যুদ্ধ ও শোণিত-পাত করিতে একান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। আর নিতান্ত বাধ্য হইয়াই যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে ছিলেন।

আবদুল্লা-বিন্-সাবা এবং মিস্‌র প্রভৃতি দেশের বিপ্লব-বাদিগণ এই সুযোগে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আপনাদের বাহাদুরী ও বীরত্বের 'জওহর' খুব দেখাইতে লাগিল। শবায়ী ও বালওয়াই (বিপ্লববাদী) দলের সর্দ্দার (নেতা)গণ হজরত আলীর (কঃ অঃ) আশে-পাশে থাকিয়া, প্রাণপণ যুদ্ধ ও আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত নিদর্শন দেখাইতে লাগিলেন। ঐ সময় কাব-বিন্-সুর হজরত ওম্মোল মুমেনিনের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, উভয়দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ; এসময় কর্ত্তব্য-বোধ হইতেছে যে,

আপনি উষ্ট্রোপরি আরোহণ করুন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে চলুন, ইহা সম্ভবপর হইতে পারে যে, আপনার সওয়ারি (আরোহিত উষ্ট্র) দেখিয়া লোকেরা যুদ্ধ কার্য্যে ও শোণিত-পাতে বিরত হয় এবং পরস্পর সন্ধি স্থাপনের কোনও উপায় অবলম্বিত হয়। এই কথা শুনিয়া হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ আঃ) এ বিষয়ে সম্মতি দান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিলেন। তাঁহার পরদা আক্রমণ প্রতিহত জন্য উষ্ট্রের সুগন্ধচকে (হাওদায়) লৌহ নির্ম্মিত যেরাঃ (লৌহ-নির্ম্মিত জাল) বিস্তার করিয়া দিলেন এবং উষ্ট্রটী এমন স্থানে আনিয়া দাঁড়-করান হইল, যে স্থান হইতে যুদ্ধ হাঙ্গামা খুব দৃষ্টি-গোচর হয়। তাঁহার আরোহিত উষ্ট্র যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দেখিয়া কোথায় লোকে যুদ্ধে বিরত হইবে, তাহা না হইয়া যুদ্ধানল আরও ভীষণভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। স্বপক্ষীয় যোদ্ধৃ পুরুষগণ মনে করিলেন, হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ আঃ) স্বয়ং সেনাপতি রূপে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন; এবং আমাদিগকে অধিকতর বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে-ছেন। সুতরাং তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; ওদিকে হজরত আলী (রাজিঃ) আহ্‌লে জমল—অর্থাৎ হজরত ওম্মোল-মুমেনিনের পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গের যুদ্ধোন্মাদ ও প্রচণ্ড আক্রমণ দর্শনে স্বয়ং সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধে যোগদান ও স্বীয় সৈন্যগণকে উৎসাহিত করা সঙ্গত ও কর্ত্তব্য মনে করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্পকাল পরেই

হজরত তাল্‌হার (রাজিঃ) পায়ে একটী বিষাক্ত তীর আসিয়া লাগিল। শোণিতে মোজা ভিজিয়া গেল। যন্ত্রণার তীব্রতা এত বেশী রকম অনুভব হইতেছিল যে, তাহা সহ্য করা সম্ভবপর ছিল না। শোণিত ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে ছিল; কিছুতেই তাহা বন্ধ হইতেছিল না। হজরত আলী (কঃ অঃ)এর সঙ্গীয় ছাহাবা হজরত কায়কার বিন্‌-ওমরু (রাজিঃ) হজরত তাল্‌হার (রাজিঃ) এই শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে আবু মোহাম্মদ (রাজিঃ)! আপনার যখম (ক্ষত) বড়ই মারাত্মক, আপনি এখনই বস্‌রা শহরে চলিয়া যান। তদনুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্‌রা নগরে প্রস্থান করিলেন; বস্‌রায় পৌঁছিয়াই তিনি বেহোশ (অচৈতন্য) হইয়া পড়িলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন (ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাযেউন)। মারওয়ান-বিন্‌-আল্‌-হকম এই যুদ্ধে হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)এর সঙ্গে ছিলেন। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) এয়াদাঃ (সঙ্কল্প) করিলেন যে, আমিও হজরত আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে যুদ্ধ করিব না। এই খেয়ালে তিনি সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক দিকে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং হজরত আলী (কঃ অঃ)এর পূর্ব্ব বর্ণিত কথা কয়টি সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিতে ছিলেন। আবার হজরত যোবের (রাজিঃ) ও হজরত আলীর (রাজিঃ) পরস্পর কথাবার্ত্তা এবং এমার-বিন্‌-এয়াছের (রাজিঃ)এর সম্বন্ধীয়

পেশিনগোয়ী (ভবিষ্যদ্বানী) স্মরণ করিয়া এই যুদ্ধে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন ; এবং যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে সঙ্কল্প করিতে ছিলেন। মারওয়ান-বিন্-আল হকম তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন ; এবং বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি যুদ্ধে যোগদান করিতে ইচ্ছুক নহেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছেন ; কুটীল কুল-চূড়ামণি মারওয়ান তৎক্ষণাৎ স্বীয় গোলাম (ক্রীতদাস)কে ইঙ্গিত করিলেন। সে সেই এশারা (ইঙ্গিত) বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখে চাদরে দিয়া ঢাকিয়া দিল, মারওয়ান চাদরে স্বীয় মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া (যেন তাহাকে কেহ চিনিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে) একটী বিষাক্ত তীর হজরত তাল্‌হার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এই ভীষণ বিষাক্ত তীর হজরত তাল্‌হার (রাজিঃ) পায়ে লাগিয়া তাঁহার আরোহিত অশ্বের পেটে গিয়া লাগিল। অশ্ব তাঁহাকে লইয়া ভূপতিত হইল। হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ভূমি হইতে উঠিয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) এক গোলাম (দাস)কে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া তাহার হস্তে কিংবা হজরত কায়কায় [রাজিঃ]এর হস্তে (যাঁহার উপস্থিতির সংবাদ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে) প্রতিনিধিত্ব হিসাবে হজরত আলীর [রাজিঃ] বায়েত করিলেন ; এবং এই প্রতিনিধিত্ব মূলক বায়েতের পর বস্রায় গমন পূর্ব্বক অত্যল্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ করিলেন। হজরত আলী [কঃ অঃ] যখন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন, তখন এই সহযোগী বন্ধুর আত্মার

মঙ্গল কামনায় খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিলেন, আর তাঁহার বিশেষ প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে এবং তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যখন উভয় পক্ষের অনিচ্ছাকৃত ও অপ্রীতিকর যুদ্ধ এব্‌নে-সাবা ও বিপ্লববাদীদিগের চক্রান্তে আরম্ভ হইল, তখন হজরত যোবের-বিন-আওয়াম [রাজিঃ]—যিনি পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, হজরত আলীর [রাজিঃ] সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন না—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বজুদা [স্বতন্ত্র] হইয়া গেলেন, ঘটনা বশতঃ হজরত এমার [রাজিঃ]এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি হজরত যোবের [রাজিঃ]কে দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইলেন, এবং যুদ্ধের জন্য তাহাকে টুকিলেন [ব্যঙ্গ-সূচক ইঙ্গিত করিলেন]; তিনি বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব না। হজরত এমার [রাজিঃ] ইহাকে যুদ্ধের প্রধান কারণ স্বরূপ জানিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত নারাজ [অসন্তোষ] ছিলেন, তিনি হজরত যোবের [রাজিঃ]কে আক্রমণ করিলেন। তিনি তাঁহার আক্রমণের গতিরোধ করিয়া কেবল মাত্র আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু হজরত এমার [রাজিঃ]এর প্রতি একবারও অস্ত্র-প্রক্ষেপ করিলেন না, হজরত এমার [রাজিঃ] মহাবীর হজরত যোবের [রাজিঃ]কে আক্রমণ করিতে করিতে নিজেই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, এই অবসরে হজরত যোবের [রাজিঃ] সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বস্রাবাসীদিগের মধ্যে তত্রস্থ অন্যতম নায়ক আখফ-বিন্‌-কায়স্‌ স্বীয় সম্প্রদায়ের [দলের] এক বৃহৎ সেনাদল

লইয়া উভয় প্রতিপক্ষ সেনাদলের মধ্যস্থানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই উভয় পক্ষের নেতৃ মণ্ডলীকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আমি কোনও পক্ষেরই সাহায্য বা বিরুদ্ধাচরণ করিব না। হজরত যোবের (রাজিঃ) যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে রওয়ানা হইয়া আখফ্-বিন-কায়সের শিবির শ্রেণীর নিকট দিয়া বস্রাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। আখফ্-বিন-কায়সের সেনাদলস্থ ওমরু-বিন-আশ্ জরমুয্ নামক এক ব্যক্তি হজরত যোবের (রাজিঃ) এর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া পাশা-পাশি গমন করিতে, তাঁহাকে কোনও মস্‌লা জিজ্ঞাসা করিল। এ অবস্থায় হজরত যোবের (রাজিঃ) তাঁহার সম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দেহ করিলেন না; কিন্তু উহার মনে দুরভিসন্ধি ছিল; এজন্য সে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। যখন হজরত যোবের (রাজিঃ) "ওয়াদি অস্‌বায়" নামক স্থানে পঁহুছিলেন; তখন নামাজের (সম্ভবতঃ জোহারর নামাজের) সময় হইল, তিনি অজু বা তৈয়ম্মম করিয়া নামাজে দণ্ডায়মান হইলেন। যখন তিনি সেজদায় গেলেন, তখন ওমরু-বিন্-আল্ জরমুয্ তাঁহাকে তরবারির দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিল। হজরত যোবের (রাজিঃ) বলিলেন, আমি জানি না, তুমি এই কাজ ভাল করিলে কি মন্দ করিলে; হত্যাকারী সেখানে হইতে দ্রুত গমনে হজরত আলীর (রাজিঃ) শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ এক ব্যক্তি আসিয়া হজরত আলী (রাজিঃ)কে

সংবাদ দিল যে, হজরত যোবের (রাজিঃ)এর হত্যাকারী আপনার খেদমতে উপস্থিত হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। তিনি বলিলেন, উহাকে আসিতে বল, এবং ইহাও বলিয়া দাও যে, তাহার স্থান জাহান্নমে (দোজখে বা নরকে)। যখন সে হজরত আলী (রাজিঃ)এর সমীপে উপস্থিত হইল ; এবং আমিরুল মুমেনিন তাহার হস্তে হজরত যোবেরের তরবারি দেখিতে পাইলেন ; তখন তাঁহার নয়ন যুগল হইতে প্রবল বেগে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইল। তিনি সেই হত্যাকারী পাষাণকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন, রে জালেম (হত্যাকারী), ইহা সেই তরবারি, যাহা সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত হজরত রছুলোল্লার (সালঃ) হেফাজৎ (তত্ত্বাবধান) করিয়াছিল। হত্যাকারী ওমরু বিন্-অল্‌জরমুয্ এই কথা শুনিয়া এরূপ মনঃক্ষুণ্ণ ও উত্তেজিত হইল যে, সে হজরত আলী করমুল্লাহ্ অজহুর প্রতি কয়েকটি বে-আদবী উচ্চারণ পূর্ব্বক, সেই তরবারি খানি স্বীয় উদরে প্রবিষ্ট করিয়া দিল, এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু পথের পথিক হইয়া জাহান্নম-বাসী হইয়া গেল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরক্ষণেই হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) এবং হজরত যোবের (রাজিঃ) যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছেন। কবায়েল (সম্প্রদায় বা দল)এর সরদার এবং ছোট ছোট সেনাপতিগণ স্ব স্ব দলভুক্ত বা অধীনস্থ যোদ্ধৃদলদিগকে লইয়া ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ আঃ) পক্ষ হইতে হজরত আলীর (রাজিঃ) সৈন্য সেনানীদলের সঙ্গে

বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে ছিলেন। হজরত ওম্মোল-মুমেনিনের (রাজিঃ আঃ) ইচ্ছা ছিল, যাহাতে যুদ্ধ শীঘ্র থামিয়া যায়, এবং পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। তাঁহার অর্থাৎ আহলে জমলের পক্ষে প্রধান সেনাপতি কেহই ছিলেন না। এ পক্ষে যাহারা যুদ্ধ করিতে ছিলেন, তাহারা একথাও জানিতেন না যে, যুদ্ধ করা হজরত ওম্মোল মুমেনিনের (রাঃ আঃ) উদ্দেশ্য; কিংবা তাঁহার মতের বিরুদ্ধ। হজরত ওম্মোল মুমেনিন এবং তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য-সেনাপতিদিগের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, হজরত আলী (কঃ-অঃ) সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইয়া আমাদিগকে ধোকা দিতে চাহিয়া ছিলেন, এবং অতি নির্দ্দয়ভাবে অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া 'নেস্তনাবুদ' (ধ্বংস) করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি স্বীয় সৈন্যদলকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে বা আত্ম-রক্ষা কার্য্যে বিরত রাখিতে অক্ষম ছিলেন। বস্রার লোকেরা পূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছিল যে, হজরত আলী (কঃ অঃ) বস্রাবাসীদিগের উপর বিজয়ী হইয়া তাহাদের পুরুষদিগকে ক্রীতদাস এবং নারীদিগকে ক্রীতদাসী করিবেন; বর্ত্তমান ঘটনায় তাহাদের সেই বিশ্বাস ও ধারণা সম্পূর্ণ-রূপে বদ্ধমূল হইল; এবং এজন্য তাহারা অধিকতর প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আপনাদের ভীষণ বিপদ দূরীকরণার্থে বিশেষ ভাবে প্রয়াস পাইতে লাগিল। ফলতঃ এই ধূর্ত্ততা-মূলক অন্যায় যুদ্ধে উভয় পক্ষে প্রায় ১০ হাজার যোদ্ধৃ পুরুষ সমর-শায়ী হইল। ধূর্ত্ত-চূড়ামণি এব্‌নে সাবা ও বিপ্লববাদীদিগের

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল না। প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষ এবং যোদ্ধৃ পুরুষগণ অন্ধকারেই থাকিয়া গেলেন। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারিলেন না, এই যুদ্ধ কিরূপে আরম্ভ হইল। প্রত্যেক দলই প্রতিপক্ষ দলকে এই অন্যায় যুদ্ধ সম্বন্ধে দায়ী ও দোষী মনে করিতে লাগিলেন। হজরত আলী (কঃ অঃ) স্বয়ং সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে পরিচালিত করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষ হইতে এমন ভীষণ আক্রমণ চলিতে লাগিল যে, 'আহলে জমল' পশ্চাৎ পদ হইতে বাধ্য হইল। এবং ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ আঃ) আরোহিত জবল (উষ্ট্র) হজরত আলীর (রাজিঃ) আক্রমণ-কারী সেনাদলের আয়ত্তের মধ্যে (বেষ্টন বা ঘেরাওর ভিতর) আসিয়া গেল। এই উষ্ট্রের মহার (লাগাম স্বরূপ দড়ি বা রসি) হজরত কায়াবের (রাঃ) হস্তে ছিল; তিনিই পরামর্শ দিয়া হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ)কে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সম্মানিত ভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে সোলেহ্ (সন্ধি বা আপোস) হইয়া যায়। যখন হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাজিঃ আঃ) দেখিতে পাইলেন যে, আক্রমণকারী সৈন্যগণের গতি কিছুতেই রোধ করা যাইতেছে না; পক্ষান্তরে যে বস্রার সৈন্যদল ইতিপূর্ব্বে পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা ওম্মোল-মুমেনিনের উষ্ট্র রক্ষার জন্য নবোদ্যমে অগ্রসর হইয়া ভীষণভাবে তরবারি সঞ্চালন করিতেছে

তখন ওম্মোল-মুমেনিন (রাঃ আঃ) কায়াবকে আদেশ দিলেন যে, তুমি উষ্ট্রের রজ্জু ছাড়িয়া দিয়া, কোরআন মজিদ উচ্চে তুলিয়া অগ্রসর হও; এবং লোকদিগকে কোরআন মজিদের আজ্ঞা পালনার্থ আহ্বান কর। আর ঘোষণা কর যে, আমরা কোরআন মজিদের মীমাংসা মান্য করিতে সম্মত আছি; তোমরাও কোর-আন মজিদের মীমাংসা মানিয়া লও। কায়াব (রাজিঃ) ঐ আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন; কিন্তু আবদুল্লা-বিন্-সাবার দলস্থ বিপ্লববাদী ও কুটিলমনাঃ লোকেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এমন অজস্র ভাবে তীর বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তিনি সেই স্থানেই শহিদ হইয়া গেলেন। এতদ্দর্শনে বস্রাবাসিদিগের উত্তেজনা এবং ক্রোধাগ্নি চরমে উঠিল; তাহারা প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপক্ষদলের সঙ্গে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তরবারি, বর্শা ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরের জীবন হননে আগ্রহান্বিত; অজস্র তীরের সাঁই সাঁই শব্দে রণক্ষেত্রে মুখরিত। অশ্বের হ্রেসারব, বীরগণের জয় ধ্বনিতে বিশাল সমর ক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত। ওম্মোল-মুমেনিনের আরোহিত উষ্ট্রের চতুর্দ্দিকে মৃত দেহের ঢেড়ি লাগিয়া গেল। বস্রাবাসিগণ মহামাননীয়া ওম্মোল-মুমেনিনের (রাজিঃ আঃ) উষ্ট্রটীর রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে; হজরত আলীর (কঃ অঃ) সৈন্যগণ উহা স্বীয় আয়ত্বে বা ধৃত করণ জন্য জীবনের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া অগ্রসর হইতেছে। সে ভীষণ সংগ্রামের অবস্থা বর্ণনা করিতে লেখনী অশক্ত, কল্পনা পরাস্ত। বস্রা-

বাসিগণ দলে দলে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষদিগকে কিছুতেই ওম্মোল মুমেনিনের উষ্ট্রের নিকট আসিতে দিতে ছিল না। হজরত আলী (কঃ অঃ) যখন এই ব্যাপার দর্শন করিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে পর্য্যন্ত এই নাকাঃ (উষ্ট্র) যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবে, তত্তাবৎ কাল এই মহা সংহারক ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইবে না ; হজরত আয়েশার (রাঃ-আঃ) উষ্ট্র যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল এবং ভীষণ শোণিত পাত ও হত্যাকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চতুর্দ্দিক হইতে ওম্মোল-মুমেনিনের কজাওয়ার (শগদফ্ বা হাওদার) উপর অজস্র তীর বর্ষণ হইতেছিল। তিনি হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)এর হত্যাকারিগণের প্রতি বদ্‌ দোওয়া (অভিসম্পাত) করিতে ছিলেন। হজরত আলী (কঃ-অঃ) স্বীয় সৈন্যদলকে আদেশ করিলেন, এই উষ্ট্রকে যেরূপে পার, হত্যা কর। উষ্ট্রটী ভূপতিত হইলেই সংগ্রামের অবসান হইবে। হজরত আলীর (কঃ অঃ) পক্ষে মহাবীর মালেক-বিন্‌-আশ্‌তর —যিনি বিপ্লববাদীদিগের একজন প্রধান নেতা এবং তৎকালের একজন প্রধান বীর পুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহাপরাক্রমের সহিত বিপক্ষদলের সঙ্গে যুঝিতে ছিলেন। এইরূপ অন্যান্য বিপ্লববাদী নেতাও ভীম তেজে শত্রু-সংহার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। কুচক্রী আবদুল্লা-বিন্‌-সাবা সুযোগ বুঝিয়া নানা কৌশলে যুদ্ধের তীব্রতা আরও বাড়াইতে ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য উভয় পক্ষের মুসলমানদিগকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়া

তাহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করা। হজরত আলী (কঃ অঃ)এর পক্ষ হইতে আহলে জমলের উপর উপর্য্যুপরি কয়েকটী ভীষণ আক্রমণ হইল, কিন্তু বস্রার যোদ্ধ্ পুরুষগণ প্রত্যেক আক্রমনই মহাবীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করিল। হজরত আবদুল্লা-বিন্-যোবের, মারওয়ান-বিন্ আল্ হকম, প্রতিপক্ষের আক্রমণ রোধ করিতে গিয়া আহত হইলেন। আবদুর রহমান বিন্-এতাব, জয্ ব্-বিন-যহির, আবদুল্লা-বিন্ হকিম (রাজিঃ) প্রভৃতি বীরগণ জমল রক্ষা করিতে করিতে শহিদ হইলেন। হজরত আবদুল্লা-বিন্-যোবেরের গায় ৭২টী যখম, (অস্ত্রের আঘাত) হইয়াছিল। নাকাব মহার (উষ্ট্রের রজ্জু) এক এক জন ধারণ করিত, সেই লোক শহিদ হইবা মাত্র অন্য লোক তাহা ধরিত; এইরূপ ওম্মোল মোমেনিনের উষ্ট্রের রজ্জু-ধারী শত শত লোক "শরবতে শাহাদত" পান করিল। অবশেষে ওম্মোল মুমেনিনের পক্ষীয় বস্রার সৈন্যগণ এমন ভীষণভাবে প্রতিপক্ষ সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল যে, উষ্ট্রের নিকট হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত রাস্তা পরিস্কার হইয়া গেল। হজরত আলী (রাজিঃ) এই অবস্থা দর্শনে স্বয়ং স্বায় সেনাদল লইয়া আহলে জমলকে আক্রমণ করিয়া পশ্চাতে হঠাইয়া দিলেন। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে কয়েক বার উভয় প্রতিপক্ষ দল অগ্রসর হইল, এবং পশ্চাতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। অবশেষে এক ব্যক্তি উষ্ট্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া উহার পায়ে ভীষণ তরবারির আঘাত করিল। সেই আঘাতে ওম্মোল মুমেনিনের আরোহিত উষ্ট্রটী ভীষণ চীৎকার

সহকারে বুকের উপর ভর করিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল। সেই সময় হজরত কায়ফার-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) উষ্ট্রের খুব নিকটে উপস্থির হইয়াছিলেন। উষ্ট্রের পতনে আহলে জমল অর্থাৎ বস্রার সৈন্যদল চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদল ভূপতিত উষ্ট্রটী বেষ্টন করিয়া লইল। তখন হজরত আলী (রাজিঃ) মোহাম্মদ-বিন্-আবি-বকর (রাজিঃ)কে যিনি তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন,—আদেশ করিলেন, যাও, তুমি গিয়া তোমার ভগিনীর 'হেফাজৎ' (তত্বাবধান) কর। কোনমতে তাঁহার যেন তখ্‌লিফ (কষ্ট বা অসুবিধা) না হয়। কায়ফার-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) মহাম্মদ-বিন-আবিবকর (রাজিঃ) এবং এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ) কাজাওয়ার দড়ি কাটিয়া দিয়া, কাজোরা উঠাইয়া শবরাশির মধ্য হইতে খানিক দূরে নিয়া রাখিলেন, এবং পরদার জন্য উহার উপর চাদর লট্‌কাইয়া (টাঙ্গাইয়া) দিলেন। পরে হজরত আলী (কঃ অঃ) সেখানে পৌঁছিয়া, হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ আঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আম্বাজান! আপনার মেজাজের খায়ের তো? উত্তরে ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ আঃ) বলিলেন, খোদাতায়ালা তোমার সকল গল্‌তি (ভুল বা ভ্রান্তি) মার্জ্জনা করুন। হজরত আলী (রাজিঃ)ও প্রত্যুত্তরে বলিলেন, খোদাতায়ালা আপনারও সকল ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করুন। অতঃপর সেনাদলের ছরদার (অধি-নায়ক)গণ ক্রমান্বয়ে হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ আঃ)কে

সালাম করিবার জন্য উপস্থিত হইতে লাগিলেন। হজরত কায়কার (রাজিঃ)কে হজরত ওম্মোল মুমেনিন আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ আঃ) বলিলেন, এই ঘটনা ঘটিবার ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমার মৃত্যু ঘটিলেই ভাল হইত। হজরত কায়কার-বিন্ ওমরু (রাজিঃ) যখন এই কথা হজরত আলী (কঃ অঃ)এর নিকট বর্ণনা করিলেন, তখন তিনিও বলিলেন, আজ হইতে ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমারও মৃত্যু ঘটিলে ভাল হইত। যাহা হউক এইরূপ ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইল। যুদ্ধের ভিত্তি কিরূপ ষড়যন্ত্র ও দাগাবাজীর উপর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

এই যুদ্ধের নাম "জঙ্গে-জমল" নামে প্রসিদ্ধলাভ করিবার কারণ এই যে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ আঃ) যে উষ্ট্রের উপর সওয়ার ছিলেন, ঐ উষ্ট্রই যুদ্ধের কেন্দ্র রূপে পরিণত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে হজরত ওম্মোল মুমেনিনের (রাঃ আঃ) পক্ষে যোদ্ধৃ পুরুষের সংখ্যা ৩০ হাজার ছিল; তন্মধ্যে ৯ হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদ হন। পক্ষান্তরে হজরত আলীর (রাজিঃ) সৈন্য সংখ্যা ২০ হাজার ছিল, তন্মধ্যে ১ হাজার ৭০ জন শহিদ হইয়া ছিলেন। যুদ্ধান্তে হজরত আলী (রাজিঃ) উভয় পক্ষের শাহাদৎ প্রাপ্ত বীরপুরুষদিগের জানাজার নামাজ পড়িয়া যথা-নিয়মে তাঁহাদিগকে কবরস্থ করিলেন। সেনানিবাস সমূহে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল মাল-আসবাব (সামগ্রী-সম্ভার) ছিল, ঐ সকলের সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যে যে ব্যক্তি স্ব স্ব

মাল-আস্‌বাব চিনিতে পারে, তাহারা উহা লইয়া যাউক। যখন দিবা অবসান হইল, তখন হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ আঃ)কে তদীয় ভ্রাতা হজরত মোহাম্মদ-বিন্ আবুবকর (রাজিঃ) বস্রায় লইয়া গেলেন; এবং আবদুল্লা-বিন-খলফ খয়ারী গৃহে, ছফিয়া বিন্তন হবছ-বিন-আবি তাল্‌হার নিকট পঁহুছাইলেন। পর দিন হজরত আলী (রাজিঃ) বস্রা নগরে প্রবেশ করিলেন। ঐ দিনই বস্রার সমগ্র অধিবাসী তাঁহার হস্তে বয়েত করিল। ইহার পর হজরত আলী (কঃ অঃ) ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ আঃ) হুজুরে উপস্থিত হইলেন। এই যুদ্ধে আবদুল্লা-বিন-খলফ নিহত হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার শোকাতুরা জননী হজরত আলী (কঃ অঃ)কে অনেক কটু-কাটব্য বলিলেন; কিন্তু হজরত আলী তাঁহার কথার কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। তাঁহার সঙ্গীয় লোকেরা ইহা অসহ্য মনে করিলে, তিনি ধীরভাবে বলিলেন, স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধি অনেকটা দুর্ব্বল, এজন্য আমি মোশরেকা (কাফের) স্ত্রীলোকদিগের কটুকাটব্য কথায়ও কর্ণপাত করি না—উপেক্ষা করিয়া থাকি। আর ইহারা ত মুসলমান স্ত্রীলোক, ইহাদের সকল কথাই বরদাশ্‌ত (সহ্য) করা উচিত। হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাজিঃ আঃ)এর প্রতি হজরত আলী (রাজিঃ) অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিলেন; এবং বলিলেন, আপনার কোনও বিষয় কিছু তক্‌লিফ্ (কষ্ট বা অসুবিধা) ত হইতেছে না? ফলতঃ তাঁহাদের কাহারও মনে তখন কোন

দ্বিধা রহিল না। পরস্পরের মধ্যে 'ছাফায়ী' (মন পরিষ্কার) হইয়া গেল। হজরত আলী (রাজিঃ) হজরত ওম্মোল মুমেনিনের (রাঃ আঃ) নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; পক্ষান্তরে তিনিও ক্ষমা চাহিলেন। আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ অঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন-আব্বাছ (রাজিঃ)কে বস্রার গবর্ণর (শাসন-কর্ত্তা) নিযুক্ত করিলেন, আর মোহাম্মদ-বিন আবিবকর (রাজিঃ)কে সফরের ছামান (প্রবাস যাত্রার জিনিষ পত্র) প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর ১লা রজব (৩৬ হিজরী) সর্ব্বপ্রকার সফরের সামগ্রী সম্ভার সংগ্রহ হওয়ার পর হজরত আলী (কঃ আঃ), হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ আঃ)কে বস্রার রইস্ শ্রেণীর ৪০ জন স্ত্রীলোক এবং তাঁহার ভ্রাতা মোহাম্মদ-বিন-আবিবকর (রাজিঃ)কে বস্রা হইতে মক্কা মোকাররমা অভিমুখে রওয়ানা করিয়া দিলেন।

জমল যুদ্ধে বহু সংখ্যক বনু-ওম্মিয়াও যোগদান করিয়াছিল এবং আহলে জমলের (হজরত আয়েশা সিদ্দিকার [রাজিঃ] পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। যুদ্ধের পর মারওয়ান বিন্-হকম, ওক্‌বা-বিন্-আবুসুফিয়ান (হজরত মোয়াভিয়ার ভ্রাতা) মারওয়ানের ভ্রাতা আবদুর রহমান ও ইয়াহ্ইয়া প্রভৃতি বনু ওম্মিয়ার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বস্রা হইতে শামে (সিরিয়া) অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নিকট দেমেস্কে চলিয়া গেলেন। হজরত আবদুল্লা বিন্ যোবায়ের (রাজিঃ) এই যুদ্ধে আহত হইয়া বস্রা নগরে আযদি নামক

একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ) স্বীয় ভ্রাতা মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ)কে বস্রায় পাঠাইয়া তাঁহাকে নিজের কাছে আনাইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মক্কা মোয়াজ্জমায় গমন করিলেন।

সাবাইয়া সম্প্রদায়ের আর একটা ষড়যন্ত্র।—হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ)কে বস্রা হইতে রওয়ানা করিবার পর হজরত আলী (রাজিঃ) বস্রায় 'বায়তুল মাল' ভাণ্ডার খুলিলেন। উহাতে যে পরিমাণ নগদ অর্থ পাইলেন, তৎ সমস্ত স্বীয় সেনাদলের মধ্যে ভাগ বণ্টন করিয়া দিলেন। প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ ৫০০ পাঁচ শত দরম পাইয়াছিল। এই টাকা ভাগ-বণ্টন করিয়া তিনি সেনাদলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, যদি তোমরা মোল্‌ক্ শাম (সিরিয়া রাজ্য) আক্রমণ করিয়া জয়ী হইতে পার, তবে তোমাদের নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত আরও ঐ পরিমাণ টাকা তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে। আবদুল্লা-বিন্-সাবার দল (যাহারা 'সাবাইয়াঃ' সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়), জমলের যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই প্রকাশ্য ভাবে হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রতি নানা প্রকার দোষারোপ করিতে লাগিল। হজরত আলী (রাজিঃ) বস্রাবাসীদিগের মাল-আসবাব (সামগ্রী সম্ভার) লুণ্ঠন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাই তাহাদের দোষ কীর্ত্তনের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিত। এযাবৎ এই বিষয়ের জন্য দোষরোপ করিয়া

লোকদিগকে হজরত আলীর (রাজিঃ) বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত। এক্ষণে প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ বয়তুলমাল হইতে পাঁচ শত দরম করিয়া ভাগ পাওয়াতে, আবার তাহারা নূতন ভাবে মহামান্য খলিফার কার্য্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষে ইহাদের সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকা (কোনও প্রতিকার না করা) অসম্ভব হইয়া পড়িল। হজরত আলী (কঃ অঃ) ইহাদিগকে যতই সদুপদেশ দিতেছিলেন, অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন, ইহাদের সাহস ও অসদাচরণ ততই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। তাঁহার বিশাল সেনাদলের মধ্যে এই বিপ্লববাদিদল বিদ্বেষ-বিষ ছড়াইতে ছিল। অবশেষে একদা নিশিযোগে এই দুর্ব্বৃত্তের দল বস্রা হইতে প্রস্থান করিল। হজরত আলী (রাজিঃ) ইহাদের পলায়ন সংবাদ অবগত হইয়া স্বীয় সৈন্য শ্রেণী হইতে একদল যোদ্ধৃ পুরুষকে তাহাদিগকে ধরিবার জন্য পাঠাইলেন; কিন্তু তাহারা ধরা পড়িল না। কারণ, তাহারা খুব দ্রুতগতিতে চলিয়া গিয়াছিল। তাহারা এক্ষণে সুযোগ লাভ করিয়া সর্ব্বত্রই হজরত আলীর (রাজিঃ) বিরুদ্ধে জন-সাধারণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। এক্ষণে স্মরণ রাখা উচিত যে, আবদুল্লা-এবনে-সাবা পূর্ব্বে আপনাকে হজরত আলীর (রাজিঃ) 'ফেদায়ী' (পরম ভক্ত) বলিয়া পরিচিত করিত। আর হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরদার অন্তরাল হইতেই তাহারা ইতিপূর্ব্বে

হজরত ওস্‌মান রাজিআল্লাহ আনহুর শাহাদতের (হত্যাকাণ্ডের) উপকরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এতাবৎ কাল যে, তাহার অনুচর এবং ভক্তের দল হজরত আলীর (রাজিঃ) পরম ভক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছিল; কিন্তু জমল যুদ্ধ ও বস্‌রা জয়ের পরে দেখিল, এসময় হজরত আলীর (রাজিঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিলে ইস্‌লাম ধর্ম্মের ক্ষতি সাধন করা যাইবে; তখন তাহারা আর বিলম্ব না করিয়া ঐপথ অবলম্বন করিল। এই দল প্রকৃত প্রস্তাবে ইস্‌লামের ধ্বংস করণেচ্ছু য়িহুদী দল হইতে উদ্ভুত একটা কপট বা ভণ্ড মুসলমানের দল ছিল। পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ভবিষ্যতে এইদল "খারেজ" বা "খারেজী" নামে আবির্ভূত হইয়া ছিল। ২য় খলিফা হজরত ওমর ফারুকের শাহাদতের (শহিদ হওয়ার) পর হইতেই ইস্‌লামের ধ্বংসাভিলাষী একটা দলের সৃষ্টি হইয়াছিল; ইহারা গুপ্তভাবে আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের অনেক গুপ্ত সমিতি ছিল। এই দল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম গ্রহণ পূর্ব্বক মুসলমানদিগের মধ্যে মহা অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহারা কখনও ('ফেদায়ী') কখন 'ইস্মাইলী' নামে অভ্যুত্থিত হইয়া আপনাদের দুষ্কার্য্য সাধনে তৎপর হইয়াছিল।

এই সাবাইয়া দল বস্‌রা হইতে 'ফেরার' হইয়া এরাকে আরব প্রদেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। আর যত সুবিধাবাদী, বেকার ভবঘুরে লোকদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিতে

লাগিল। ক্রমে ইহাদের দল একটা বিরাট আকার ধারণ করিল। ইহাদের প্রধান দল সুবে 'সবস্তানে' গিয়া জড় হইল। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল, একাদিক্রমে ইরানী সুবাগুলিতে বিপ্লব বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। আর খলিফাতুল মুস্‌লেমিনকে মুসলমানদিগের একটী বিরাট দল সঙ্গঠন করিতে দিবে না। মুসলমানদিগের মধ্য হইতে একতা ও ভ্রাতৃভাবের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবে। এই সাবাইয়াদল ইরানী সুবা সমূহে এই উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল যে, হজরত আলী (রাজিঃ) যাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া দৃঢ়তার সহিত সুবে সাম (সিরিয়া) আক্রমণ করিয়া সাফল্য লাভ, এবং পূর্ণভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ইস্‌লামের একটা মহাশক্তি সংগঠন করিতে না পারেন। আবদুল্লা-ইব্‌নে-সাবা অতিশয় ধূর্ত্ত, চতুর এবং চালবাজ লোক ছিল। ইস্‌লামের ধ্বংস ব্যতীত তাহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। হজরত আলী করমুল্লাহে ওজহু যখন শুনিতে পাইলেন যে, বিপ্লব বাদী সম্প্রদায় সুবে 'সবস্তানে' গিয়া মহা বিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছে, তখন তিনি তাহাদের দমনার্থ আবদুর রহমান-বিন্‌-জায়দ তায়ীকে ক্ষুদ্র একদল সৈন্যসহ সবস্তানে পাঠাইলেন। উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং এই যুদ্ধে আবদুর রহমান-বিন্‌-তায়ী পরাজিত ও শহিদ হইলেন। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া মহামান্য খলিফাতুল মুস্‌লেমিন রবিয়-বিন্‌-কাস নামক সেনাপতির অধীনে ৪ হাজার বিশ্বস্ত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তিনি এই বিপ্লব বাদী ভবঘুরের দলকে

ভীষণভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজিত এবং ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। তাহাদের বহু সংখ্যক লোক রণশায়ী হইল। এই অবসরে ছফ্ফিন যুদ্ধের জন্য হজরত আলী (রাজিঃ) এবং হজরত আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) মহা আড়ম্বরে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে য়িহুদীরূপী ভণ্ড মোসলমানের দল—অর্থাৎ সাবাইয়া সম্প্রদায় হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল বলিয়া মনে করিল, এবং নানা কৌশলে ও ছদ্মবেশে মহামান্য খলিফার সেনাদলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

হজরত আলীর (রাজিঃ) কুফায় রাজধানী স্থাপন।

জমল যুদ্ধ হইতে অবসর লাভ করিয়া হজরত আলী করমুল্লাহে ওজহুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও প্রধান কার্য্য ছিল, সুবে শামের (সিরিয়া) উপর প্রাধান্য বিস্তার করা এবং হজরত আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) হইতে বয়েত গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি কুফা নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলে কুফাবাসী যোদ্ধ্ পুরুষের সংখ্যাই অধিক ছিল; ইহাও কুফায় রাজধানী স্থাপন করার একটী

প্রধান কারণ। বিশেষতঃ মদীনা শরীফ্ আরবের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। মক্কা, তায়েফ, এয়মন, এমামা প্রভৃতি দক্ষিণ দিকস্থ সুবা সমুহের জন্য তেমন ভাবনার বিষয় কিছু ছিল না। সমগ্র ইস্লামী এলাকা উত্তর, উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব্ব দিকেই অবস্থিত ছিল। উত্তরে প্যালেষ্টাইন হইতে সমগ্র শামের (সিরিয়া) অতি সমৃদ্ধ জনপদ, যাহা এসিয়া মাইনরের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর পশ্চিম দিকে ধন-ধান্যে পূর্ণ প্রকৃতির রম্য কানন মিসর এবং আফ্রিকার অন্যান্য বহু জনপদ। উত্তর পূর্ব্বদিকে বিশাল পারশ্য সাম্রাজ্য। সুতরাং কুফায় রাজধানী হইলে এই বিশাল জনপদ সেখান হইতে অনেকটা নিকটবর্ত্তী হয়। বিশেষতঃ মহামান্য খলিফার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আমীর হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) রাজধানী দেমেস্ক (দামাস্কস্) কুফা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। যোদ্ধৃ পুরুষদিগের অন্যতম কেন্দ্রস্থল বস্রা (বসোরা)ও কুফার খুব নিকটবর্ত্তী। সুতরাং হজরত আলীর (রাজিঃ) রাজধানী নির্ব্বাচনার্থ বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচায়ক হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

হজরত ওস্মান (রাজিঃ)এর খেলাফত কালে মদীনার সাহাবা (রাজিঃ) অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা নানা দেশের এবং নানা জনপদের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা কার্য্যস্থলে গমন কালে আপনাদের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির এক বিরাট দল সঙ্গে লইয়া যাইতেন; উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের

সাহচর্য্য লাভে বিশেষ সুবিধা করিয়া লওয়া। নিজেদের সাহায্য-কারী একটা প্রকাণ্ড দল থাকাতে তাঁহাদের সকল বিষয়েই বিশেষ সুবিধা হইত। এইরূপে মদীনা মনুওরার সম্ভ্রান্ত দল হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)এর খেলাফত কালে অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। নগরের লোক সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছিল। হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ) স্বীয় খেলাফৎ কালে মদীনা তৈয়বার অধিবাসীদিগকে বিদেশে পাঠাইতেন না। কেবল মাত্র যিনি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন, তিনি স্বীয় পরিবার বর্গ লইয়া কার্য্যস্থলে গমন করিতেন। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের এক একটা বিরাট দল লইয়া যাইতে পারিতেন না। মহামান্য দ্বিতীয় খলিফা মদীনার জাঁক জমক সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাদিগকে যুদ্ধার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। উপযুক্ত সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়া সেনাদল পরিচালিত করিতেন। তৃতীয় খলিফার খেলাফৎ কালে প্রধান প্রধান সাহাবা (রাজিঃ)গণও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন নাই; যথাঃ—হজরত আলী (রাজিঃ), হজরত যোবায়ের (রাজিঃ), হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্‌-অওফ (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্‌-আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত সয়ীদ (রাজিঃ) হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-আব্বাস (রাজিঃ), হজরত সায়াদ-বিন-আবিওকাস (রাজিঃ) প্রভৃতি।

ইঁহাদিগকে প্রধানতঃ খলিফার মন্ত্রণা সভায় সদস্যরূপে কাজ করিতে হইত। বয়তুল মাল তহবিল হইতেও ইঁহারা যথাযোগ্য অংশ পাইতেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) খেলাফৎই বিবাদ-বিসম্বাদ এবং অনৈক্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন। ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে অবস্থা আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খেলাফতের প্রারম্ভেই হজরত আলী (রাজিঃ)কে বাধ্য হইয়া মদীনা তৈয়বা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় তিনি সেই পবিত্র নগরীতে হজরতের পবিত্র সমাধি সান্নিধ্যে তাঁহাকে জীবনে আর আসিতে হয় নাই। প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী হজরত ফাতেমা জোহরার (রাজিঃ) পবিত্র কবর জেয়ারত করিবার সুযোগ তাঁহার আর ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি মদীনা তৈয়বা হইতে একেবারে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহাকে খেলাফতের প্রারম্ভেই সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এই সকল ঘটনায় খেলাফতের শক্তি হ্রাস পাইয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনা পরম্পরায় মদীনা তৈয়বা হইতে কুফায় রাজধানী স্থাপন করা তিনি অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতৃব্যপুত্র মহা বিদ্বান্ হজরত আবদুল্লা বিন্-আব্বাস (রাজিঃ)কে বস্রার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং কুফায় রাজধানী

স্থাপন করিয়া হজরত আমীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সঙ্গে যুদ্ধ করণার্থ রণ-সজ্জা করিতে লাগিলেন। সাবাইয়ার দলে প্রকৃত মোনাফেক—অর্থাৎ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম-বিধ্বস্ত করণেচ্ছু ভণ্ড-পাষণ্ডের দল ত ছিলই ; তদ্ব্যতীত এক দল সাদাসিদে সরল বিশ্বাসী মোসলমানও ধোকায় পড়িয়া ঐ দলভুক্ত হইয়াছিল। তাহারা সাবাইয়া দলের উদ্দেশ্য জানিত না ; সাবাইয়া দল তাহা জানিতেও দিত না। উহাদের খাস দলের মধ্যেই তাহাদের দুরভিসন্ধিটা সীমাবদ্ধ ছিল। আবদুল্লা-বিন্-সাবা ও তাহার প্রধান প্রধান ভক্তবৃন্দ সাদা-সিদে মোসলমান দিগকে বুঝাইত যে, ইস্‌লাম ধর্ম্মের উন্নতি বিধান, জাতীয় শক্তি গঠন ইত্যাদি কার্য্যই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তাহারা এজন্যই মোসলমানদিগের মধ্য হইতে দলাদলি ও সম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া ফেলিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছে। এজন্যই তাহারা যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হইয়া, উন্নত এবং সাধু সঙ্কল্পে জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। সরল বিশ্বাসী অনেক মোসলমানই তাহাতে ধোকা খাইয়া প্রতারিত হইয়াছিল। এমন কি, হজরত আলীর (রাজিঃ) পরম ভক্ত ও অনুরক্ত এবং পরম হিতৈষী আদর্শ মহাবীর মালেক আশ্‌তরও তাহার ধোকাবাজীতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। এই সাবায়ী দল এমনই চতুর ও চালবাজ ছিল যে, যখন যে খাঁটি মোসলমানের দলকে বাক্‌চাতুরী চাল বাজীতে ভুলাইয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিত। তাহাদের সাহায্যে সে কাজ

সারিয়া লইত। আবার প্রয়োজন মতে ধোকা দিয়া অন্য এক দলের সাহায্য লাভ করিত। দুষ্ট ও ভণ্ড লোক সরল বিশ্বাসী সাদা-সিদে লোকদিগকে সহজেই ধোকায় ফেলিতে পারে সুতরাং এই চালবাজ, বিপ্লবপন্থী কপট দল আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন সম্বন্ধে নানা সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই জন্যই এই ভণ্ড পাষাণ্ড সাবাইয়ার দল হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আনহুর শাহাদৎ (হত্যাকাণ্ড) ব্যাপারে একদল বিশ্বাসী ও খাঁটি মুসলমানের সাহায্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। জঙ্গে জমলে (জমল যুদ্ধ)ও তাহারা ধোকাবাজীর একশেষ প্রদর্শন করিয়া উভয় শান্তি-কামী মুসলমানদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া মোস্‌লেম শক্তির সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই মোনাফেক (কপট) দলের আবির্ভাব না হইলে, মুসলমানদিগের শক্তি এমনভাবে চূর্ণীকৃত হইত না। অবশ্য আমীর হজরত মোয়াভিয়ার সঙ্গে মহামান্য খলিফার যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য ছিল। দ্বিতীয় খলিফার সময় হইতেই তিনি শক্তি সঞ্চয় করিয়া আসিতে ছিলেন। বিশেষতঃ তৃতীয় খলিফা হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া, তাঁহার পক্ষে শক্তি সঞ্চয়ে মহা-সুযোগ ঘটিয়াছিল। শামের একটী সুবিশাল সুবা তাঁহার হস্ত-গত থাকাতে তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল ছিল। আর এক প্রকাণ্ড যোদ্ধৃপুরুষের দলও তিনি প্রস্তুত রাখিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ দামেস্কের ন্যায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৃহৎ নগরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করাতে, তাঁহার সুবিধাটা আরও

সহজ হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার আড়ম্বর ও জাঁক-জমকের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাঁহার সেনাদল সর্ব্বদা যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, তাহারা বীরত্ব-প্রকাশে সুবিধালাভ করিত। আবার ওম্মিয়ার অতি প্রকাণ্ডদল তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ওদিকে বনি হাশেম ব্যতীত খাস মদীনা ও মক্কাবাসীদিগের মধ্যেও অনেকে হজরত আলীর (রাজিঃ) বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। বড় বড় সাহাবা (রাজিঃ)দিগের মধ্যে অনেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) অন্যায় হত্যাকাণ্ডে অধিকাংশ সাহাবার (রাজিঃ) হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ)ও এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া যুদ্ধায়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে একদল শয়তানরূপী য়িহুদী-নামা মোনাফেক (কপট) লোক ইস্‌লামের ভিত্তি বিপর্য্যয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, সরল বিশ্বাসী সাদা-সিদে মোসলমানগণ বিজ্ঞ সাহাবা মণ্ডলীও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা উপরের আবরণটার প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন ; ভিতরে যে বিষ ক্রিয়া সঞ্চালিত হইয়াছিল, সেদিকে তাঁহারা খুব লক্ষ্যই করিয়াছিলেন না। ফলতঃ এই সময়টা ইস্‌লামের পক্ষে বড়ই বিপদ জনক ছিল। মোসলমানগণ এক মাত্র নেতার, একমাত্র খলিফার পবিত্র পতাকা মূলে দণ্ডায়মান হইবার সুযোগ হারাইয়া ছিলেন।

এস্থলে একথাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আনহুর হত্যাকারী ও বিদ্রোহীদিগের মধ্যে একদল আবদুল্লা-বিন্‌-সাবার চেষ্টায় তাহার পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; উহাদিগকে আবদুল্লা-বিন্‌-সাবার সম্প্রদায় ভুক্ত বলা যাইতে পারিত; কিন্তু এই সাবায়ী জামাতে (দলে) অনেক ধোকা প্রাপ্ত মোসলমান আপনাদের সরলতার জন্য যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত সাবায়ীদল বিষাক্ত বীজের ন্যায় উহাদের মধ্যে কাজ করিত। উহারা সরল বিশ্বাসী মোসলমানদিগের মধ্যে কাহাকেও আপনাদের নেতা নির্ব্বাচিত করিয়া তদ্দারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইত; পরে তাহাকে ছাড়িয়া আর একজনকে নেতৃরূপে গ্রহণ করিত। এজন্যই হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আনহুর হত্যাকাণ্ডে ইহারা সরল বিশ্বাসী বিপ্লবপন্থী অর্থাৎ বিদ্রোহী দল দ্বারা আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিল; 'জঙ্গে জমল' পর্য্যন্ত উহারা ঐ প্রণালীতে সেই কাজ করিয়া আসিতেছিল; অর্থাৎ তাহারা হজরত আলী করমুল্লাহ্‌ ওয়াজহুর প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শন করিত; তাঁহার বিরুদ্ধাচারীদিগের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা প্রদর্শন করিত। জঙ্গে জমলের পরে উহারা অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। তখন হইতে উহারা আমিরুল মুমেনিন হজরত আলীর (রাজিঃ) নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করে। এই সময় বিপ্লববাদীদিগের অধিকাংশ অর্থাৎ এক বিরাট দল সাবায়ী দল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। কেবল মোনাফেক অর্থাৎ কপট ও ভণ্ড খাঁটি

সাবায়ী দলই এখনে সাবার দলে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত সরল বিশ্বাসী মুসলমানগণ হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলেই অবস্থান করিতে থাকেন; যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার জন্য জীবনোৎসর্গ করিতেও ইহারা কুণ্ঠিত হয় নাই। ইঁহারা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেও, ধর্ম্ম বিশ্বাসে অটল এবং ইস্‌লামের হিতৈষী ছিলেন; কাজেই হজরত আলীর খেলাফৎ সম্বন্ধে ইহারা বিশেষভাবে সাহায্য করা আপনাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। হজরত আলী (রাজিঃ) কুফায় খেলাফতের রাজধানী স্থাপন করিবেন বলিয়া যখন মত প্রকাশ করিলেন, তখন ইঁহাদের ভক্তির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি হইল। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কুফাবাসীদিগের এক প্রবল দল ছিল, এক্ষণে তাঁহারা হজরত আলীর (রাজিঃ) জন্য জীবনোৎসর্গ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। এজন্য হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকারিগণ কেবল মাত্র হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলে আশ্রয়ই প্রাপ্ত হইয়াছিল না বরং তাঁহার বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা হজরত আমীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) অনেকটা সুযোগই উপস্থিত হইল; কারণ যে সকল সাহাবা কিংবা নিরপেক্ষ ব্যক্তি হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধকামী ছিলেন, তাঁহারা যখন হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকারী-দিগের মধ্যে অনেককে হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলে উচ্চপদে অধিরূঢ় ও সম্মানিতরূপে দেখিলেন, তখন হজরত

মোয়াভিয়া (রাজিঃ) অপেক্ষা হজরত আলীর (রাজিঃ) ফজিলত বোজর্গী সম্মান অধিক জানিয়া এবং স্বীকার করিয়াও হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সঙ্গে যোগদান করিতেন। কারণ হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ আন্হুর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য শত্রুতাচরণের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ-বিন্-আবিবকর (রাজিঃ) মিসরের শাসন কর্তৃত্ব পদে।—

হজরত ওসমান (রাজিঃ) যখন শহিদ হন, তখন আবদুল্লা-বিন্-সাদ কে মিসরের শাসনকর্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিয়া মোহাম্মদ-বিন্-আবি হোযায়ফা ঐ পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত আলী (রাজিঃ) খলিফা মনোনীত হইয়াই কায়স্-বিন্-সাদ (রাজিঃ)কে মিসরের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, মদীনা হইতে মিসরে পাঠাইয়াদিলেন। কায়স্-বিন্-সাদ মাত্র ৭ জন লোক সঙ্গে লইয়া মিশরে গমন করেন; এবং সেখানে গিয়াই মোহাম্মদ-আবি হোযায়ফাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং তথাকার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। মিসরে এযিদ-বিন্-আল্-ইয়ছ, মোসলেমা-বিন্-খলদ প্রভৃতি কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। যাঁহারা হজরত ওস্মানের (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধের দাবী করিতেন। তাঁহারা কায়স্-বিন্-সাদের (রাজিঃ) বায়েত গ্রহণে এই বলিয়া আপত্তি এবং অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন যে, আমাদিগকে এক্ষণে অপেক্ষা

করিতে দিন ; আমরা দেখি, হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যা-কাণ্ড সম্বন্ধে কি মীমাংসা হয়। যখন এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে, তখন আমরা বায়েত করিব। আর যে পর্য্যন্ত বায়েত না করি, চুপ করিয়া থাকিব, আপনার কোনওরূপ বিপক্ষ-তাচরণ করিব না। কায়েস্‌-বিন্‌-সাদ (রাজিঃ) স্বীয় আখ্‌লাক (সৌজন্য) এবং কাবেলিয়ত (উপযুক্ততা) প্রভাবে মিশরে বিশেষরূপ শক্তি সঞ্চয় করিলেন ; তাঁহার প্রভাব ও শাসন কর্ত্তৃত্ব সেখানে খুব বদ্ধমুল হইল।

যখন জমল যুদ্ধ শেষ হইল ; এবং হজরত আলী (রাজিঃ) কুফায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন, তখন আমীর হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, হজরত আলী (রাজিঃ) এইবার তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, মিশরে কায়স্‌-বিন্‌-সায়াদ (রাজিঃ) বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তিনি হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রেরিত, এবং তাঁহার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ও হিতৈষীদিগের মধ্যে একজন। হজরত আলী (রাজিঃ) যখন কুফার দিক হইতে আমাকে আক্রমণ করিবেন, তখন তিনি অবশ্যই কায়স্‌-বিন্‌-সায়াদ (রাজিঃ)কে আদেশ করিবেন যে, তুমি অপর দিক্‌ দিয়া মিশরীয় সৈন্যদল সহ আক্রমণ কর। যখন দুই দিক্‌ হইতে শাম (সিরিয়া) আক্রান্ত হইবে, তখন বড়ই বিপদে পড়িবার কথা। হজরত আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে স্বাভাবিকভাবে শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ

ঘটিয়াছিল। তিনি অতি সুচতুর এবং রাজনীতি বিশারদ পুরুষ ছিলেন, সুতরাং এই সুযোগ কিছুমাত্র পরিত্যাগ করিলেন না। হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আন্‌হুর শোণিত রঞ্জিত পিরাহন, এবং তাঁহার বিবীর কর্ত্তিত অঙ্গুলী হজরত আমীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নিকট বহু পূর্ব্বেই পঁহুছিয়াছিল ; তিনি প্রত্যহ ঐ শোণিত রঞ্জিত বস্ত্র ও কর্ত্তিত অঙ্গুলী দেমেস্কের জামে-মস্‌জেদের মেম্বরোপরি রাখাইয়া দিতেন। জন সাধারণ উহা দেখিয়া 'আহ্‌জারী' শোক প্রকাশ করিতেন। শামের সুবাটী সকল বিষয়েই কায়সাররুমের (কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাটের) আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল ; সেই আক্রমণ প্রতিশোধ জন্য এক বিপুল সেনাদল সর্ব্বদা সজ্জিত ও প্রস্তুত থাকিত। এই বিপুল সেনাসঙ্ঘ সপথ করিয়াছিল যে, যে পর্য্যন্ত হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) এর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, তত্তাবৎ কাল পর্য্যন্ত শয্যায় শয়ন এবং সুশীতল পানী পান করিব না। আরবের নামজাদা বাহাদুর (বীরপুরুষ) লোক-দিগকে নিজের মতানুবর্ত্তী করিবার জন্য তাহাদিগের আদর সমাদর করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটী করিতেন না, কাজের লোকদিগকে নিজের পক্ষপাতী ও সাহায্যকারী করিবার পক্ষে তিনি কোনও উপায় অবলম্বন করিতেই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদের আর্থিক সাহায্য করিতে, তাঁহাদের অভাবাদি দূর করিতে তিনি খুব সতর্কতার সহিত প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন। নিজের দাবী এবং উদ্দেশ্য যে নিতান্ত ন্যায়-সঙ্গত, উহা প্রমাণিত করিবার

জন্য এবং হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) উত্তরাধিকারীরূপে অন্যায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন বলিয়া খুব দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আনহুর হত্যাকাণ্ডের (শাহাদতের) পর এক বৎসর গত হইয়া গিয়াছিল, এই অবসরে তিনি খুব ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত কালের জন্য এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন বা সময় ক্ষেপ করেন নাই। পক্ষান্তরে হজরত আলী (রাজিঃ)কে এই সময় মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ও বিষম ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। যদিও তিনি কুফায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং তথায় রাজধানী স্থাপনের পর একমাত্র সুবা শাম ব্যতীত ইস্‌লামী খেলাফতভুক্ত সমুদয় দেশ, প্রদেশ ও জনপদের উপর তাঁহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল দেশ ও জনপদের উপর তাঁহার এরূপ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল না, যেরূপ ২য় খলিফা হজরত ওমর ফারুকের সময় ছিল। হেজায্‌, এমন, এরাক, মিসর, ইরানী-সুবা সমূহে তাঁহার ফরমা বরদার (আদেশ পালক ও ভক্ত) লোকদিগের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ বহু লোকও দেখা যাইত, যাহারা হজরত আলীর (রাজিঃ) কার্য্যে প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করিত এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে উৎসাহের সহিত দোষারোপ করিতে দেখা যাইত। এজন্য তিনি কোনও সুবা হইতেই পূর্ণভাবে সৈনিক সাহায্যে পাইবার অধিকারী ছিলেন না। হজরত আলীর

মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত ছিল। যদিও তিনি একমাত্র সুবা শামের (সিরিয়ার) শাসনকর্তা ছিলেন; কিন্তু সমগ্র ইস্‌লামী অধিকারের, খেলাফতের অধীনস্থ প্রত্যেক প্রদেশ ও জনপদের মোসলমানগণের অধিকাংশ তাহার হাম-খেয়াল (এক মতাবলম্বী) এবং পক্ষ সমর্থনকারী ছিল। ইস্‌লামী অধিকারের সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বহুতর লোক দৃষ্ট হইত। হজরত আলী করমুল্লাহে অজহুর সঙ্গে যে তাঁহাকে বল পরীক্ষা করিতে—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, একথা তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য ভাবী যুদ্ধে সাফল্যলাভার্থ তিনি প্রথমে যে কার্য্য করিলেন, তাহা এই যে, মিশরের দিক্ হইতে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা তিনি সর্ব্ব প্রথমে দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হজরত আমীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) হজরত কায়স্‌-বিন্‌-সায়াদের (রাজিঃ) সঙ্গে এবং উপযুক্ততা সম্বন্ধে বিশেষরূপে, অভিজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে ভয় করিতেন। হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সৌভাগ্যবশতঃ এমন একটা কারণ উপস্থিত হইল, তদ্দারা তিনি অতি সহজে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সাফল্যলাভ করিলেন। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ), হজরত কায়স্‌-বিন-সাদ (রাজিঃ)কে পত্র লিখিলেন যে, হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)কে অন্যায়রূপে অতি নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হইয়াছে; সুতরাং এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কার্য্যে আপনি আমার সহায়তা করুন। হজরত সায়াদ (রাজিঃ) প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, আমি নিঃসংশয়িতরূপে

জানি যে, হজরত আলী (রাজিঃ) এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না ; যখন তাঁহার হস্তে লোকেরা বায়েত করিয়াছেন, আর তিনি খলিফা মনোনীত হইয়াছেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে আপনার যুদ্ধ করা কিছুতেই উচিত নহে। হজরত কায়স-বিন্-সায়াদ রাজি আল্লাহ আনহুর নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইয়া হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) নিরাশ হইলেন ; এক্ষণে হজরত আলীর (রাজিঃ) শাম (সিরিয়া) আক্রমণের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা মিসরে হজরত সায়াদের (রাজিঃ) শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই, একথা বুঝিতে পারিলেন ; এবং সেই, শেষ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। একবার মিসর জয় করিতে পারিলে হজরত আলীর (রাজিঃ) গতিরোধ করা সহজ হইবে বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু একথাও তিনি জানিতেন যে সর্ব্ব প্রকার সুবিধা স্বত্বেও বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী (রাজিঃ) যখন সেনাদল পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন এবং অধিকাংশ প্রধান প্রধান মহাজের ও আন্সার যখন তাঁহার পতাকা-মূলে সমাগত হইবেন ; সঙ্গে সঙ্গে কুফা ও বস্রার মহাপরাক্রান্ত বীর পুরুষগণ যখন সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইবে, তখন আমার সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইলেও জয়লাভের আশা খুব কম। বীরেন্দ্র-কুল-শ্রেষ্ঠ হজরত আলীর (রাজিঃ) ব্যক্তিগত প্রভাব খুব বেশী ; সমগ্র আরব, শাম, এরাক, মিসর ও পারস্যে তাঁহার বীরত্ব 'মশ্হুর'। জন-সাধারণ তাঁহাকে

শেরে খোদা, (আল্লাহতালার শার্দ্দুল) বলিয়া উল্লেখ করেন। বিশেষতঃ তিনি হজরতের পিতৃব্য-পুত্র ও জামাতা, সকল দিক্ দিয়া তাঁহার প্রতি সাহাবায় কারাম (রাজিঃ) দিগের সহানুভূতি আছি, সুতরাং আমাকে অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে আট ঘাট বাঁধিয়া কাজ করিতে হইবে। অতি বুদ্ধিমান্ অতি বিচক্ষণ, অতি রাজনীতি বিশারদ হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) অতি সাবধানে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি একথাও বুঝিতে পারিলেন যে, যদি মিসর আক্রমণে আমি অকৃতকার্য্য হই, তবে তাহার ফল অতি শোচনীয় হইবে। ঠিক ঐ সময় যদি হজরত আলী (রাজিঃ) ইরাকের দিক্ হইতে সিরিয়া আক্রমণ করেন, আর তাড়াতাড়ি মিসরাক্রমণকারী শামী সেনাদলকে তথা হইতে হঠাইয়া এদিকে আনায়ণ করা না যায়, তবে বিপদের অবধি থাকিবে না। সেই অবসরে হজরত আলী (রাজিঃ) শাম অধিকার করিয়া লইলে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। আমার সমুদয় উদ্যোগ আয়োজন পণ্ড হইবে ; আমার উচ্চ আশা নিরাশায় পরিণত হইবে। ওদিকে হজরত কায়স (রাজিঃ) যদি হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া গয়ংগচ্ছ করিতে এবং আত্মরক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তবে মিসরীর যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে ; এবং হজরত আলী (কঃ-অঃ) কর্ত্তৃক শাম (সিরিয়া) আক্রমণের সংবাদ পাইয়া তিনি যদি মিসর হইতে প্রবল সেনাদল লইয়া শাম আক্রমণ করেন, তবে ত আর কোনও উপায় থাকিবে না।

কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ ছিল, হজরত মোয়াভিয়ার সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়িল। এই সময় মধ্যে হজরত কায়স-বিন্-সাদের (রাজিঃ) একখানি পত্র খলিফাতুল মোসলেমিন হজরত আলীর (কঃ-অঃ) কুফায় আসিয়া পঁহুছিল। ঐ পত্রে লেখা ছিল যে, মিসরের বহু সংখ্যক লোক এক্ষণে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়া চুপ হইয়া বসিয়া আছে, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের চাল ও অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহাদের প্রতি কোনওরূপ কঠোরতা অবলম্বন করা আমি সঙ্গত মনে করি নাই। এই পত্র প্রাপ্তির পর হজরত আবদুল্লা-বিন্-জাফর তৈইয়্যাব (রাজিঃ), স্বীয় পিতৃব্য হজরত আলী (রাজিঃ)কে পরামর্শ দিলেন যে, কায়স্-বিন্-সায়াদ (রাজিঃ)কে এইরূপ আদেশ-লিপি পাঠান হউক যে, তিনি আনুগত্য স্বীকারকারী (যাঁহারা হজরত আলীর [রাজিঃ] নামে বায়েত করিয়াছিল) লোকদিগের সাহায্যে যাহারা নীরব আছে, এবং এযাবৎ বায়েত করে নাই, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে বায়েত করিতে (আনুগত্য স্বীকার করিতে) বাধ্য করুন। তাঁহাদিগকে নীরব ও নির্ব্বাক থাকিতে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। হজরত আলী (রাজিঃ)ও এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন; এবং তদনুসারে হজরত কায়স্ (রাজিঃ)কে ঐ মর্ম্মে পত্র লিখিলেন; এস্থলে রাজনীতিক হিসাবে হজরত আলী (রাজিঃ) একটী মারাত্মক ভুল করিলেন। হজরত কায়স্-বিন্-সাদ মহামান্য খলিফার পত্র পাইয়া মনে করিলেন, এরূপ কার্য্যের পরিণাম ফল

বিষময় হইবে, সুতরাং তিনি আদেশ কার্য্যে পরিণত না করিয়া, (তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখিলেন যে, যে সকল লোক সম্প্রতি খামুস (নীরব) আছে, উহারা আপনার জন্য ক্ষতি কারক নহে। কিন্তু যদি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তবে তাহারা সকলেই আপনার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। তদ্দারা আপনার ভয়ানক অনিষ্ট সাধন হইবে। এ অবস্থায় তাহাদিগকে তাহাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তি সঙ্গত। এই পত্র পাওয়া মাত্রই হজরত আলীর (রাজিঃ) মন্ত্রণাদাতা ও সভাসদগণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, হজরত কায়স্ (রাজিঃ) নিশ্চয়ই হজরত মোয়া-ভিয়ার (রাজিঃ) সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু হজরত আলী (কঃ অঃ) এ বিষয়ে তাঁহার মন্ত্রীদের সঙ্গে এক মতাবলম্বী হইতে পারিলেন না ; তিনি মনে করিলেন, এ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হজরত কায়স্-বিন্-সায়াদের (রাজিঃ) ন্যায় একজন ক্ষমতাশালী ; প্রভাব সম্পন্ন ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষের মিসরের শাসনকর্তৃত্ব পদে থাকা একান্ত আবশ্যক। হজরত আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) যখন তাঁহার গুপ্তচরদিগের দ্বারা একথা জানিতে পারিলেন যে, হজরত কায়সের (রাজিঃ) সম্বন্ধে হজরত আলীর (রাজিঃ) দরবারে সন্দেহ করা হইতেছে। তখন তিনি স্বীয় দরবারে প্রকাশ্যভাবে হজরত কায়সের (রাজিঃ) প্রশংসাবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। আর লোকের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, কায়স (রাজিঃ) আমার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এবং আমার মতাবলম্বী। তাঁহার চিঠিপত্রও সর্ব্বদা আমার

নিকট আসিয়া থাকে। তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়ের গোপনীয় সংবাদ ও নিয়মিতরূপে আমাকে পাঠাইয়া থাকেন। কখন কখন প্রকাশ্য দরবারে ইহাও বলিতেন যে, হজরত কায়স-বিন্-সায়াদ (রাজিঃ) মিসরে হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ প্রার্থীদিগের সঙ্গে খুব সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ ও সম্মান প্রদর্শন করেন।

হজরত আলীর (রাজিঃ) যে সকল জাছুছ (গুপ্তচর) দামেস্কে ছিল, তাহারা হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) উক্তি ও বর্ণনাদি লিপিবদ্ধ করিয়া কুফায় আমিরুল মুমেনিন হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট পাঠাইয়া দিল। ইহার ফল এই হইল যে, হজরত আলী (রাজিঃ) এই সংবাদ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কায়স্-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ)কে পদচ্যুত করিয়া সেইস্থলে মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)কে মিসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। এই ঘটনা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দামেকেস্থ হজরত আলীর (রাজিঃ) গুপ্তচরগণ সুদক্ষ ও হুশিয়ার লোক ছিল না। তাহারা ব্যাপারটার ভালরূপ অনুসন্ধান করিলে, প্রকৃত ঘটনা অবশ্যই বুঝিতে পারিত। পক্ষান্তরে সরলমনাঃ হজরত আলী (রাজিঃ) মিসরে কোনও বিশ্বস্ত গুপ্তচর পাঠাইলেই হজরত কায়েস বিন্ ছায়াদের (রাজিঃ) গতি-মতি বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার পদচ্যুতির কার্য্যটাও অতি তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হইয়াছিল; আর তাঁহার যে সকল পারিষদ তাঁহাকে কায়েস্ বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) সম্বন্ধে

পরামর্শ দিয়াছিলেন, দেমেস্ক হইতে প্রেরিত সংবাদ পাইয়া তাঁহারাও হয় ত হজরত আলী (রাজিঃ)কে এই কার্য্য করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ ও বাধ্য করিয়াছিলেন। একজন বড়-দরের পরম ধার্ম্মিক সাহাবার প্রতি হঠাৎ এরূপ ধারণা করা ঠিক হইয়াছিল না। তাঁহার বীরত্ব, কার্য্যদক্ষতা, রাজনীতিজ্ঞান ও দৃঢ়তার সহিত তুলনা করিলে হজরত মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)এর ন্যায় একজন তরুণ বয়স্ক যুবককে এরূপ কঠোর দায়িত্ব পূর্ণ পদে নিযুক্ত করা সমীচীন হইয়াছিল না। বিশেষতঃ হজরত ওস্মান রাজি আল্লাহ আন্হুর শাহাদৎ (হত্যাকাণ্ড) সম্বন্ধে ইঁহার উপর অনেক লোকই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। আবার ঐরূপ বীতশ্রদ্ধ লোকের মিসরে ও অভাব ছিল না। অতি বৃদ্ধ, পরম ধার্ম্মিক, সরলচেতা খলিফার অন্যায় হত্যাকাণ্ডে বহু লোকই প্রকৃত প্রস্তাবে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তবে ইব্নে সাবা ও অন্যান্য সুবিধা বাদী কপট লোকের কথা স্বতন্ত্র। যাহা হউক, হজরত মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) মিসরে পঁহুছিয়া ; স্বীয় নিয়োগ পত্র ও কায়স্-বিন্-সাদের (রাজিঃ) পদচ্যুতির ফরমান তাঁহাকে দেখাইলে, সেই প্রবীণ সাহাবা ও সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ; কিন্তু তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া, মদীনা-মনুওরায় চলিয়া আসিলেন। মদীনা মনুওরা হইতে হজরত আলী করমুল্লাহে চলিয়া আইসাতে, সেখানে কোনওরূপ শাসন-শৃঙ্খলা ছিল না—এক প্রকার

অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। মদীনা শরীফে এরূপ বহু সংখ্যক লোক ছিলেন, যাঁহারা হজরত আলীর (রাজিঃ) খেলাফৎ ন্যায় সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতেন, আর তাঁহার প্রত্যেক আদেশ ও প্রত্যেক কার্য্য ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতেন, এবং মানিয়া লইতেন; আবার এরূপও বহু লোক ছিলেন, যাঁহারা হজরত ওস্‌মান রাজিঃ আল্লাহ আনহুর শাহাদতের (হত্যাকাণ্ডের) কেছাছ (প্রতিশোধ) গ্রহণ না করাতে বে-চয়েন (উৎকণ্ঠিত) ছিলেন। আর এই ব্যাপারে হজরত আলীর (রাজিঃ) শৈথিল্য দর্শনে, তাঁহার ঐরূপ শৈথিল্য প্রতিবাদ যোগ্য মনে করিতেন। এমন কি, তাঁহার প্রতি প্রকাশ্যভাবে দোষারোপ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। কায়স্‌-বিন-সায়াদ (রাজিঃ) মদীনা পঁহুছিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) বিখ্যাত ষড়যন্ত্রকারী ও কুটীলমনা বিপ্লবের সর্ব্ব প্রধান নেতা মারওয়ান-বিন-আল্‌-হকমকে মদীনায় পাঠাইয়া বিশেষভাবে তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, যেরূপে পার কায়স বিন্‌-সায়াদ (রাজিঃ)কে আমার এখানে লইয়া আইস। তদনুসারে মারওয়ান মদীনায় পঁহুছিল' মারওয়ানের নানা প্রকার প্রলোভনে যখন এই ধার্ম্মিক পুরুষ কোনও ক্রমেই বিচলিত হইলেন না— কিছুতেই দেমেস্কে যাহাতে রাজী হইলেন না, তখন সেই ধূর্ত্তপুরুষ মারওয়ান তাঁহাকে নানা প্রকারে বিরক্ত করিতে লাগিল। যখন মারওয়ানের বিরক্তিজনক কার্য্য তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল, তখন তিনি মদীনা তৈয়বা হইতে কুফায় আমিরুল মুমেনিন হজরত

আলীর (রাজিঃ) নিকট চলিয়া গেলেন। সেখানে হজরত আলী (রাজিঃ) তাঁহার বাচনিক সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন; আর আমিরুল মুমেনিন তাঁহার প্রতি যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, সেই সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া গেল। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন তাঁহাকে স্বীয় সভাসদরূপে নিজের নিকট রাখিলেন। যখন হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এই সংবাদ শুনিলেন, তখন তিনি মারওয়ান-বিন্-আন্ হকমকে লিখিলেন' যদি তুমি একলক্ষ্য বীর পুরুষ দ্বারা আলীর (রাজিঃ) সাহায্য করিতে, তাহাতেও তত ক্ষতি হইত না; কায়স্-বিন্-সায়াদ (রাজিঃ) তাঁহার নিকট (হজরত আলীর [রাজিঃ] নিকট) চলিয়া যাওয়াতে ক্ষতি হইয়াছে।

মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ) মিশর পঁহুছিয়া, এবং শাসনভার গ্রহণ করিয়াই নিরপেক্ষ লোকদিগের নিকট ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, তোমরা আমার অধীনতা স্বীকার কর। এবং আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওজহুর নামে বায়েত কর (তাঁহার খেলাফৎ মানিয়া লও)। যদি তাহা না কর, তবে আমার শাসনাধীন এই মিশর দেশ হইতে চলিয়া যাও। তদুত্তরে তাহারা বলিল, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এবং আমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে এত তাড়াতাড়ি করিবেন না; বেশী না হউক আমাদিগকে কয়েক দিনের অবসর দিন, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া লই। মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে

কিছুতেই সময় দেওয়া যাইবে না; তাহারা নব-নিয়োজিত শাসনকর্ত্তার ঈদৃশ কঠোর উত্তর শ্রবণে আত্ম-রক্ষার্থে দৃঢ়তা অবলম্বন করিল। শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা সেই আক্রমণের প্রতিরোধ জন্য পূর্ণভাবে সজ্জিত হইয়া থাকিল। তাহাদের সংখ্যাও কেবল অল্প; এবং শক্তিও উপেক্ষনীয় ছিল না। মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ) জঙ্গে ছফিন (ছফিনের যুদ্ধ) শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের উপর খুব নারাজ থাকিলেন; পক্ষান্তরে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, ছফিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

হজরত ওমরু-বিন্-আল্-আছ (রাজি) দেমেস্কে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সমীপে।

হজরত ওমরু-বিন্-অল্-আছ (রাজিঃ) একজন প্রধান সাহাবা। তিনি যেমন বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ—তেমনই মহাবীর পুরুষ ছিলেন। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ আন্‌হুর খেলাফৎ কালে তিনি মিসর দেশ জয় করিয়া খেলাফতের শাসনাধীন করিয়া দেন। এই বিজয় কার্য্যে তিনি

মহাবীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মিসরের খৃষ্টিয়ান শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। সিরিয়া বিজয় কার্য্যেও ইনি একজন প্রধান সেনাপতি ও অন্যতম নেতা ছিলেন। যখন বিপ্লববাদীগণ মদীনায় উপস্থিত হইয়া খলিফা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) গৃহ অবরোধ করেন, তখন তিনি মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিপ্লববাদীদিগের অন্যায় কার্য্য-কলাপ এবং এই বিপ্লবের পরিণাম ফলের বিষয় চিন্তা করিয়া ইহাই সঙ্গত মনে করিলেন যে, এ সময় মদীনা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া বাস করাই কর্ত্তব্য। তদনুসারে তিনি স্বীয় দুই পুত্র আবদুল্লা ও মোহাম্মদকে সঙ্গে লইয়া মদীনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বয়তুল মোকদ্দসে গমন করিলেন এবং আপাততঃ সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানে থাকিয়া নীরবে বর্ত্তমান ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা ও খেয়াল করিতেন। অতি সতর্কতা সহকারে সকল তথ্য গ্রহণ করিতেন। একজন সুদক্ষ ও সুচতুর রাজনীতিকের পক্ষে যাহা করা কর্ত্তব্য তিনি সেইরূপ করিতে কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন না। বয়তুল মোকদ্দসে থাকিয়া তিনি প্রথমতঃ তৃতীয় খলিফা হজরত ওস্‌মান জিন্নূরায়েন রাজি আল্লাহ আন্‌হুর শাহাদতের (শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের) সংবাদ পাইলেন। তৎপর সংবাদ পাইলেন, হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্তে অধিকাংশ মোসলমান বায়েত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) এর হত্যাকারিগণের নিকট কেছাছ (হত্যার প্রতিশোধ) লইতে বিলম্ব করিতেছেন। আবার

সংবাদ পাইলেন, ওম্মোল-মুমেনিন (বিশ্বাসী অর্থাৎ মোসলমান-গণের মাতা) হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ আঃ), ৩য় খলিফার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবা ও বহু-সংখ্যক যোদ্ধৃপুরুষ সঙ্গে লইয়া বস্রায় গমন করিয়াছেন ; আর সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর হস্তে বায়েত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন ; সঙ্গে সঙ্গে হজরত ওস্‌মান গনির হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী করিয়াছেন। পরে সংবাদ পাইলেন, হজরত আলী (রাজিঃ)ও সসৈন্যে বস্রাভিমুখে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। ইহার কিছুকাল পরেই সংবাদ পাইলেন, জঙ্গে জমলে (জমলের যুদ্ধে) হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) শহিদ হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী (রাজিঃ) বস্রা অধিকার করিয়া হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-আব্বাস (রাজিঃ)কে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ)কে সসম্মানে মক্কায় পাঠাইয়া দিয়াছেন ; পরে হজরত আলী (রাজিঃ) কুফায় তশরিফ্ আনিয়া কুফাকে রাজধানীর সম্মান প্রদান পূর্ব্বক শাম (সিরিয়া) আক্রমণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শেষোক্ত সংবাদ শুনিয়া হজরত ওমরু-বিন-আল্‌-আস (রাজিঃ) স্বীয় দুই পুত্রের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ চাহিলেন, এবং বলিলেন, এতদিনে সুযোগ

উপস্থিত হইয়াছে; এই সময় আমার পক্ষে আমীর হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নিকট দামেস্কে চলিয়া যাওয়া উচিত। সেখানে গিয়া খেলাফৎ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও উহার শেষ মীমাংশা করিতে হইবে। জঙ্গে জমলের পূর্ব্বে খেলাফতের দাবীদার ৪ চারি ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমতঃ হজরত আলী (রাজিঃ) খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ হজরত তাল্‌হার (রাজিঃ) প্রতি বস্রার অধিবাসিগণ অনুরাগী এবং তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন; তিনিও খেলাফতের আশা করিতেন। হজরত যোবায়ের (রাজিঃ)এর প্রতি কুফাবাসিগণ ভক্ত ও তাঁহার একান্ত অনুরাগী ছিলেন; ইঁহাদের দলও পুরু ছিল; এবং ইঁহাদের মধ্যে যোদ্ধৃ পুরুষের সংখ্যাও বেশী ছিল। কুফাবাসিগণ হজরত যোবায়েরকেই খেলাফতের ন্যায্য হক্‌দার (অধিকারী) মনে করিত। চতুর্থ দাবীদার হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ), কোরেশদলের সর্ব্ব প্রধান নায়ক হজরত আবু-সুফিয়ানের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) খেলাফৎ কালেও নানা দায়িত্ব পূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ আনহুর খেলাফৎ (আধিপত্য) কালে ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবিদ-বিন-আবু সুফিয়ানের (রাজিঃ) দামেস্কের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি যেমন বীর পুরুষ তেমনি শাসন কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। সিরিয়ার ভীষণ মহামারীতে তিনি পরলোক গমন করিলে, মহামান্য খলিফা কর্ত্তৃক হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থলে সিরিয়ার শাসনকর্ত্তানিযুক্ত হন। অতি প্রাচীন ও গৌরবান্বিত মহানগরী দামেস্ক তাঁহার রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। অত বড় বৃহৎ, সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর তখন খেলাফতের অধীনে আর একটীও ছিল না। দামেস্ক (ডামাস্কস্) অতি আড়ম্বর পূর্ণ আদর্শ নগর ছিল। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) শাসন কার্য্যে অতি সুদক্ষ ছিলেন। এজন্য ২য় খলিফা হজরত ফারুক আজমের খেলাফৎকালে তিনি প্রশংসা ও যোগ্যতার সহিত সিরিয়ার শাসনকর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছিলেন। মহামান্য খলিফা তাঁহার কার্য্যে কোনও রূপ দোষ-ত্রুটি পাইয়াছিলেন না। যদি তিনি কিছুমাত্র ত্রুটী পাইতেন, তবে এরূপ দায়িত্ব পূর্ণ শাসনকর্তৃত্বে তাঁহাকে নিযুক্ত রাখিতেন না। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) একজন সুযোগ্য বীর-পুরুষও ছিলেন। সিরিয়ার বাহিরেও তিনি কতক প্রদেশ ও জনপদ অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন। মহামান্য দ্বিতীয় খলিফা ঘাতক হস্তে আহত হইয়া শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলে (পরলোক গমন করিলে) হজরত ওস্মান-(বিন্-আফ্ফান) জিন্নুরায়েন খলিফার পদ লাভ করিলেন। তখন হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষে স্বর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হইল। কারণ হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) খলিফার অতি নিকট আত্মীয়—জ্ঞাতি ভ্রাতা, তদুপরি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বীর-পুরুষ ও সুযোগ্য সেনাপতি ও সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা। এই সুযোগে তিনি স্বীয় শক্তি খুব বাড়াইয়া লইলেন। খেলা-ফতের এলাকা ও রোমক সম্রাটের এলাকা পরস্পর সংযুক্ত

ছিল; সুতরাং রোমক সম্রাটের সঙ্গে সিরিয়ার শাসনকর্ত্তার সঙ্ঘর্ষণ ঘটিবার আশঙ্কা সর্ব্বদাই থাকিত। সময় সময় পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধও ঘটিত, তজ্জন্য সিরিয়ায় প্রবল সেনাদল রাখার একান্ত প্রয়োজনই অনুভূত হইত। আর বিশাল সিরিয়া অতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেশ, বহু সুন্দর সুন্দর নগর পরম্পরায় ইহা আচ্ছন্ন। উৎকৃষ্ট ফলবান্ বৃক্ষের উদ্যানরাজিতে সিরিয়ার বিভিন্ন জনপদ সমাচ্ছন্ন। শ্যামল শস্যক্ষেত্র সমূহে সমগ্র দেশ সুশোভিত। এজন্য আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মোসলমানগণ সিরিয়ায় নূতন উপনিবেশ সমুহ স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) বিশেষ অনুগত ও অনুরক্ত ছিল। আবার বনু-ওম্মিয়া অর্থাৎ হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) আত্মীয়-স্বজন শামদেশে বড় বড় পদ এবং জায়গীর ইত্যাদি লাভ করিয়া বিশেষ অর্থ-সম্পদশালী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার সামরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সুবিধারও কোন অভাব ছিল না। এক্ষণে হজরত ওস্মান রাজি আল্লাহ আনহুর অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সুযোগে, তিনি তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় —জ্ঞাতি-ভ্রাতার উত্তরাধিকারীরূপে কেছাছ (হত্যার প্রতিশোধ) গ্রহণের দাবী খুব জোর-শোরে করিতে লাগিলেন। সুতরাং হজরত তালহা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ)এর শাহাদতের পর খেলাফতের দাবীদার দুই ব্যক্তিই মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। আমীর হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) বলিতেন, হজরত আলী (রাজিঃ) কেবল ঐ বিদ্রোহী দল কর্ত্তৃক নির্ব্বিচিত

খলিফা—যাহারা হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)কে শহিদ (হত্যা) করিয়াছে। অনেক বড় বড় জলিলল কদর (মহা সম্মানিত) সাহাবা (হজরত রেছালত মাবের শিষ্য) মদীনায় বিদ্যমান ছিলেন; তাঁহারা হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্তে বায়েত করেন নাই। আবার সাহাবা (রাজিঃ) দিগের মধ্যে এক বৃহৎ দল মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না; তাঁহারা নানা দেশে নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বায়েত গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফা নির্ব্বাচনকালে ঐ সকল ছাহাবার বায়েত গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা হইয়াছিল; এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যথানিয়মে বায়েত গ্রহণ করা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার এই যে, হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আনহুর হত্যাকারী বিদ্রোহীদল হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলভুক্ত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু বলিতেন, আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ইস্‌লামের খেদমতে, হজরতের নিকটবর্ত্তী রেশ্‌তায় (আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ট সম্পর্কে), সর্ব্বাগ্রে ইস্‌লাম গ্রহণের গৌরবে, কোনও ক্রমেই আমার সঙ্গে মোকাবেলা করিতে (তুলনীয় হইতে) পারেন না। স্থূল কথা তাঁহারা উভয়ে আপনাদের দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেন। হজরত ওমরু-বিন-আল্‌-আস (রাজিঃ) এই ব্যাপারে আপনাকে নিঃসংশ্রবান্বিত রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। আবদুল্লা-বিন-ওমরু (রাজিঃ) পিতাকে বলিলেন এবং পরামর্শ দিলেন, আপনি হজরত রেছালত মাব (সালঃ), হজরত আবু বকর সিদ্দিক

(রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) হজরত ওসমান (রাজিঃ) দিগের নবুয়ত, খেলাফৎ ও আধিপত্য কালে আপনি সন্তুষ্টির ও গৌরবের সহিত ছিলেন ; সুতরাং এক্ষেত্রেও আপনার নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া চুপ থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। আপনি আপাততঃ নির্জ্জন বাসে সময়াতিবাহিত করুন। মোসলমানগণ স্থির হইয়া একজন খলিফার মতানুবর্ত্তী হউক ; তখন আপনি কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ-বিন্ ওমরু (রাজিঃ) বলিলেন, আপনি একজন ক্ষমতাশালী সদ্বিবেচক প্রধানতম সাহাবা, আপনি এই বিপ্লবের সময় নীরব থাকিলে চলিবে কেন ? এ ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ করা উচিত। হজরত ওমরু-বিন্-আল্-আস (রাজিঃ) উভয় পুত্রের বক্তব্য ও যুক্তিবাদ শুনিয়া বলিলেন, আবদুল্লার পরামর্শ দীনের (ধর্ম্ম বা পরকালের) পক্ষে মঙ্গলজনক, আর মোহাম্মদের পরামর্শ দুনিয়ার (ইহকালের) পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। ইহার পর তিনি আরও কিছুকাল চিন্তা এবং বিবেচনা করিলেন। দীনের উপরে দুনিয়ার জয় হইল। অর্থাৎ অত বড় ছাহাবা পরকালের চিন্তা ত্যাগ করিয়া, পার্থিব মায়া-জালে এবং লালসা-জালে আবদ্ধ হইলেন। পার্থিব সুবিধা ও গৌরবের দিকেই তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল। তিনি বয়তুল মোকদ্দসের নির্জ্জন বাস পরিত্যাগ করিয়া, সপুত্র দামস্কে—হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) দরবারে উপস্থিত হইলেন। আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) মহা-ধুম ধামে তাঁহার "আওভক্ত" করিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন

রাজনীতিবিদ্, বুদ্ধিমান, সুচতুর ও বীর পুরুষকে পাইয়া হজরত মোয়াভিয়া নিতান্ত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলেন। তিনি দামেস্কে পঁহুছিয়াই হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে বলিলেন, মজলুম (অত্যাচারে নিহত) খলিফার অন্যায় হত্যাকাণ্ডের দাদ (প্রতিশোধ) অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা অতি আবশ্যক। আপনার পক্ষে এ দাবী করা সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত। প্রথমতঃ আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) তাঁহার সঙ্গে আলাপাদি করিতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাঁহার মনে কিছু—কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল। পরে ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক, বড় বড় কার্য্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীত্ব পদ প্রদান পূর্ব্বক আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিলেন। হজরত ওমরু-বিন্-আল্আস (রাজিঃ) হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে পরামর্শ দিলেন যে, হজরত ওস্মান রাজি আল্লাহ আন্হুর শোণিতাক্ত কামিজ (পিরহান বা কুরতা) ও হজরত নায়েলার (রাঃ-আঃ) কর্ত্তিত অঙ্গুলী প্রত্যহ সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার কোনও প্রয়োজন নাই; কারণ এরূপ করিলে লোকের 'জোবা' (উত্তেজনা) ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিবে; কর্ত্তব্য এই যে, এই জিনিষদ্বয় বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে আনিয়া প্রদর্শন করা যাইবে। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) তাঁহার এই পরামর্শ যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন। লোকেরা প্রত্যহ শাহাদৎ প্রাপ্ত (নিহত) খলিফার শোণিতাপ্লুত কামিজ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী হজরত নায়েলার (রাঃ আঃ)

কত্তিত অঙ্গুলী দেখিয়া যে ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ প্রভৃতি দ্বারা শোক প্রকাশ করিত; ঐ দুই জিনিষের প্রদর্শন বন্ধ করাতে, সেই দৈনিক শোক প্রকাশও বন্ধ হইয়া গেল। ওমরু-বিন্-আল্-আস (রাজিঃ) হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে একথাও বুঝাইয়া দিলেন যে, জঙ্গে জমলের পর হজরত আলীর (রাজিঃ) সামরিক শক্তি অনেক হ্রাস পাইয়াছে। কারণ বস্রার যুদ্ধে ৮।৯ হাজার পরাক্রান্ত যোদ্ধৃ-পুরুষ নিহত হইয়াছে; তন্মধ্যে অনেক বড় বড় সরদার (নেতা বা দলপতি)ও ছিলেন। এক্ষণে হতাব-শিষ্ট বস্রাবাসী তাঁহার হস্তে বায়েত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা বস্রাবাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রাণের সহিত মনের উৎসাহের সহিত করিবে না। তদ্ব্যতীত হজরত আলীর (রাজিঃ) সৈনিকবৃন্দের মধ্যে সকলে একতাবলম্বী এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি সম্পান্ন নহে; হজরত ওমরু-বিন্-আল্-আসের (রাজিঃ) এ অনুমাত্র ঠিকই ছিল; আর হজরত আলীর (রাজিঃ) সামরিক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সাবেয়ী দলেরও অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাহারা তাহাদের ভীষণ দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য পূর্ণোদ্যমে কার্য্য করিতেছিল।

ছফিন যুদ্ধের ভূমিকা।

হজরত আলী করমুল্লাহে অজহু কুফায় আগমন পূর্ব্বক শাম (সিরিয়া) আক্রমণের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। হজরত

আবদুল্লা-বিন-আব্বাস (রাজিঃ)কে বস্রার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, তুমি বস্রা হইতে সেনাদল সংগ্রহ পূর্ব্বক, এখানে একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিবে, এবং যত সত্বর সম্ভব সসৈন্যে কুফায় গিয়া আমার সঙ্গে সম্মিলিত হইবে। তদনুসারে তিনি বস্রার যোদ্ধৃদল দ্বারা একটী প্রবল সেনাদল গঠন পূর্ব্বক, বস্রায় উপযুক্ত প্রতিনিধি রাখিয়া কুফা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বেই তিনি কুফায় মহামান্য আমিরুল মুমেনিন হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট যাত্রার তারিখ লিখিয়া পাঠাইলেন। আবার যাইবার সময়ও দ্রুতগামী সংবাদ বাহক প্রেরণ করিলেন। হজরত ইব্‌নে আব্বাসের (রাজিঃ) যাত্রার সংবাদ পাইবামাত্র কুফায় আবু মসুউদ আন্‌সারী (রাজিঃ)কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, স্বীয় বিক্রান্ত সেনাদল সহ "তখ্‌লিয়া" অভিমুখে যাত্রা করিলেন; তথায় পঁহুছিয়া সেনাদলের সুশৃঙ্খলা বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্থানেই হজরত আবদুল্লা-বিন-আব্বাস (রাজিঃ) বস্রার সেনাদল সহ তাঁহার সঙ্গে আসিয়া যোগদান করিলেন। অনতি-বিলম্বে হজরত আলী (রাজিঃ) মহাবীর যেয়াদ-বিন্‌-নছর হারসিকে ৮০০০ আট সহস্র সৈন্যসহ মকদ্দমাতুল জায়শ্‌ (অগ্রগামী সেনাদল) রূপে সিরিয়াভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তৎপর অন্যতম বীর পুরুষ সরিহ্‌-বিন্‌-হানীকে ৪ চারি হাজার সৈন্যসহ পূর্ব্বোক্ত সেনাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠাইলেন। তদনন্তর স্বয়ং তথা হইতে কুচ্‌ (যাত্রা) করিয়া পারস্য সম্রাটের

রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ "মদায়েন" সহরে উপস্থিত হইলেন। মদায়েনে মছউদ ছকফিকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, মীফল-বিন্-কায়সকে ৩০০০ তিন হাজার সৈন্যসহ সিরিয়াভিমুখে রওয়ানা করিলেন। অতঃপর মহামান্য আমিরুল মুমেনিন মদায়েন হইতে যাত্রা করিয়া "রোক্কা" অভিমুখে চলিলেন। রোক্কার নিকটেই ফোরাত (ইউফ্রেটিস্) নদী পার হইলেন। এই স্থানে পূর্ব্ব প্রেরিত সেনাপতিত্রয় যেয়াদ, ছবিহ্ ও মীফল এবং তাঁহাদের সেনাদল সমবেত হইয়াছিলেন। ওদিকে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) যখন সংবাদ পাইলেন যে, হজরত আলী (রাজিঃ) বিরাট সেনাদল লইয়া সিরিয়াভিমুখে অভিযান করিয়াছেন, তখন তিনি আতুলআওরোছ ছালামার নেতৃত্বাধীনে একদল সৈন্য অগ্রগামী সেনাদলরূপে পাঠাইলেন। হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু ফোয়াত নদী পার হইয়া আবার যেয়াদ ও শরিহ্ এই দুই জন সেনানীকে অগ্রগামী সেনাদলের সেনাপতিরূপে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। যেয়াদ ও শরিহ্ সসৈন্যে শামের সীমায় পদার্পণ করিয়া জানিতে পারিলেন, আবুল আওরোছ ছালামঃ সিরীয় সেনাদলসহ তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ হজরত আলী (রাজিঃ)এর সমীপে এই সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র মহাবীর মালেক আশ্তর কে তথায় প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, তুমি সেখানে পঁহুছিয়াই সেনাপতির পদ স্বয়ং গ্রহণ করিবে, এবং যেয়াদ ও শরীহকে ময়মিনা ; ও মইছরার (দক্ষিণ এবং বাম

ভাগের) সেনাপতির পদ প্রদান করিবে। আর যে পর্য্যন্ত সিরীয় (শামী) সেনাদল তোমাদিগকে আক্রমণ না করে, তখন পর্য্যন্ত তুমি তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে না। মহাবীর মালেক আশতর মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র দ্রুতগতিতে অগ্রগামী সেনাদলে পঁহুছিয়া, স্বয়ং প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন; এবং যেয়াদ ও শরিহকে দক্ষিণ এবং বাম ভাগের সেনাপতিত্বের ভার দিলেন, ওদিকে আবুল আওরোছ ছালামাঃ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের সম্মুখভাগে শিবির বিন্যস্ত করিলেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় সেনাদল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া চুপ করিয়া থাকিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় আবুল-আওরোছ ছালামাঃ কুফা ও বস্রার সম্মিলিত অগ্রগামী সেনাদলকে আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধ করিয়াই উভয় প্রতিপক্ষ দল যুদ্ধে বিরত এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, আপনাপন শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দ্বিতীয় দিবস প্রভাত কাল সিরীয় সেনাপতি আবুল আওরোছ-ছালামাঃ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও যোদ্ধাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করাতে, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের সেনাদল হইতে হাশেম-বিন্-ওতবা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে লাগিয়া গেলেন। আছরের নমাজের সময় পর্য্যন্ত এই দুই বীর পুরুষ প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। পরে উভয়ে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন; এই সময় সেনাপতি মালেক ওশতর স্বীয়

সৈন্যদিগকে শত্রুদলকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। আবুল আওরোহ ছালামাঃ স্বীয় সৈন্যদিগকে প্রতি আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ চলিল, উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইল; রাত্রি উপস্থিত হইলে যখন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; তখন উভয় সেনাদল যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পর দিবস হজরত আলী (রাজিঃ) ও মূল সেনাদল লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ইহাও জানা গেল যে, হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)ও স্বীয় বিশাল সেনাদলসহ খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। হজরত আলী (রাজি) যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া মহাবীর মালেক ওশতরকে বলিলেন, তুমি অবিলম্বে একদল সৈন্য লইয়া ফোরাত নদীর তটে গমন পূর্ব্বক উহা অবরোধ কর। মালেক ওশতর নদী তটে গমন পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) তৎ-পূর্ব্বেই ফোরাত নদী অবরোধ পূর্ব্বক তাহা স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়াছেন। হজরত আলী (রাজিঃ) যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি সায়া-বিন্-সোহানকে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজি) নিকট এই সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন যে, আমি ঐ সময় পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতাম না, যে পর্য্যন্ত তোমার ওজর না শুনিতাম। আর হক্ (ন্যায়) কথা অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ ইসলামের অনুশাসন তোমাকে না শুনাইয়া তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতাম না। কিন্তু তোমার সৈন্যগণ প্রথমেই আমার সেনাদলকে সত্বরতা সহকারে আক্রমণ করিয়াছে।

এক্ষণে আমি ইহাই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি যে, তোমাকে হক্-রাস্তার দিকে—ন্যায় পথে (পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মানুমোদিত সৎপথে) আহ্বান করি, আর যে পর্য্যন্ত হুজ্জত (উদ্দেশ্য) পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত কোনও ক্রমেই যুদ্ধ আরম্ভ করিব না, ইহাই আমার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তুমি ফোরাৎ নদীর তট অবরোধ করিয়া আমাদের পানী বন্ধ করিয়া দিয়াছ। আমার সৈন্যগণ পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া বিষম কষ্ট পাইতেছে। তুমি তোমার সৈন্যদলকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন আমাদিগকে পানী আনিতে বাধা না দেয়। যে পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে কোনওরূপ মীমাংসা না হয়, সে পর্য্যন্ত পানী বন্ধ করিও না। আর যদি তুমি ইহাও চাও যে, যে উদ্দেশ্যে আমি এখানে আগমন করিয়াছি, উহা ভুলিয়া গিয়া পানী লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করি, এবং যে গালেব (জয়ী) হয়, সেই পানী পান করিতে পাইবে, তবে আমি সে ব্যবস্থায়ও প্রস্তুত আছি। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এই প্রস্তাব শুনিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় মন্ত্রী এবং পারিষদদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রস্তাব তাঁহাদের সম্মুখে পেশ করিলেন। মিশরের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা আবদুল্লা-বিন্-ছায়াদ ও অলিদ্-বিন্-ওকবাহ বলিলেন, আমাদিগের পক্ষে নদীর অবরোধ তুলিয়া লওয়া উচিত নহে পিপাসার্ত্ত করিয়া উহাদিগকে বধ করাই উচিত। কারণ উহারা হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) গৃহে পানী বন্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং সেই পিপাসার্ত্ত অবস্থায়ই তাঁহাকে শহিদ (হত্যা) করা

হইয়াছিল। হজরত ওমরু-বিন্-আল্-আছ (রাজিঃ) এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, পানী কিছুতেই বন্ধ করা উচিত নহে। হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলকে পিপাসার্ত্ত রাখিয়া কষ্ট দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়। এই সভায়ই সায়াসায়া এবং অলিদ-বিন্-ওকবার সঙ্গে কিছু তর্ক-বিতর্ক ও কথা কাটাকাটী হইল। অবশেষে উহা শক্ত গালি-গালাজে পরিণত হইল। সায়াসায়া অবশেষে নিতান্ত নারাজ হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলেন, এবং হজরত আলী (রাজিঃ)কে বলিলেন, উহারা আমাদিগকে কিছুতেই পানী দিবে না। এতচ্ছ্রবণে হজরত আলী (রাজিঃ) আশতর-বিন্-কায়স্‌কে একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ নদী তটে পাঠাইলেন এবং বলিলেন, বলপূর্ব্বক নদী তট অধিকার করিবে এবং যেরূপেই হউক, পানীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। ওদিকে আবুল আওরোছ ছালামাঃ যুদ্ধের সজ্জা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে উভয় দল হইতে তীর বর্ষণ আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে নেজা-যুদ্ধও চলিতে লাগিল। শানিত তরবারি ও বিদ্যুৎ চমকাইল। শোণিত পাত, মুণ্ডপাতও হইতেছিল। স্থূল কথা যুদ্ধের কোন অঙ্গই বাকী থাকিল না। কিন্তু এ বিষয়ে কোন মীমাংসা হইল না যে, ফোরৎ নদীর উপর কোন্ দলের আধিপত্য হইবে। এই সময় হজরত ওমরু-বিন্-আল-আছ (রাজিঃ) হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে বুঝাইয়া বলিলেন, যদি আপনি নদীর অবরোধ উঠাইয়া না লয়েন, আর হজরত আলীর (রাজিঃ)

সৈন্যগণকে তৃষ্ণার্ত্ত রাখেন, এবং তাহারা পিপাসায় ছটফট করিতে থাকে, তবে আপনার সেনাদলের মধ্যেই অনেকের ধর্ম্মচুতি ঘটিবে, এবং বহু লোক আপনার বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিবে। এরূপ অন্যায় অত্যাচারে তাহাদের হৃদয় ব্যথিত হইলে তাহারা গিয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) দলে যোগ দিয়া আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এই কথা শুনিয়া অত্র নদীর অবরোধকারী সৈন্যদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, নদীর অবরোধ ত্যাগ কর, শত্রু পক্ষকে পানী গ্রহণে বাধা প্রদান করিও না। তাহারা যেন পানীর অভাব ও কষ্ট অনুভব না করে। এইরূপে এই বিভ্রাটের অবসান হইল।

ইহার পর দুই দিন পর্য্যন্ত উভয় প্রতিপক্ষ সেনাদল পরস্পর সম্মুখীন অবস্থায় থাকিল; কোনও পক্ষ কোনও পক্ষকেই আক্রমণ করিল না। ইতি পূর্ব্বে হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলে হেজায, এমন এবং আরবের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে, আর পারশ্যের সুবা-হামাদান প্রভৃতি স্থান হইতে বহু যোদ্ধ, পুরুষ আসিয়া যোগদান করিয়াছিল। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর মোট সৈন্য সংখ্যা দাড়াইয়া ছিল ৯০ হাজার, পক্ষান্তরে হজরত মোয়াভিবার সৈন্য সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। উভয় সেনাদলের প্রধান সেনাপতি হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ছিলেন। অধীনস্থ সেনাপতিদিগের বিভাগ এইরূপ হইয়াছিল। হজরত

আলীর (রাজিঃ) পক্ষে কুফার বিক্রান্ত অশ্বারোহী দলের সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন মহাবীর মালেক ওশ্‌তর, বস্রার অশ্বারোহী সেনাদলের সেনাপতি হইয়াছিলেন সাহল-বিন্‌-হানিফ ; কুফার পদাতিক সেনাদলের সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন হজরত এমার-বিন্‌-এয়াছর (রাজিঃ), বস্রার পদাতিক দলের সেনাপতির পদলাভ করিয়াছিলেন কয়েস্‌-বিন্‌-সায়াদ বিন্‌-এবাদা। হাশেন বিন্‌-ওকবা প্রধান পতাকাধারী ছিলেন। আবার বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সেনাপতি পদে তাহাদের উপযুক্ত দলপতিদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রণ পতাকা ছিল। হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) বিশাল সেনাদলে বাম বাহুর সেনাপতি ছিলেন যোলকালাহ্‌ হামিরী, বাম বাহুর সেনাপতি ছিলেন হবিব-বিন্‌-সালমাঃ, অগ্রগামী সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন আবুল আওরোছ ছালামাঃ। দামেস্কের প্রবল অশ্বারোহী সেনাদলের সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন হজরত ওমরু-বিন্‌-অল-আছ (রাজিঃ) ; পদাতিক সেনাদলের সেনাপতিত্ব পদ লাভ করিয়াছিলেন মোস্‌লেম-বিন্‌-ওকবা। তদ্ব্যতীত ছোট ছোট সেনাদলের সেনাপতি হইয়াছিলেন আবদুর রহমান-বিন্‌-খালেদ, ওবেদুল্লা-বিন্‌-ওমর, রসিদ-মালেক ও কন্দি প্রভৃতি।

২ দিন চুপচাপ থাকিবার পর ৩৬ হিজরীর ১লা যেলহজ্জ তারিখে হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু, বশির-বিন্‌-ওমরু (রাজিঃ) বিন্‌ মহসেন আন্‌সারি (রাজিঃ) ও সয়ীদ-বিন্‌-কায়স,

শবত-বিন-রবয়ী-তমিমি দ্বারা গঠিত এক ওকদ্ (ডেপুটেশন) হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য, তাঁহারা তাঁহাকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া খলিফা হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ইহারা হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) সমীপে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার দরবারে উপবেশন করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে বশি্র-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) বলিলেন, হে মোয়াভিয়া! তুমি মোসলমানদিগের জামায়াতের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইও না। আর আপসে শোণিত পাতের সুযোগ আনয়ন করিও না। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) উত্তর দিলেন, তুমি স্বীয় দোস্ত (বন্ধু) আলী (রাজিঃ)কে এরূপ নছিহত (উপদেশ) প্রদান করিয়াছিলে কি না? উত্তরে বশির (রাজিঃ) বলিলেন, সর্ব্ব প্রথমে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ এবং হজরত রসুলোল্লার খুব নিকট আত্মীয় বলিয়া খেলাফৎ সম্বন্ধে তিনি অধিক হক্‌দার। তোমার উচিত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করা (তাঁহার হস্তে বায়েত করা)। আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) উত্তর দিলেন যে, ইহা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে যে, আমি হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আন্‌হুর খুনের দাবী পরিত্যাগ করি। তখন শবত-বিন-রবয়ী (রাজিঃ) বলিয়া উঠিলেন, হে মোয়াভিয়া (রাজিঃ)! হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) খুনের দাবী সম্বন্ধে তোমার প্রকৃত অভিপ্রায় আমার অবিদিত নাই। তুমি এজন্যই হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আন্‌হুর সাহায্য করিতে গড়ি-মসি করিয়া বিলম্ব করিয়া-

ছিলে যে, তিনি শহিদ হইয়া গেলে তুমি তাঁহার খুনের দাবী করিবে; এবং সেই সুযোগে তুমি নিজে খেলাফতের ও এমামতের দাবী করিয়া বসিবে। হে মোয়াভিয়া! তুমি তোমার এই অন্যায় খেয়াল পরিত্যাগ কর। হজরত আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করিও না। হজরত মোয়াভিয়া (রাজি) কঠোরতার সহিত এই কথার উত্তর দিলেন। শবস্ (রাজিঃ) ও তদুপযুক্ত উত্তর প্রদানে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। সুতরাং এই দূত দল অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তৎক্ষণাৎ উভয় দলে যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

ছফিন যুদ্ধের প্রথম অংশ।

যখন সন্ধি বা মীমাংসার প্রচেষ্টা বিফল হইল, তখন উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কিন্তু দুই দিকেই মোসলমান এবং পরস্পারের মধ্যে অনেক আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ছিল, এজন্য প্রথম প্রথম যুদ্ধ তেমন ভীষণ আকার ধারণ করিল না। কাফেরের বিরূদ্ধে মোসলমানগণ যেমন ভীষণভাবে পূর্ণ পরাক্রমে অরাতি নিপাতে চেষ্টা পাইত, এক্ষণে তাহা হইল না। সাধারণতঃ উভয় দলের যোদ্ধৃ-পুরুষদিগের এই মনোভাব ছিল যে, উভয় পক্ষে পরস্পার সন্ধি হইয়া যায়; যুদ্ধ বিগ্রহ না ঘটে। উভয় পক্ষে মোসলমান, আবার উভয় পক্ষেই পবিত্র চরিত্র সাহাবা (রাজিঃ)গণ, অবশ্য হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষে

ইহাদের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে এই অবস্থা দাঁড়াইল যে, এক এক দল হইতে এক একজন যোদ্ধৃ পুরুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগমন করিয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ কৌশল ও বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন, দুই পক্ষের সৈন্যদল দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিত। কয়েক দিন ত এই ভাবেই যুদ্ধ চলিল।

"বারাঃ এমাম" নামক গ্রন্থে আহম্মদ মকরুম আব্বাছি চিড়িয়া কঠি (নখ্নৌ) নামক লেখক লিখিয়াছেন ঃ—

১ম দিন চাহার-শোম্বাঃ অর্থাৎ বুধবার দিন হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষ হইতে মহাবীর মালেক ওশতর একদল পরাক্রান্ত সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) জনিব-বিন-মোস্-লেমা কহরিকে রণক্ষেত্রে পাঠাইলেন। সারাদিন সিরীয় সেনা-দলের সঙ্গে এরাকী সেনাদলের ঘোর যুদ্ধ হইল। সন্ধ্যার সময় উভয় পক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিল।

দ্বিতীয় দিবস বৃহস্পতিবার হজরত আলী (রাজিঃ) হাশেম-বিন-ওতবা আবি ওক্কাস যহরী (রাজিঃ)কে বিরাট সেনাদল সহ যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন। ইনি পারস্য বিজেতা হজরত সায়াদ-বিন-আবিওক্কাস (রাজিঃ)এর ভ্রাতা। ইনিও একজন প্রখ্যাতনামা বীর-পুরুষ ছিলেন। এরমুকের ভীষণ যুদ্ধে ইঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে সোফিয়ান-বিন্-অওফ্ কে রণক্ষেত্রে প্রেরণ

করিলেন। সমস্ত দিন ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সন্ধ্যার সময় উভয় সেনাপতি স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয় দিবস (জুমার দিন) হজরত আলী (রাজিঃ) হজরত আবি তফিজান-এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ)কে বদরের যুদ্ধে উপস্থিত মহাসম্মানিত মহাজেরিন ও আন্সারদিগের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ), হজরত ওমরু-বিন্-অল আছ (রাজিঃ)কে সিরীয় সৈন্যদলের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পাঠাই-লেন। জোহরের নমাজের সময় পর্য্যন্ত উভয় দলে ঘোর সংগ্রাম চলিল। তৎপর উভয় সেনাদল রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল।

চতুর্থ দিবস শনিবার হজরত আলী (রাজিঃ) স্বীয় বীর পুত্র মোহাম্মদ-বিন্-আল্ হানিফাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ওবায়েদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ)কে প্রেরণ করিলেন, উভয় দলে সারা দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিল। সায়ংকালে উভয় প্রতিপক্ষ দল যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

৫ম দিবস রবিবারে হজরত আলী (রাজিঃ) স্বীয় পিতৃব্য-পুত্র হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ)কে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন; তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) অলিদ-বিন্-ওকবাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন। ওলিদ-বিন্-ওকবা মুফট্ (মুখ-পাতলা) মানুষ ছিল; সে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই

মহা-মাননীয় বনি হাশেম ছা-দাত (সৈয়দ)গণকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। তচ্ছ্রবণে হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং উচ্চৈস্বরে বলিলেন, রে ছফওয়াল (অলিদের উপাধি)! খোলা ময়দানে আসিয়া বনি হাশেমের বীরত্ব স্বচক্ষে একবার দেখ; কিন্তু কাপুরুষ অলিদ ভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইল না। এই দিবস যুদ্ধ খুব ভীষণ ভাবে চলিল, এবং বিপুল শোণিত-পাত হইল। সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ তীব্র তেজে চলিল, এবং সন্ধ্যার সময় উভয় সেনাদল স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

৬ষ্ঠ দিবস সোমবারে হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষ হইতে সয়ীদ-বিন্-কায়স হামদানী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) মহাবীর যোজ কালাহ্‌কে পাঠাইলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিল, সন্ধ্যার সময় উভয় পক্ষের সেনাদল যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া রণক্ষেত্র হইতে স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল, এই দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছিল।

৭ম দিবস মঙ্গলবার হজরত আলী (রাজিঃ) পুনরায় মালেক ওশতরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন, হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে অলিদর-বিন্ সজমা ফহরিকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন, উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল।

৮ম দিবস বুধবারে মোস্‌লেম সূর্য্য এমামুল মোস্‌লেমিন হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু স্বয়ং, আছহবে বদর (যে সকল ছাহবা (রাজিঃ) বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন), মহাজেরিন এবং আনছার বীর পুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীম তেজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আমিরুল মুমেনিনের বিরুদ্ধে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ও সিরীয় (শামীয়) বীর পুরুষদিগকে লইয়া রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোনও দলের জয় পরাজয় নির্ণীত হইল না; সন্ধ্যার সময় উভয় দলের বীর পুরুষগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অদ্যকার যুদ্ধেও উভয় পক্ষে বহু বীর পুরুষ রণ-শয্যায় শায়ীত এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক আহত হইয়াছিল।

৯ম দিবস বৃহস্পতিবারও হজরত আলী (রাজিঃ) পুনরায় স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। ওদিকে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ও সঙ্গে সঙ্গে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অদ্যকার যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ছিল। উভয় পক্ষের বহু মোসলমান হত এবং আহত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও শোচনীয় ঘটনা এই ঘটিল যে, অদ্যকার যুদ্ধে হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষে প্রসিদ্ধ ছাহাবা হজরত এমার-বিন-এয়াছর (রাজিঃ) শহিদ হন। আবু মোয়াভিয়া তাঁহাকে শহিদ করে। ইঁহার বয়ঃক্রম তিরনব্বই কিংবা চুরনব্বই বৎসর হইয়াছিল। আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (রাজীঃ) তাঁহার জানাযার নমাজ পড়াইয়াছিলেন।

হজরত বেলাল (রাজিঃ) তাঁহাকে গোছল দিয়াছিলেন। ঐ রণ-ক্ষেত্রেই তাঁহার দফন কার্য্য সমাধা হয়। ২৭ হিজরীতে এই শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

হজরত এমার-বিন-এয়াছর (রাজিঃ) প্রাথমিক আছহাব-দিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম ছাহাবা ছিলেন। বদরের পবিত্র যুদ্ধেও তিনি শরীক ছিলেন। হজরত রেছালত মাব (সালঃ) ইহার সম্বন্ধে ফরমাইয়াছিলেন,

يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية

অর্থাৎ হে সমিতার পুত্র! তোমাকে এক বিদ্রোহী সম্প্রদায় কতল (হত্যা—শহিদ) করিবে।

এই হাদিস প্রকৃত প্রস্তাবে হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, হজরত আলী (রাজিঃ) হক্ পথে ছিলেন ; হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) অন্যায় পথাবলম্বন পূর্ব্বক বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। যখন হজরত এমার-বিন-এয়াছরের শাহাদৎ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল তখন হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) প্রধান মন্ত্রী হজরত ওমরু-বিন-আল-আছ (রাজিঃ) যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিয়া, হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কে গিয়া বলিলেন, অতঃপর যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ হজরত রসুলোল্লাহ (সালঃ) ফরমাইয়াছিলেন, হজরত এমার (রাজিঃ) কে বিদ্রোহিগণ বধ করিবে। এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে যে, আমরা অন্যায় ভাবে (নাহক্ পথে) যুদ্ধ করিতেছি। কারণ আমাদের দলের লোকেই তাঁহাকে কতল

(হত্যা—শহিদ) করিয়াছে। তচ্ছ্রবণে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, চুপ থাক, আমরা কেন হজরত এমার (রাজিঃ) কে কতল করিতে যাইব ? এমার (রাজিঃ) কে স্বয়ং আলী (রাজিঃ) ও তাঁহার দলের লোকেরা বধ করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছেন। আমরা কেবল মাত্র আত্ম রক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত আছি।

এই সংবাদ যখন হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট পঁহুছিল ; তখন তিনি বলিলেন, যদি মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) এই যুক্তি সত্য হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরত আমীর হামযাঃ (রাজিঃ) কে স্বয়ং রসুলোল্লাহ কতল (হত্যা—শহিদ) করিয়াছিলেন ; কারণ হজরতই আমীর হামযাঃ (রাজিঃ) কে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হজরত সম্বন্ধে এরূপ খেয়াল করা কোফর ও বেদ্দিকতা। হজরত এমার-বিন-এয়াছর (রাজিঃ) এর শাহাদৎ সম্বন্ধে ২টী বিভিন্ন রওয়ায়েত আছে। তন্মধ্যে একটী রওয়ায়েত উপরে বর্ণিত হইয়াছে ; অর্থাৎ আবু মোয়াভিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বয়ান এই যে, হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) তাঁহাকে কতল করিবার জন্য এব্নে আল জওয়ার সকুতিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর এই কার্য্যের জন্য তাহাকে এক থলে দিনার (সুবর্ণ মুদ্রা) প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। অর্থ লোভে সকুতি হজরত এমার-বিন-এয়াছরকে কতল (শহিদ)

করে। আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১ থলি সুবর্ণ মুদ্রা হজরত ওমরু-বিন-আল-আছের দ্বারা তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি মুদ্রার (দিনারের) থলেটী সকুতির হাতে দিয়া বলিলেন, লও এই থলি তোমার পরকালের আযাবের (শাস্তির) সংবাদ জ্ঞাপক। এই কথা শুনিয়া সকুতি দিনারের থলি দূরে ফেলিয়া দিল, এবং হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নিকট গিয়া অভিযোগ করিল। হজরত মোয়াভিয়াও এই কথায় প্রধান মন্ত্রী হজরত ওমরু-বিন-আল-আসের (রাজিঃ) প্রতি এমন বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, ৩ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াছিলেন না।

হজরত এমার রাজি আল্লাহ আনহুর শাহাদতের পর হজরত আলী (রাজিঃ) এর পক্ষীয় মহাবীর সয়ীদ-বিন-কায়স্ হামদানী, কায়স্-বিন সায়াদ-বিন-এবাদাঃ, রাবিয়, আদি-বিন-হাতেমতায়ী (জগদ্বিখ্যাত দাতা ও পরোপকারী হাতেম তায়ীর পুত্র) প্রভৃতি স্ব স্ব দলস্থ যোদ্ধৃ পুরুষগণকে লইয়া মহা উৎসাহ ও উত্তেজনার সঙ্গে—বীরত্ব সহকারে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন; অতঃপর দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। নরশোণিতে যুদ্ধ ক্ষেত্র কর্দ্দমাক্ত হইল। তরবারি খঞ্জর (ছুরিকা বিশেষ) নেজা (বর্শা), তীর, গদা (মুদগর) প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার অস্ত্রের ব্যবহারই চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষে হমস্ ও কন্সারিন বাসী বহু লোক নিহত হইল। শেরে খোদা (আল্লাহতাআলার শার্দ্দূল) আলার হেচ্ছা-

লাত ও চাহালাম (হজরত আলী [রাজিঃ] বীরদর্পে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মোয়াভিয়া ! (রাজিঃ), খোদাতালার সৃষ্ট মনুষ্যগণকে কেন অনর্থক বিনষ্ট করাইতেছ ? যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাহির হইয়া আইস, আমরা উভয়ে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া শেষ মীমাংশা করি। যদি আমি যুদ্ধে তোমাকে হত্যা করিতে পারি, তবে খেলাফৎ আমারই উপর বর্ত্তিবে, আর তুমি যদি আমাকে বধ করিতে পার, তবে খেলাফতের পদ স্থায়ী ভাবে তুমিই লাভ করিবে। হজরত ওমরু-বিন-অল্‌আছ (রাজিঃ), হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে বলিলেন, এই মিমাংসাই উত্তম। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) উত্তর করিলেন, ইহা কিরূপ ভাল মীমাংসা ? তুমি কি জান না, আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে যুদ্ধে কোনও বীর পুরুষ কি নিজের জীবন রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে ? আচ্ছা, তুমিই একবার তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাওনা কেন ? অনেক কথা কাটাকাটির পর মিসর বিজেতা ওমরু-বিন্‌-আল্‌-আছ (রাজিঃ), হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কর্ত্তৃক হজরত আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। শেরে খোদা বিক্রান্ত সিংহের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। হজরত ওমরু-বিন্‌-আল্‌ আছ (রাজিঃ) কম্পিত হৃদয়ে হজরত আলীর (রাজিঃ) সম্মুখীন হইবা মাত্র তিনি স্বীয় "যোলফোক্কার" নামক ভীষণ তরবারি উত্তোলন করিলেন। ওমরু-বিন্‌-

আল্-আস (রাজিঃ) পরিহিত বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে উলঙ্গ হইয়া গেলেন এবং কাতর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আপনার ভ্রাতা একান্ত নিরুপায় হইয়া আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে; বীরত্বের অহঙ্কার করিয়া আইসে নাই। হজরত আলী (রাজিঃ) ওমরু-বিন্-আল্-আছ (রাজিঃ)কে উলঙ্গ দেখিয়া লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; এবং তরবারি নিম্ন-মুখ করিয়া বলিলেন, আচ্ছা তুমি চলিয়া যাও। অত বড় মহাবীর কম্পিত কলেবরে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বীয় শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) ভীষণ ভাবে তরবারি পরিচালন পূর্ব্বক শত্রু সৈন্য বিমথিত ও বিমর্দ্দিত করিলেন, তাঁহার হায়দারী হাঁক শুনিয়া তদীয় সৈন্য ও সেনাপতিগণ:মহাবিক্রম সহকারে সিরীয় সেনাদলকে নিপাত করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, এই দিনের যুদ্ধে শেরে-খোদা হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্তেই ৫২৩ জন সিরীয় সৈন্য নিহত হইয়াছিল। তাঁহার হস্তে নিহত যোদ্ধৃ-পুরুষ দিগের সংখ্যা এইরূপে গণনা করা হইয়াছিল যে, হজরত আলী প্রত্যেক বীর-পুরুষকে কতল (নিহত) করিবার সময় অতি উচ্চস্বরে তকবির ধ্বনি করিতেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক মক্‌তুলিন (নিহত) যোদ্ধৃ পুরুষের সংখ্যা নয়শতের উপর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দিবসের যুদ্ধের ভীষণ অবস্থা এবং স্বীয় পরাজয় অনিবার্য্য মনে করিয়া হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) সন্ধি স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া সন্ধি সম্বন্ধে চিঠি পত্র লেখা-লিখি করিতে লাগিলেন। "বারাঃ এমাম" গ্রন্থের বর্ণনা এস্থলে পরিত্যাগ করিয়া আমরা আবার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মওলানা আকবর শাহ নজিরাবাদী প্রণীত "তারিখ এস্‌লাম" অবলম্বনে যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

সফিনের প্রথম যুদ্ধ একমাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। উভয় পক্ষের যোদ্ধৃ পুরুষগণই ভাবী ভীষণ যুদ্ধের জন্য যেন যুদ্ধের অভিনয় করিতে তালিম পাইতেছিল। এই একমাস কাল স্থায়ী যুদ্ধকে সফিন যুদ্ধের প্রথমাংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জেলহজ্জ মাস শেষ হইয়া যখন মোহারম মাস আরম্ভ হইল, ১লা মোহররম ৩৭ হিজরী, সেই দিন হইতে ঐ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত এক মাসের জন্য যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করা হইল। এই এক মাস কাল উভয় পক্ষের সেনাদল নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিল। এই অবসরে সন্ধির কথাবার্ত্তাও ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। এস্থলে একথাও স্মরণ রাখার উপযুক্ত যে, মোহররমের এই একমাস কাল উভয় মোসলমান সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন ভাবে বিনাযুদ্ধ হাঙ্গামায় স্ব স্ব শিবিরে শান্তির সহিত অবস্থান করাতে এই খেয়াল আপনা হইতে মনে উদয় হয় যে, যুদ্ধাপেক্ষা শোলেহ্ (সন্ধি) উৎকৃষ্ট, আর মোসলমান-দিগকে কোনও ক্রমেই আপসে যুদ্ধ করা উচিৎ নহে। যখন সমুদয় সেনাদলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়, তখন সৈন্যগণের সরদার বা সেনাপতিগণের মনও সন্ধির দিকে আকৃষ্ট হয়;

অর্থাৎ তাঁহারাও সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে যদিও এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়া ছিল ; কিন্তু ইস্‌লামের ধ্বংসকারী সাবায়ী দলের পক্ষে যুদ্ধের বিরতি অসহ্য হইয়া পড়িল। উভয় পক্ষীয় সেনাদলের যুদ্ধের উৎসাহ ও উত্তেজনা হ্রাস প্রাপ্ত হইল, তাহাদের কুমৎলব ও মন্দ উদ্দেশ্য ত কিছুতেই সফল হয় না, এই যুদ্ধ নিবৃত্তির অবস্থায় তাহারা পুনরায় অতি শীঘ্র শীঘ্র যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতে লাগিল। যদিও এই সাবায়ী দলের স্বতন্ত্র কোনও অস্থিত্ব ছিলনা। হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদলেই তাহারা পরছায়ার স্থায় মিশিয়া ছিল। কিন্তু গুপ্তচর রূপে উভয় সেনা-দলে প্রবেশ করিয়া, লোকদিগকে প্রতিপক্ষের প্রতি জিঘাংসা-পরায়ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যাহাতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, 'হামদর্দ্দী,' সহানুভূতি জন্মিতে না পারে, সে পক্ষে সাবায়ীদিগের চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। সেনাদলের সরদার অর্থাৎ নেতা-দিগের অবস্থা এই ছিল যে, হজরত আলী (রাজিঃ) খেলাফতের দাওয়া কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতে ছিলেন না। কারণ, তাঁহার সম্মুখে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) দাওয়া নিতান্ত দুর্ব্বল। তিনি হজরতের প্রধান সাহাবা চতুষ্ঠয়ের অন্যতম, হজরতের পিতৃব্য পুত্র ও জামাতা, আবার আশরায় মোবাশ্বারাদের মধ্যে তখন কেহই জীবিত ছিলেন না। দিনদারী পরহেজগারী ও বিদ্যার দিক্ দিয়া দেখিলেও তাঁহার দাবী অগ্রগণ্য ছিল। এলমে মারেফাতের তিনি দরিয়া (সমুদ্র)

ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে "বিশ্বাসী গণের নেতা" বলা হইত। আবার তিনি হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আনহুর হত্যাকারিগণকেও দণ্ডিত করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ মালেক ওশ্‌তরের ন্যায় মহাবীর ও প্রধান সেনাপতি, মোহাম্মদ-বিন্‌-আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) এর ন্যায় একজন প্রধান গবর্ণর (মিসরের শাসনকর্ত্তা) হজরত এমার-বিন্‌-এয়াসরের (রাজিঃ) ন্যায় একজন প্রধান সাহাবাকে দণ্ড দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। আবার সমুদয় কুফি ও মিসরীয় সেনাদলকে বিদ্রোহী করিয়া লওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তদ্ব্যতীত হত্যাকারী এবং তাহাদের সাহায্যকারীদিগের বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল, তদ্দ্বারা নিশ্চয়রূপে তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। উহা সন্দেহের 'দরজা' হইতে নিশ্চয়তার 'দরজায়' পঁহুছিয়া ছিল না। প্রকৃত হত্যাকারীদিগের 'শেনাক্‌ত' ঠিকরূপে কেহ করিতে পারেন নাই। সুতরাং এরূপ সন্দেহের ক্ষেত্রে কাহাকেও শরিয়তের বিধানানুযায়ী শাস্তি দেওয়াও যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে আমির মোয়াভিয়া (রাজিঃ) আপনাকে মক্কার রয়ীস (প্রধান নাগরিক), জঙ্গে ওহদাদি যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি, হজরত আবুসুফিয়ানের (রাজিঃ) পুত্র, হজরতের এক স্ত্রীর (ওম্মোল মুমেনিন হজরত ওম্মে হাবিবার) ভ্রাতা, এবং ওহি লেখক কাতেব বলিয়াও তাঁহার উচ্চ সম্মান ছিল। পক্ষান্তরে হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আন্‌হুর জ্ঞাতি

ভ্রাতা, এবং সঙ্গত ওয়ারেস্ (উত্তরাধিকারী) বলিয়াও তাঁহার একটা দাবী ছিল; সুতরাং তিনি আপনাকে খেলাফতের প্রকৃত হক্‌দার বলিয়া মনে করিতেন। এতবড় একটা হত্যাকাণ্ডের (মহামান্য খলিফাকে শহিদ করিবার) ব্যাপারটাকে সন্দেহ জনক ঘটনা বলিয়া উপেক্ষা করা, এ বিষয়ে কাহাকেও হত্যার অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত না করা, তিনি বড় একটা অপরাধ বলিয়া প্রকাশ করিতেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) খেলাফতের দাবী তাঁহার বিবেচনায় আসিত না তিনি তাহা বুঝিতে ইচ্ছা করিতেন। হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়রের (রাজিঃ) খরুজ অর্থাৎ হজরত আলীর (রাজিঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, আর মদীনা তৈয়বার কতিপয় বড় বড় সাহাবার (রাজিঃ) হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্তে বায়েত না করা, এবং হজরত ওমরু-বিন্-আল্ আছ (রাজিঃ) প্রমুখ কতিপয় সাহাবার (রাজিঃ) সাহায্য লাভ করা তাঁহার খেলাফৎ লাভের সঙ্কল্প আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিল। উভয় প্রতিপক্ষ নিজ নিজ কথা ও সঙ্কল্পের উপর ন্যায় সঙ্গত ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপের এবং আপনাদের খাহেশ ও এরাদার ফেরেব হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারিতেন—যদি তাঁহাদের সঙ্গীয় পরিষদ মণ্ডলী ও সেনানায়কগণ ঠিক পন্থাবলম্বনের জন্য তাঁহাদিগকে মজ্‌বুর (বাধ্য) করিতেন। আর এই রূপ উপায় অবলম্বনের পক্ষে এই যুদ্ধ বিরাম বা সংগ্রাম বিরতির সময়টা বড়ই সুবিধা জনক ছিল। কিন্তু ইস্‌লামের মূলোৎপাটনাকাঙ্খী দুরাচার সাবায়ী দল অতি সতর্কতার সহিত আপনাদের

অভিষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কার রাখিতে ছিল। তাহারা অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে উভয় সেনাদলে বিচরণ করিয়া, পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ভাব প্রচার করিতেছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেও বিশেষ বিলম্ব ঘটিল না। এই দুরাত্মাদিগের প্রচেষ্টায় সন্ধি স্থাপনের যে টুকু আশা ছিল, তাহাও ঘোর নৈরাশ্যে পরিণত হইল।

যুদ্ধের বিরাম কালে সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধে দ্বিতীয় বার প্রচেষ্টা। —যুদ্ধ বন্ধ করিবার পরে ৩৭ হিজরীর মোহররম মাসের কোনও এক তারিখে হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু এক ছেফারত (দৌত্য অর্থাৎ দূতদল) হজরত আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) সমীপে প্রেরণ করিলেন। উদ্দেশ্য—পুনরায় ছোলেহ্ অর্থাৎ সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতে থাকুক। এই দূতদলে আদি-বিন্-হাতেম (রাজিঃ), যয়েদ বিন্-কায়স্ (রাজিঃ), যেয়াদ-ইব্‌নে-হাস্‌ফাঃ (রাজিঃ), শবস্-বিন্-রবয়ী (রাজিঃ) এই চারিজন বোজর্গ সাহাবা ছিলেন। শবস্-বিন্-রবয়ী (রাজিঃ) পূর্ব্ববারেও দৌত্য কার্য্যে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নিকট গমন করিয়াছিলেন; এবং হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এর সঙ্গে ইঁহার কটু কাটব্য কথাও হইয়াছিল। সুতরাং এবার তাঁহার দূতদলে যোগদান করা যে আশঙ্কা-জনক ছিল, তাহা মনে করা যাইতে পারে। এই দূত দল হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কে, আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহুর খেলাফৎ স্বীকার করিতে এবং তাঁহার হস্তে বায়েত করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে,

আপনি যদি বায়েত করেন, তবে মোসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর এত্তেফাক (একতা) সংস্থাপিত হইবে। আপনি এবং আপনার বন্ধুগণ ব্যতীত আর কেহই বায়েত করিতে অস্বীকৃত নহেন। যদি আপনি শত্রুতাচরণে নিবৃত্ত না হন, তবে হয়ত ঐ ঘটনার পুনরভিনয় হইবে, যাহা আসহাবে জমলের পক্ষে (অর্থাৎ জমল যুদ্ধকারীদের পক্ষে) ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, হে আদি. আপনারা ছোলেই (সন্ধি) করিতে আসিয়াছেন না ঝগড়া করিতে ? আপনারা আমাকে আছহাবে জমলের ব্যাপার স্মরণ করাইয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন ? আপনারা কি জানেন না যে, আমি হরবের (হজরত মোয়াভিয়ার [রাজিঃ] এক জন পূর্ব্বপুরুষ আর "হরব্" অর্থই যুদ্ধ) পৌত্র ? আমি যুদ্ধের জন্য একটুও ভীত নহি। আমি বেশ জানি, আপনারাও হজরত ওস্মানের (রাজিঃ) হত্যাকারী দলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহতালা আপনাদিগকেও কতল (হত্যা) করাইবেন। তচ্ছ্রবণে এযিদ-বিন্-কায়স (রাজিঃ) বলিলেন ; আমরা দূত-রূপে আসিয়াছি, আমাদের কর্ত্তব্য নহে যে আপনাকে উপদেশ দান করি। কিন্তু আমাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে যে, যাহাতে মোসলমানদিগের মধ্যে একতা স্থাপিত হয় ; এবং অনৈক্য দূর হইয়া যায়। এই কথা বলিয়াই তিনি হজরত আলীর (রাজিঃ) ফজিলত (ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধে প্রশংসা বাদ) এবং খেলাফৎ সম্বন্ধে তাঁহার দাবী যে অগ্রগণ্য তাহা অতি

সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিলেন। তদুত্তরে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, আপনারা আমাকে জমায়াতের কথা কি বলিতেছেন? আমার সঙ্গেও জমায়াত (মোসলমানের দল) আছে; আমি আপনাদের বন্ধুকে (হজরত আলী [রাজিঃ] কে) খেলাফতের হক্‌দার বলিয়া স্বীকার করি না। কারণ তিনি আমাদের খলিফাকে হত্যা করিয়াছেন; তাঁহার হত্যাকারী-দিগকে পানাহ্‌ (আশ্রয়) দিয়াছেন। সোলেহ (সন্ধি) ত ঐ সময় হইতে পারে, যখন তিনি হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকারীদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করেন। হজরত মোয়া-ভিয়া (রাজিঃ) এই পর্য্যন্ত বলিবার পরই শবত্‌-বিন্‌-রবয়ী (রাজিঃ) বলিয়া উঠিলেন, আপনি কি এমার-বিন্‌-এয়াছর (রাজিঃ)কেও কতল হত্যা করিবেন? হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) উত্তরে বলিলেন, আমাকে এমার (রাজিঃ) কে কতল করিতে কি সে বাধা দিতে পারে? আমিত তাহাকে হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) গোলামের (ক্রীতদাসের) হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যা করিব। শবত-বিন্‌-রবয়ী (রাজিঃ) তচ্ছ্রবণে বলিলেন, যে পর্য্যন্ত যমিন (পৃথিবী) আপনার পক্ষে তঙ্গ (সঙ্কীর্ণ) হইবে, সে পর্য্যন্ত আপনি তাঁহাকে (হজরত এমার-বিন্‌-এয়াছর) [রাজিঃ] হত্যা করিতে পারিবেন না। তচ্ছ্রবণে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, তৎপূর্ব্বেই পৃথিবী আপনার পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইবে। ঈদৃশ কঠোর ও তীব্র বাক্যালাপের পর এই দূতদল ও বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পর হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) হবিব-বিন্-মোস্‌লেমাহ্, শরজিল-বিন্-আসমত, ময়ন-বিন্-জয়দকে হজরত আলীর (রাজিঃ) সমীপে দূত রূপে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা হজরত আলীর (রাজিঃ) দরবারে উপস্থিত হইলেন ; এবং প্রথমেই হবিব-বিন্-মোস্‌লেমাহ হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুকে বলিলেন, হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) খলিফা বরহক ছিলেন ; এবং তিনি কেতাব (কোরআন শরীফ) ও সোন্নতানুযায়ী 'হুকুম-আহকাম' জারী করিতেন (আদেশ দিতেন) ; তাঁহার জীবিত থাকা আপনার পক্ষে নাগাওয়ার (অসহ্য) বোধ হইয়াছিল, এজন্য আপনি তাঁহার হত্যা সাধন করিলেন। যদি আপনি তাঁহাকে হত্যা না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার হত্যাকারীদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন ; তৎপর খেলাফৎ হইতে 'দস্ত্‌বরদার' হউন, (পদত্যাগ করুন), ইহার পর মোসলমানগণ স্বাধীন ভাবে আপনাদের খলিফা নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। এই অন্যায় ও অসঙ্গত কথা শুনিয়া হজরত আলী (রাজিঃ) নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন।

তিনি বলিলেন, তুমি চুপ থাক ; এমারত্ (ছোলতানৎ) ও খেলাফৎ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার তোমার অধিকার নাই। তদুত্তরে হবিব-বিন্-মোস্‌লেমাঃ বলিলেন, আপনি আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া লইবেন, যাহা আপনার পক্ষে বিরক্তি-জনক বোধ হইবে। তাহার কথার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমরা তরবারির সাহায্যে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইব। তচ্ছ্রবণে

হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, যাও, তোমরা যাহা করিতে পার তাহা অবাধে কর। এই কথা বলিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, এবং হামদ্ ও ছানা (খোদাতালার প্রশংসা ও হজরতের গুণকীর্ত্তন) করিয়া হজরত রেসালত মাবের মবউছ (আল্লাহতালা কর্ত্তৃক তাঁহার প্রেরণ) হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিলেন। তৎপর খেলাফৎ শেয়খিনের (১ম ও ২য় খলিফার) নাম উল্লেখ এবং তাঁহাদের উন্নত স্বভাব চরিত্র ও আদর্শ কার্য্য-কলাপের উল্লেখ করিয়া ফরমাইলেন, আমি তাঁহারে কর্ত্তব্য কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে দেখিয়াছি; একজন্য আমি হজরতের অতি নিকট আত্মীয় হওয়া স্বত্বেও, তাঁহাদের খেলাফতে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই। একথার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা অতি ন্যায়সঙ্গত ভাবে ঠিক হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) পদানুসরণ পূর্ব্বক খেলাফৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। পরে বলিলেন, প্রথমোক্ত দুই খলিফার পরে লোকেরা হজরত ওস্মান (রাজিঃ) কে খলিফা নির্ব্বাচন করিলেন; কিন্তু তাঁহার কার্য্য-কলাপ এমন ছিল যে, বহু লোক তাঁহার প্রতি নারাজ (বিরক্ত) হইল। আর সেই সকল লোকেরা তাঁহাকে কতল (হত্যা—শহিদ) করিয়া ফেলিল। তৎপর লোকেরা আমার হস্তে বায়েত হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইল; আমিও তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। বায়েতের পর তাল্হা (রাজিঃ) ও যোবায়ের (রাজিঃ) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন; এবং মোয়াভিয়া (রাজিঃ) আমার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি

আমার ন্যায় প্রাথমিক সময়ের মোসলমান (প্রথমে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বনকারী) নহেন, তিনি বহু পরবর্ত্তী সময়ে ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছেন; আমার বড়ই আশ্চার্য্য বোধ হইতেছে যে, তোমরা কিরূপে তাঁহার বশীভূত হইয়া গিয়াছ। ফলতঃ আমি কেতাব; সোন্নত ও উহার দিনের দিকে মোসলমানদিগকে আহ্বান করিতেছি। আমি হক্ জারী ও অন্যায়কে বাতেল করিতে প্রয়াস পাইতেছি। তচ্ছ্রবণে শরজিল-বিন্‌-আস্‌মতাঃ বলিলেন, আপনি কি একথার শাহাদৎ দিতেছেন না যে, হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) মজলুম (অত্যাচারের সহিত) শহিদ হইয়াছেন? তদুত্তরে হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, আমি হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)কে না 'মজলুম' মনে করি না; 'জালেম'। এই কথা শুনিয়া হজরত মোয়াভিয়ার প্রেরিত দূতত্রয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন; যিনি হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) কে মজলুম (উৎপীড়িত) না বলেন, আমরা তাঁহার উপর বেজার (বিরক্ত); এই বলিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) স্বীয় বন্ধুদিগকে বলিলেন, ইহাদিগকে উপদেশ দান করা এবং না করা সমান; ইহাদের উপর তাহাতে কোনও ক্রিয়া হইবে না। ইহার পরে উভয় পক্ষে সন্ধি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনও কথা-বার্ত্তা হয় নাই।

সফিন যুদ্ধের এক সপ্তাহ—

মোহররম মাসের (৩৭ হিজরী) শেষ তারিখে হজরত আলী (রাজিঃ) স্বীয় সেনাদলের প্রতি এই আদেশ জারী করিলেন যে,

আগামী কল্য—১লা সফর উভয় দলে ফয়সলা কুন্ (শেষ মীমাংসা-সূচক) যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, শত্রুগণ যখন তোমাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে, তখন আর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে না; এবং তাহাদিগকে হত্যা করিবে না। আহত যোদ্ধাদিগের জিনিষ-পত্র কাড়িয়া লইবে না; নিহত লোকদিগের নাক কাণ কাটিবে না। স্ত্রীলোকেরা যদি গালিও দেয়, উহাদের প্রতি কোনওরূপ অত্যাচার করিবে না। এইরূপ আদেশ হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ও স্বীয় সেনাদলের প্রতি জারী করিলেন। পূর্ব্ব নির্দ্ধারণানুসারে ১লা সফর তারিখে এই ভীষণযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ দিন মহাবীর মালেক ওশ্‌তরের পরিচালনাধীনে কুফার যোদ্ধৃ পুরুষগণ, আর হবিব-বিন্-মোস্‌লেমার সেনাপতিত্বে শামবাসিগণ (সিরীয় সেনাদল) পরস্পরের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল; প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমান তেজে যুদ্ধ চলিল; কিন্তু কোনও পক্ষেরই জয়-পরাজয় নির্ণীত হইল না। সন্ধ্যার সময় উভয় দলের সৈন্য ও সেনানীগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় দিন হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষ হইতে হাশেম-বিন্-ওত্ত'বা অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন; হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষ হইতে আবু আলাওর সলমি সেনাপতি পদে বরিত হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগমন করিলেন; অসংখ্য মোসলমান

যুদ্ধে হত এবং আহত হইয়া যুদ্ধের ভীষণতা প্রতিপন্ন করিল। এ দিনের যুদ্ধেও কোনও পক্ষের জয়-পরাজয় নির্নীত হইল না।

তৃতীয় দিবস হজরত আলী (রাজিঃ) এর পক্ষ হইতে প্রসিদ্ধ ছাহাবা হজরত এমার-বিন্-এয়াছের (রাজিঃ) বিপুল বাহিনী লইয়া রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন; হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষ হইতে মিসর-বিজয়ী মহাবীর হজরত ওমরু-বিন্-অল্ আছ (রাজিঃ) সেনাপতি পদে বরিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। অদ্যকার যুদ্ধ পূর্ব্বকার দুই দিনের যুদ্ধ অপেক্ষাও ভীষণতর ছিল। উভয় দলে বহু সৈন্য হত এবং আহত হইল। হজরত এমার-বিন্-এয়াছের (রাজিঃ) সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে এমন ভীষণ ভাবে শত্রু দলকে আক্রমণ করিলেন যে, হজরত ওমরু-বিন্-আল্ আছ (রাজিঃ) কে কিয়ৎ পরিমাণে পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইল। কিন্তু কার্য্যতঃ কোনও পক্ষের জয়-পরাজয় নির্নীত হইল না। রাত্রি সমাগত হইলে উভয় সেনাদল স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অদ্যকার যুদ্ধেও উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হত এবং আহত হইল।

চতুর্থ দিবস হজরত মোয়াভিয়ার পক্ষ হইতে ওবায়দুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) ও হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহুর পক্ষ হইতে তদীয় বীর পুত্র মোহাম্মদ-বিন্-আল্ হানিফা সেনাপতি রূপে সসৈন্যে রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন; ঐ দিবসও তুমুল যুদ্ধ হইল; তখন ওবায়দুল্লা-বিন্-ওমর

(রাজিঃ) মোহাম্মদ-বিন্-হানিফাকে সেনাদল হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করিলেন। মোহাম্মদ বিন্-হানিফা তচ্ছ্রবণে বারমদে মত্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হজরত আলী (রাজিঃ) অশ্ব ধাবিত করিয়া দ্রুতগতি তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং মোহাম্মদ-বিন্-আল্ হানিফাকে ফিরাইয়া আনিলেন; তৎপর ওবায়দুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) ও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শামী (সিরীয়) সেনাদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৫ম দিবসে হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষ হইতে হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) বিপুল বাহিনী সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন; আর হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষ হইতে অলিদ-বিন্-ওক্বাঃ সসৈন্যে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সেদিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিল।

৬ষ্ঠ দিন হজরত আমিরুল মুমেনিনের (রাজিঃ) পক্ষ হইতে পুনরায় মহাবীর মালেক ওশ্তর সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন; শামী সেনাদল হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে হবিব-বিন্-মোস্লেমার যুদ্ধক্ষেত্রে ২য় বার অবতীর্ণ হইলেন। এই দিবসও উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ ও ভীষণ রূপ শোণিতপাত হইল; কিন্তু কোনও দলের জয়-পরাজয় নির্ণীত হইল না।

সপ্তম দিবসে হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত মোয়াভিয়া

(রাজিঃ) স্বয়ং সেনাপতি রূপে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। এই দিবস পূর্ব্বতন যুদ্ধ সমূহ হইতে ভীষণ যুদ্ধ সমারব্ধ হইল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পূর্ণোৎসাহে যুদ্ধ চলিল; উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হত এবং আহত হইল, কিন্তু কোনও পক্ষের জয় পরাজয় নির্ণীত হইল না।

এই সাত দিনের যুদ্ধে প্রত্যহ উভয় পক্ষ হইতে নূতন নূতন সেনাপতি রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; উভয় দলের সৈন্য সংখ্যা ৯০ এবং ৮০ হাজার ছিল। অর্থাৎ হজরত আলীর (রাজিঃ) সৈন্য সংখ্যা ৯০ হাজার এবং হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সৈন্য সংখ্যা ৮০ হাজার। এই সপ্ত দিবসের যুদ্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, উভয় সৈন্য এবং সেনাপতিগণ বীরত্ব এবং শৌর্য্য-বীর্য্যে সমতুল্য ছিলেন। উভয় পক্ষের সৈন্য এবং সেনাপতিদিগের বীর্য্য-বত্তা ও রণদক্ষতা সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে বোধ হইবে যে, কোনও পক্ষই কোনও পক্ষ হইতে প্রবল বা দুর্ব্বল নহে। কিন্তু এই সপ্ত দিবসীয় যুদ্ধে একথা প্রতিপন্ন হইল যে, উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের ইচ্ছা এবং সমরোৎসাহ পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। অবশ্য এই সপ্তাহটী মোসলমান জাতির পক্ষে অত্যন্ত মনহুছ-(অশুভকর) ছিল। কারণ মোসলমানদিগের তরবারি মোসলমানদিগের মস্তক ছেদনে ও হত্যা সাধনে প্রযুক্ত হইয়াছিল; মোস্‌লেম শত্রুগণ (বিধর্ম্মিগণ) নিবিষ্ট মনে এই আত্ম-কলহ জনিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের তামাসা দেখিতে ছিল। কিন্তু এই

সপ্তাহ অপেক্ষা আরও দুটী অশুভ জনক মারাত্মক দিন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল।

একথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, মিশরে কয়েস-বিন্-সায়াদ (রাজিঃ) কিংবা ঐরূপ কোনও উপযুক্ত প্রবীণ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিতে, এবং তিনি যদি একদল প্রবল মিসরীয় সৈন্য সহকারে হজরত মোয়াবিয়া (রাজিঃ) কে পশ্চাদ্দিক্ হইতে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতেন, কিংবা রাজধানী দামেস্কই আক্রমণ করিয়া বসিতেন, তবে অতি সহজেই যুদ্ধের অবসান হইত; এবং হজরত আলী (রাজিঃ) নিশ্চয়ই জয় লাভের অধিকারী হইতেন। কিন্তু মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকরের (রাজিঃ) ন্যায় তরুণ বয়স্ক অপরিণামদর্শী চঞ্চল মতি যুবক শাসনকর্ত্তার নিকট তাহা হইবার আশা ছিল না; তিনি পূর্ব্ব হইতেই একদল প্রবল মিসরবাসীকে বিগড়াইয়া লইয়া ছিলেন।

সফিন যুদ্ধের শেষ দুই দিন—

পূর্ণ এক সপ্তাহের কঠিন বল বিক্রম পরীক্ষার পর ৩৭ হিজরীর ৮ই সফর বৃহস্পতিবার দিবস উভয় সেনাদল শেষ এবং ফয়সলাকুন্ (শেষ মীমাংসা-সূচক) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। বুধবার এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যবর্ত্তী রাত্রিকালে উভয় সৈন্যদল

যুদ্ধের সাজ-সজ্জায় প্রবৃত্ত ছিল। বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজের সময় (ফজরের নামাজ পড়িয়া) হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু স্বীয় বিশাল সেনাদল লইয়া শামী (সিরিয়) সেনাদলকে অতি ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণ কালে তিনি স্বীয় সেনাদলের মধ্যভাগে (কলবে লশকার) ছিলেন। এইস্থলে বস্রা ও কুফার সম্ভ্রান্ত দলপতিগণ, মদীনা বাসীগণ—যাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ আনছার ও কিয়ৎ পরিমাণে বনু খযায়্যা ও বনুকেনানাঃ সম্প্রদায়ের বীর পুরুষ বিরাজ করিতেছিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) এই বিশাল সেনাদলের দক্ষিণ ভাগের সেনাপতি পদে আবদুল্লা-বিন্-বদিল-বিন্ ওরকা খযায়ীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাম ভাগের সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)কে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যোদ্ধৃ পুরুষদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ছিলেন। আবার প্রত্যেক কবিলার (সম্প্রদায় বা দলের) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঝাণ্ডা (যুদ্ধ পতাকা বা নিশান) ছিল। হজরত এমার বিন্ এয়াছর (রাজিঃ) আজ রজয্ খানি (যুদ্ধের উৎসাহ বর্দ্ধক কবিতা পাঠক) এবং কারীদিগের সুবন্দোবস্ত ও সুশৃঙ্খলা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। কয়েস্-বিন্-সায়াদ (রাজিঃ) এবং আবদুল্লা-বিন্-এবিয়ও রজয্ খান (যুদ্ধের উৎসাহ-বর্দ্ধক কবিতা পাঠক) দিগের পরিচালক পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

ওদিকে হজরত মোওয়াভিয়া (রাজিঃ) স্বীয় শিবিরে বসিয়া লোকদিগের নিকট মৃত্যু সম্বন্ধে বায়েত লইয়া ছিলেন। অর্থাৎ

তাহারা যুদ্ধে জীবন দান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিল। হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সেনাদলে হবিব-বিন্-মোস্লেমাঃ বামদিকের এবং ওবয়েদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) দক্ষিণ দিকের সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন। হজরত আলী রাজিঃ আল্লাহ আনহুর ডানদিকের সেনাদল আবদুল্লাহ্-বিন্-বদিল খাযায়ীর পরিচালনাধীনে, আমীর হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) বাম বাহু অর্থাৎ হবিব-বিন্-মোস্লেমা কর্ত্তৃক পরিচালিত সেনা-দলকে ভীষণ তেজে আক্রমণ করিল। যদিও এই আক্রমণ অতি ভীষণ ও ক্ষতিজনক ছিল, কিন্তু পরিশেষে ইহার ফল শামী (সিরীয়) দিগের পক্ষে অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। হবিব-বিন্-মোস্লেমার রেকাবী নিকটবর্ত্তী বা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সেনাদলকে আবদুল্লা-বিন্-বদিল দাবাইতে দাবাইতে (পশ্চাতে হটাইতে হটাইতে) ঐ স্থানে গিয়া পঁহুছিলেন, যে স্থানে বসিয়া হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) তাঁহার সৈন্য সেনাপতি দিগকে মৃত্যুর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) প্রতি পক্ষের ভীষণ আক্রমণ দর্শনে, সেই মৃত্যুর জন্য পণকারী সৈন্য-দিগকে শত্রু পক্ষের উপর ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সেই জীবনোৎসর্গ কার্য্যে প্রতিশ্রুত শামী সেনাদল আবদুল্লা-বিন্-বদিল কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্য দলকে এমন ভীষণ তেজে আক্রমণ করিল যে, মাত্র ২৫০ আড়াই শত সৈন্য তাঁহার সঙ্গে রহিয়া গেল, অবশিষ্ট সমস্ত এরাকী সৈন্য পশ্চাতে সরিয়া এবং পলায়ন করিয়া ঐ স্থানে গিয়া পঁহুছিল, যে স্থানে

হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু দণ্ডায়মান ছিলেন। স্বীয় সেনাদলের বাম বাহুর ঈদৃশ দুর্দ্দশা দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ সহিল-বিন্-হানিফকে মদীনাবাসী যোদ্ধৃ পুরুষদিগের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করিয়া আবদুল্লা-বিন্-বদিলের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শামী (সিরিয়) সেনাদল এই নব নিয়োজিত সেনাপতিকে আবদুল্লা-বিন্-বদিলের নিকট পঁহুছিতে (অগ্রসর হইতে) দিল না। সুতরাং মহাবীর আবদুল্লা-বিন্-বদিল সেই অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে সমরশায়ী (শহীদ) হইলেন। এদিকে স্বীয় দক্ষিণ বাহুস্থ সেনাদলের ভীষণ পরাজয়ে হজরত আলী (রাজিঃ) তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে ছিলেন। সেই সময়ই তাঁহার বিশাল সেনাদলের বামবাহুও শামী সৈন্যদলের ভীষণ আক্রমণে পরাজিত পশ্চাৎপদ হইল। ঐদিকে রবিয় বংশীয় লোক-রাই কেবল মাত্র অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মহামান্য খলিফার গৌরব রক্ষা করিতেছিল, অন্যান্য সেনাদল পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। স্বীয় বাম বাহুর সেনাদলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজাহু স্বীয় তিন পুত্র এমাম হাসান (রাজিঃ) এমাম হোসায়েন (রাজিঃ) এবং মোহাম্মদ বিন্ হানিফাকে ঐদিকে রওয়ানা করিলেন; উদ্দেশ্য, রবীয় সম্প্রদায়ও যেন পলায়ন করিতে বাধ্য না হয়। আর মহাবীর মালেক ওশ্‌তরকে বলিলেন, তুমি দক্ষিণ বাহুর পলায়নপর সৈন্যদিগকে যাইয়া বল, তোমরা ঐ মৃত্যু হইতে কোথায় পলায়ন করিতেছ—যে মৃত্যুকে তোমরা জীবিত থাকা অবস্থায় প্রতিরোধ করিতে না পারিবে। মালেক

ওশ্‌তর তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে দ্রুত ধাবিত হইয়া, দক্ষিণ বাহুর পলায়নপর সৈন্যদিগকে হজরত আলীর (রাজিঃ) ঐ পয়গাম (বাণী) উচ্চৈস্বরে শুনাইয়া দিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে শায়রত (লজ্জা)-জনক কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে স্বীয় নেতৃত্বাধীনে গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবিক্রমে শামী সেনাদলের সম্মুখীন হইলেন। ওদিকে হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু স্বীয় বাম বাহুর অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য স্বয়ং সেই দিকে মনোনিবেশ করিলেন। রবীয় সম্প্রদায়ের বীর যোদ্ধ, পুরুষগণ যখন দেখিতে পাইল যে, স্বয়ং আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (রাজিঃ) আমাদের সঙ্গী হইয়া শত্রু দলের বিরুদ্ধে তরবারি পরিচালনা করিতেছেন, তখন তাহাদের সাহস ও উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। হজরত আলী (রাজিঃ)কে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিয়া হজরত আবু সুফিয়ানের (রাজিঃ) আহ্‌মর নামক গোলাম (ক্রীতদাস) তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য দ্রুত বেগে অগ্রসর হইল; তদ্দর্শনে হজরত আলীর (রাজিঃ) ক্রীতদাস কিছান অগ্রসর হইয়া উহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের মধ্যে তরবারির যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে আহ্‌মরের হস্তে কিছান নিহত হইল। হজরত আলী (রাজিঃ) স্বীয় প্রিয় দাসকে মকতুল (নিহত) হইতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট ভাবে আহমরকে ভীম পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিলেন, এবং কঠোর উত্তেজনার প্রভাবে শূন্যে তুলিয়া এমন জোরে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন (আছাড় দিলেন)

যে, উহার দুই খানি হস্তই ভাঙ্গিয়া গেল। শামী সেনাদল হজরত আলী (রাজিঃ)কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে ভীম বেগে আক্রমণ করিল। কিন্তু রবীয় সম্প্রদায়ের বিক্রান্ত যোদ্ধৃপুরুষ গণ বিরাট পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের সেই ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিল; এবং উহাদিগকে হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট পর্য্যন্ত পঁহুছিতে দিলনা। বীরেন্দ্র কেশরী মালেক ওশ্‌তরও এই সময় মধ্যে দক্ষিণ বাহুর অবস্থা শামলাইয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে উভয় দলের যোদ্ধৃ পুরুষ-গণ যুদ্ধক্ষেত্রে জমিয়া পরস্পরের প্রতি তরবারি চালাইতে লাগিল। আছরের নামাজের সময় পর্য্যন্ত উভয় দলে খুব ঘনঘটায় তরবারির যুদ্ধ চলিল।

প্রায় আছরের নামাজের সময় মহাবীর মালেক ওশ্‌তর আমীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) বাম বাহুর সেনা দলকে ভীষণ আক্রমণে পশ্চাতে হঠাইয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) রেকাবী—অর্থাৎ সন্নিকটস্থ (চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী) সৈন্যদল যাহারা ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল—পলায়নপর বাম বাহুর সেনাদলকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিল; এবং হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুর দক্ষিণ বাহু ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দিল। হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষ হইতে আবদুল্লা-বিন্-হছিন—যিনি হজরত এমার বিন্-এয়াছরের (রাজিঃ) সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিলেন; যুদ্ধের

উৎসাহ-ব্যঞ্জক ও উত্তেজনা-সূচক জ্বালাময়ী কবিতা পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন; বিপক্ষ দল হইতে ওকবাঃ-বিন্-হুজিয়াঃ নমিরি নামক যোদ্ধৃপুরুষ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল; কিন্তু যুদ্ধে ওকবা নিহত হইলে শামী (সিরীয়) পক্ষ হইতে অতি ভীষণ ভাবে আক্রমণ করা হইল। এই যুদ্ধে এরাকী সেনাদলের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা স্বীয় অধ্যুষিত স্থানে পর্ব্বতের ন্যায় অটল রহিল। হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহু স্বীয় সেনাদলের বাম দিক হইতে দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সৈন্যদিগকে সাহস ও উৎসাহ প্রদান জন্য ঐ দিকে আগমন করিলেন। এই স্থানে উভয় প্রতিপক্ষ দল খুব জমিয়া পরস্পরের প্রতি তরবারি চালাইতে ছিল। এই সময় শামী (সিরীয়) পক্ষ হইতে মহাবীর যোল কালহু হমিরী এবং ওবায়দুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) হজরত আলীর (রাজিঃ) বাম বাহুস্থ সেনাদলকে অতি ভীষণভাবে আক্রমণ করিলেন। অতি বীরযোদ্ধা রবীয় দলের যুদ্ধ-পতাকাও আর স্থির থাকিতে পারিল না। উভয় দলের অসংখ্য বীরপুরুষ সমরক্ষেত্রে চির নিদ্রায় অভিভূত হইল। আপনাদের বাম ভাগস্থ সেনাদলের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মহাবীর আবদুল কয়েস অগ্রসর হইয়া, রবীয় সম্প্রদায়ের বীরদিগকে রক্ষা করিলেন; এবং শামী (সিরীয়) সেনাদলের অগ্রগতি রোধ করিয়া দিলেন। যথা সময়ে যথোপযুক্ত সাহায্য লাভ করাতে হজরত আলীর (রাজিঃ) বাম বাহুস্থ সেনাদল আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। এই

ভীষণ যুদ্ধ কালে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) পক্ষীয় দুইজন শ্রেষ্ঠতম বীর যোল কালাহ হমিরী এবং ওবায়দুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) শমরশায়ী হইলেন। স্থূলকথা এই দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় দলের দক্ষিণ এবং বাম ভাগে এমন ভীষণ যুদ্ধ হইল, যাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু উভয় সেনাদলের মধ্যভাগ (কলবে লস্কর বা সম্মুখ ভাগ) এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধ-হাঙ্গামা ও শোণিত-পাত হইতে মুক্ত ছিল। অবশেষে হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষ হইতে হজরত এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ) স্বপক্ষীয় যোদ্ধৃ পুরুষদিগকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, যাহারা খোদাতালার সন্তুষ্টি লাভ করিতে ইচ্ছুক, যাহারা ধনৈশ্বর্য্য এবং স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবার বর্গের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে সম্মত আছ, তাহারা আইস, আমার সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হও। তিনি এই কথা বলিয়াই দ্রুতবেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন ; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একদল প্রবল সৈন্য জীবনের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভীম প্রভঞ্জনের ন্যায় সেনাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সম্মুখের দিকে ধাবিত হইল। অবশেষে তাঁহারা হজরত আলী রাজি আল্লাহ আন্হুর খাস পতাকা-ধারী হাশেম-বিন্-ওক্‌বার নিকট গিয়া পঁহুছিলেন। তিনি ও পতাকা উত্তোলন পূর্ব্বক মহোল্লাসে এই যোদ্ধৃ পুরুষদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। হজরত এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ) এই ফেদায়ী (জীবনোৎসর্গকারী) সেনাদল লইয়া একেবারে সিরীয় সেনাদলের কলবে (মধ্যস্থলে) পঁহুছিলেন।

এ সময় দিবা অবসান হইয়া রাত্রি সমাগত হইয়াছিল। রজনী শুক্লপক্ষ ছিল বলিয়া যুদ্ধে তেমন অসুবিধা ঘটিতেছিল না। হজরত এমার-বিন্-এয়াছের রাজি আল্লাহ আন্হুর এই আক্রমণ বড়ই ভীষণ ছিল; শামী সেনাদল প্রথম আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; অবশেষে হজরত ওমরু-বিন্-আজ্ আছ (রাজিঃ) অতি কষ্টে ও অমানুষিক বীরত্বের সহিত সেই আক্রমণের গতিরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে উন্মুক্ত তরবারি অতি ভীষণ ভাবে চলিতে লাগিল। দলে দলে যোদ্ধৃপুরুষ মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়ীত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে ঋষিকল্প বীর পুরুষ খ্যাত নামা সাহাবা হজরত এমার-বিন-এয়াছের (রাজিঃ) শহিদ হইলেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেউন)। হজরত এমার-বিন-এয়াছেরের শহিদ হওয়ার সংবাদে হজরত আলী (রাজিঃ) নিতান্ত শোকাকুলিত হইলেন। এই সময় শামী (সিরীয়) সেনাদলের সঙ্গে হজরত আলীর (রাজিঃ) সৈন্যদিগের সর্ব্বত্রই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তরবারির ভীষণ ক্রিয়া ও উহার আঘাতে কেহ দ্বিখণ্ডিত, কেহ মুণ্ডহীন কবন্ধ স্বরূপ, কেহ হস্ত হীন, কেহ পদ হীন হইতে লাগিল। ভীষণ নেযাঃ বা বড়শাঘাতে কাহারও বক্ষঃ ও উদর বিদ্ধ হইল, কাহারও নাড়ী-ভুড়ি বাহির হইয়া গেল; কাহারও পদ ছিন্ন হইল; কাহারও মস্তক ভগ্ন হইয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িল। যুদ্ধে উৎসাহ প্রদান-কারী কবিতা পাঠক, কোর‌্আন পাঠক হাফেজ এবং যোদ্ধৃ পুরুষদিগের তক্‌বির ধ্বনিতে রণক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

নিশাকর অস্তাচলে গমন করিল, সমগ্র জগত অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল, তবু এই সর্ব্ব-সংহারক মহাযুদ্ধের বিরাম নাই। ইহা জুমার পবিত্র রাত্রি ছিল; এই রাত্রি 'লায়লাতুল হরির' নামে বিখ্যাত। এই রজনীতে হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) অকৃত্রিম প্রেমাস্পদ তাপসকুল-চূড়ামণি হজরত আয়েস করণী (রাজিঃ) শহিদ হইলেন। (ইন্নাঃ) তাঁহার শহিদ হওয়ার সংবাদে হজরত আলী (রাজিঃ) অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন। বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী (রাজিঃ) কখনও সেনাদলের দক্ষিণ বাহুতে বিরাজ করিতেন, কখনও বাম বাহুতে দৃষ্ট হইত। তিনি দ্রুত অশ্ব-সঞ্চালনে বিদ্যুৎ-গতিতে সেনাদলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিলেন। কখনও ভীষণ তরবারি দ্বারা মহাসংহারক রূপে শত্রু-সংহার করিতে দেখা যাইত। রণ-ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্বর্গীয় দূতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে ছিল। হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) সেনাদলের বাম ভাগ অতি দক্ষতা সহকারে রক্ষা করিতেছিলেন। আর মহাবীর মালেক ওশ্‌তের দক্ষিণ ভাগ সতর্কতা সহকারে রক্ষা করিয়া ভীম-বিক্রমে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিতেছিলেন। পক্ষান্তরে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষে মহাবীর ওমরু-বিন্-আল্ আছ (রাজিঃ) ও অন্যান্য প্রথিত নামা সেনাপতিগণ শামী সেনাদলকে পরিচালিত ও অতি সতর্কতা সহকারে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিলেন। সারা রাত্রি এই ভীষণ যুদ্ধ চলিল। রাত্রি অবসান হইয়া জুমার দিন দেখা দিল, কিন্তু এই মহাযুদ্ধ পরিসমাপ্তির কোনও লক্ষণই

দৃষ্ট হইল না। দিবাকর পূর্ব্ব দিন অস্তাচলে গমন করিবার সময় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে যেরূপ ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত দেখিয়াছিল ; পুনরায় উদয় হইয়াও সেইরূপ মহাসংগ্রামে লিপ্ত দেখিতে পাইল। লায়লাতুল-হরির যুদ্ধের একটী স্মরণীয় ঘটনা এই ছিল যে, হজরত আলী মরতুজা (রাজিঃ) একবার বার হাজার বিক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অতি ভীষণ ভাবে শামী (সিরীয়) সেনাদলকে আক্রমণ করিলেন ; এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুদলকে হঠাইয়া, হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) খিমা (শিবির) পর্য্যন্ত পঁহুছিলেন, এবং হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মোয়াভিয়া (রাজিঃ)! অনর্থক মোসলমানদিগকে হত্যা (ধ্বংস) করাইয়া কোনও ফল নাই ; তুমি শিবির হইতে বাহির হইয়া আইস, আমরা উভয়ে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই ; আমাদের মধ্যে যে যুদ্ধে জয়ী হইবে, সেই-ই খেলাফৎ লাভ করিবে। হজরত আলী বাজি আল্লাহ আনহুর এই আওয়াজ এবং উক্তি শুনিয়া হজরত ওমরু-বিন্-আল্-আছ (রাজিঃ), হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে বলিলেন, এই প্রস্তাবই ত: উত্তম। অসংখ্য মোসলমানের নিপাত সাধন ও তাহাদের শোণিতে ভূ-পৃষ্ঠ কর্দ্দমিত করা অপেক্ষা আপনার যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, হজরত আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শেষ মীমাংসা করা উচিত। তচ্ছ্রবণে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, আপনি এ প্রস্তাব কিসে ভাল মনে করিলেন ? আপনি নিজের জন্য এই ফয়সলা (মীমাংসা)

কেন পসন্দ (মনোনীত) করেন না (অর্থাৎ আপনি কেন আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না)? আপনি কি একথা জানেন না যে, (হজরত) আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে যে ব্যক্তি যুদ্ধে অগ্রসর হয়, সে জীবন লইয়া কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না? তৎপর পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, সম্ভবতঃ আপনি এই জন্য (হজরত) আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে আমাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পাঠাইতে চান যে, আমি যুদ্ধে গিয়া মারা যাই; আর আপনি শামের (সিরিয়ার) আধিপত্য লাভ করেন। স্থূলকথা এই যে, হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষ হইতে হজরত আলী (রাজিঃ) কে কোনই উত্তর দেওয়া হইল না। তৎপর তিনি স্বীয় মূল সেনাদলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জুমার দিন বেলা দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত পূর্ণ তেজে এই মহা-সংহারক যুদ্ধ চলিল। এই ভীষণ যুদ্ধ ক্রমাগত ত্রিশ ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াছিল। এই ত্রিশ ঘণ্টার যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় ৭০ হাজার সৈন্য প্রাণত্যাগ করে।

মোসলমানদিগের এরূপ বিপুল সংখ্যক যোদ্ধৃপুরুষগণের আত্ম-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ও হৃদয়-বিদারক ব্যাপার। এই ৭০ হাজার বিক্রান্ত মোসলমান যোদ্ধা সমগ্র পৃথিবী জয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও যুদ্ধে ইহার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ মোসলমান বীরপুরুষও প্রাণত্যাগ করে নাই। এই অশুভকর যুদ্ধে মোসলমানদিগের যে শক্তিক্ষয় হইয়াছিল, উত্তর-

কালে সে শক্তির আর পুনঃ সঞ্চয় হয় নাই। এই বিক্রান্ত ধর্ম্মপ্রাণ মোস্‌লেম যোদ্ধৃ বৃন্দ অনায়াসে সমগ্র এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জয় করিতে পারিত। যাহা হউক, যখন দিবাকর মধ্যগগন ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে ঢলিয়া—গড়াইয়া পড়িল, তখন মহাবীর মালেক ওশ্‌তর স্বীয় অধীনস্থ সেনাদলকে হায়ান-বিন্‌-হোয়্‌দা নামক বীর পুরুষের নেতৃত্বাধীনে স্থাপন পূর্ব্বক, স্বয়ং একদল বিক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করাইলেন যে, "হয় যুদ্ধে জয়ী হইব, নয় যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" অসমসাহসী মদীনাবাসী, বস্রায়ী ও কুফি যোদ্ধৃ পুরুষদিগের মধ্য হইতে একদল প্রবল অশ্বারোহী সৈন্য ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। অবশিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যগণ হজরত আলীর (রাজিঃ) হামরেকাব (সঙ্গে) থাকিল। অধিক সংখ্যক প্রবল ও তেজস্বী অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া মহাবীর মালেক ওশ্‌তর কোনও উপযুক্ত স্থান হইতে শামী (সিরীয়) সেনাদলকে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীম তেজে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধের শেষ মীমাংসা হওয়া সম্বন্ধে এই সময়টী বিশেষ অনুকূল ছিল। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধে বৃহস্পতি-বার দিন যদিও শামী (সিরীয়) সৈন্যদলের সাফল্যই দৃষ্ট হইয়াছিল; ঐ দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল, হজরত আলীর (রাজিঃ) পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; এবং হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) জয়যুক্ত হইয়া যুদ্ধের সুফল ভোগ করিবেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার দিবাগত সারা-

রাত্রি ধরিয়া যে ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে শামী সেনাদলই অধিক পরিমাণে সমরশায়ী হয়। জুম্মার দিন (শুক্রবার) দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধরূপ ঘড়ির কাঁটা ঠিক্ সমান ভাবেই চলিয়াছিল; অর্থাৎ উভয় পক্ষই সমান ভাবে সাফল্য লাভ করিতেছিল; কিন্তু এই সময় মধ্যে শামী (সিরীয়) দিগের অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক যোদ্ধৃপুরুষ সমরসায়ী হয়। তাহাদের সংখ্যা ৮০ হাজার হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া মাত্র ৩৫ হাজারে পঁহুছিয়াছিল। পক্ষান্তরে হজরত আলী রাজি আল্লাহ্ আন্‌হুর পক্ষে মাত্র ২৫ হাজার যোদ্ধা প্রাণদান করিয়াছিল; অবশিষ্ট প্রায় ৬৫ হাজার যোদ্ধৃপুরুষ তখনও রণ-ক্ষেত্রে থাকিয়া ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল। সুতরাং এসময় হজরত আলীর (রাজিঃ) সৈন্য সংখ্যা হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ রহিয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় হজরত আলী রাজি আল্লাহ্ আন্‌হুর পক্ষে বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, তিনি মূল সেনাদল হইতে একটী বৃহৎ দল বিচ্ছিন্ন করিয়া, শত্রু দলের এক পার্শ্ব বা পশ্চাদ্দিক আক্রমণ পূর্ব্বক অবাধে উহাদের ধ্বংস সাধন করিতে পারিতেন। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে শত্রু পক্ষ একেবারে "নেস্তে-নাবুদ" হইয়া যাইত। যাহা হউক, মহাবীর মালেক ওশ্‌তর স্বীয় অধীনস্থ কেদায়ী অশ্বারোহী সেনাদলকে লইয়া ভীম পরাক্রমের সহিত শত্রু দলকে আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণ অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা করাই কর্ত্তব্য ছিল; কারণ যে পদাতিক সৈন্য দল ক্রমাগত ৩০।৩২ ঘন্টা

পর্য্যন্ত অনাহারে—অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল; সমস্ত রাত্রি যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই নিতান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ শ্রান্ত-ক্লান্ত দুর্ব্বল সৈন্য দলের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার শক্তি খুব কমই অবশিষ্ট ছিল। অশ্বারোহী সেনাদলের যুদ্ধ এতাবৎ কাল তত প্রবল ভাবে চলিয়াছিল না, তজ্জন্য অশ্বগুলি ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ তেমন কাবু হইয়া পড়িয়াছিল না। তাহারা বেশ সতেজ এবং সবল ছিল। মহাবীর মালেক ওশ্‌তর জীবনোৎসর্গ কার্য্যে প্রতিশ্রুত স্বীয় অধীনস্থ প্রবল অশ্বারোহী যোদ্ধৃপুরুষগণকে লইয়া বিদ্যুদ্বেগে ভীষণ বজ্রের ন্যায় শত্রু সেনাদলের উপর আপতিত হইলেন। তাহাদের পংক্তিগুলি ভাঙ্গিয়া, দলিত ও মথিত করিয়া রুদ্রতেজে কলবে লশকর (সেনাদলের মধ্যস্থলে) গিয়া পঁহুছিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) যখন দেখিলেন, মহাবীর মালেক ওশ্‌তর শত্রু সৈন্য-দিগকে দলিত ও মথিত করিয়া ভীম বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছেন; তাঁহার বিজয়-পতাকা দ্রুত গতিতে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে, তখন তিনি স্বীয় অধীনস্থ অশ্বারোহী সৈন্য দল হইতে বাছা বাছা নূতন নূতন সাহায্যকারী দল ক্রমাগত সেনাপতি মালেক ওশ্‌তরের সাহায্যের জন্য পাঠাইতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, ঐ প্রবল আক্রমণের গতি যেন কিছুমাত্র মন্দীভূত হইতে না পারে, এবং মালেক ওশ্‌তর ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া শত্রুদলকে সর্ব্বতোভাবে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে পারে। এইরূপে নূতন

নূতন অশ্বারোহী সৈন্যদল সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছিল—আমিরুল মুমেনিনের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। ঐ সময় শামী আলম বরদার (পতাকাধারী) ও বীরেন্দ্র সিংহ মালেক ওশ্‌তরের হস্তে নিহত হইল। এক্ষণে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ও হজরত ওমরু-বিন্‌-আল্‌-আশের (রাজিঃ) অবস্থানীয় শিবিরের সম্মুখেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল। মহাবীর মালেক ওশ্‌তরের আক্রমণের পর হইতেই শামী (সিরীয়) সৈন্য দলের বিস্তৃত অবস্থান স্থান (প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র) ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। শামী সেনাদলের দক্ষিণ ও বাম বাহু ক্রমে ক্রমে মূল অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী সেনাদলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। সুতরাং অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় সৈন্যদল পরস্পরের শোণিত-পাতে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যদি শামী সৈন্যগণের দক্ষিণ ও বাম বাহুর সৈন্যদল মধ্যবর্ত্তী সৈন্য দলের সহিত একত্রে মিশিয়া না যাইত, উহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিত এবং কয়েকটী বিভিন্ন কেন্দ্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুদ্ধ চলিত, তবে মহাবীর মালেক ওশ্‌তরের এই আক্রমণ দ্বারা যুদ্ধের শেষ মীমাংসা হইতে পারিত কি না সন্দেহ। শুক্রবার দিনও যুদ্ধ শেষ হইত কি না তাহাতেও ঘোর সংশয় ছিল। কিন্তু মহাবীর মালেক ওশ্‌তর ও তাঁহার দ্বারা পরিচালিত প্রচণ্ড ফেদাই (জীবনোৎসর্গ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) অশ্বারোহী দল এরূপ ভীষণ ভাবে শামী সেনাদলকে আক্রমণ করিয়া

সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিল যে, তাহাদের পরাজয় লাভ ব্যতীত অন্য কোনই উপায় ছিল না। তাহাদের শক্তি একেবারে নিঃশেষিত এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ও সমর-প্রিয় শামী (সিরীয়) সৈনিক বৃন্দ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিল না। এরূপ নৈরাশ্য জনক অবস্থায়ও তাহাদিগকে তখনও পরাজিত বলা যাইতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইতে আর এক ঘণ্টাও বিলম্ব ছিলনা ; মাত্র কয়েক মিনিট কাল বিলম্ব ছিল ; হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য নৈরাশ্য-সাগরে বিলীন হইতে কতিপয় মুহূর্ত্তকাল মাত্র বাকী আছে বলিয়া মনে হইত। এই অবস্থায় সুচতুর হজরত ওমরু-বিন্‌-আছের (রাজিঃ) এক মাত্র কৌশলে চালবাজিতে মহাযুদ্ধের অবস্থা একেবারে উল্টিয়া গেল। তাই উর্দ্দু কবি বলিয়াছেন—

"এধার-ছে ওধার ফের গিয়া রোখ্‌ হাওয়া কা"

মহা যুদ্ধের অবসান।

হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু, মালেক ওশ্‌তরের সাফল্য মণ্ডিত আক্রমণ দর্শনে যেমন আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইতেছিলেন ; হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) অন্তঃকরণ সেইরূপ দুশ্চিন্তা ও

নৈরাশ্যের তিমির-জালে আচ্ছন্ন হইতেছিল। তাঁহার দুর্ভাবনা ও 'পেরেশানীর' কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না। পরাজয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া হজরত ওমরু-বিন্-আল্ আছ (রাজিঃ) হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কে বলিলেন, এক্ষণে আর কি দেখিতেছেন ? আমাদের পরাজয় ত অনিবার্য্য। এ অবস্থায় সৈন্যদিগকে বলুন, এই মুহূর্ত্তেই কোরআন শরীফ্ বড়শাগ্রে বাঁধিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন করে ; এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে "হাধা কেতাবাল্লাহ্ বায়েনানা ও বাইনাকুম" (আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহতালার কেতাব কোরআন মজিদ রহিয়াছে)। বিষম বিপন্ন ও চিন্তা ক্লিষ্ট হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) তন্মুহূর্ত্তেই ঐরূপ আদেশ প্রচার করিলেন ; আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে শামী সেনাদল নেজার অগ্রভাগে কোরআন শরীফ্ উচু করিয়া ধরিল, এবং উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিল, "আমরা কোরআন শরীফের ফয়সলা (মীমাংসা) মান্য করিতে প্রস্তুত।" সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—একেবারে কায়া পল্‌ট হইয়া গেল।

হঠাৎ যাদুমন্ত্র বলে যেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ থামিয়া গেল। ভীষণ বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া কাহাকেও দংশন করিতে উদ্যত হইলে সাপুড়ের এক টুকরা গাছের জড়ি-বুটি (বৃক্ষ বা লতার জড় অর্থাৎ মূল) দেখিলে যেমন মস্তক নত করিয়া সম্পূর্ণ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে বিজয়োন্মুখ এরাকী সেনাদল শত্রুগণকে দলিত ও মথিত করিয়া একেবারে

'নেস্তে-নাবুদ' করিবার উপক্রম করিয়াছিল; তাহারা অবিকল সেইরূপ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। যুদ্ধের জোশ (উৎসাহ এবং উত্তেজনা) তাহাদের মধ্য হইতে দূরে পলায়ন করিল। যুদ্ধক্ষেত্রের কোনও দিক্ হইতে এই শব্দ উত্থিত হইল যে, মোসলমানগণ! আমাদের যুদ্ধ দীনের (ধর্ম্মের) জন্য; আইস আমরা কোরআন শরীফের মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লই; এবং যুদ্ধের উপসংহার করি। কোনও দিক্ হইতে শব্দ উত্থিত হইল যে, মোসলমানগণ! কোরআন শরীফ্‌কে বিচারক নির্ব্বাচন করিয়া লও। যদি যুদ্ধে শামিগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তবে বিধর্ম্মী রুমী (রোমক) দিগের আক্রমণ কে প্রতিরোধ করিবে? আর এরাক বাসিগণ যদি বিধ্বস্ত হয়, তবে পূর্ব্বদিকস্থ বিধর্ম্মী শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে কাহারা মোসলমানদিগকে রক্ষা করিবে? হজরত আলীর (রাজিঃ) সৈন্যগণ সর্ব্ব প্রথমে যখন কোরআন মজিদ সমূহ নেযা অর্থাৎ বর্শাগ্রে দেখিতে পাইল, তখন পর্য্যন্ত প্রকৃত যুদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে 'ফেরেব' (চক্রান্ত বা দাগাবাজী) সেইস্থান অধিকার করিল। হজরত আলী (রাজিঃ) স্বপক্ষীয় লোকদিগকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা এ সময় যুদ্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করিও না; অতি শীঘ্রই আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিব—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু লোকেরা অবিশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধ করিয়া একান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; আর মোসলমানগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া উৎসন্ন যাইতেছে, ইহা ইস্‌লামের পক্ষে মহা অমঙ্গল জনক বলিয়াও মনে করিতেছিল;

এজন্য তাহারা যুদ্ধ বন্ধ করা এবং উভয় প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পক্ষে রাজী (সম্মত) হওয়া নিতান্ত শুভ-জনক ব্যাপার বলিয়া মনে করিল। সুতরাং তাহারা তৎক্ষণাৎ তরবারি কোষবদ্ধ করিল। উন্নত বড়শাগুলি নিম্ন-মুখ হইল। যোদ্ধৃপুরুষগণ সেগুলি ভূতলে গাড়িয়া বা বিদ্ধ করিয়া যেন শান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এতাবৎ কাল উভয় সেনাদলের শক্তি রণ-নৈপুণ্য ও বীরত্ব সমান সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। আজ যুদ্ধের অবস্থা হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষে যেরূপ অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহার নিশ্চিত জয়লাভের যেরূপ সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল; স্বয়ং হজরত আলী এবং তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতিগণ—পক্ষান্তরে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)ও তাঁহার সেনানীগণ যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা যেমন অনুভব ও অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন; সাধারণ সৈন্যগণ তাহা বুঝিতে বা অনুমান করিতে পারিয়াছিল না। তাহারা মনে করিতেছিল, এতাবৎ কাল যুদ্ধের যে অবস্থা চলিয়া আসিতেছে, কোনও পক্ষেরই জয় পরাজয় নির্ণীত হইতেছে না; বর্ত্তমান অবস্থাও তাহাই। এজন্য এরাকী সৈন্যগণ দলে পুরু হইয়াও বিজয়-লাভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহারা শামীদিগের সন্ধির প্রস্তাব 'গনিমৎ' (যথেষ্ট) বলিয়া মনে করিল। এই অবস্থা দর্শনে মোস্‌লমান-বিদ্বেষী সাবায়ীদলের লোকেরাও আনন্দাভব করিল; এবং মহা উৎসাহের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল; তাহারা হজরত আলীর (রাজিঃ) চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া,

তাঁহাকে মজবুর (বাধ্য) করিতে লাগিল যে, আপনি অনতি-বিলম্বে মালেক ওশ্‌তরকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য করুন। মহাবীর মালেক ওশ্‌তর দিব্য চক্ষে দেখিতে ছিলেন যে, আমাদের জয়লাভের আর বিলম্ব নাই, আমরা সত্বরে সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভের অধিকারী হইব; দলপতি ও সেনানায়কগণ মালেক ওশ্‌তরকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিবার জন্য হজরত আলী (রাজিঃ) কে নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিতেছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সৈন্যগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ দলে যোগ-দান করিয়াছিল।

এদিকে সৈন্যগণ যুদ্ধ বন্ধ করিল, ওদিকে মহাবীর মালেক ওশ্‌তরের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য শামী সৈন্যগণ অবসর পাইল। সুতরাং তাহাদের পক্ষে বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। এদিকে হজরত আলী (রাজিঃ) কে তাঁহারই সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া লইল; এবং এতদূর 'গোস্তাখানা' (বে-আদবী বা অশিষ্টতাজনক) কথা বলিতে লাগিল, যাহা স্মরণ করিতেও হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভূত হয়। ঐ সকল কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব হীন বে-আদব লোকেরা বলিতে লাগিল, আপনি যদি মালেক ওশ্‌তরকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিতে আদেশ না দেন, তবে আমরা ওস্‌মান (রাজিঃ) এর সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছি, আপনার সঙ্গেও সেইরূপ ব্যবহারই করিব; অর্থাৎ তাঁহাকে যেমন হত্যা করিয়াছি, আপনাকেও তাহাই করিব। সম্ভবতঃ এই দলে সাবায়ী ও বিপ্লববাদী লোকই

অধিক ছিল। সঙ্কটাপন্ন ও ভীষণ মারাত্মক অবস্থা দর্শনে হজরত আলী (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ লইয়া মালেক ওশ্‌তরের নিকট লোক পাঠাইলেন যে, এখানে বিপ্লবের দর-ওয়াজা খুলিয়া গিয়াছে, যত সত্বরে সম্ভব, যুদ্ধ বন্ধ করিয়া আমার নিকট চলিয়া আইস। বীরবর মালেক ওশ্‌তর নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ভগ্ন হৃদয়ে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট ফিরিয়া আসিলেন। যাদু মন্ত্রের ন্যায় সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে যে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় প্রতিপক্ষ দল পরস্পর পরস্পরের জীবন হননের জন্য, মুণ্ডপাত করিবার জন্য, পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিল ; যুদ্ধে জয়ী হওয়া উভয় সেনাদলের প্রত্যেকেরই আন্তরিক কামনা ছিল, এক্ষণে তাহাদের সে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্র একেবারে নিস্তব্ধতা ধারণ করিয়াছিল। মালেক ওশ্‌তর যখন হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তিনি সমস্ত ঘটনা আনু-পূর্ব্বিক তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। মালেক ওশ্‌তর নিতান্ত আক্ষেপ ও মর্ম্ম বেদনার সহিত বলিতে লাগিলেন, হে এরাক বাসিগণ ! যে সময় তোমরা আহ্‌লে শামের (শাম-বাসীদিগের) উপর সম্পূর্ণ জয়ী হইতে ছিলে, সেই সময় তোমরা কপটতা-জালে জড়িত হইয়া পড়িলে। লোকেরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে এমনই উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা মালেক ওশ্‌তর-কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু হজরত আলী (রাজিঃ)

যখন উহাদিগকে খুব শাসাইলেন, আর তাহাদের ঈদৃশ অসঙ্গত কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, তখন তাহারা ঐরূপ অন্যায় কার্য্য হইতে নিরস্ত হইল। ইহার পর আশয়ছ-বিন্-কয়েস্ অগ্রসর হইয়া হজরত আলী (রাজিঃ) কে বলিলেন, হে আমিরুল মুমেনিন! লোকেরা কোরআনের আদেশ মানিয়া লইয়াছে, এবং যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে যদি আপনি আদেশ দেন, তবে আমি মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নিকট গমন করিয়া তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, জানিয়া আসি। হজরত আলী (রাজিঃ) তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে আশয়স্-বিন্-কয়েস হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সমীপে গমন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি কোরআন শরীফ্ কোন্ উদ্দেশ্যে নেজার উপর (বড়শাগ্রে) উত্তোলন করাইয়া (উচু করাইয়া) ছিলেন? হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) তদুত্তরে বলিলেন, "আইস আমরা —এবং তোমরা খোদা ও রছুলের দিকে "রুজু" করি, আল্লাহ্ ও রছুলের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কাজ করি। এক ব্যক্তিকে আমরা আমাদের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন করি। আর এক ব্যক্তিকে তোমাদের পক্ষ হইতে মনোনীত কর। এই দুই ব্যক্তিকে এই বলিয়া শপথ করান হউক যে, তাঁহারা যেন কোরআন শরীফের ব্যবস্থানুযায়ী মীমাংসা করেন। তৎপর তাঁহারা মধ্যস্থ ভাবে যে মীমাংসা করিবেন, তাহাতে আমরা উভয় পক্ষই রাজী হইব (মীমাংসা মানিয়া লইব)।" আশয়স্-

বিন্-কয়েস্ এই কথা শুনিয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট ফিরিয়া আসিলেন, এবং আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিকট বলিলেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) চতুর্দ্দিকে যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, আমরা এই প্রস্তাবে সম্মত আছি; এইরূপ ফয়সলা (মীমাংসা) আমরা পছন্দ করি। ইহার পর আমীর মোয়াভিয়া ও শামী নেতাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমরা আপনাদের পক্ষ হইতে কাহাকে 'হাকেম' (মীমাংসাকারী) মনোনীত করিতে চাও? তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন, আমাদের পক্ষ হইতে ওমরু-বিন্-আল্-আছ (রাজিঃ) মনোনীত হইবেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) সভায় এই প্রস্তাব পেশ হইল যে, আমাদের পক্ষ হইতে কাহাকে মনোনীত করা হইবে। হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, আমাদের পক্ষ হইতে আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) নিযুক্ত হইবেন। সকলে বলিলেন, আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) আপনার রেশ্‌তাদার (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়); আমরা এমন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিতে চাই, যাঁহার সঙ্গে আপনারও মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সমান সম্বন্ধ থাকে। হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, তবে তোমরা কাহাকে পছন্দ কর, তাঁহার নাম বল। তাঁহারা বলিলেন, আমরা আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) কে পছন্দ করি। হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, আমি আবু মুছা (রাজিঃ) কে ছক্কা মনে করি না। তোমরা যদি আবদুল্লা-এব্‌নে

আব্বাস (রাজিঃ) কে আমার ঘনিষ্ট আত্মীয় বলিয়া নির্ব্বাচন করিতে না চাও, তবে মালেক ওশ্‌তরকে মনোনীত কর ; সে ত আর আমার আত্মীয় নহে। লোকেরা বলিল, আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) হজরত রসুলে আক্‌রমের (সালঃ) সংসর্গ লাভ করিয়াছেন, তিনি একজন প্রধান ছাহাবি। মালেক ওশতরের অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই ; সুতরাং আমরা আবু মুসার (রাজিঃ) স্থলে তাঁহার নিয়োগ কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। অবশেষে আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) কেই হাকেম (বিচারক) মনোনীত করা হইল। এদিকে এই সকল গোলমাল চলিতেছিল ; সেই সময় হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষ হইতে হজরত ওমরু-বিন্ আছ (রাজিঃ) একরার নামা লিখাইবার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

একররনামা লেখাপড়া এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

ওমরু-বিন্-অল্-আছ (রাজিঃ) হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহুর খেদমতে উপস্থিত হইয়া একরার নামা লেখা পড়া করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে অল্প সময়ের মধ্যেই নিম্নলিখিত মর্ম্মে একরার নামা লিপিবদ্ধ হইল ;

"এই একরার নামা আলী বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ) এবং মোয়াভিয়া এব্‌নে আবি সুফিয়ানের (রাজিঃ) মধ্যে লেখা

হইল। আলী ইব্‌নে আবিতালেব (রাজিঃ) কুফা বাসী এবং তাঁহার সঙ্গীয় অন্যান্য লোকের পক্ষ হইতে এক পঞ্চায়ত মকরর (নিযুক্ত) করিলেন। এইরূপে মোয়াভিয়া-বিন্‌-আবি সুফিয়ান (রাজিঃ) শামবাসী এবং তাঁহার সঙ্গীয় লোকের পক্ষ হইতে—যাহারা তাঁহার সঙ্গে আছে, এক পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা খোদা-তালার কেতাব (কোরআন পাক) এবং তাঁহার আদেশকে কাজী (বিচারক) মনোনীত করিয়া, এই কথার একরার করিতেছে (এই বিষয়ের স্বীকৃত দান করিতেছে) যে, খোদা-তালার আদেশ এবং তাঁহার কেতাব (কোরআন শরীফ) ব্যতীত আমরা অপর কাহারও কথা শুনিব না (মীমাংসা মান্যকরিব না) আমরা "আল্‌হাম্‌দো" হইতে আরম্ভ করিয়া "অন্নাছ" পর্য্যন্ত নমগ্র কোরআন শরীফকে মান্য করি; এবং তদনুসারে প্রতি-শ্রুতি দান করিতেছি যে, কোরআন শরীফ যে কার্য্য করিবার আদেশ দিয়াছেন, তাহাই পালন করিব; আর যে কার্য্য সম্পাদন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেকাজ করিব না। দুই জন সালিস মোকরর হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে আবুমুসা আবদুল্লা-বিন্‌-কায়স্‌ আশয়ারি (রাজিঃ) এবং ওমরু-বিন্‌-আল্‌ আছ (রাজিঃ) ইঁহারা উভয়ে কেতাব আল্লাহর মধ্যে যাহা পাইবেন, সেই অনুসারে ফয়সলাঃ (মীমাংসা) করিবেন। আর যদি কেতাব আল্লাহর (কোরআন পাকের) মধ্যে তাহা না পান, তাহা হইতে সোন্নত আদেলাঃ জামেয়াঃ গায়ের মখ্‌তলক্‌ ফিহার উপর আমল করিবেন।

ইহার পর হাকেম অর্থাৎ বিচারকদ্বয় আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) ও ওমরু-বিন্-অল আছের (রাজিঃ) নিকট হইতে নিম্ন-লিখিতরূপ একরার (স্বীকৃতি বা প্রতিশ্রুতি) গ্রহণ করা হইল যে, "আমরা খোদাতাআলাকে হাজের ও নাজের (উপস্থিতি) জানিয়া কেতাব আল্লাহ ও সোন্নত রছুলুল্লার মওয়াফেক (অনুযায়ী বা অনুমোদিত) সহি অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিতভাবে এই বিবাদের মীমাংসা করিব। আর ওম্মত মরহুমাকে যুদ্ধ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও অনৈক্যতায় মোবতেলাঃ (লিপ্ত) করিব না।"

ইহার পর আগামী রমজান শরীফ পর্য্যন্ত ছয় মাস সময় হাকীম (সালেম) দ্বয়কে দেওয়া গেল। তাঁহাদিগকে এই এখ্‌তিয়ার (ক্ষমতা) দেওয়া গেল যে, এই ছয় মাস সময়ের মধ্যে তাঁহারা যখন ইচ্ছা করেন, উভয় পক্ষকে সংবাদ দিয়া "দোমাতল জন্দলের" নিকটবর্ত্তী "আওযজ" নামক স্থানে (যাহা দেমেশক ও কুফা শহরের—তুই রাজধানীর ঠিক মধ্যপথে অবস্থিত) উপস্থিত হইয়া আপনাদের হুকুম (আদেশ) প্রচার করিতে পারিবেন। আর এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যেন আলোচ্য অর্থাৎ বিবাদীয় বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ তদন্ত এবং আপনাদের খেয়ালাৎ (সঙ্কল্প) অর্থাৎ স্বাধীন মতামত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পারেন। এ কথাও স্থির হইল যে, যখন কুফা হইতে আবু মুছা আশয়ারি (রাজিঃ)ও দামেস্ক হইতে ওমরু-বিন্-অল-আছ (রাজিঃ) আওযজাভিমুখে ফয়সলা শুনাইবার জন্য রওয়ানা হইবেন, তখন হজরত আলী (রাজিঃ), আবু মুসা আশয়ারির

(রাজিঃ) সঙ্গে ৪০০ চারি শত লোক, এবং হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ওমরু-বিন্-অল্-আসের (রাজিঃ) সঙ্গে ৪০০ চারি শত লোক রওয়ানা করিবেন। এই ৮০০ আট শত লোক উভয় পক্ষের সমুদয় মোসলমানের 'কায়েম মকাম' (প্রতিনিধি) বলিয়া গণ্য হইবেন। ইঁহাদিগকে হাকেমদ্বয় আপনাদের 'ফয়সলা' (মীমাংসা বা বিচার-ফল) শুনাইবেন। এই সকল কথা স্থিরতর হইয়া যাওয়ার পর শেষ সিদ্ধান্তানুসারে হজরত আলী (রাজিঃ) স্বীয় সমুদয় সেনাদল এবং হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) স্বীয় সৈন্যগণ হইতে এই কথার একরার (স্বীকৃতি) লইলেন যে, ফয়সলা প্রকাশ করিবার পরে হাকেম (বিচারক) দ্বয়ের ধন-প্রাণ, পুত্র-পরিজন সর্ব্ব প্রকারে সুরক্ষিত থাকিবে। অর্থাৎ তাঁহাদের ধন-প্রাণ ও পরিবারবর্গের উপর কেহ কোনও-রূপ জোর-জোলম বা অত্যাচার করিতে পারিবে না। উভয় দলের সৈন্য-সেনাপতিগণই বখুশি (স্বেচ্ছায়) ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহার পর একরার নামার ২খানা নকল লেখা হইল। উহাতে হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষ হইতে আশয়স্-বিন্-কয়েস, সায়াদ-বিন্ কয়েস হামদানী, ওরকা-বিন্-ছমি-অল জবলী, আবদুল্লা-বিন্ ফহলী আজলী, হজর-বিন্-আদি কান্দ, আবদুল্লা-বিন্-তফছিল আমরি, ওকবা-বিন্-যেয়াদ হজরমি, এযিদ-বিন্-খজিয়া এতিমি, মালেক-বিন্-কায়াব হামদানী সাক্ষী এবং যামেন (প্রতিভূ) স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন। পক্ষান্তরে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষ হইতে আবু আলায়োর,

হবিব-বিন্-মোস্‌লেমা, যয়ল-এবনে ওমরু আবরী, হামযাঃ-বিন্-মালেক হামদানী, আবদুর রহমান-বিন্-খালেদ মখযুমী, সবীয়-বিন্-এযিদ আনছারী, ওকবা-বিন্-আবু সুফিয়ান এবং এযিদ-বিন্-আলহর আবছি দস্তখত (স্বাক্ষর) করিলেন। যখন নকল দুই খানি প্রস্তুত হইল, তখন উহার একখানি আবু মুসা আশয়ার (রাজিঃ)কে, আর দ্বিতীয় খানি ওমর-বিন্-আল আছ (রাজিঃ) কে দেওয়া হইল। হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষ হইতে যাঁহারা প্রতিভূস্বরূপ দস্তখত করিয়াছিলেন, উহাদের সঙ্গে মালেক ওশ্‌তরকেও দস্তখত করিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে স্পষ্টভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। আশয়স-বিন-কয়েস তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করাতে উভয়ের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয়, এবং কটু-কাটব্যে পর্য্যন্ত পঁহুছে ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি বা লড়াই-জঙ্গ হইতে পারে নাই। একরার নামা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে ও তদনুসঙ্গিক কথাবার্ত্তা স্থির করিতে এবং যুক্তি-পরামর্শ দ্বারা সকল বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে ৪ দিন সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। ১৩ই সফর তারিখে একরার নামা হাকেমদ্বয়কে অর্পণ করা হইল। তৎপর উভয় সৈন্যদল সফরের সরঞ্জাম ঠিক ঠাক্ করিয়া সেই চিরস্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্র, মোসলমানদিগের আত্মদ্বন্দ্ব, আত্ম-কলহ, পরস্পারের শোণিত পাতের এবং জাতীয় সর্ব্বনাশের ভীষণ ক্ষেত্র "সফিন"এর ময়দান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রায় লক্ষাধিক মোসলমানের শোণিত সেই অশুভকর (মনহুছ) ময়দান কর্দ্দমাক্ত এবং রঞ্জিত করিয়া, নিহত

বীরপুরুষদিগের কবর পরম্পরায় ময়দানের এক বিশাল অংশ আচ্ছন্ন করিয়া, উভয় প্রতিপক্ষ দল কুফা ও দামেস্কের দিকে রওয়ানা হইলেন। সফিন যুদ্ধক্ষেত্রকে ইস্‌লামের কুরুক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। হতাবশিষ্ট মোসলমানগণ ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র-ভাগিনেয়, পিতা-পিতৃব্য-মাতুল প্রভৃতি কোনও না কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-অন্তরঙ্গকে হারাইয়া, বহুদলের লোকেরা স্ব স্ব দলপতিদিগকে, সৈন্যগণ সেনাপতিদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া শোকাকুলিতচিত্তে ও ভগ্ন হৃদয়ে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। বহু খ্যাতনামা সাহাবা, তাপস বা দরবেশ, এই রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। আরব, ইরাক ও শামের এমন বংশ খুব কমই ছিল, যাঁহাদের কেহনা কেহ এই মহাযুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন না করিয়াছিলেন। মোসলেম্ অভ্যুদয়ের মধ্যাহ্নকালে, ইস্‌লামে যে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, তাহার ক্ষতির বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কুচ (যাত্রা) করিয়া এবং পথিমধ্যে মকাম করিয়া মঞ্জেলে মঞ্জেলে যথানিয়মে থামিয়া এবং শিবির সন্নিবেশিত করিয়া, মঙ্গলমতে স্বীয় রাজধানী দামেস্কে গিয়া পঁহুছিলেন। কিন্তু হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহুর জন্য বিপ্লববাদের একটী নূতন দরওয়াজা খুলিয়া গেল।

খারেজী-বিপ্লব।

হজরত আলী (রাজিঃ) যখন ৩৭ হিজরীর ১৩ই সফর তারিখে সফিন রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুফাভিমুখে রওয়ানা হইবার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় কতকগুলি ক্রূরমতি বিপ্লব-পন্থী কপট লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হজরত আপনি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া শামীদিগকে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করুন। তদুত্তরে হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, আমি একরারনামা লিখিয়া দিবার পর কিরূপে এই অসঙ্গত কাজ (সন্ধিভঙ্গ) করিতে পারি ? এক্ষণে আমাকে আগামী রমজান মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের খেয়াল (কল্পনা)ও মনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া সেই লোকগুলি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু আলগ (স্বতন্ত্র বা আলাহেদা) হইয়া তাহাদের হামখেয়াল (এক মতাবলম্বী) লোকদিগকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, হজরত আলী (রাজিঃ) হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আমাদের স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করা উচিত। হজরত আলী (রাজিঃ) যখন স্বীয় সেনাদল লইয়া কুফাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন পথিমধ্যে বিষম হট্টগোল উপস্থিত হইল। বিভিন্ন দলের মধ্যে অনৈক্যতা, কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ আত্মপ্রকাশ করিল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কটু-কাটব্য বাক্য

প্রয়োগ ইত্যাদি চলিতে লাগিল। কেহ বলিতেছিল, পঞ্চায়ত মকরর হইয়া ভাল হইয়াছে। কেহ বলিল, ইহা নিতান্তই অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। কেহ বলিতেছিল, এই ব্যাপারে পঞ্চায়ত নিয়োগ করা ইস্‌লামী শরানুযায়ী না-জায়েজ (অসিদ্ধ); উত্তরে কেহ বলিল, খোদাতাআলা স্বামী-স্ত্রীর মোয়ামেলায় (ব্যাপারে) হাকীম (মীমাংসাকারী) নিয়োগ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কেহ বলিতে লাগিল, স্বামী-স্ত্রীর মনোবাদ বা ঝগড়ার সঙ্গে এ ব্যাপারের উপমা দেওয়া নিতান্তই ভুল। আমাদিগকে বাহুবলে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত ছিল। কখন কখন কেহ কেহ প্রতিবাদ স্বরূপ বলিতে ছিল, হাকেম (মীমাংসক) দিগের পক্ষে আদেল (সদ্বিচারক) হওয়া আবশ্যক। যদি তাঁহারা আদেল (সুবিচার কারী) না হন, তবে কেন তাঁহাদের কথা শুনা যাইবে? আবার কেহ কেহ বলিতেছিল, হজরত আলী (রাজিঃ) যুদ্ধ মুলতবি (বন্ধ) এবং মালেক ওশ্‌তরকে যুদ্ধ বন্ধ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তনের যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই অন্যায় আদেশ ছিল, সে আদেশ পালন করাও উচিত হয় নাই। একথার উত্তরে আর একদল লোক বলিল, আমরা হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্তে বায়েত করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক আদেশ পালন করা আমাদের পক্ষে ফরজ। তচ্ছ্র-বণে আর একদল লোক উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, আমরা তাঁহার (হজরত আলীর [রাজিঃ] কোনও অন্যায় আদেশ

পালন করিতে বাধ্য নহি। আমরা স্বাধীন, আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে; খোদার কেতাব (কোরআন পাক) ও রসুলের সোন্নত (হাদীস) আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইহা ব্যতীত অন্য কাহারও অধীনতার যোয়াল আমরা স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহি। এই কথা শুনিয়া অন্য একদল লোক বলিয়া উঠিল, আমরা / সকল অবস্থায়ই হজরত আলী রাজি আল্লাহ অন্‌হুর সাথী। তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাকে ফরজ এবং প্রকৃত শরিয়ত বলিয়া মনে করি; আর তাঁহার 'নাফরমানী' (আদেশ অমান্য) করাকে 'কোফর' (ধর্ম্ম-দ্রোহিতা) বলিয়া জানি। এই সকল তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ বাড়িতে বাড়িতে এই অবস্থা দাঁড়াইল যে, প্রত্যেক 'মঞ্জেলে' পরস্পরের মধ্যে গালি-গালাজ এবং মার-ধর দাঙ্গা-হাঙ্গামার 'দর্‌জা' পর্য্যন্ত পঁহুছিল। সৈন্যদিগের এইরূপে আব্‌তর (শোচনীয়) অবস্থা সংশোধন করিয়া স্বাভা-বিক অবস্থায় আনয়ন জন্য এবং লোকদিগকে বুঝাইয়া শুনাইয়া সৎপথাবলম্বী করণার্থে হজরত আলী (রাজিঃ) প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছিলেন; কিন্তু জ্বলন্ত অনলে শুষ্ক কাষ্ঠ এবং তৈল প্রক্ষেপকারী লোকের এদলে অভাব ছিল না। কপট, ধূর্ত্ত, বিপ্লব-পন্থী, ইস্‌লামের ঘোর শত্রু এবং ধ্বংস-কামী সাবায়ী দল সুযোগ অন্বেষণেই ব্যস্ত ছিল। সরল বিশ্বাসী সাদা-সিদে লোকদিগকে বিপথে চালিত করিবার জন্য ইহারা নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল; যেখানে যে

চালবাজী দ্বারা সাফল্যলাভের আশা ছিল, সেখানে সেই পন্থাই অবলম্বন করিত। সুতরাং তাঁহার যত্ন চেষ্টা সফল হইতেছিল না। সেনাদলের মধ্যে একটা ভয়ানক গোলযোগ এবং বিপ্লব-বাদ চলিতে লাগিল। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা, ইস্‌লামের পবিত্র নীতি ও 'আখ্‌লাক' তাহারা যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। অনেকেই পরকালের চিন্তা মনে স্থান দিতে ছিল না। হঠকারিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, আত্মম্ভরিতা, তাহাদের হৃদয়ে যেন বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। এমন চঞ্চল চিত্ত, বিপ্লবপন্থী, বিবাদ-প্রিয় অস্থির-মতি লোকের উপর নির্ভর করিয়া কি কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা যায়? হজরত আলীর (রাজিঃ) যে সৈন্যদল কুফা হইতে সফিনে যাওয়াকালীন একতা সম্পন্ন ও এক মতাবলম্বী দৃষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সৈন্যদলই সফিন হইতে কুফা প্রত্যা-বর্ত্তনকালে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একতা, এক প্রাণতা, ভ্রাতৃভাবপ্রভৃতির নাম গন্ধও ছিল না। মনোবাদ, বিদ্বেষ ভাব, হঠকারিতা, আত্ম-প্রাধান্য লিপ্সা, কর্ত্তব্য জ্ঞান-হীনতা, মহামান্য খলিফার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব প্রভৃতি সমস্ত দোষই তাহাদের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে সেনাদলের শৃঙ্খলাও একেবারে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিংশতি দল অপেক্ষাও অধিক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের পরস্পরের মত এবং মনের গতিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। এক দলের লোকের মতামতের সঙ্গে অন্য দলের লোকের কোনও মিল বা সামঞ্জস্য ছিল না। এক দল অপর দলের নিন্দা করিত,

একদল অপর দলকে গালি দিত, ও "গোমরাহ্" (সুপথ-ভ্রষ্ট) বলিত ; সঙ্গে সঙ্গে হাতা-হাতি, চাবুক বাজী পর্য্যন্ত চলিতে থাকিত ; এমন কি, কখন কখন কোষোম্মুক্ত তরবারি ও 'খঞ্জর' (বৃহৎ ছোরা বিশেষ) পরস্পরের প্রতি চালাইতে কুণ্ঠিত হইতে ছিল না। দুনিয়ার সমুদয় অনৈক্য, মতদ্বৈধতা, কর্ত্তব্য-বিমুখতা, অশিষ্টতা (বে-আদবী), ন্যায়-ভ্রষ্টতা ইত্যাদি সমস্তই যেন পুঞ্জীকৃত হইয়া এই সেনাদলে একটা বীভৎস কাণ্ডের সূত্রপাত করিয়াছিল। কিন্তু বহুদল হইলেও ইহাদের মধ্যে দুইটী প্রধান দল লোক-সংখ্যায় এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রধান ছিল ; ইহাদের যেমন 'জোশ-খরুস্' (উৎসাহ-উত্তেজনা) ছিল, তেমনই ক্ষমতা এবং বলবিক্রমও ছিল। তন্মধ্যে একদল হজরত আলী রাজি আল্লাহ আন্হুকে 'মোয্রেম' (অপরাধী) সাব্যস্ত করিত, আর তাঁহার অধীনতা ও খেলাফৎ স্বীকার করা আবশ্যক মনে করিত না। দ্বিতীয় দল হজরত আলী (রাজিঃ)কে মাছুম (নিরপরাধ ও নির্দ্দোষ) মনে করিত ; আর ইঁহার তাবেদারী ও আদেশ প্রতিপালন করাকে খোদা এবং রছুলের তাবেদারী অপেক্ষাও গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। উত্তর-কালে এই দুই দলের মধ্যে প্রথম দল "খারেজ" বা "খারেজী" আর দ্বিতীয় দল "শিয়ানে আলী" (রাফেজী) নামে অভিহিত হইয়াছে। আর যে সকল ছাহাবায় কারাম এবং ধার্ম্মিক তাপস-মণ্ডলী ঐ সেনাদলে ছিলেন, তাঁহারা এই অস্বাভাবিক ও হৃদয় বিদারক ব্যাপার দর্শন করিয়া আল্লাহর দরগায় শান্তি কামনা

করিতেন, আর ভীষণ বিপ্লব, আত্ম-দ্বন্দ্ব, বিপ্লববাদিতা হইতে মোসলমান জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য কায়মনে প্রার্থনা করিতেন। আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয় এই ছিল যে, খারেজী-দলের ঐ সকল লোকই এমাম, নেতা বা পরিচালক ছিল, যাহারা মহাবীর মালেক ওশ্‌তরকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরাইয়া আনাইবার জন্য হজরত আলী (রাজিঃ)কে তাঁহার অনিচ্ছাসত্বেও ভীতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক বাধ্য করিয়াছিল। হজরত আলী (রাজিঃ) পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন যে, তোমরাই ত আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করাইয়াছিলে, এবং সন্ধি স্থাপন 'পছন্দ' (মনোনীত) করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমরাই আবার সন্ধি স্থাপন করাকে 'না পছন্দ'—অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া, আমাকে মলযম (অপরাধী ও দোষী) সাব্যস্ত করিতেছ। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"—তাহারা এ কথায় কর্ণপাতও করিতেছিল না। অবশেষে অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, উল্লিখিত বিশৃঙ্খল সেনাদল যখন কুফার নিকট পঁহুছিল, তখন হজরত আলীর (রাজিঃ) সেনাদল হইতে ১২ হাজার সৈন্য স্বতন্ত্র হইয়া হরুরাহ দিকে প্রস্থান করিল। ইহারাই খাঁটি খারেজ বা খারেজী সম্প্রদায় ছিল, হরুরাহ গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং সেখানে থাকিয়া আবদুল্লা-বিন্-আলকুয়াঙ্গকে আপনাদের নমাজের এমাম (খতিব) এবং ছব্‌ত-বিন্-রবয়ীকে আপনাদের সেনাপতি মনোনীত করিল। ইনি সেই ছবত-বিন্-রবয়ী—যাহাকে হজরত আলী (রাজিঃ) ছফিন যুদ্ধক্ষেত্রে

অবস্থান কালে দুইবার দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া হজরত আলীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নিকট পাঠাইয়াছিলেন ; আর ঐ দুই বারেই হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সঙ্গে ইঁহার 'হুথ্‌ত্‌-কালামী' রূঢ়ভাবে কথাবার্ত্তা (বাদ প্রতিবাদ) হইয়াছিল। এবং ঐ দুইবারেই দূত প্রেরণ কার্য্য বিফল হইয়াছিল। উহারা একমতাবলম্বী হইয়া আপনাদের মধ্যে শৃঙ্খলা-বিধান করিয়া নিম্ন-লিখিতরূপ ঘোষণা-পত্র প্রচার করিল।

"বায়েত কেবলমাত্র খোদাতালার। কেতাব আল্লাহ এবং রসুলের (সালঃ) সোন্নত মতাবেক সৎকার্য্যাবলীর আদেশ করা ও মন্দ কার্য্যের নিষেধ করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে কোনও খলিফা এবং কোনও আমীর নাই। জয়লাভ করিবার পর সমস্ত কার্য্য সমগ্র মোসলমানদিগের পরামর্শ এবং অধিকাংশ লোকের ভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ও (হজরত) আলী (রাজিঃ) উভয়েই সমান দোষী (অপরাধী)।

খারেজীদিগের এই কার্য্য-কলাপের বিষয় অবগত হইয়া হজরত আলী (রাজিঃ) নিতান্ত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ও নম্রতার সহিত তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিলেন। বিশেষরূপ পরিণামদর্শীতার পরিচয় দিলেন। যাহারা সফিনের মহাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, কুফা নগরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ তাহাদের আহলে ও আয়াল (পরিবার পরিজন) বর্গকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। আর এ কথাও

ফরমাইলেন যে, সফিনের যুদ্ধে যাহারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা সকলেই শহিদ হইয়াছে। অতঃপর তিনি হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ)কে খারেজীদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য—তাহাদিগকে যেন বুঝাইয়া শুনাইয়া রাহে রাস্তে (সুপথে) আনয়ন করা হয়। হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস্ (রাজিঃ) তাহাদের সেনানিবাসে গমন পূর্ব্বক উহা-দিগকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহারা তর্ক-বিতর্ক করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল; হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) যে কথাই বলিতেছিলেন, উহারা তাহারই প্রতিবাদ করিতেছিল। এইরূপে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক —বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল, এমন সময় হজরত আলী (রাজিঃ) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি এযিদ-বিন্-কায়সের শিবিরে গমন করিলেন। কারণ এই দলের উপর এযিদ-বিন্-কায়সের বিশেষরূপ প্রভাব ছিল। হজরত আলী (রাজিঃ) এযিদের খিমায় (তাম্বুতে) পঁহুছিয়া প্রথমতঃ দুই রেকায়াত নমাজ পড়িলেন। পরে এযিদ-বিন্-কয়েস্‌কে এস্‌ফাহানের গবর্ণর (শাসনকর্ত্তা) নিযুক্ত করিলেন। তৎপর ঐ জলসার (সভায়) উপস্থিত হইলেন,—যেস্থানে হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাসের (রাজিঃ) সঙ্গে খারেজীদিগের তর্ক-বিতর্ক হইতেছিল। তিনি খারেজীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ এবং তোমাদের সম্মানিত নেতা? তাহারা একবাক্যে বলিয়া

উঠিল, "আবদুল্লা বিন্-আল্‌কুয়া।" হজরত আলী (রাজিঃ) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার বয়েত করিয়া ছিলে, বয়েত করার পর উহা হইতে খারেজ হইবার (বশ্যতা স্বীকার না করিবার) এবং আমার বিরুদ্ধাচারী হইবার কারণ কি ? আবদুল্লা বলিল, "আপনার অন্যায় আদেশ প্রদান জন্য।" হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু ফরমাইলেন, আমি খোদাতালার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার যুদ্ধ বন্ধ করিবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তোমরা যুদ্ধ বন্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলে। কাজেই আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বাধ্য হইয়া পঞ্চায়েতের মীমাংসার উপর সম্মতি দান করিতে হইল। তবুও আমি উভয় ছালেছ (মধ্যস্থ) কে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করাইয়া লইয়াছি যে, তাঁহারা পবিত্র কোরআন মজিদ অনুযায়ী ফয়সলা করিবেন। তাঁহারা যদি কোরআনানুযায়ী ফয়সলা (মীমাংসা) করেন, তবে তাহাতে কোন আপত্তি নাই। যদি তাঁহারা কোরআন অনুযায়ী মীমাংসা না করেন, তবে আমি উহা কখনও মানিব না। তচ্ছ্রবণে খারেজীগণ বলিল, আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) মোস্‌লমানদিগের শোণিত-পাতে 'আকদাম' এবং বিদ্রোহাচরণে আরতকাব করিয়াছেন, ইহাতে মধ্যস্থ নির্ব্বাচন করা বিচার সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। ইহার জন্যে কোরআনে পরিষ্কাররূপে আদেশ বিধিবদ্ধ রহিয়াছে যে, ঐ ব্যক্তি কতলের (প্রাণদণ্ডের) উপযুক্ত। তদুত্তরে হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইলেন যে, আমি প্রকৃত প্রস্তাবে

মানুষকে হাকেম (মধ্যস্থ বা মীমাংসাকারী) নিযুক্ত করি নাই; কোরআন মজীদই হাকেম, মানুষ (মধ্যস্থ বা মীমাংসাকারী) কেবল কোরআনের সঠিক আদেশ শুনাইয়া দিবেন মাত্র। আবার খারেজিগণ এই বলিয়া এতরায্ (প্রতিবাদ) করিল যে, ছয় মাসের দীর্ঘ সময় মীমাংসার জন্য স্থির করিবার কি প্রয়োজন ছিল? হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু ফরমাইলেন, হইতে পারে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মোস্‌লমানদিগের এখ্‌তেলাফ্ (মত বৈষম্য বা মতদ্বৈধ) আপনা হইতেই না দূর হইয়া যায়। স্থূল কথা এই যে, এই প্রকার বাদ-প্রতিবাদ এবং তর্ক-বিতর্ক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চলিল। খারেজীদিগের এক প্রধান নেতাকে হজরত আলী (রাজিঃ) এস্‌ফাহান এবং রসার গবর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আবার সাধারণের মনের উপর হজরত আলীর (রাজিঃ) বাক্যে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিল; সুতরাং খারেজিগণ অবশেষে চুপ হইয়া রহিল। পুনরায় হজরত আলী (রাজিঃ) খুব ধীরতা ও নম্রতার সহিত—এবং মমতা ও স্নেহব্যঞ্জক ভাষায় বলিলেন, বৎসগণ চল, কুফানগরের মধ্যে তোমরা অবস্থান করিবে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে তোমাদের সওয়ারির অশ্ব সকল এবং বারবরদারির পশুগুলি (উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অশ্বতর প্রভৃতি) উপযুক্ত আহার পাইয়া বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, মোটা তাজা ও বলশালী হইবে। মীমাংসা না হইলে পরে বেশ শক্তিশালী হইয়া আমরা শত্রুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য নবোদ্যমে বাহির হইব। ইহা শুনিয়া তাহারা রাজী হইল;

এবং হজরত আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে রওয়ানা হইয়া বস্রা নগরে প্রবেশ করিল; আর পঞ্চায়ত অর্থাৎ মধ্যস্থদ্বয়ের মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন, হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) কে বস্রায় রওয়ানা করিয়াছিলেন; কারণ তিনি বস্রার গবর্ণর (শাসনকর্ত্তা) ছিলেন। বস্রায় উপস্থিত হইয়া এমন সঙ্কটের সময় তথাকার শাসন-শৃঙ্খলা বিধান করা তাঁহার পক্ষে একান্তই আবশ্যক ছিল। সফিন যুদ্ধের সময় তিনি সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং নূতন ভাবে বস্রার শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করা তাঁহার জন্য একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছিল।

আয্রহে মীমাংসাকারী দ্বয়ের ঘোষণা।

নানা গোলযোগে কয় মাস কাটিয়া গেল। যখন ছয় মাস অবকাশের কিছুকাল বাকী রহিল, তখম হজরত আলী (রাজিঃ) হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) কে, বসরায় নমাজের এমাম মকরর (নিযুক্ত) করিয়া, নির্ব্বাচিত চারিশত প্রতিনিধি সহ আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) সমভিব্যাহারে আযরহ অভিমুখে রওয়ানা করিলেন। তিনি শরীহ-বিন্-হানিকে বুঝাইয়া বলিয়া

দিলেন, যখন আয্‌রহে ওমরু-বিন্‌-আল-আস (রাজিঃ)এর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তখন তুমি তাঁহাকে বলিয়া দিবে, রাস্তি (ন্যায়) ও সদাকৎকে বিসর্জ্জন না দেন, আর কেয়ামতের দিনের কথা সত্য যেন স্মরণ রাখেন। ওদিকে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ও ৪০০ প্রতিনিধিসহ ওমরু-বিন্‌-আল-আস্‌ (রাজিঃ) কে আয্‌রহে প্রেরণ করিলেন। এই ফয়সলা (মীমাংসা) শ্রবণ এবং আয্‌রহের মজলেসে (সভায়) উপস্থিত হইবার জন্য মক্কা ও মদীনার কতিপয় 'বা-আছর' (সম্মানিত ও প্রতিপত্তিশালী) বোযর্গকেও কষ্ট দেওয়া হইল। তাঁহারাও মোসলমানদিগের মতভেদ ও মনান্তর দূর করিবার জন্য নিরাপত্যে এই সভায় যোগদানে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা হইয়া মোসলমানদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, ইহা তাঁহাদের একান্ত অভিপ্রেত ছিল। তদনুসারে আবদুর রহমান-বিন্‌-আবু-বকর সিদ্দিক (রাজিঃ), আবদুল্লা-বিন্‌-ওমর-(রাজিঃ), আবদুল্লা-বিন্‌-যোবায়ের (রাজিঃ), হজরত সায়াদ-বিন্‌-আবি ওকাস (রাজিঃ) প্রমুখ কতিপয় প্রধান প্রধান সাহাবা এবং মোসলমানদিগের সম্মানিত নেতা সুদূরবর্ত্তী এই সভায় উপস্থিন হইলেন। যখন সকলে আযরহ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন সকল লোকের মনেই একটা আগ্রহ ও অশান্তির তরঙ্গ উত্থিত হইল যে, সভায় না জানি কিরূপ মীমাংসা হয়। কিন্তু আযরাহ যাওয়া মাত্রেই মীমাংসাকারী (মধ্যস্থ) দ্বয় আপনাদের মীমাংসার ফল তখন তখন প্রকাশ করিলেন না। বরঞ্চ উভয় মধ্যস্থ ঐ স্থানে

একত্র হইয়া আপনাদের পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে মক্কা এবং মদীনার বোজর্গগণের আগমন-প্রতীক্ষা করাও একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। যে সময় হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু, আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ)কে কুফা হইতে আযরহ অভিমুখে রওয়ানা করিতেছিলেন, তখন খারেজী-দিগের পক্ষ হইতে হরব কুছ বিন্-যহির আসিয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) খেদমতে আরজ করিলেন, আপনি সালিসীর ফয়সলায় রাজী হইয়া বড়ই ভুল করিয়াছেন। আপনি এখনও ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন; এবং শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্ত কুচ করুন; আমরা সকলেই আপনার সঙ্গী আছি (অর্থাৎ আপনার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধ করিব)। হজরত আলী (রাজিঃ) উত্তর করিলেন, আমি একরার নামার বিরুদ্ধে সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে কোনও ক্রমেই পারি না। ইনি সেই হরকুছ-বিন্-যহির, যিনি হজরত ওস্মান গণির (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ড জনিত হাঙ্গামায় বিপ্লববাদীদিগের একজন প্রধান ও বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। আর এক্ষণে খারেজী দলেরও একজন প্রধান নেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) রওয়ানা হইবার পর হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু প্রত্যহ হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাসের (রাজিঃ) নামে পত্র প্রেরণ করিতেছিলেন। ওদিকে ঠিক সেইভাবে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পত্রও হজরত ওমরু-বিন্-অল্ আসের (রাজিঃ) নামে আসিতেছিল। উভয় পক্ষের দ্রুতগামী

কাসেদ (দূত বা পত্রবাহক) গণ এই সকল পত্র পঁহুছাইত। এই ব্যাপার এমনই জটিল ও গোলযোগ পূর্ণ ছিল যে, উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষেরই এ বিষয়ে বিশেষ রকম খেয়াল রাখা এবং সতর্ক থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। এই স্থলেও একটু খট্‌কা এই ছিল যে, হজরত আলীর (রাজিঃ) পত্র তাঁহার পক্ষের সালেস্ বা মীমাংসাকারী হজরত আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) নামে না আসিয়া, হজরত এবনে আব্বাসের (রাজিঃ) হস্তে আসিত ; হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পত্র তাঁহার পক্ষের মীমাংসাকারী হজরত ওমরু-বিন-আল্-আসের (রাজিঃ) নামে আসিত। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, হজরত আলী (রাজিঃ) হজরত আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না। আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্য-কলাপে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা-স্থাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভবই ছিল। পক্ষান্তরে হজরত মোয়া-ভিয়া (রাজিঃ), হজরত ওমরু-বিন-অল্ আসের (রাজিঃ) প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবেই তাঁহার বুদ্ধি-মত্তা, রাজনীতিক কৌশল এবং বীরত্বেই হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এতাবৎকাল এতটা সাফল্য লাভ করিয়া আসিয়া-ছিলেন। আর ইনি রাজনীতি শাস্ত্রে একান্তই পরিপক্ক ও বিশারদ ছিলেন। এই বিংশ শতাব্দীর রাজনীতিকদিগের অনেক চালবাজীই তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তেমন একজন বিচক্ষণ রাজনীতি-বিদ্, বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী হজরত আজীর (রাজিঃ) কেহই

ছিলেন না। তাঁহার পক্ষে সরলমনাঃ ধার্ম্মিক সাদা-সিদে গোছের আদর্শ মোসলমানই অধিক ছিলেন। আর ছিল উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, ভীষণ বিপ্লববাদীর দল। আবার ওমরু-বিন্-অল্ আসের (রাজিঃ) সঙ্গে দেমেস্ক হইতে যে সকল প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, ধীর-স্থির-গম্ভীর, তাঁহাদের আমীর (অধিপতি) এবং নেতার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত; স্বেচ্ছাচারিতার নাম গন্ধও তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। তদ্ব্যতীত সে পক্ষের বন্দোবস্তও অতি পাকা ছিল। হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষের লোকেরা কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, কিরূপ স্বেচ্ছাচারী এবং মহামান্য নেতার কিরূপ অবাধ্য ও অনিষ্টকারী ছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা পরম্পরা দ্বারা অতি সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। শামী প্রতিনিধিগণ একথা জানিতে কখনও ইচ্ছা করেন নাই যে, তাঁহাদের আমীর, ওমরু- বিন্-অল্-আসের (রাজিঃ) নিকট হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কি চিঠি-পত্র লিখিতেছেন। তাঁহারা তাহাদের নেতার একান্ত বাধ্য এবং 'ফরমাবরদার' (আদেশ পালনকারী) ছিলেন। পক্ষান্তরে হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রেরিত ৪০০ চারি শত প্রতিনিধির অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। তাঁহারা প্রত্যহ হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রেরিত পত্রের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাসের (রাজিঃ) চতুর্দ্দিকে আসিয়া সমবেত হইতেন; আর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেন, হজরত আলী (রাজিঃ) পত্রে কি

লিখিয়াছেন ? এজন্য কোনও কথাই গোপন থাকিত না মহামান্য আমিরুল মুমেনিন প্রত্যহ যাহা লিখিয়া পাঠাইতেন ; এখানে সেই পত্র পঁহুছামাত্র ৪০০ প্রতিনিধি এবং অন্যান্য লোক সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মর্ম্ম অবগত হইত। বিপক্ষের সুদক্ষ গুপ্তচর দ্বারা তাহা তাঁহাদের জানিতেও আর বিলম্ব ঘটিত না। হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রেরিত পত্রাবলীতে এমন অনেক কথা থাকিত ; যাহা তখন তখনই প্রকাশ হওয়া কিছুতেই উচিত ছিল না ; তিনি সেই সকল গোপনীয় কথা ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেই লোকেরা তাঁহার উপর নারাজ ও বিরক্ত হইতেন। ক্রমে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, প্রেরিত প্রতিনিধিবর্গ তাঁহার উপর একেবারে খড়গহস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর সকলে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন ; নিন্দার বিষয় এই যে, হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুর প্রেরিত পত্রাবলীর মর্ম্ম আমাদিগকে তিনি জানিতে দিতেছেন না।

যাহা হউক হজরত আবদুর রহমান-বিন্-আবিবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-যোবায়ের (রাজিঃ), আবদুর রহমান বিন্-অল্-হব্, ছআবদুর রহমান-বিন-আবদ ইয়াগুছ যহরি, আবু জহম-বিন্-হযিফাঃ, মগিরা-বিন-শয়বাঃ, হজরত সায়াদ-বিন-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ)-প্রমুখ মহাত্মাগণ যখন

আয্‌রাহ আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন সমস্ত খাস-উল খাস (বিশিষ্ট ভদ্রলোক) ও খ্যাতনামা মহাত্মাদিগের সম্মিলনে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইল। এই বিশেষ সভায় আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ), ওমরু-বিন-অল্‌ আছ (রাজিঃ) ও আগমন করিলেন। এই বিশেষ সভায় ওমরু-বিন-অল্‌-আছ (রাজিঃ) ও আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) কথোপকথন আরম্ভ হইল। ওমরু-বিন-অল্‌আছ (রাজিঃ) সর্ব্ব প্রথমে আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ)কে এ বিষয়ের একরার করাইলেন (স্বীকার করাইলেন) যে, হজরত ওস্‌মান গণি (রাজিঃ) কে মজলুম (জোলপ অর্থাৎ অত্যাচারের সহিত) হত্যা করা হইয়াছে। তারপর একথাও স্বীকার করাইলেন যে, মোয়াভিয়া (রাজিঃ) হামজদ (এক বংশীয়) হওয়ার জন্য হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) খুনের দাবী (হত্যার প্রতিশোধার্থ দাওয়া) করার তাঁহার হক আছে। এই দুইটী কথা এমন ছিল, আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) ইহার বিরুদ্ধে কখনও মত প্রকাশ করেন নাই। অর্থাৎ এই দুইটী বিষয়ে তাঁহার কোনওরূপ মত-বৈষম্য ছিল না। সুতরাং এই দুইটী কথার সাপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিতে তিনি কোনওরূপ আপত্তি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন না। ইহার পর ওমরু-বিন্‌-অল্‌-আছ (রাজিঃ) খেলাফতের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন; এবং বলিলেন, মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কোরেশ বংশের একজন শরীফ (সম্ভ্রান্ত) ও নামজাদা (খ্যাতনামা) বংশের বংশধর; হজরত রেছালত

মাবের (সালঃ) যওজাঃ মতাহরা (মহামান্নীয়া স্ত্রী) হজরত ওম্মে হবিবার (রাজিঃ-আঃ) ভ্রাতা, সাহাবীদের মধ্যেও তিনি একজন প্রধান পুরুষ; এই কথা শুনিয়া আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ) বলিলেন, মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) এই সকল গুণ আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ওম্মত মরহুমার এমারত (হজরত রেসালত মাবের শিষ্য মণ্ডলীর নায়কত্ব—খেলাফৎ) হজরত আলী (রাজিঃ) এবং অন্যান্য মহাসম্মানিত বোজর্গ-দিগের বর্ত্তমানে কিরূপে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে? এই সকল কথা (গুণ) হজরত আলীর (রাজিঃ) মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ রেশ্‌তায় (আত্মীয়তা সম্বন্ধে) তিনি হজরত রসুলের (সালঃ) সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তাঁহার বংশও অতি উচ্চ; কোরেশের অন্যতম ছরদার (নেতা) বলিয়া পরিগণিত; বিদ্যা, বীরত্ব, তকওয়া (পরহেজগারী—ধার্ম্মিকতা) প্রভৃতি গুণেও তিনি বিশেষভাবে খ্যাতিসম্পন্ন। ওমরু-বিন্‌-অল্‌ (রাজিঃ) বলিলেন, আমীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) মধ্যে রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত গুণ ও শক্তি এবং রাজনৈতিক জ্ঞান খুব বেশী আছে, আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ) বলিলেন, তাকওয়াপরহেজগারী ও ইমানদারীর সম্মুখে এ সকল গুণের কোনও মূল্য নাই, মূল কথা এইরূপ কথার কাটাকাটি চলিতে লাগিল। অবশেষে আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ) বলিলেন, আমার মতে আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ও (হজরত) আলী (রাজিঃ) এই দুই জনকেই মাজুল (পদচ্যুত) করিয়া আবদুল্লা-

বিন্‌-ওমর (রাজিঃ)কে খলিফা নির্ব্বাচিত করা উচিত। আবদুল্লা-বিন্‌-ওমর (রাজিঃ) তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ শুনিতে শুনিতে কোন এক গভীর চিন্তার বিভোর হইয়া চক্ষু মুদিয়া ছিলেন। তিনি সেই অবস্থায় নিজের নাম উল্লেখ করিতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) প্রস্তাব শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি এ প্রস্তাবে রাজী নহি।" তখন ওমরু-বিন্‌-আল আছ (রাজিঃ) আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ)কে বলিলেন, আপনি আমার পুত্র আবদুল্লাকে কেন খলিফা মনোনীত করিতেছেন না? আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ) বলিলেন, আপনার পুত্র আবদুল্লা অবশ্য একজন নেক লোক (ধার্ম্মিক পুরুষ); কিন্তু আপনি তাঁহাকে এই যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া বিপ্লবে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রকারের আলোচনায় ও কথা কাটাকাটিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু কোনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। অবশেষে ওমরু-বিন্‌-অল্‌-আছ (রাজিঃ) নিম্ন-লিখিত রূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ও আলী (রাজিঃ) এই উভয়ের বিবাদে এবং যুদ্ধে সমগ্র মোসলমান সমাজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে; অসংখ্য মোসলমানের শোণিতে ধরা রঞ্জিত হইতেছে; এমতাবস্থায় আমাদের উভয়ের পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি যে, তাঁহাদের উভয়কে মাজুল (বরখাস্ত—পদচ্যুত) করি। তৎপর মোসলমানদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া হউক যে, তাহারা আপনাদের খলিফা নির্ব্বাচন করিয়া লয়।

যিনি অধিক ভোট পাইবেন, যাঁহাকে অধিকাংশ মোসলমান খলিফা বলিয়া স্বীকার করিবেন; এবং যাঁহার হাতে অধিকাংশ মোসলমান বায়েত করিবেন, তাঁহাকেই খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) তাঁহার এই মত সমীচীন বলিয়া মানিয়া লইলেন। অতঃপর স্থির হইল যে, এই খাস জলসা (বিশেষ সভা) হইতে বাহিরে গিয়া আমি জলসায় (সাধারণ সভায়) এই মত ঘোষণা করা হউক। যদিও সালেস্ অর্থাৎ মীমাংসকদ্বয় এই প্রস্তাবে এক মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা কম আশঙ্কা-জনক ছিল না। কেননা, এক বিরাট মোসলমান দল যখন হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে বায়েত হইয়াছেন; তন্মধ্যে বহুসংখ্যক 'ছাহাবায় কেবার' (হজরতের মহামান্য শিষ্যদল) ও আছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি নিজের মাজুলী (পদচ্যুতি) কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ও বিশাল শাম দেশের (সিরিয়ার) একচ্ছত্রাধিপতি —দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন; কতিপয় ছাহাবা তাঁহার দলে এবং তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন; সুতরাং তিনিই বা প্রসন্ন চিত্তে এরূপ মীমাংসা কেন মানিয়া লইবেন ? যাহা হউক বা-কায়দাঃ (যথা নিয়মে) সাধারণ সভায় মীমাংসার কথা ঘোষণা করা হইবে বলিয়া প্রচার করা হইল। অগ্রে জন-সাধারণ ও উভয় পক্ষের প্রতিনিধি দল সেখানে সমবেত হইলেন।

তৎক্ষণাৎ সেখানে একটী মিম্বর স্থাপন করা হইল। উভয় পঞ্চায়ত এবং মক্কা ও মদিনার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সেখানে আগমণ করিলেন। তখন ওমরু-বিন্- আছ (রাজিঃ), আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ)কে বলিলেন, আমাদের মধ্যে যে ফয়সলা (মীমাংসা) হইয়াছে, তাহা আপনি সমবেত জন-মণ্ডলীর সম্মুখে ঘোষণা করুন। তদনুসারে আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ) মেম্বরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া এই ঘোষণা প্রচার করিলেন :—

"হে মোস্‌লেম জনমণ্ডলি! আমরা উভয়ে (সালেস্ বা মীমাংসাকারী দ্বয়) অনেক চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখিলাম, একটী ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যবস্থায়ই আমরা একমতা-বলম্বী হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আমরা তোমাদিগকে সেই একমতাবলম্বীয় ব্যবস্থার কথা শুনাইতেছি। আমরা আশা করি, আমাদের এই একমতাবলম্বীয় ব্যবস্থা তোমরা কার্য্যে পরিণত করিয়া মোসলমানদিগের মধ্যে একতা ও শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে। ঐ ফয়সলা (মীমাংসা)—যাহার উপর আমি ও ওমরু-বিন্ আছ (রাজিঃ) উভয়ে মওফক্ (একমতাবলম্বী) তাহা এই যে, আমরা এ সময় আলী (রাজিঃ) ও মোয়াভিয়া (রাজিঃ) উভয়কে পদচ্যুত করিতেছি ; আর তোমাদিগকে এই এখ্‌তিয়ার (ক্ষমতা বা স্বাধীনতা) দিতেছি যে, তোমরা সকলে একমতাবলম্বী হইয়া যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকে খলিফা নির্ব্বাচন কর।"

সমবেত জন-মণ্ডলী আবু মুসা আশয়ারির (রাজিঃ) এই

তক্‌রির (বক্তৃতা) শ্রবণ করিলেন ; তখন আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) মিম্বর হইতে অবতরণ করিলেন, এবং ওমরু-বিন্‌-আছ (রাজিঃ) মিম্বরে আরোহণ পুর্ব্বক সমবেত জন-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

"আপনারা সাক্ষী থাকিবেন, আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ) তাঁহার বন্ধু হজরত আলী (রাজিঃ) কে মাকুল (বরখাস্ত —পদচ্যুত) করিলেন ; আমিও তাঁহার এই কার্য্যে একমতাবলম্বী ; এবং তদনুসারে হজরত আলী (রাজিঃ) কে খেলাফৎ হইতে পদচ্যুত করিতেছি , কিন্তু আমি মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কে পদচ্যুত করিতেছি না ; তাঁহাকে আমি বহাল রাখিতেছি। কারণ তিনি মজলুম (অত্যাচারগ্রস্ত) নিহত খলিফার অলি (উত্তরাধিকারী) এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার অধিকারী।" *

যদি হজরত ওমরু-বিন্‌-আছ (রাজিঃ) আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) সম্পূর্ণরূপ তায়ীদ (সমর্থন) করিতেন, আমীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) অনুকূলে কোনও কথা না বলিতেন, তবে সালেস (মধ্যস্থ বা মীমাংসাকারী) দ্বয়ের ফয়সলার (মীমাংসার) যে বে-হোরমতি (অবমাননা) পরে হইয়াছিল, তাহা আর হইত না। হজরত আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ) সাধারণ সভায় যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যদিও তাহাতে

* এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। অনেকের মতে ওমরু-বিন্‌-আস [রাজিঃ] সরল চেতাঃ আবুমুসা আশয়ারি [রাজিঃ] কে সম্পূর্ণরূপেই ধোকা দিয়াছিলেন।

দুর্ব্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তি ছিল, কিন্তু ইহাতে বদ দেয়ানতি ও খেষানাতের (বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিশ্বস্ততার) কোনওরূপ সন্দেহ ছিল না; ইহাতে উভয় পক্ষের আটশত প্রতিনিধির সম্ভবতঃ কোনওরূপ আপত্তি ও মতভেদ হইত না। কারণ কোনও একজন খলিফা নির্ব্বাচন করিবার ভার হাকেম বা মধ্যস্থদ্বয়ের পক্ষ হইতে উভয় পক্ষের আটশত প্রতিনিধির উপর অর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু পরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা ঘটা অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য ছিল। আর সম্ভবপর ছিল যে, ইহা অপেক্ষাও কোন খারাবি (অনিষ্টপাত) মোসলমানদিগের পক্ষে ঘটিত। কারণ হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু স্বীয় মাজুলী (পদচ্যুতি) নিশ্চয়ই স্বীকার করিতেন না। পক্ষান্তরে হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)ও পরম সমৃদ্ধিশালিনী শাম (সিরিয়া) দেশের আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন না। কাজেই এক তৃতীয় ব্যক্তিকে খলিফা মনোনীত করিতে হইত; সেই ব্যক্তি হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) হইতে অধিকতর শক্তিশালী ও অধিকাংশ লোকের মনোনীত হওয়া কিছুতেই সম্ভপর ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থলে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন। আবার হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) অতি নিকট অতি আত্মীয়, প্রিয়পাত্র, তাঁহার সম্পূর্ণ পদানুসরণ কারী, পরম ধার্ম্মিক, সর্ব্বতোভাবে কোর-আনের আদেশ পালক, মহাবীর, জ্ঞানবান, সুবিচারক ব্যক্তি সাহাবার

কারামদিগের মধ্যে হজরত আলী রাজিঃ আল্লাহ আনহুর ন্যায় আর একজনও ছিলেন না। পক্ষান্তরে রাজনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মহাপরাক্রমশালী, রাজ শাসনে উপযুক্ত, রোমক জাতীর ন্যায় মহা পরাক্রান্ত শত্রুর নির্য্যাতনকারী সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদেশের শাসনকর্ত্তা এক বিপুল জনসঙ্ঘের শ্রদ্ধাভাজন হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) ন্যায় আর কাহাকেও দেখা যাইতে ছিল না। তাঁহার সঙ্গে মহাবীর ও কূট রাজনীতিবিদ মিসর বিজয়ী ওমরু-বিন্-আছ (রাজিঃ) সম্মিলীত হওয়াতে, হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) শক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তৃতীয় খলিফা নির্ব্বাচিত হইলে ইঁহাদের তুলনায় তিনি ক্ষীণ শক্তি সম্পন্নই হইতেন। ইহা দ্বারা বিবাদ বিপ্লবের অবসান না হইয়া উহা আরও বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইত; এবং মোসলমান-দিগের অনিষ্ট পাতে, তাহাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ও শোণিতপাত আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) সন্ধিবন্ধনে বা মীমাংসা করণে কিছুতেই রাজী ছিলেন না। সফিনের মহা যুদ্ধে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই সন্ধি ও মীমাংসার প্রস্তাবে তিনি রাজী হইয়াছিলেন। তিনি নিজের দাবী পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। যদি মীমাংসা করা তাঁহার অভি-প্রেত হইত, তবে সফিনের মহা সংহারক ভীষণযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যখন হজরত আলী (রাজিঃ) মীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখনই একটী মীমাংসা

করিয়া মহাসর্ব্বনাশকারী, মোসলমানদিগের উত্তপ্ত শোণিতে ভূপৃষ্ঠ কর্দ্দমাক্তকারী, ভীষণ মহাযুদ্ধের দ্বারাবরোধ করিতেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) খেলাফৎ স্বীকার করিয়া, স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ণ গৌরবের সহিত বিশাল সিরিয়া রাজ্যশাসন করিতে পারিতেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) তুলনায় তাঁহার খেলাফতের দাবী যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল, একথা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আর প্রকৃত খেলাফৎ যে মাত্র ত্রিশ বৎসর কাল স্থায়ী থাকিবে, হজরতের এই বিশ্বাস্ত হাদীস—অব্যর্থ বানীর বিষয় স্মরণ করিলেও তাঁহার খেলাফৎ যে হক্—ন্যায়সঙ্গত, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। আবার হজরত এমার-বিন্-এয়াছরের (রাজিঃ) শহীদ হওয়া সম্বন্ধে হজরত নবী করিম (সালঃ) যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাও হজরত আলীর (রাজিঃ) খেলাফতের প্রতিপোষক। সফিন যুদ্ধের পূর্ব্বে উভয় পক্ষ হইতে দুইজন সালেস (মধ্যস্থ বা মীমাংসাকারী) নিযুক্ত করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলে লক্ষাধিক মোসলমানের উত্তপ্ত শোণিতে সফিন যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত হইত না। বিশ্ববিজয়ী বীরবৃন্দ আত্ম-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া অসময়ে শমনাগারে প্রেরিত হইত না। ইরাক ও শামের ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল শুনা যাইত না। বহুসংখ্যক পবিত্রাত্মা সাহাবী, সাধু পুরুষ, সুফী দরবেশ সফিন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতেন না। যখন মহা সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেন, উদ্ধারের আর

কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখনই সুকৌশলী ওমরু-বিন্‌-আল্‌ আছের (রাজিঃ) পরামর্শে নেজার উপর কোর-আন্‌ বাঁধিয়া, উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক কোর-আনের আদেশ পালনের ধূয়া ধরিয়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। এই কৌশল অবলম্বন না করিলে আর দশ পনর মিনিটের মধ্যেই হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) দর্প চূর্ণ হইত। হয় তিনি বন্দী হইতেন, নয় নিতান্ত দুর্গতির সঙ্গে পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার তখনকার "হাযা কেতাবাল্লাহ বাইয়েলানা ও বাইনা কুম" একটী সামরিক চালবাজী ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কোর-আন্‌ উত্তোলিত অবস্থায় দর্শনে হজরত আলীর (রাজিঃ) অল্প বিশ্বাসী ও অস্থির চিত্ত সেনাদলের তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ত্যাগ ও মহাবীর মালেক ওশতরকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা, হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষে সোণায় সোহাগা হইয়াছিল। এইরূপে হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু পঞ্চায়তের মীমাংসা স্বেচ্ছাক্রমে মানিয়া ছিলেন না। তিনি এরূপ মীমাংসার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বদলের লোকেরাই তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে ঐরূপ মীমাংসায় রাজী হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাবীর মালেক ওশ্‌তরকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করাইয়া ফিরাইয়া আনাইয়াছিল। সুতরাং একথা বিশ্বাস করিয়া লওয়া চাই যে, ওমরু-বিন্‌-অল্‌ আছ (রাজিঃ) সাধারণ সভায়, উপস্থিত জন-সঙ্ঘের সম্মুখে আবুমুসা আশয়ারির (রাজিঃ) বয়ানের (বর্ণনার) যদি

অবিকলরূপে সমর্থন করিতেন, এবং উভয়কে মাজুল (পদচ্যুত) করিতেন, তবে উভয়কে এই মীমাংসা মানিয়া লইতেন কিম্বা না লইতেন, ইহা সহজ ব্যাপার ছিল না। যাহা হউক, উভয় সালেস (মীমাংসাকারী) সাহেবদ্বয় সাধারণ জন-সভার সম্মুখে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, এবং অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন,—যাহার বিষয় উপরে বর্ণিত হইয়াছে ; ওমরু বিন্-অল্-আসের (রাজিঃ) বক্তৃতাও মন্তব্য শুনিয়া হজরত আবদুল্লা বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) এবং অন্যান্য সুধীবর্গ আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ)কে মালামত করিলেন (কটুকাটব্য কথা বলিলেন), এবং ইহাও বলিলেন, আপনি ধোকা খাইয়াছেন। আবুমুসা আশয়ারি (রাজিঃ), ওমরু-বিন্-অল্-আছ (রাজিঃ)কে খুব কড়া কড়া কথা শুনাইলেন, এবং বলিলেন, তুমি কড়ার দাদ বাহম্বির (উভয়ে মিলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়া ছিলাম তাহার) বিপরীত রায় (মত) প্রকাশ করিয়াছ, এবং আমাকে ভয়ানক ধোকা দিয়াছ। যাহা হউক, তৎক্ষণাৎ এই সভা ভাঙ্গিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত হইল। শরিহ্-বিন্ হানি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ওমরু-বিন্-আছ (রাজিঃ) কে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করিলেন, ওমরু-বিন্ আছ (রাজি) তাঁহার আক্রমণের গতিরোধ করিয়া শরিহ্-বিন্-হানিকে প্রতি-আক্রমণ করিলেন। সকলে মাধ্যে পড়িয়া লড়াই থামাইয়া দিলেন ; বিবাদ আর বাড়িতে দিলেন না। এই মজলেসে যে বদ নজমি (বিশৃঙ্খলা) ও এক্ত্রা-তক্‌রিহ (বিবাদ-বিসম্বাদ)

উপস্থিত হইল, তাহার ফলও হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) অনুকূল ও হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রতিকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কেননা এক্ষণে শামী (সিরীয়) ও এরাকী (কুফা ও বস্রা প্রভৃতি বাসী) উভয় দলের একস্থানে অবস্থিতি করা উভয় পক্ষের ছরদার (নেতা) দিগের বিবেচনায় মবর (ক্ষতি বা অহিতজনক কিংবা আশঙ্কাজনক) বিবেচিত হইল। কারণ উভয় পক্ষের এই আট শত প্রতিনিধি এক্ষণে কোনও ব্যবস্থা, না একমতাবলম্বী হইয়া পাস করিতে পারিতেছিলেন, না প্রধান প্রধান ছাহাবাগণ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম ছিলেন। এক্ষণে আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) ওমরু-বিন্-অল্ আছ (রাজিঃ) সহকারে শামী প্রতিনিধিগণের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ দেমেস্কাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; আর হজরত এব্‌নে আব্বাস (রাজিঃ) শরিহ-বিন্-হানিকে লইয়া আপনাদের সঙ্গীয় প্রতিনিধি-দিগের সঙ্গে কুফাভিমুখে কুচ করিলেন। এতদ্ব্যতীত মক্কা মোয়াজ্জমাও মদিনা তৈয়বা হইতে যে সকল মহামান্য ছাহাবায় কারাম ও অন্যান্য বোজর্গ লোক এই শান্তি সভা বা মীমাংসা-বৈঠকে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব সুবিধা অনুযায়ী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফলতঃ অল্প সময়ের মধ্যেই আদযহ ময়দানস্থ আঞ্জমন ভঙ্গ হইয়া, দেখিতে দেখিতে উহা পূর্ব্ব-বৎ নির্জ্জন প্রান্তরে পরিণত হইল। শামের প্রতিনিধিগণ ওমরু-বিন্-অল্-আছের (রাজিঃ) সঙ্গে মহাআনন্দ সহকারে দেমেস্কা-ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাফল্য

মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়াও তাঁহারা নানা প্রকারে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে "আমিরুল-মুমেনিন" ও "খলিফাতুল-মুস্‌লেমিন" বলিয়া অভিহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। দেমেস্কে পঁহুছিয়া শামিগণ আমীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সাফল্য লাভের সুসংবাদ প্রদান করিবার পর, সকলেই তাঁহার হস্তে বায়েত করিলেন। পক্ষান্তরে এরাকের প্রতিনিধি দল—যাঁহারা হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-আব্বাস (রাজিঃ) ও শরিহ-বিন্‌-হানির সঙ্গে কুফায় প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা শামী (সিরীয়) দিগের ঠিক বিপরীত ছিল। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে মন্দ বলিতে-ছিলেন, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করিতেছিলেন; কেহ আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ)কে দোষী সাব্যস্ত করিতেছিলেন, এবং তাঁহাকে মন্দ বলিতেছিলেন; কেহ তাঁহার সমর্থন করিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিতেছিলেন; কেহ হজরত আলী (রাজিঃ) কে মন্দ বলিতে ছিলেন; আর মধ্যস্থ দ্বয়ের বক্তৃতার সমর্থন করাকে ভ্রমজনক বলিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন; কেহ এইরূপ রায় প্রকাশ ঘোর অন্যায় বলিয়া ওমরু-বিন্‌-অল্‌-আসের (রাজিঃ) প্রতি গালি বর্ষণ করিতেছিলেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই চারি শত প্রতিনিধির ঐরূপ অবস্থা দাঁড়াইল—ঠিক সফিন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে হজরত আলীর (রাজিঃ) সঙ্গীয় সেনাদলের যে অবস্থা হইয়াছিল। এইরূপ গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার সহিত প্রতিনিধিগণ কুফায় পঁহুছিলে,

হজরত এব্‌নে-আব্বাস (রাজিঃ) আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা হজরত আলীর (রাজিঃ) খেদমতে প্রকাশ করিলেন; তিনি আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) ও ওমরু-বিন্‌-অল্‌-আছ (রাজিঃ)—ইঁহাদের উভয়ের ফয়সলা (মীমাংসা) কোরআন মজীদের খেলাফ (বিরুদ্ধ) বলিয়া মত প্রকাশ পূর্ব্বক, উহা মানিয়া লইতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আর মোয়াভিয়া (রাজিঃ), ওমরু-বিন্‌-আছ (রাজিঃ), হবিব-বিন্‌-মোছলেমাঃ, আবদুর রহমান বিন-মখলদ, যোহাক-বিন্‌-কয়েস, অলিদ, আবু, আলায়োর প্রভৃতি জন্য 'বদ দোওয়া' (অভিসম্পাত) করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রতি 'লায়ানত' দিলেন। এই 'বদ দোওয়া' ও লায়ানতের সংবাদ যখন হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) শুনিতে পাইলেন, তখন তিনিও হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রতি ঐরূপ 'বদ-দোওয়া' ও 'লায়ানত' প্রদান করিলেন। সেই সময় হইতে একের প্রতি অন্যের 'বদ-দোওয়া' ও 'লায়ানত' বলিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না এলায়হে রাযেউন)।

আব্‌রাহর ব্যাপারে হজরত মোয়াভিয়ার, (রাজিঃ) এই কায়দা (ফল), হইল যে, তাঁহার দলের লোকেরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে মোসলমানদিগের খলিফা ও আমীর-উল-মুমেনিন বলিতেন না; এক্ষণে তাহারা তাঁহাকে প্রকাশ্য ভাবে "আমিরুল-মুমেনিন" বলিতে লাগিল। কিন্তু কোনও নূতন মোসলমান সম্প্রদায় আব্‌রাহর ব্যাপার তাঁহার হস্তে বায়েত করে নাই। এদিকে হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষে পূর্ব্বের দ্বিগুণ বিপদ এক্ষণে ত্রিগুণ

হইয়া দাঁড়াইল। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ও শামীদিগকে পরাস্ত করা; ও খারেজীদিগকে দমন করিয়া রাখা ত প্রথম হইতেই তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল; তৃতীয় বিপদ এই হইয়া দাঁড়াইল যে, স্বীয় বন্ধুবর্গ ও ভক্তবৃন্দকে এই কথা বুঝাইতে হইত যে, মীমাংসা কারিদ্বয় আপসে (পরস্পরের মধ্যে) বিভিন্ন মত হইয়াছেন; তাঁহারা একমত হইয়া রায় প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের কোন ফয়সলা (মীমাংসা)ই গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। মীমাংসাকারী-দ্বয়কে কোরআন মজীদ এই ক্ষমতা দান করেন নাই যে, তাঁহারা খোদা ও রসুলের আদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারিতার সহিত মত প্রকাশ করেন, এবং সত্য ও ন্যায়পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-বিমুখ হন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত হজরত আলী (রাজিঃ) কুফাবাসী-গণকে এই কথা বুঝাইতে লাগিলেন যে, মধ্যস্থদ্বয়ের অন্যায় মীমাংসা কিছুতেই গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। আমাদিগকে পুনরায় শাম দেশ আক্রমণ করা চাই। যখন এ বিষয়ের বৈধতা লোকেরা বুঝিতে পারিল, তখন তাহারা পুনরায় শাম দেশ আক্রমণ করিবার জন্য সম্মতি দান করিল; এই ব্যাপার দর্শনে কুফার খারেজী দল—কুফা নগরে তাহাদের সংখ্যা প্রচুর ছিল—পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল।

খারেজী বিদ্রোহ।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সময় হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু সালেস অর্থাৎ মধ্যস্থ দ্বয়ের ফয়সলা (মীমাংসা) শুনিবার জন্য ৪০০ চারিশত প্রতিনিধি অয্‌রহ্‌ অভিমুখে পাঠাইতেছিলেন, তখন হরকুছ-বিন্‌-যহির আসিয়া বলিতেছিল, আপনি এখনও এই পঞ্চায়তের কার্য্যে (মীমাংসা) অংশ গ্রহণ করিবেন না (যোগ দিবেন না) ; বরং সিরিয়া (শাম) আক্রমণ করুন। কিন্তু হজরত আলী (রাজিঃ) তাহার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পরিষ্কার রূপে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ; এবং বলিয়াছিলেন, আমি সন্ধিভঙ্গ করিতে পারি না, এবং আমি যে একরার নামায় স্বাক্ষর করিয়াছি, তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারি না। এক্ষণে হরকুছ-প্রমুখ খারেজিগণ যখন দেখিল, হজরত আলী (রাজিঃ) পঞ্চায়েত অর্থাৎ মধ্যস্থদ্বয়ের মীমাংসা পক্ষপাত দুষ্ট ও গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়া লোকদিগকে শাম (সিরিয়া) রাজ্য আক্রমণের জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছেন, তখন যয়়়্যাহ-বিন্‌-অল্‌-বরহ এবং হরকুছ-বিন যহির নামক খারেজী সরদার (নেতা) দ্বয় হজরত আলীর (রাজিঃ) খেদমতে হাজের হইয়া বলিল, আপনি আমাদের যুক্তি সঙ্গত পরামর্শ প্রথমতঃ ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছেন ; আর এক্ষণে আপনাকে ঐ কাজই

করিতে হইতেছে, যাহা করিবার জন্য আমরা যথাসময়ে অনুরোধ করিয়াছিলাম। মধ্যস্থ মান্য করা আপনার পক্ষে ভ্রান্তিজনক কার্য্য ছিল; কিন্তু আপনি সেই ভ্রান্তি (ভুল) স্বীকার করেন নাই। এক্ষণে আপনি পঞ্চায়েতের (মধ্যস্থ দ্বয়ের) মীমাংসা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছেন, এবং শাম দেশ—আক্রমণের অভিপ্রায় জানাইতেছেন; এরূপ ক্ষেত্রে আমরা ঐ সময় আপনার সঙ্গী হইব, এবং শাম দেশ আক্রমণে সাহায্যকারী হইয়া যোগ দিব, যখন আপনি স্বীয় ভুল স্বীকার করিয়া ঐরূপ কার্য্য হইতে তওবা করিবেন। তদুত্তরে হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইলেন, পঞ্চয়ত মান্য করিতে এবং মধ্যস্থের আদেশ পালন করিতে তোমরাই ত আমাকে নানা প্রকারে বাধ্য করিয়াছিলে, অন্যথা যুদ্ধের দ্বারা ত তখনই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল। তোমাদের এ কিরূপ উল্টা কথা (বিপরীত অভিযোগ) যে, আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিতেছ, এবং তওবা করিতে বলিতেছ? তচ্ছ্রবণে তাহারা বলিল, আচ্ছা, আমরা স্বীকার করি যে, আমরাও গোনাহ (পাপ) করিয়াছি, তজ্জন্য আমরাও তওবা করি, আপনিও নিজের পাপ স্বীকার পূর্ব্বক তওবা করুন; তৎপর শামবাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলুন। হজরত আলী (রাজিঃ) বলিলেন, আমি যখন গোনাহ (পাপ)ই স্বীকার করিতেছি না, তখন তওবা (অনুতাপ) কেন করিব। পাঠক, এস্থলে ব্যাপারটা একবার বুঝুন। দুই বা ততোধিক জনের মধ্যে একজন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ আদৌ

কোনও পাপ করেন নাই ; অপর ব্যক্তি বা অপর একদল লোক সত্য সত্যই পাপ করিয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত নিষ্পাপ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে পাপ স্বীকার করিতে এবং তওবা (অনুতাপ) করিতে বলা শেষোক্ত ব্যক্তি বা শেষোক্ত দলের পক্ষে কি অতি মাত্রায় ধৃষ্টতা নহে ? সে বা তাহারা জানে, আমরা সত্য সত্যই পাপী, জানিয়া শুনিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, সুতরাং তাহাদের পক্ষে পাপ স্বীকার করা, এবং তওবা করা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিপক্ষ নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ ব্যক্তিকে পাপ স্বীকার করিতে ও তওবা (অনুতাপ) করিতে বলা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যাপার। এস্থলে খারেজী দলপতিগণ মহামান্য খলিফা হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রতি অন্যায় দাবী ও অনুরোধ উপস্থিত করিয়া আপনাদের হঠকারিতা এবং অসঙ্গত বাক্-চাতুর্য্যেরই পরিচয় দিয়াছিল। যাহা হউক হজরত আলীর (রাজিঃ) উত্তর শুনিয়া খারেজী দলের নেতৃদ্বয় "লাহোক্‌মো ইল্লা লিল্লাহে" "লাহোক্‌মো ইল্লা লিল্লাহে" বলিতে বলিতে আপনাদের শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল।

ইহার পর হজরত আলী (রাজিঃ) কুফার মস্‌জেদে উপদেশ প্রদান জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, তখন মস্‌জেদের এক প্রান্ত হইতে জনৈক খারেজী উচ্চস্বরে বলিল "লা হাকুম ইল্লা লিল্লাহ" তচ্ছ্রবণে হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইলেন, দেখ ইহারা কালেমা হক্ হইতে বাতেলকে প্রকাশ করিতেছে।" ইহার পর তিনি আবার খোতবা আরম্ভ করিলেন, তখনই আবার "লা

হাকম ইল্লা লিল্লাহ” এই শব্দ উত্থিত হইল। তচ্ছ্রবণে হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইলেন, “লোকেরা আমার সঙ্গে বড়ই দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে। আমি তোমাদিগকে মস্জেদে আসিতে নিষেধ করিতেছি না; যতদিন তোমরা আমার সঙ্গে রহিয়াছ; আমি মালে গনিমত (যুদ্ধে লব্ধ জিনিষ পত্র) হইতে তোমাদিগকে সমান অংশ দিয়াছি, আর আমি তোমাদের সঙ্গে ঐ সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব না; যে পর্য্যন্ত তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হও। তোমাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ দেখিব, তিনি তোমাদের সম্বন্ধে কি ফয়সলা (মীমাংসা) করেন।” এই কথা ফরমাইয়া তিনি মস্জেদ হইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর খারেজিগণ আবদুল্লা-বিন্-অহবের গৃহে পরামর্শ স্থির করিবার জন্য সমবেত হইল। আবদুল্লা-বিন্-অহব, হরকুছ-বিন্-যহির, হাময়া-বিন্-সনান, যায়দ-বিন্-হছিন-অল্-তাই, সরিহ-বিন্-আওফি আত্মি প্রভৃতি মিলিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, বস্রা হইতে বাহির হইয়া কোনও পার্ব্বত্য অঞ্চলে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে, আর হজরত আলী (রাজিঃ) হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক, আমাদিগের একটী স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করিতে হইবে। হাসৃয়া-বিন্-সনান আসদি বলিল এখান হইতে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য এই যে, আমরা আমাদের মধ্যে একজনকে আমীর (অধিনেতা বা রাজা) নির্ব্বাচন করিয়া লই; এবং তাহার হস্তে আমাদের রণ পতাকা প্রদান করি। এ বিষয় স্থির করিবার জন্য পর দিবস

শরীহ এর গৃহেও একটী সভার অধিবেশন হইল। ঐ সভায় আবদুল্লা বিন্‌-ওহবকে সকলে মিলিয়া আপনাদের আমীর (নেতা বা অধিপতি) স্থির এবং তাহার হস্তেই সকলে বয়েত করিল। আবদুল্লা-বিন্‌-ওহব বলিল, আমাদিগকে এক্ষণে এখান হইতে এমন কোনও সহরের দিকে যাওয়া উচিত, যে স্থানে গিয়া নিরাপদে আল্লাহ্‌ তা-লার আদেশ প্রচার করিতে পারি। কারণ আমরা আহ্‌লে হক্‌ অর্থাৎ খোদাতালার পূর্ণ আদেশ-পালক দল। শরীহ বলিল, আমাদিগকে মদায়নের দিকে (পারস্য সম্রাট্‌দিগের পূর্ব্বতন রাজধানী মহানগরী মদায়ন) যাওয়া উচিত। কেননা, ঐ নগর আমরা অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিব। ঐ নগরে হজরত আলীর (রাজিঃ) নিয়োজিত যে অল্পসংখ্যক সৈন্য আছে, তাহাদিগকে আমরা অতি সহজেই পরাস্ত করিতে পারিব। ঐ স্থানে আমাদের ভ্রাতা (সহযোগী বা সহকর্ম্মী) দিগকেও ডাকিয়া লইব যাহারা এখনও বস্রায় বাস করিতেছে। যায়দ-বিন-হছিল বলিল, যদি আমরা সকলে এক যোগে—সমবেত ভাবে এখান হইতে বাহির হইয়া পড়ি, তবে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে। অতএব ইহাই সঙ্গত যে আমরা দুইজন, চারিজন, আটজন, দশজন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া এখান হইতে বাহির হই; এবং মদায়ন নহে—বরং নহরওয়ানের দিকে চলিয়া যাই। সেখান হইতে পত্র লিখিয়া আমাদের ভ্রাতা (বন্ধু ও সহযোগী) দিগকে বস্রা হইতে নহরওয়ানে আনাইয়া লইব।

এই শেষোক্ত প্রস্তাব সকলেরই মনোনীত হইল। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাবানুসারে খারেজিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া কুফা হইতে বাহির হইয়া বস্রার খারেজীদিগকে পত্র লিখিব যে, তোমরাও বস্রা হইতে বাহির হইয়া অগ্রসর এবং নহরওয়ানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হও। তদনুসারে বস্রা হইতে মশয্‌র-বিন্‌-কদকি এতিমি ৫০০ পাঁচশত খারেজকে সঙ্গে লইয়া নহরওয়ান অভিমুখে যাত্রা করিল। যখন হজরত আলী (রাজিঃ) জানিতে পারিলেন যে, খারেজদিগের এক বিরাট দল কুফা হইতে বাহির হইয়া মদায়েনের দিকে চলিয়া গিয়াছে তখন তিনি মদায়নের শাসনকর্ত্তা সারাদ-বিন মসউদের নিকট এক দ্রুতগামী এল্‌চি (দূতবিশেষ) প্রেরণ করিয়া এই আদেশ লিপি পাঠাইলেন যে, ঐ স্থানে খারেজদিগের গতিরোধ করিবে; অবশ্য তাহাদের সম্বন্ধে যেন নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত না থাকা হয়। সায়াদ-বিন-মস্‌উদ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে মদায়নে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া, তিনি স্বীয় অধীনস্থ অল্পসংখ্যক সৈন্য সহ খারেজীদিগের গতিরোধার্থে গমন করিলেন। 'করজ' নামক স্থানে পঁহুছিয়া তিনি একদল খারেজের সাক্ষাৎ পাইলেন; তখন উভয় দলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় দলে যুদ্ধ চলিল। তৎপর নেশ-অন্ধকারে খারেজী সৈন্য দল দজ্‌লা (টাইগ্রীস) নদী পার হইয়া উত্তর দিকে চলিয়া গেল। ইহার পর বস্রা হইতে আগত খারেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিল। কিন্তু তাহারাও দজ্‌লা নদী পার হইয়া আপনাদের সহযোগী ভ্রাতা-দিগের সঙ্গে নহরওয়ানে গিয়া মিলিত হইতে সমর্থ হইল।

নহরওয়ানে পঁহুছিয়া খারেজীগণ আপনাদিগকে খুব সুরক্ষিত ও দৃঢ়ীকৃত করিল। সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উহারা হজরত আলী (রাজিঃ) এবং তাঁহার তাবেয়ীণ অর্থাৎ মতানুবর্ত্তীদিগের প্রতি কোফরের ফতওয়া তৈয়ার করিল; এক্ষণে যাহারা হজরত আলী (রাজিঃ)কে খলিফা বলিয়া স্বীকার এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কতল (হত্যা) করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমেই ইহাদের দলপুষ্টি হইতে লাগিল, এবং তাহাদের দল বাড়িতে বাড়িতে ২৫ হাজারে গিয়া দাঁড়াইল। নহরওয়ানে তাহারা অতি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত সেনানিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক নিরীহ মোসলমানদিগের হত্যাকাণ্ডে আত্ম-নিয়োগ করিল। ফলতঃ তাহারা একটা প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়াইল।

নহরওয়ানের যুদ্ধ।

যখন খারেজিগণ কুফা হইতে সদলবলে বাহির হইয়া নহরওয়ানের দিকে চলিয়া গেল, তখন হজরত আলী (রাজিঃ) কুফার অধিবাসিগণকে শাম (সিরিয়া) আক্রমণের জন্য উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে শাম (সিরিয়া) হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার সুযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ করা হইবে না। তিনি খারেজী বিদ্রোহকে শাম আক্রমণ কার্য্য অপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার বলিয়া কোনও ক্রমেই মনে করিলেন না।

এক্ষণে তিনি বস্রার শাসনকর্ত্তা হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) কে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে, শাম আক্রমণের জন্য যত সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, সংগ্রহ ও সমবেত কর। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কুফার খারেজী দল চলিয়া গিয়াছে; বস্রার খারেজীগণও প্রস্থান করিয়াছে; সুতরাং আমাদের সেনাদল আর কোনওরূপ বিপ্লব করিবার সম্ভবনা নাই, ইহাই শাম আক্রমণের পক্ষে স্বর্ণ সুযোগ। বস্রায় তখন ৬০ ষাট হাজার বিক্রান্ত সাধু পুরুষ বাস করিতেছিল। কিন্তু যখন হজরত আবদুল্লা-বিন্- আব্বাস (রাজিঃ) তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন, তখন তাহাদের মধ্য হইতে মাত্র ৩ হাজার ১ শত যোদ্ধা যুদ্ধে গমন জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করিল। অবশিষ্ট লোকেরা পত্রের মর্ম্ম এক কাণ দিয়া শুনিল, এবং দ্বিতীয় কাণ দিয়া তাহা বাহির করিয়া দিল। এ দিকে কুফার যোদ্ধৃপুরুষদিগের মধ্যেও কোন উৎসাহ বা উত্তেজনার ভাব দৃষ্ট হইল না। বস্রা হইতে যখন পূর্ব্বোক্ত তিন হাজার সৈন্য হারেছাঃ-বিন্ কদামার নেতৃত্বে কুফায় পঁহুছিল, তখন হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু কুফা বাসিগণকে ডাকাইয়া শাম আক্রমণ সম্বন্ধে একটী উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং শাম আক্রমণ করিবার জন্য তাহাদিগকে জলদ-গম্ভীর ভাষায় উত্তেজিত করিলেন। তাহার সেই অনল বর্ষিনী বক্তৃতায় কুফাবাসিদিগের হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা যুদ্ধে গমন জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করিল। চল্লিশ হাজার

অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক যোদ্ধ্ পুরুষ যুদ্ধে গমন জন্য, হজরত আলীর (রাজিঃ) পতাকা মূলে সমবেত হইল। হজরত আলী (রাজিঃ) খারেজীদিগকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া আর একবার স্বদল ভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাওয়া সঙ্গত মনে করিলেন, তদনুসারে নহরওয়ানে আবদুল্লা-বিন্-ওহবের নিকট একখানি পত্র পাঠাইলেন, সেই পত্রে লিখিলেন, তোমরা শামী (সিরীয়) দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আমার নিকট চলিয়া আইস। আমি আমার সেই প্রাথমিক মতানুযায়ী শামবাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আবদুল্লা-বিন্-ওহব এই পত্র তাহার সহযোগী ও সহধর্ম্মীদিগকে পড়িয়া শুনাইল, এবং সকলে এক মতাবলম্বী হইয়া নিম্ন-লিখিতরূপ উত্তর লিখিল।

"আপনি সালেস (মধ্যস্থ) নিয়োজন কার্য্যে খোদা ও রছুলের আদেশের বিপরীতাচরণ করিয়াছেন। আর আপনি এক্ষণে যে শামবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা নফসের খাহেশেই (ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বশতঃ) করিতেছেন। যদি আপনি কাফের হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন, এবং তৎপর তওবা করেন, তবে আমরা আপনার সাহায্য করিতে (শাম আক্রমণ করিতে) প্রস্তুত আছি। যদি ইহা না করেন, তবে আমরা আপনার সঙ্গেই যুদ্ধ করিব।"

এই পত্র পাইয়া হজরত আলী (রাজিঃ) খারেজীদিগের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইলেন, কিন্তু তিনি শাম আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। হজরত আলী (রাজিঃ)

খারেজীদিগকে সুপথে আনয়ন জন্য স্বীয় সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। তাহারা কিছুতেই তাঁহার বশীভূত হইল না।

হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু যখন খারেজীদিগকে বলিতেন যে, তোমরাই ত যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য আমাকে মজবুর (অন্যায়রূপে বাধ্য) করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমরা কোন মুখে আমাকে অপরাধী নির্দ্দেশ করিতেছ? উহারা বলিল, আমরা আমাদের দোষ ও অপরাধ স্বীকার করিতেছি, আপনিও নিজের দোষ ও অপরাধ স্বীকার করুন। আমরা ভ্রান্তি বশতঃ কাফের হইয়া গিয়াছিলাম কিন্তু তওবা করিয়া পুনরায় মোসলমান হইয়াছি। আপনিও ঐরূপ তওবা করিয়া পুনরায় মোসলমান হউন। এরূপ করিলে আমরা আপনার বিরুদ্ধে যে কাফেরের ফতওয়া প্রচার করিয়াছি, তাহা ফিরাইয়া লইব, অর্থাৎ আপনি তওবা করিয়া মোসলমান হইয়াছেন বলিয়া পূর্ব্ব প্রদত্ত ফতওয়া 'বাতেল' করিয়া দিব, তাহা না হইলে আমরা আপনাকে নিশ্চয় কাফের জানিয়া আপনার বিরুদ্ধে জেহাদ করিব। তাহাদের এই সকল অযথা উক্তি ও অন্যায় হঠকারিতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হজরত আলী (রাজিঃ) শাম দেশ আক্রমণ করিবেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। এই সময় হজরত আবদুল্লা-বিন্-জনাব (রাজিঃ) সাহাবীর শোচনীয়রূপ শহিদ হওয়ার সংবাদ আসিয়া তাঁহার নিকট পঁহুছিল। উপরি উক্ত মহাত্মার শহিদ হওয়ার ঘটনা এইরূপ :—আবদুল্লা-বিন্-জনাব (রাজিঃ)

কোনও ছফরে (প্রবাসে) গমন করিয়াছিলেন, তিনি নহরওয়ানের নিকট দিয়া যাইবার সময় একদল খারেজী জানিতে পারিল যে, ইনি ছাহাবী। তাহারা আসিয়া ইহাকে প্রশ্ন করিল যে, আপনি হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সম্বন্ধে কি বলেন? হজরত আবদুল্লা-বিন্-জনাব উত্তর করিলেন যে, তাঁহারা উভয় অতি ভাল লোক, খোদাতালার আদেশ পালনকারী, পুণ্যবান ও আদর্শ পুরুষ ছিলেন। আবার তাহারা প্রশ্ন করিল, আপনি হজরত ওসমানের (রাজিঃ) খেলাফতের প্রথম এবং শেষ যামানা (সময়) সম্বন্ধে কি বলেন? তিনি বলিলেন, হজরত ওসমান (রাজিঃ) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত হক্ পরস্ত (ন্যায়-পরায়ণ) ও হক্ পছন্দ (ন্যায় সঙ্গত কার্য্যের সমর্থক) ছিলেন। অবশেষে তাহারা হজরত আলী (রাজিঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, হজরত আলী (রাজিঃ) সম্বন্ধে মধ্যস্থ মানিবার পূর্ব্বে এবং পরে আপনার কি মত? তিনি উত্তর করিলেন, হজরত আলী (রাজিঃ) তোমাদের অপেক্ষা খোদা ও রসুলের আদেশ ভালরূপে বুঝেন, এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। খারেজীগণ এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া হজরত আবদুল্লা-বিন্-জনাব (রাজিঃ), তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার সঙ্গীয় লোকদিগকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিল। হজরত আলী (রাজিঃ) যখন এই সংবাদ পাইলেন, তখনই ঘটনার সত্যতা জানিবার জন্য হরছ-বিন্-মররাহকে খারেজীদিগের আড্ডায়

নহরওয়ানে পাঠালেন, দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকেও হত্যা করিল। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদও পঁহুছিল যে, যে সকল লোক তাহাদের মতানুবর্ত্তী নয়, তাহাদের ন্যায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-বিশ্বাসী নয়, খারেজী-গণ তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিতেছে।

এক্ষণে যাহারা হজরত আলী রাজিঃ আল্লাহু আনহুর সেনা-দলভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মনে এই দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইল যে, আমরা যদি শাম দেশে (সিরিয়ার) যুদ্ধার্থ গমন করি, আর খারেজিগণ সেই সুযোগে কুফা ও বস্রা সম্বলিত সমগ্র এরাক দেশ অধিকার করিয়া লইতে পারে, তবে আমাদের স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গকে তাহারা অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিবে; আর গৃহ-সামগ্রী ও অর্থ-সম্পদ সমস্ত লুঠিয়া লইবে। পক্ষান্তরে হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহুও এইরূপ মনে করিলেন যে, যদি খারেজীগণ কুফা ও বস্রা অধিকার করিয়া লইতে পারে, তবে আমার পক্ষে শাম (সিরিয়া) আক্রমণ করা লাভের পরিবর্ত্তে মহাক্ষতিজনক হইয়া দাঁড়াইবে। ফলতঃ গৃহ-শত্রুর নিপাত সাধন করিয়া বহিঃশত্রুকে আক্রমণ করিতে গেলে তাহার পরিণাম ফল বড় শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। হজরত আলী (রাজিঃ)ও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম না করিয়া, শামের যুদ্ধ আপাততঃ মুলতবি (স্থগিত) রাখিলেন; এবং খারেজি দলের বিরুদ্ধে সেনাদল পরিচালিত করিলেন। তিনি খারেজী দলের খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া, তাহাদের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন ;—

"তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাদের ভ্রাতৃদিগকে কতল (হত্যা) করিয়াছে, তাহাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ কর; আমি তাহাকে হত্যার কেছাছ স্বরূপ হত্যা করিব আর তোমাদিগকে তোমাদের চালের (অবস্থার) উপর ছাড়িয়া দিয়া, শামবাসীর বিরুদ্ধে আমি অভিযান করিতে ইচ্ছুক। এই অবসরে—অর্থাৎ যত দিন না শামের যুদ্ধ হইতে অবসর লাভ করি, সম্ভব হইতে পারে যে দয়াময় আল্লাহতালা তোমাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করেন।"

ইহার উত্তরে খারেজিগণ লিখিয়া পাঠাইল:—"আমরা আপনার হাম-খেয়াল (একইরূপ বিশ্বাসী ও একই মতাবলম্বী) লোকদিগকে হত্যা করিয়াছি আমরা তাহাদের বধ কার্য্যকে মবাহ (এক প্রকার পুণ্যানুষ্ঠান) বলিয়া মনে করিতেছি; এক্ষণে আপনার শোণিত-পাত (হত্যা কার্য্য)কেও আমরা মবাহ বলিয়া মনে করি।)"

ইহার পরেও মহামান্য আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মোস্‌লেমিন হজরত আলী (রাজিঃ) কতিপয় সম্মানিত আছহাবকে খারেজীদিগের নিকট পাঠাইয়া অনেক প্রকার উপদেশ প্রদান করাইলেন, আবার তাহাদের কতিপয় নেতাকে ডাকিয়া আনাইয়া নিজেও অনেক প্রকার বুঝাইলেন ও সদুপদেশ প্রদান করিলেন। ইহাও বলিলেন যে সালেস (মধ্যস্থ বা মীমাংসাকারী) মান্য কর। যদি ভ্রান্তিজনক হইয়া থাকে, তবে সে ভুল তোমাদের দ্বারাই হইয়াছে; কারণ আমি কোনও

ক্রমে ওরূপ মধ্যস্থ মানিবার পক্ষপাতী ছিলাম না; যুদ্ধ দ্বারাই মীমাংসা করিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলাম। তোমাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতায় আমি বাধ্য হইয়া মালেক ওশ্‌তরকে যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়া চলিয়া আসিতে বলি; এবং তোমাদের অন্যায় অনুরোধ এবং হঠকারিতায়ই মধ্যস্থ মানিতে বাধ্য হই। ইহাতে যে দোষ, অপরাধ বা পাপ হইয়া থাকে, সেজন্য তোমরাই দায়ী আমি বা আমার মতাবলম্বী লোক সেজন্য অনুমাত্রও দায়ী নহে। * হজরত আলী (রাজিঃ) যতবার প্রশান্তভাবে তাহা-দিগকে বুঝাইতে লাগিলেন, উহারা ততবারই এইরূপ উত্তর প্রদান করিল যে, অবশ্যই আমরা খোদা ও রসুলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তওবা করিয়া পুনরায় মোসলমান হইয়াছি। এক্ষণে আপনিও যতক্ষণ পাপ স্বীকার করিয়া তওবা না করিবেন, ততক্ষণ কাফের থাকিবেন; এবং আমরা সেই অবস্থায় আপনার শত্রুতাচরণে কিছুতেই বিরত হইব না।" হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইতেছিলেন, "আমি আল্লাহতা'ালার উপর ঈমান আনিয়াছি, হেজরত করিয়াছি, আল্লাহর পথে জেহাদ করিয়াছি, এ অবস্থায় আমি আপনাকে কাফের বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিতে পারি?" অবশেষে হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহু খারেজী সেনাদলের খুব নিকটে

* এক্ষণে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে পূর্ব্ব কথা একেবারেই ভুলিয়া যাও, চল, আমার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া শামবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হও।

গমন করিলেন, এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'ওয়াজ' (ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা) করিতে ও সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। খারেজী নেতাগণ দেখিল, হজরত আলীর (রাজিঃ) এই ওয়াজ ও উপদেশ শুনিয়া আমাদের দলের সাধারণ লোকদিগের মনে যদি ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাদের মনের উপর এই সকল ওয়াজ ও উপদেশ ক্রিয়া করে, তবে ত আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে, এই মনে করিয়া তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চ চীৎকারের সহিত বলিতে লাগিল (হজরত) আলীর (রাজিঃ) কথা তোমরা কিছুতেই শুনিবে না; তাঁহার ওয়াজ ও বক্তৃতায় কর্ণপাতও করিবে না; তাঁহার সঙ্গে কথাও বলিবে না। বরং আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধাবিত হও; অর্থাৎ হজরত আলীর (রাজিঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ কর।"

এই অবস্থা দর্শনে হজরত আলী (রাজিঃ) খারেজীদিগের নিকট হইতে স্বীয় সেনাদল প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত করিয়া, প্রত্যেক দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। আর হজরত আবু আইউব আন্‌ছারী (রাজিঃ)কে আমানের ঝাণ্ডা (শান্তি-পতাকা) প্রদান পূর্ব্বক ফরমাইলেন, "আপনি এই শান্তি-পতাকা" লইয়া এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হউন, এবং উচ্চৈঃস্বরে এই ঘোষণা প্রচার করুণ যে, যে সকল লোক বিনাযুদ্ধে আমাদের দিকে চলিয়া আসিবে, তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করা হইবে, আর যে সকল লোক কুফা এবং মদায়েনের দিকে চলিয়া যাইবে,

তাহারাও নিরাপদে থাকিবে। হজরত আবু আইউব আনছারি (রাজিঃ) মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন, খলিফাতুল-মুসলেমিনের আদেশক্রমে শান্তি-পতাকা লইয়া এক উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা প্রচার করিলেন। এই ঘোষণা-পত্র শ্রবণ মাত্র লশ্‌কর-এবনে নওফল আশ্‌জরী পাঁচ শত যোদ্ধৃপুরুষ সঙ্গে লইয়া খারেজী দল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন। কতক লোক কুফা ও কতক মদায়েনের দিকে প্রস্থান করিল। কতক খারেজী সৈন্য মহামান্য আমিরুল-মুমেনিনের সেনাদলে আসিয়া সম্মিলিত হইল। এইরূপে দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) সৈন্য খারেজী দল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়াতে, মাত্র এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের একভাগ) লোক তাহাদের দলে রহিয়া গেল। অতঃপর মহামান্য খলিফার সৈনাগণ মহা-বিক্রমের সঙ্গে ঐ অল্প সংখ্যক খারেজীকে অতি ভীষণভাবে আক্রমণ করিল। তাহারা খারেজীদিগকে এমনভাবে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া লইল যে, তাহাদের আর কোনও দিকে পলায়ন করিবার উপায় রহিল না। তরবারি, নেযা, বড়শা প্রভৃতি দ্বারা উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মহামান্য খলিফার সেনাদল মহাপরাক্রমের সহিত যমদূতের ন্যায় খারেজী-দিগের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খারেজী-দিগের প্রধান প্রধান নেতা আবদুল্লা-বিন্-অহব, যায়দ-বিন্-হছিন, মরকুচ-বিন্-যহির, আবদুল্লা-বিন্ শজরাঃ, শরিহ-বিন্-আওফি প্রভৃতি একে একে সমরশায়ী হইল। ৮৭১০ হাজার খারেজী

যোদ্ধৃপুরুষের মধ্যে মাত্র নয় জন খারেজী কোনওরূপে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল; অবশিষ্ট সকলেই মহাবীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শমন সদনে প্রেরিত হইল। হজরত আলী (রাজিঃ) খারেজীদিগের মৃত দেহগুলি কবরস্থ না করাইয়া, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঐ অবস্থায়ই ফেলিয়া রাখিয়া, কুফা অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই যুদ্ধে খারেজীদিগের সম্পূর্ণরূপে নিপাত সাধন হওয়াতে, এই দলের বিপক্ষতাচরণ হইতে হজরত আলী (রাজিঃ) সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিলেন। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন নহরওয়ানের যুদ্ধ হইতে অবসর লাভ করিয়া এক্ষণে শামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য রণ-সজ্জা করিতে লাগিলেন। তখন আশয়স্-বিন্-কায়স্ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে আমিরুল-মুমেনিন! আপনি শামের অভিযান কিছু দিনের জন্য মুলতবি (স্থগিত) রাখুন। সৈন্যদিগকে বিশ্রাম লাভের জন্য একটু অবসর দিন। কিন্তু হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহু তাঁহার এই প্রস্তাব পছন্দ করিলেন না। তিনি "নখলিয়া" নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, এবং আদেশ প্রচার কবিলেন যে, যে পর্য্যন্ত শাম আক্রমণ করিয়া বিজয় লাভ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন না করা হয়, সে পর্য্যন্ত যেন কেহ গৃহে প্রস্থান না করে। নখজিয়ায় অবস্থান কালে মহামান্য খলিফার আদেশ অমান্য করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ সেনা নিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। হজরত

আলী (রাজিঃ) সেনা নিবাস জনশূন্য দেখিয়া নিজেও কুফায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কুফায় পঁহুছিয়া মহামান্য আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু ছরদার (নেতা) দিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন; তাঁহারা উপস্থিত হইলে, এরূপ শৈথিল্য ও যুদ্ধ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পুনরায় শাম দেশ আক্রমণের অভিমত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক লোকই যুদ্ধের জন্য সম্মতি জানাইলেন, অবশিষ্ট সমস্ত লোক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কোনও উত্তরই প্রদান করিলেন না। অতঃপর কুফার সমস্ত অধিবাসী যোদ্ধৃপুরুষদিগকে আহ্বান করিয়া শাম আক্রমণ সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা প্রদান করিলেন; সকলে নীরবে সে বক্তৃতা শ্রবণ করিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য কোনওরূপ উৎসাহ বা আগ্রহ প্রকাশ করিল না। হজরত আলী (রাজিঃ) লোক-দিগের উৎসাহ হীনতা ও নীরবতা দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং চুপ হইয়া রহিলেন; শাম আক্রমণের যে সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া নিতান্তই মর্ম্ম বেদনা অনুভব করিলেন।

ইহাদ্বারা এরাকবাসী—বিশেষতঃ বস্রা ও কুফার অধিবাসী-দিগের চঞ্চল মতিত্ব, মানসিক দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা, মহামান্য খলিফার আদেশ প্রতিপালনে অনিচ্ছা প্রকাশ প্রভৃতি দেখিয়া বোধ হইল ইহাদের মধ্যে দিনী জোশ, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা

কর্ত্তব্য ভাজন, চিত্তের দৃঢ়তা, নেতার প্রতি অটল ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণের নিতান্তই অভাব ছিল। এজন্য খারেজী দল ধ্বংস ও নির্ম্মূল হইলেও তদ্দারা মহামান্য আমিরুল মুমেনিন কোনও রূপ লাভবান হইলেন না। তাহার আশালতা ফলবতী হইবার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

মিশরের অবস্থা।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, সফিন যুদ্ধের সময় মিশরের শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ-বিন্-আবিবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুর কোনই সাহায্য এবং হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই। তিনি অদূরদর্শিতা ও যুবকোচিত হঠকারিতা বশতঃ আমিরুল মুমেনিন হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ আনহুর পক্ষ-পাতী মিশরবাসিগণের সঙ্গে এইরূপ দুঃসময়ে যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ গোলমালে এমনই জড়িত হইয়া পড়িলেন যে, মিসর হইতে মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের যে বড় রকম সাহায্যের আশা ছিল, সে আশা সম্পূর্ণ নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল। তিনি শহিদ খলিফার প্রতি মহানুভূতি সম্পন্ন লোকদিগের সঙ্গে যুদ্ধ না বাঁধাইয়া, যদি একদল প্রবল সৈন্য সহকারে শাম দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ আক্রমণ করিতেন

কিংবা উপযুক্ত সেনাপতির অধীনে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য সফিন ক্ষেত্রে হজরত আলীর (রাজিঃ) সাহার্য্যার্থ পাঠাইতে পারিতেন, তাহা হইলে সফিন যুদ্ধের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইত। কিন্তু তাহা হইল না। শহিদ খলিফার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন মিশরের অধিবাসিগণ মোয়াভিয়া-বিন্-খদিজকে আপনাদের নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকরের (রাজিঃ) সঙ্গে যথানিয়মে বাকায়দাভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহারা কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভও করিল ; সুতরাং ক্রমশঃ তাহাদের দল পুষ্ট হইতে চলিল। এ ঘটনাও হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষে অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। সফিন যুদ্ধ হইতে অবসর লাভ করিয়া হজরত আলী (রাজিঃ) মহাবীর মালেক ওশতরকে জযিরার শাসন কর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। জযিরা ইরাকের উপদ্বীপাকৃতি শেষ ভাগ বা দক্ষিণাংশ। সম্ভবতঃ তখন উহা (সুবে জযিরাঃ) ইরাকে আরবের কিয়দংশ ও ইরাকে আজমের কিয়দংশ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। উহার উত্তর পশ্চিম দিকেই ছিল সুবে বস্রা। যাহা হউক মহামান্য খলিফা অল্পদিন পরেই এই যোগ্যতম পুরুষকে মিসরের গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। মোহাম্মদ-বিন-আবুবকর (রাজিঃ) যখন শুনিতে পাইলেন, মালেক ওশতর মিসরের গবর্ণর হইয়া আসিতেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। পক্ষান্তরে হজরত মোয়াভিয়া (রাজি)ও এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। কারণ মালেক ওশতারের বীরত্ব যোগ্যতা,

জন প্রিয়তা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি মিশরের গবর্ণর হইলে মহাবিপদের কথা। মালেক ওশতর মিশরের শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলে এবং সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে যে অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা অতি বিপদ সঙ্কুল। কিন্তু খোদাতালার ইচ্ছায় এমনই একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটিল যে, মালেক ওশতর মিশরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) প্রেরিত গুপ্তচর বিষ প্রয়োগে তাঁহার হত্যা সাধন করিয়াছিল। ইহা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াও মনে হয় না। মহাবীর মালেক ওশতরের আকস্মিক মৃত্যুতে মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ) পূর্ব্ববৎ মিশরের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে রহিয়া গেলেন। মালেক ওশতরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া হজরত আলী (রাজিঃ); মোহাম্মদ বিন্-আবুবকর (রাজিঃ)কে এই বলিয়া একখানি পত্র লিখিলেন যে, আমি তোমার প্রতি নারাজ (অসন্তুষ্ট) হইয়া মালেক ওশতরকে মিশরের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম না; কেবল এই জন্য তাহাকে মিশরের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল যে, সে রাজনৈতিক ব্যাপারে খুব পরিপক্ক ছিল; সুতরাং মিশরের ন্যায় জটিল সমস্যাপূর্ণ স্থানে তাহার দ্বারা রাজনীতি ঘটিত কার্য্য খুব উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। আর বর্ত্তমান অবস্থায় মিশরের জন্য রাজনীতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী একজন শাসন কর্ত্তারই বিশেষ প্রয়োজন

ছিল। এক্ষণে যখন মালেক ওশতর পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখন মিশরের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে তোমাকেই পূর্ব্ববৎ বহাল রাখা হইল। তোমার উচিত, শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে খুব সতর্কতা, সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করা। এই পত্রের উত্তরে মোহাম্মদ-বিন্- আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) লিখিয়া পাঠাইলেন, আমি আপনার অধীন ও আজ্ঞাবহ ; আপনার শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকি। এই ব্যাপার মধ্যস্থদিগের অভিমত প্রকাশের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

যখন আয্‌রাহ মধ্যস্থদিগের মীমাংসার ঘোষনা প্রচার হইল ; তখন শামবাসিগণ হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) হস্তে বায়েত করিল ; এতদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষমতা ও শওকত পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে তিনি হজরত আলীর (রাজিঃ) বিরুদ্ধাচারী ও বিদ্রোহী মোয়াভিয়া-বিন্‌-খদিজের সঙ্গে পত্র ব্যবহার আরম্ভ করিলেন ; এবং তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের সাহস ও আশা আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া তুলিলেন। উহারা ত মোহাম্মদ বিন্‌-আবুবকরের (রাজিঃ) সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতেছিল। এক্ষণে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পত্র পাইয়া তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। কূট রাজনৈতিক হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ত ইহাই চাহিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি ওমরু-বিন্‌-আছ (রাজিঃ)কে ছয় হাজার পরাক্রান্ত সৈন্য সহকারে মিশরে প্রেরণ করিলেন। ঐ সঙ্গে মোহাম্মদ-বিন্‌-আবুবকরের (রাজিঃ) নামে একখানি পত্রও

লিখিয়াছিলেন। ওমরু-বিন্-অল্-আছ (রাজিঃ) মিশরের নিকটে পঁহুছিয়া ঐ পত্রখানি মিশরের শাসনকর্ত্তার নিকট পাঠাইয়া ছিলেন। সেই সঙ্গে নিজেও একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। মোহাম্মদ-বিন-আবুবকর (রাজিঃ) ঐ উভয় পত্র রাজধানী কুফায় হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি এই পত্র পাইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, এবং কুফাবাসীদিগকে মিশর যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিপুল চেষ্টায় এবং উপদেশ দানে দুই হাজার অপেক্ষা অধিক সৈন্য মিশর রক্ষার জন্য যাইতে রাজী হইল না।

অগত্যা সেই ২০০০ দুই হাজার সৈন্যই মালেক-বিন-কায়াবের সৈন্যাপত্যে মিসরাভিমুখে রওয়ানা করিলেন। ওদিকে ওমরু-বিন্-অল্-আসের (রাজিঃ) গতিরোধার্থ মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ) কেনানাঃ-বিন্-বশরের নেতৃত্বাধীনে ২০০০ দুই হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সামা সেনা দলের সঙ্গে কেনানাঃ-বিন-বশরের যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে তিনি মহা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সৈন্যের অল্পতা বশতঃ পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার কতিপয় সৈন্য যুদ্ধে নিহত, অবশিষ্ট সৈন্যগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। এই পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া মোহাম্মদ-বিন-আবুবকর (রাজিঃ) স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু তাহার সৈন্যগণ বিজয়ী শামী সেনাদলের ভয়ে এমন ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়িল যে, তাহারা যুদ্ধ করিবে দূরে থাকুক,

তাঁহার দল ছাড়িয়া চতুর্দ্দিকে সরিয়া পড়িল। মোহাম্মদ-বিন-আবুবকর (রাজিঃ) যখন দেখিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গী কেহই ছিল না; অগত্যা তিনি জবলা-বিন-মশরুকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সামী সেনাদল ও মোয়াভিয়া-বিন-খদিজের অনুচরগণ আসিয়া জবলা-বিন-মশরুর গৃহ অবরোধ করিল। তখন মোহাম্মদ-বিন-আবুবকর (রাজিঃ) জীবনে নিরাশ হইয়া আশ্রয় দাতার গৃহ হইতে বাহির হইয়া শত্রুদলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই অবস্থায় তিনি সত্রুদল কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন। মোয়াভিয়া-বিন-খদিজ তাঁহাকে কতল (হত্যা—শহীদ) করিয়া একটী মৃত অশ্বের চর্ম্মের মধ্যে তাঁহার মৃত দেহ পূরিয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলিল। ভূতপূর্ব্ব মহামান্য প্রথম খলিফার পুত্রকে একজন খ্যাতনামা সাহাবীকে মোসলমান কর্ত্তৃক এরূপ শোচনীয়ভাবে মোসলমানগণই হত্যা করিয়া, এমন পৈশাচিক ভাবে তাঁহার মৃত দেহের অবমাননা করিল, পুড়াইয়া ফেলিল, ইহা শুনিতেও হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত এবং মর্ম্মাহত হয়। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, ওমরু-বিন-অল্-আস (রাজিঃ) কর্ত্তৃকই এই জঘন্য ও নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু একজন প্রধান সাহাবী যে এমন জঘন্য, নির্ম্মম ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ যখন হজরত আলী করমুল্লাহ

ওজস্থর (গুপ্তচর) আবদুর-রহমান-ইব্‌নে-শবত-ফযারী শাম হইতে আসিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মালেক-বিন-কায়াবকে ফিরাইয়া আনাইবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। ওদিকে মালেক-বিন-কায়াব মিশরের দিকে অল্প মাত্র পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে হোজাজ-বিন-আরফাঃ আনসারীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; তিনি মিশর হইতে এই মাত্র আসিতেছিলেন। তিনি মিশরের বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। মোহাম্মদ-বিন-আবুবকরের (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ড ও ওমরু-বিন্-অল্-আসের মিসর অধিকারের সংবাদ আদ্যোপান্ত তাঁহাকে শুনাইলেন; এই সময় হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুর পত্রও তাঁহার নিকট আসিয়া পঁহুছিল। সুতরাং মালেক-বিন্-কায়াব তৎক্ষণাৎ সসৈন্য কুফায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর হজরত আলী (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন; এবং ইহা বলিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিলেন যে, তোমাদেরই অমনোযোগ দৌর্ব্বল্য এবং সহানুভূতির অভাবে বিশাল মিসর দেশ আমার হস্তচ্যুত এবং শত্রুপক্ষের করতল গত হইল। এই বক্তৃতা শুনিয়াও কুফার হৃদয়হীন অস্থিরচিত্ত, কর্ত্তব্য বিমুখ অধিবাসিগণ চুপ করিয়া রহিল। হজরত আলী (রাজিঃ) নিরুপায় হইয়া শাম ও মিসর এই উভয় দেশের আশা পরিত্যাগ করিলেন। মোহাম্মদ-বিন- আবুবকর

(রাজিঃ) ৩৮ হিজরীতে অতি নির্দ্দয়ভাবে মিসরে শহিদ হইয়াছিলেন।

হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) কর্তৃক

অন্যান্য সুবা অধিকার করিবার প্রয়াস।

মহাসমৃদ্ধি সম্পন্ন বিশাল মিশর দেশ হস্তগত হওয়াতে হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) রাজ্য-বিজয়-পিপাসা এবং সমগ্র মোসলেম জগতের একচ্ছত্রাধিপতি হইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইল। মিসর হস্তগত করিবার পর তিনি সুবে বস্রা হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহুর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। বস্রার অবস্থা মিসরের মতনই ছিল। জমল যুদ্ধের পর বস্রার বহু সংখ্যক অধিবাসী হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; এবং হজরত ওসমানগণির (রাজিঃ) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাহারা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিত। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এ বিষয় অবিদিত ছিলেন না। তিনি আবদুল্লা-বিন-হজরমীকে এই উপদেশ দিয়া বস্রায় পাঠাইলেন যে, যে সকল বস্রাবাসী হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রতি অসন্তুষ্ট, এবং হজরত ওস্মানের (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক, উহাদিগকে আমাদের স্বপক্ষে আনয়নের জন্য চেষ্টা করিবে। তাহাদিগের

সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিয়া বস্রা হস্তগত করিবার উপায় অবলম্বন করিবে। এবনে হজরমি যখন বস্রায় পঁহুছিলেন, তখন বস্রার শাসনকর্ত্তা হজরত আবদুল্লা-বিন-আব্বাস্ (রাজিঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিবার জন্য কুফায় গমন করিয়াছিলেন। এজন্য আবদুল্লা-বিন-হয্রমীর পক্ষে সাফল্য লাভের বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছিল। আবদুল্লা-বিন-হযরমী এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই হজরত আলীর (রাজিঃ) বিরুদ্ধবাদী লোকদিগকে লইয়া, হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পক্ষাবলম্বী একটী বৃহৎ দল গঠন করিতে সমর্থ হইলেন। যখন এই সংবাদ কুফায় হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকটে পঁহুছিল, তিনি আয়ীন-বিন-ধবিয়াহকে এই উপদেশ দিয়া বস্রায় প্রেরণ করিলেন যে, যেরূপেই পার, কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক, এবনে হযরমীর পক্ষপাতী বস্রাবাসী লোকদিগকে তাঁহার সঙ্গে মত ভেদের এবং অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সমস্ত যোগাড় যন্ত্র নষ্ট করিয়া দিবে। তদনুসারে আয়ীন-বিন-ধবিরাহ বস্রায় পঁহুছিয়া বস্রাবাসী এবং এবনে হযরমীর মধ্যে মতভেদ এবং অনৈক্যের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন; তাঁহার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ৩৮ হিজরীর শেষ ভাগে এবনে হযরমী সহায় সম্পদহীন অবস্থায় বস্রায় নিহত হইয়াছিলেন।

৩৯ হিজরীর প্রারম্ভে আহলে কারেসা অর্থাৎ (নব বিজিত) পারস্যের বিধর্ম্মী অধিবাসীগণ যখন জানিতে পারিল যে বস্রার

লোকদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তথাকার কতক লোক হজরত আলীর (রাজিঃ) ভক্ত ও অনুরক্ত, এবং কতক লোক হজরত মোয়াভিয়ার (রাজি) পক্ষপাতী, সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পক্ষে ইহা স্বর্ণ-সুযোগ। তদনুসারে তাঁহারা তথাকার শাসনকর্ত্তা সহিল-বিন-হানিফকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) এই সংবাদ পাইয়া বস্রার শাসনকর্ত্তা হজরত আবদুল্লা-বিন-আব্বাস (রাজিঃ) কে পত্র লিখিলেন যে, যেয়াদকে পারস্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাও। সে যেন তথাকার বিদ্রোহ দমন করিয়া তথায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। তদনুসারে মহাবীর ও রাজনীতিতে সুপরিপক্ক যেয়াদকে পারস্যের গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইল; তিনি এক সুদক্ষ সেনাদল লইয়া সেখানে গমন করিলেন; এবং ভীষণ যুদ্ধে—তরবারি বলে বিদ্রোহ বহ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত করিলেন।

হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) যখন দেখিতে পাইলেন যে, হজরত আলীর (রাজিঃ) পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে কুফা এবং বস্রাবাসিগণ ইচ্ছুক নহে, আর চতুর্দ্দিকে বিপ্লব ও বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে; তাঁহার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে; তখন তিনি উপস্থিত সুযোগে নিজের অনেক সুবিধা করিয়া লইলেন। তিনি পুরস্কার ও তহফা দানে, আর্থিক সাহায্য প্রদানে, পূর্ব্বে যাহারা বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শনে, কাহাকেও কাহাকেও উচ্চপদ প্রদানে খুবই বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। শাম ও মিশরের ন্যায় দুইটী

সমৃদ্ধিশালী বিশাল দেশ তাঁহার অধিকৃত, অর্থ ও সৈন্যের অভাব নাই; উপযুক্ত কর্ম্মঠ কর্ম্মচারির প্রকাণ্ড দল তাঁহার অধীনে অবস্থিত, নিজে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও বীরপুরুষ। অমরু-বিন্-অল্-আস (রাজিঃ) তাঁহার মন্ত্রণাদাতা, সুতরাং কোনও দিক দিয়াই তাঁহার কোনও অভাব নাই। মদীনা তৈয়বা মক্কা মোয়জ্জমা, তায়েফ, এমন প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশ ও নগরাবলী হইতে দলে দলে লোক দামেস্কে গিয়া, শহরের লোক সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিল। দামেস্ক মোস্‌লেম জগতের সর্ব্বপ্রধান নগরে পরিণত হইল। সমাগত লোকেরা হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) আদর অভ্যর্থনায় ও অর্থ সাহায্যে তাঁহার অনুগত ও বশীভূত হইয়া পড়িলেন, যিনি যে কার্য্যের উপযুক্ত তিনি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নব-বিজিত মিসর দেশেও বহু লোকের চাকুরী হইল। সব দিকে আট ঘাট বন্ধ করিয়া হজরত মোয়াভিয়া নওমান-বিন্-বশিরকে একদল সৈন্যসহ আয়িনল্ তমরের দিকে পাঠাইয়া দিলেন। তত্রত্য শাসনকর্ত্তা মালেক বিন্-কায়াব মহামান্য খলিফাকে বিপদের সংবাদ জানাইয়াও কোন সৈনিক-সাহায্য পাইলেন না। নওমান-বিন্-বশির অতি সহজেই আয়িনল্-তমর অধিকার করিয়া লইলেন। সুফিয়ান-বিন্-অওফ্‌কে এক বিরাট বাহিনী সহ মদায়েনের দিকে রওয়ানা করিলেন; সুফিয়ান-বিন্-অওফ্ আন্‌বার, মদায়েন প্রভৃতি প্রদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক, লুণ্ঠন করিয়া বিপুল অর্থ ও সামগ্রী-সম্ভার হস্তগত করিলেন, এবং তাহা লইয়া দামেস্কে চলিয়া গেলেন।

সংবাদ পাইবামাত্র হজরত আলী (রাজিঃ) একদল ক্ষুদ্র সৈন্য লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু সুফিয়ানকে ধরিতে পারিলেন না।

এইরূপে বোসর-বিন্-আরতাত্‌কে হেজায্ ও এমনের দিকে সসৈন্যে পাঠাইলেন। মদীনাবাসিগণ হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) হস্তে বায়েত করিলেন; এমনবাসিগণ ও ঐ পন্থাবলম্বন করিল; বোসরা তত্রত্য শাসনকর্ত্তা ওবায়দুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ)কে এমনের রাজধানী "সানয়া" নগরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। স্থূল কথা, ৪০ হিজরীর প্রারম্ভেই এমন, হেজায, শাম, ফলস্তিন, মিসর প্রভৃতি দেশ, প্রদেশ, জনপদ হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) হস্তগত হইয়াছিল। আর এই বিজিত দেশ সমূহে কোনও প্রকার বিদ্রোহ-বিপ্লব, বা শাসন-দৌর্ব্বল্য অনুভূত হইতেছিল না। সর্ব্বত্রই শাসন-শৃঙ্খলা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মক্কা-মোয়াজ্জমা ও মদীনা-তৈয়বা এই উভয় পবিত্র নগরীকে নিরপেক্ষ রাখা হইয়াছিল। ইহা কোনও পক্ষেরই শাসনাধীন ছিল না; উভয় পক্ষই এই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে হজরত আলীর (রাজিঃ) হস্তে কেবল মাত্র এরাক ও বিরাট পারস্য দেশ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এরাক প্রদেশস্থ আরবদিগের এক প্রকাণ্ড দল হজরত আলীর (রাজিঃ) ও তাঁহার খেলাফতের সঙ্গে কোনও-রূপ সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল না। এইরূপে পারস্যের বিভিন্ন প্রদেশে ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহ বিরাজ করিতেছিল। পারস্যের

ভূতপূর্ব্ব অগ্ন্যুপাসক রাজশক্তি পুনরায় স্বদেশের স্বাধীনতার সুখ-স্বপ্ন দেখিতে এবং সকল দিক দিয়া সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিলেন। কুফা ও বস্রা শহরদ্বয় হজরত আলীর (রাজিঃ) খেলাফতের কেন্দ্র স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল; কিন্তু এই দুই শহরের ও বহু লোক হজরত আলীর (রাজিঃ) বিরুদ্ধাচারী ও হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন দৃষ্ট হইত। হজরত আলী রাজি আল্লাহ্ আন্হুর দুর্জ্জয় সাহস, অতুলনীয় বীরত্ব ও অনুপমেয় ধর্ম্ম-প্রাণতা সব কিছুই করিতে চাহিত; তিনি স্বীয় খেলাফৎকে সমগ্র ইস্‌লাম জগতের উপর একাধিপত্য বিস্তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গীয় ও সাহায্যকারী লোকদিগের চিত্ত-দৌর্ব্বল্য, নাফর-মানী (অবাধ্যতা)-প্রভাবে তিনি নিরুপায় ছিলেন। দুর্ব্বল-চেতা, কুটীলমনাঃ, লোভী ও স্বার্থপর লোকের দ্বারা তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসাই বিলীন হইতে চলিয়াছিল। আবার তাঁহার সেনাদলে আজমী অর্থাৎ পারস্যবাসী লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল; তজ্জন্যও হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) অনেকটা সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহা স্বত্বেও হজরত আলী রাজি আল্লাহ্ আন্হুর ব্যক্তিগত প্রাধান্য, সাহস, বীরত্ব—সর্ব্বোপরি জীবন্ত ও আদর্শ ধর্ম্মভাব তাঁহার পদ-মর্য্যাদাকে এত উচ্চে স্থান দিয়াছিল যে, হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) সর্ব্ব প্রকার সুবিধালাভ করাতেও আপনাকে তাঁহার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য দেখিতে পাইতেন। এজন্য এত দেশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়াও তিনি হজরত আলী

(রাজিঃ) সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইতে পারেন নাই। সর্ব্বদাই তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিতেন। তিনি একথা খুব জানিতেন যে, যদি ইরাক বাসিগণ তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত হয়, তাহা হইলে এ অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া সাফল্যলাভ করা আমার পক্ষে সুদূর পরাহত, কিন্তু আল্লাহতালার বিধান অন্যরূপ ছিল। মোসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম্মের বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তি কতকটা শিথিল হওয়াতে, প্রকৃত খেলাফতের এখান হইতেই অবসান আরম্ভ হয়। আদর্শ ধর্ম্ম-প্রাণ তাপস-কুল শিরোমণি হজরত আলী (রাজিঃ) এ অবস্থায়ও একমাত্র আল্লাহ তালার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিলেন, "শোকর" ও "ছবর" (আল্লাহতালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা) তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল।

হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাসের (রাজিঃ) বস্রা হইতে প্রস্থান।

হজরত আলীর (রাজিঃ) পরম আত্মীয় ও প্রকৃত হিতৈষীদিগের মধ্যে একমাত্র যোগ্য পুরুষ ছিলেন হজরত আবদুল্লা-বিন-অব্বাস (রাজিঃ)। ইঁনি যেমন হজরত আলীর (রাজিঃ) পিতৃব্য পুত্র, তেমনই হজরত রেছালত মাবের (দঃ) একজন উপযুক্ত ও প্রধান সাহাবী, বিখ্যাত হাদীস্-বেত্তা, মহাবিদ্বান্, মহাবীর ও শাসনকার্য্যে সুদক্ষ পুরুষ ছিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) প্রথম হইতে সকল সময়েই সকল

বিষয় ইঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য ইঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত রাজ্য ও প্রয়োজনীয় নগরী বস্রার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তিনিই খেলাফতের অধীনে প্রধান রাজ-প্রতিনিধি বা গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। নিকটবর্ত্তী অনেক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তাঁহার মতানুসারেই নির্ব্বাচিত হইতেন। জনসাধারণের উপরও তাঁহার বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। উপরোক্ত সময়ে—অর্থাৎ ৪০ হিজরীর প্রারম্ভ কালে একটী অপ্রীতিকর হৃদয় বিদারক ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। অর্থাৎ হজরত আলী রাজি আল্লাহ্ আন্‌হুর পূর্ব্বোক্ত হিতৈষী ভ্রাতা হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) তাঁহার (হজরত আলীর) প্রতি নারাজ হইয়া, বস্রার শাসন-কর্ত্তার পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কা-মোয়াজ্জমায় চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার যথাযথ বিবরণ এই :—বস্রা হইতে আবুল আছওয়াদ, হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাসের (রাজিঃ) বিরুদ্ধে মিথ্যা শেকায়েত (নিন্দা বা অপবাদ) পূর্ণ এক খানি পত্র, হজরত আলীর (রাজিঃ) নিকট লিখিয়া পাঠাইল। সেই পত্রের মর্ম্ম এই যে, হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) আপনার বিনানুমতিতে বায়তুল মালের অর্থ খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। হজরত আলী (রাজিঃ) এই পত্রের উত্তরে শোকরিয়া আদায় করিয়া (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক) এক খানি পত্র আবুল আছওয়াদকে লিখিয়া পাঠাইলেন; ঐ পত্রে ইহাও লিখিলেন যে, তুমি সর্ব্বদা এই প্রকারের এত্তেলা

আমাকে লিখিয়া পাঠাইবে। শাসনকর্ত্তাদিগের বিপথগামী হওয়া সম্বন্ধে সংবাদাদি সর্ব্বদা আমাকে দিবে। হামদর্দ্দী (সহানুভূতি) ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইহাই দলিল। ওদিকে হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তোমার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে; এ সম্বন্ধে তুমি কি বলিতে চাও? তাঁহার নামীয় পত্রে আবুল আছওয়াদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছিল না। উত্তরে হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) মহামান্য খলিফাকে লিখিলেন, আপনি যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। আমি যে অর্থ ব্যয় করিয়াছি, উহা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি; উহার সঙ্গে বায়তুল মালের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই পত্র পাইয়া হজরত আলী (রাজিঃ) দ্বিতীয় পত্রে লিখিলেন যে, যদি উহা তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা অর্থ হয়, তবে ইহা জানাও যে, তুমি ঐ অর্থ কোথায় এবং কিরূপে পাইলে; আর সেই অর্থ কোথায় রাখিয়াছিলে? এই শেষোক্ত পত্রের উত্তরে হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) লিখিলেন, আমি এরূপ গবর্ণরী (শাসনকর্তৃত্ব) পদে থাকিতে ইচ্ছা করি না। আপনি যাহাকে ইচ্ছা বস্রার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। আমি যে অর্থ ব্যয় করিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই আমার ব্যক্তিগত অর্থ। ঐ অর্থ স্বাধীনভাবে খরচ করিবার অধিকার আমার ছিল। এই পত্র লিখিয়াই

তিনি প্রবাসের উপযোগী জিনিষ-পত্র সংগ্রহ করিয়া বস্রা পরিত্যাগ করিলেন; এবং মক্কা-মোয়াজ্জমায় পঁহুছিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

হজরত আলী করমুল্লাহ্‌ ওয়াজহুর শাহাদত।

যখন হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) নারাজ হইয়া বস্রার শাসনকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কা-মোয়াজ্জমায় চলিয়া গেলেন; ঠিক ঐ সময়ই হজরত আলীর (রাজিঃ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত আকিল-বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ) তাঁহার প্রতি নারাজ হইয়া, হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) নিকট দামেস্কে চলিয়া গেলেন। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার জন্য উচ্চ মোশাহেরা (বৃত্তি) নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এই ব্যাপারে হজরত আলীর (রাজিঃ) হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি পদে পদে অপ্রতিভ হইয়া হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। তিনি কুফাবাসীদিগের নিকট আবার হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। এবার তাঁহার হৃদয়াকর্ষী বক্তৃতায় সুফল প্রদান করিল। কুফাবাসীর হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। ৬০ হাজার কুফাবাসী যোদ্ধৃ-পুরুষ এই বলিয়া তাঁহার হস্তে বয়েত করিল যে, আমরা

প্রাণ থাকিতে আপনাকে পরিত্যাগ করিব না; এবং মরিতে কিংবা মারিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকিব। তিনি এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ৬০ হাজার যোদ্ধৃপুরুষ ব্যতীত আরও সৈন্য সংগ্রহেও যুদ্ধ-সামগ্রী এবং রসদ সংগ্রহের যোগাড়ে প্রবৃত্ত হইলেন, সর্ব্বত্র যুদ্ধের সাড়া পড়িয়া গেল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, নহরওয়ানের যুদ্ধে খারেজি-কুল সম্পূর্ণ রূপ নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল; প্রকাশ্যতঃ এই বিপ্লববাদী সম্প্রদায়ের দ্বারা কোনওরূপ অনিষ্ট পাতের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু পাঠকগণ অবগত আছেন, নহর-ওয়ানের যুদ্ধ হইতে মাত্র ৯ জন খারেজী প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উত্তর কালে এই নয় ব্যক্তি খারেজীদিগের দলপতি এবং এমামের পদলাভ করিয়াছিল। ইহারা নহরওয়ানের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমতঃ পারস্যের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; তাহারা সেই সকল স্থানে খারেজী মতের বীজ বপন এবং হজরত আলীর (রাজিঃ) বিরুদ্ধে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে ছিল। সেখানে বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার নানাপ্রকার চেষ্টায়ও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন হেজাজ ও এরাকে প্রবেশ করিয়া ভবঘুরের ন্যায় ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল।

অবশেষে আবদুর-রহমান-বিন-মলজম মোরাদী, বরক-বিন্-আব্দুল্লা এতিমি, ওমরু-বিন্-বকর-এতিমি এই তিন ব্যক্তি

মক্কা শরীফে গিয়া একত্রিত হইল; এবং নহরওয়ানে নিহত স্বদলস্থ লোকদিগের জন্য বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিল। অবশেষে তাহারা এক মতাবলম্বী হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, যে তিন ব্যক্তির জন্য ইস্‌লাম জগতে মহা অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে,—মোসলমান-দিগের শোণিতে ধরাপৃষ্ঠ রঞ্জিত হইতেছে, ঐ তিন ব্যক্তি অর্থাৎ (হজরত) আলী (রাজিঃ), (হজরত) মোয়াভিয়া (রাজিঃ) এবং (হজরত) ওমরু-বিন্-অল্-আছ (রাজিঃ), এই তিন জনের হত্যাসাধন করিতে হইবে। তাহারা পরস্পর একথায় ও মীমাংসা করিয়া লইল যে, কে কাহাকে হত্যা করিবে। হজরত আলী (রাজিঃ)কে হত্যা করিবার ভার গ্রহণ করিল যেরূপেই হউক, দুরাত্মা আবদুল-রহমান্-বিন্-মলজম মোরাদী-মিসরী, হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ)কে হত্যা করিবার ভার লইল বরক-বিন্-আবদুল্লা এতিমি; আর হজরত ওমরু-বিন্-অল্-আছ (রাজিঃ)কে হত্যা করিবার ভার পড়িল ওমরু-বিন্-বকর এতিমি সায়াদীর উপর। এই হত্যাকাণ্ড একই তারিখে, একই সময়ে সম্পাদিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। তদনুসারে ১৬ই রমজান-অল্-মবারক জুমার দিন ঠিক ফজরের সময় হত্যা কার্য্য সমাধা করা হইবে, পরস্পর ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। অতঃপর এই তিন ব্যক্তি মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে কুফা, দামেস্ক এবং মিসরাভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল। এবং নির্দ্দিষ্ট

স্থানে গিয়া পঁহুছিল। যখন রমজান শরীফের নির্দ্দিস্ট তারিখ আসিল, সেই দিন (জুমার দিন প্রাতঃকালে) যখন হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) দামেস্কের জামে মসজেদে ফজরের নামাজের এমামতি করিতেছিলেন, ঐ সময় বরক-বিন্-আবদুল্লাহ এতিমি তাঁহাকে তরবারির এক আঘাত করিল, এবং মনে করিল, তরবারির ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে; তাঁহার দফা রফা হইয়াছে। সে তলোয়ারের আঘাত করিয়াই দ্রুতগতি পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধৃত হইল। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের কোনও আশঙ্কা ছিল না; উপযুক্ত চিকিৎসার ফলে তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন। বরক শাস্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কতল্ (প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—হত্যা।) করা হয়; কেহ কেহ বলেন, তাহাকে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া পরে তাহার শিরচ্ছেদ করা হইয়াছিল। ইহার পর হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) নিজের জন্য মসজেদে স্বতন্ত্র সুরক্ষিত স্থান তৈয়ার করাইয়াছিলেন; এবং স্বীয় জীবন রক্ষার্থ প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঠিক ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ওমরু-বিন্-বকর মিসরের জামে মসজেদে খারজা-বিন-আবিজয়বাঃ-বিন্-আমেরকে ফজরের নমাজের এমামতি করিবার অবস্থায়, ওমরু-বিন্-আছ (রাজিঃ) মনে করিয়া তরবারির একই

আঘাতে হত্যা করিল। ঘটনা বশতঃ ঐ দিন হজরত ওমরু-বিন-আল্ আছ (রাজিঃ) অসুস্থতা বশতঃ মস্জেদে এমামতি করিতে আসিতে পারিয়াছিলেন না; সেই জন্য স্বীয় এক জন প্রধান সামরিক অফিসার (সেনাপতি) খারজাঃ-বিন্-আবি হুয়রাঃকে এমামতি করিবার আদেশ দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকেই প্রাণ দিতে হইল। হজরত ওমরু-বিন-আল্-আসের (রাজিঃ) আয়ুকাল তখনও পূর্ণ হইয়াছিল না, সুতরাং তিনি বাঁচিয়া গেলেন। আবার ঠিক ঐ দিবসই কুফার জামে-মস্জেদে আবদুর রহমান বিন্ মলজম, ফজরের নমাজের সময় হজরত আলী রাজি আল্লাহ আলাহুকে আক্রমণ করিল। তাহার তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে তিনি ভাষণরূপে আহত হইলেন। তাঁহার পবিত্র মস্তকে এই ভীষণ আঘাত লাগিয়া ছিল; সেই নিদারুণ আঘাতেই অজস্র রক্তপাত হইয়া ২ দিন পরে, ১৭ই রমজানুল-মবারক ৪০ হিজরীতে, আদর্শ ধার্ম্মিক মহাপুরুষ, আদর্শ মহাবীর হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু শহীদ হইলেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না এলায়হে রাযেউন)। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এই যে, আবদুর রহমান-বিন-মলজম কুফা নগরে আসিয়া স্বীয় বন্ধু-বর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল; কিন্তু কাহারও নিকট আপনার অভিসন্ধি ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিল না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বীয় অকৃত্রিম বন্ধু শবয়েত-বিন্-শজরাহ্ আশজয়ার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাহার

নিকট এ বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিল; এবং ইহাও বলিল, আমাদিগকে নহরওয়ানের নিহত ভাই-বন্ধুদিগের জীবনের পরিবর্ত্তে হজরত আলীর (রাজিঃ) হত্যাকার্য্য সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রথমে শবয়েত তাহাকে এই ভীষণ সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইল, অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার এই দুষ্কার্য্যে সাহায্য করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। এতিমি সম্প্রদায়ের যে দশ জন লোক খারেজী দল-ভুক্ত হইয়া নহর-ওয়ানের যুদ্ধে যোগাদান করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। ঐ নিহত ব্যক্তিদিগের যে সকল আত্মীয়-অন্তরঙ্গ কুফা নগরে বাস করিত, তাহারা হজরত আলীর (রাজিঃ) প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট ও বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিল। এব্‌নে মলজম ঐ সকল লোকের গৃহে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, এবং তাহাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলিত মিশিত। ঐ দলের এক গৃহে সে এক পরমা সুন্দরী রমণী-রত্নকে দেখিতে পাইল। ঐ সুন্দরীর নাম কতাম। ঐ রমণীর পিতা এবং ভ্রাতা উভয়েই নহরওয়ানের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। এই অনিন্দ্য সুন্দরীকে দেখিয়া আবদুর রহমান তাহার রূপ মোহে একেবারে উন্মত্তবৎ হইল; এব্‌নে মলজম সুন্দরীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। রমণী বলিল, যদি বিবাহের পূর্ব্বে আমার মোহর (দেন-মোহর) আদায় করিয়া দাও, তবে আমি তোমার সঙ্গে উদ্বাহ-বন্ধনে বন্দীভূতা

হইতে রাজী আছি। যখন এব্‌নে মলজম মোহরের পরিমাণ জানিতে চাহিল, তখন সে বলিল, মোহরের পরিমাণ ৩ হাজার দরহম (দেরেম), একটী দাসী, একটী দাস এবং হজরত আলীর (রাজিঃ) কর্ত্তিত মুণ্ড (ছিন্ন মস্তক)। এবনে বলজম ত হজরত আলীর (রাজিঃ) হত্যা সাধনের উদ্দেশ্যে আসিয়াই ছিল, সে বলিল, আমি কেবল মাত্র শেষ সর্ত্ত পূর্ণ করিতে পারি। অন্যান্য সর্ত্ত পালন করিতে—অর্থাৎ মোহরের অন্যান্য দ্রব্য আদায় করিতে আমি সম্প্রতি অক্ষম। প্রতিহিংসা-পরায়ণা কতাম বলিল, যদি তুমি শেষ সর্ত্ত পালন করিতে পার, তবে অবশিষ্ট দ্রব্যের দাবী আমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য আছি। এব্‌নে মলজম বলিল, যদি তুমি ইহাই চাও যে আমি হজরত আলী (রাজিঃ)কে হত্যা করিতে সাফল্য লাভ করি, তবে তুমি এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। কতাম তাহার ঐ প্রস্তাবে রাজি হইল। সে তাহার আত্মীয়ের মধ্যে দরদান নামক এক ব্যক্তিকে এব্‌নে মলজমের সাহায্যকারী রূপে নিযুক্ত করিল। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট তারিখে, ১৬ই রমজানুল মবারক—জুমার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল; এব্‌নে মলজম, শবিব-বিন্‌-শজরাঃ ও দরদান এই তিন পাষণ্ড রাত্রির শেষ ভাগে কুফার জামে-মস্‌জেদে আসিল; এবং মস্‌জেদের দরওয়াজার নিকট চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হজরত আলী (রাজিঃ) যথানিয়মে নমাজীদিগকে মস্‌জেদে আসিবার জন্য আহ্বান করিতে করিতে মস্‌জেদের দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন, এই সময় দরদান অগ্রসর হইয়া

তাঁহার প্রতি তরবারির আঘাত করিল; কিন্তু ঐ আঘাত মস্‌জেদের দরওয়াজাস্থ চৌকাঠে কিংবা প্রাচীরে লাগিল; সুতরাং তাহার আঘাত নিষ্ফল হইল। হজরত আলী মরতুজা (রাজিঃ) লম্ফ দিয়া যখন মস্‌জেদের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন এবনে মলজম তীব্র গতিতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার গরদানে (ঘাড়ে) সবলে তরবারির ভীষণ আঘাত করিল। সে আঘাত বড়ই সাঙ্ঘাতিক ছিল। তিনি মস্‌জেদে সমাগত মুসল্লি-দিগকে আদেশ করিলেন যে, উহাদিগকে ধৃত কর। তৎক্ষণাৎ লোকেরা তাহাদিগকে ধরিবার জন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। দরদান ও সবিব দ্রুতবেগে ছুটীয়া পলাইল, কিন্তু এব্‌নে মলজম মস্‌জেদ হইতে বাহির হইয়া যাইবার অবসর পাইল না। সে তাড়াতাড়ি মস্‌জেদের এক কেনারে আত্ম-গোপন করিল, কিন্তু লোকেরা তৎক্ষণাৎ সেই নর-পিশাচকে ধরিয়া ফেলিল। হযরমী নামক এক ব্যক্তি শবিবকে ধরিয়া ছিল, কিন্তু সে তাহার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিল; তাহাকে আর ধরা গেল না। দরদান পলায়ন করিয়া তাহার গৃহের নিকট পর্য্যন্ত গিয়া পঁহুছিয়াছিল, কিন্তু লোকেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, সেই স্থানেই তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। এব্‌নে মলজম ধৃত হইয়া হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর হুজুরে আনীত হইল; তিনি বলিলেন, যদি আমি এই যখমে (আঘাতে) মারা যাই, তবে তোমরা ইহাকে হত্যা করিবে; আর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়,

তাহাই করিব। পরে তিনি বনু-আবদুল মোত্তালেব অর্থাৎ আবদুল মোত্তালেবের বংশধরদিগকে (বনি-হাশেমকে) এই বলিয়া অছিয়ত করিলেন যে, "আমার কতল হওয়া—অর্থাৎ হত্যা-কাণ্ডকে মোসলমানদিগের মধ্যে শোণিতপাতের একটা 'বাহানা' করিয়া লইবে না। এই একই মাত্র ব্যক্তিকে আমার হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যা করিবে।" পরে হজরত আলী (রাজিঃ) স্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র হাসান (রাজিঃ)! যদি আমি এই যখমে (আঘাতে) মৃত্যুমুখে পতিত হই, তবে তুমি উহাকে (হত্যা কারী এব্‌নে মলজমকে) তলোয়ারের একই আঘাতে হত্যা করিবে; কিন্তু মছলাহ করিবে না (নাক কাণ কাটিবে না); কারণ হজরত রেছালতমাব (সালঃ) মানুষের নাক কাণ কাটিতে নিষেধ করিয়াছেন। এব্‌নে মলজমের সেই প্রচণ্ড তরবারির আঘাত হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর কাণপটি (কর্ণমূল) পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল, আর তরবারির ধার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল; তিনি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জুমার দিন ও পরবর্ত্তী রাত্রি পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলেন। ১৭ই রমজান-অল্-মবারক শনিবার দিন তাঁহার পবিত্র প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ রাজ্যে চলিয়া গেল। তাঁহার পরলোক গমনের কিছুকাল পূর্ব্বে জবব-বিন্-আবদুল্লাহ আসিয়া আরজ করিলেন, যদি আপনি আমাদিগ হইতে 'জুদা' হইয়া যান (পরলোক গমন করেন), তবে আমরা হজরত এমাম হাসানের

(রাজিঃ) হস্তে কি বায়েত করিব ? তদুত্তরে হজরত আমিরুল-মুমেনিন খলিফাতুল-মুস্‌লেমিন (রাজিঃ) বলিলেন, আমি এ সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিব না, তোমরা যাহা কর্ত্তব্য মনে কর, তাহাই করিবে। পরে তিনি এমাম (রাজিঃ) ভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে পরম করুণাময় আল্লাহ্-তালার আদেশ পালনে এবং পার্থিব-ব্যাপারে নিমগ্ন হইয়া না থাকার জন্য অছিয়ত (উপদেশ প্রদান) করিয়া যাইতেছি। কোনও দ্রব্য হস্তগত ও কোন উদ্দেশ্য সাধন না হইলে, তজ্জন্য আফ্‌সোস্ (আক্ষেপ—দুঃখ-প্রকাশ) করিবে না। সর্ব্বদাই হক্ বাক্য (ন্যায্য কথা) বলিবে ; এতিম (অনাথ বালক বালিকা)দিগের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রদর্শন করিবে ; নিরুপায় দরিদ্র লোকদিগকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিবে, জালেমের (অত্যাচারীর) দোস্মণ (শত্রু) এবং মজলুম (উৎপীড়িত) লোকদিগের সাহায্যকারী হইবে। কোর-আন শরীফের আদেশ প্রতিপালন করিবে : আর খোদাতালার আদেসানুযায়ী কার্য্য করিতে শত্রুদিগের শত্রুতাচরণে ভীত হইও না। পরে মোহাম্মদ বিন্-হানিফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাকেও আমি ঐ সকল উপদেশ প্রদান করিতেছি, তদ্ব্যতীত তোমাকে তোমার এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবার জন্যও তাঁহাদের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন জন্য অছিয়ত করিয়া যাইতেছি। কারণ, ইহাদের হক্ তোমাদের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদের মতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করাই

তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তৎপর হোসনায়েনের (রাজিঃ) প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদিগের ও মোহাম্মদ-বিন্-আলি-হানিফার প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ প্রদর্শন ও তাহার দ্বারা কোনও দোষ-ক্রটী হইলে তাহা ক্ষমা করিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজনোচিত করুণ, নম্র ও সদয় ব্যবহার করা উচিত জানিবে। পরে একটী সাধারণ অছিয়ত লিপিবদ্ধ করাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা পূর্ণ করিবার অবসর ঘটিল না। "লায়লাহা ইল্লাল্লাহ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পবিত্র জীবনের অবসান হইল। পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অকালে অস্তমিত হইয়া গেল। তাঁহার পবিত্র গৃহ শোক্-পুরীতে পরিণত হইল। কুফা নগরে শোকের প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হইল। হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, কোরআনের প্রকৃত আদেশ-বাহক "বিশ্বাসী-গণের নেতা" পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহুর শাহাদতের অব্যবহিত পরেই এব্‌নে মলজম হজরত এমাম হাসানের (রাজিঃ) সমীপে আনীত হইল। তিনি তরবারির এক আঘাতেই তাহার পাপ-দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। আমিরুল-মুমেনিন খলিফা-তুল মুস্‌লেমিন হজরত আলী রাজি আল্লাহ আন্‌হুর বয়ঃক্রম ত্রিষট্টি বৎসর হইয়াছিল। পৌণে পাঁচ বৎসর খেলাফৎ করিবার পর শহিদ হইলেন। হজরত হাসন-বিন্-আলী (রাজিঃ), হজরত হোসায়েন-বিন্-আলী (রাজিঃ) এবং হজরত আবদুল্লা-বিন্-জাফর

(রাজিঃ) তাঁহার পবিত্র দেহ ধৌত করিলেন (গোছল দেওয়াইলেন), তিন খানি বস্ত্র দ্বারা কাফন দেওয়া হইল, কিন্তু তাহাতে কামিজ ছিল না। হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ) তাঁহার জানাযার নমাজ পড়াইলেন। কোনও কোনও রওয়ায়েতানুসারে তাঁহার পবিত্র দেহ কুফার জামেয় মস্‌জেদে সমাহিত হইয়াছিল ; কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নিজ গৃহে (হুজরায়), কাহারও কাহারও মতে কুফা হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থানে তাঁহার সমাধি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, খারেজিগণ তাঁহার পবিত্র মৃতদেহের কোনওরূপ অবমাননা করে, এই আশঙ্কায় হজরত এমাম হাসান আলায়হেস্‌-সালাম পিতার মৃতদেহ পূর্ব্ব কবর হইতে তুলিয়া অন্য কোনও গোপনীয় স্থানে সমাহিত করিয়াছিলেন। এই রওয়ায়েতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। খারেজীদিগের দ্বারা তাঁহার পবিত্র মৃতদেহের বা কবরের অসম্মান হইবার খুবই আশঙ্কা ছিল। তাঁহার প্রতি এই হতভাগ্য ভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট দলের বড়ই আক্রোশ ছিল। অন্য এক রওয়ায়েতে আছে যে, তাঁহার তাবুত মদীনা শরীফে, হজরত রেছালত মাবের (দঃ) কবরের সান্নিধ্যে দফণ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল, যে উটের উপর জানাযাঃ ছিল, পথিমধ্যে সেই উটটী পলায়ন করে ; উহা আর পাওয়া যায় নাই। আর এক রওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঐ হারান উটটী তয় প্রদেশের লোকদের হস্তগত হয়, তাহারা তাবুত নামাইয়া হজরত আলীর (রাজিঃ) পবিত্র মৃত-

দেহ সেই স্থানে দফণ করে। অপর রওয়ায়েত অনুসারে জানা যায় যে, আব্বাস বংশীয় জগদ্বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অল্ রশিদ, হজরত আলী রাজি আল্লাহ্ আনহুর কবরের সন্ধান পান, এবং তাঁহার পবিত্র কবর শরীফের উপর সুদৃশ্য সমাধি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ক্রমে উহা এক মহাতীর্থে পরিণত হয়, এক্ষণে উহা "নজফ-আশরফ্" নামক একটী পরম সমৃদ্ধি সম্পন্ন বৃহৎ নগরে পরিণত হইয়াছে। শিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে উহা কারবালার ন্যায় একটী প্রধান তীর্থ স্থান। বহু শিয়া মোশ্তা-হেদ ও আলেম হেজরত করিয়া তথায় গিয়া বাস করেন। শত সহস্র শিয়ার সমাধি-পরম্পরায় ঐ পবিত্র নগরী সমাচ্ছন্ন। সোন্নত জামাতের মোসলমানগণও ভক্তি সহকারে ঐ কবর জেয়ারত করেন। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও কোনও লোক হজরত আলী (রাজিঃ)কে রছুল আকরমের (দঃ) অপেক্ষা উচ্চ সম্মান প্রদান করে; এমন কি, কেহ কেহ আল্লাহ জল্লশানহুর পবিত্র আসনে বসাইতেও ইতস্ততঃ করে না, উহারা মহাভ্রান্ত।

হজরত আলী রাজি আল্লাহ্ আনহুর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ।

ইতিহাস-বেত্তাগণের মতে হজরত আলী (রাজিঃ) নয়টী বিবাহ করেন; তাঁহাদের গর্ভে ১৪টী পুত্রসন্তান ও ১৭টী কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। তাঁহার প্রথম নেকাহ্ (বিবাহ) হজরত রছুল-নন্দিনী, স্বর্গের মহারাজ্ঞী হজরত ফাতেমা জোহরা রাজিআল্লাহ আন্‌হার সঙ্গে হইয়াছিল, একথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার গর্ভে দুইটী ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র ও দুইটী কন্যা-রত্ন জন্ম-গ্রহণ করেন। পুত্র হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোসায়েন (রাজিঃ); আর কন্যাদ্বয় হরজত জয়নব (রাজিঃ-আঃ) ও হজরত কুলসুম (রাঃ-আঃ)

২। হজরত ফাতেমা রাজিআল্লাহ আন্‌হার পরলোক গমনের পর হজরত আলী (রাজিঃ), ওম্মোল নহিন বিন্তে হরাম কলাবিয়া (রাজিঃ)কে বিবাহ করেন; তাঁহার গর্ভে আব্বাস (রাজিঃ), জাফর (রাজিঃ), আবদুল্লা (রাজিঃ), ওস্মান (রাজিঃ) এই চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

৩। তৃতীয় বিবাহ লায়লী-বিন্তে মসঊদ-বিন-খালেদ (রাঃ-আঃ)কে করেন; ইঁহার গর্ভে ওবায়াদুল্লাহ্ ও আবুবকর নামক দুইটী পুত্রের জন্ম হয়।

৪। চতুর্থী পত্নী আস্‌মা বিন্তে-য়্যামিসের (রাজিঃ) গর্ভে মোহাম্মদন-আল্-আছগর (রাজিঃ) ও ইয়াহ্ইয়া (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। শেষোক্ত আট ভ্রাতা কারবালার মহাযুদ্ধে আপনাদের পরম শ্রদ্ধা-ভাজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত ইমাম হোসায়েন রাজি আল্লাহ আন্‌হুর সঙ্গে শহীদ হইয়াছিলেন।

৫। পঞ্চম বিবাহ এমামা বিন্তে-আমিল-আছ-বিন-আর রবির

বিন্‌-আবদুল্ কারি, বিন-আব্‌দশমছ (রাজিঃ)কে করেন ; যাঁহার মাতা যয়নব বিন্তে রসুলোল্লাহ অর্থাৎ ইঁনি হজরত রেছালত মাবের (দঃ) দৌহিত্রী ছিলেন। ইহার গর্ভে মোহাম্মদনল্‌ আওছত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৬। ষষ্ঠ বিবাহিতা পত্নী খোলা-বিন্তে জাফর (রাঃ-আঃ) ইঁহার হানফিয়া বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। ইঁহার গর্ভে একটী মাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার নাম মোহাম্মদনল্‌-আকবর ; সাধারণতঃ ইনি মোহাম্মদ-বিন্‌-আল্‌ হানিফাঃ নামে প্রসিদ্ধ। ইনিও মহাবীর পুরুষ ছিলেন ; কিন্তু কারবালার যুদ্ধে ইঁনি উপস্থিত ছিলেন না। হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-যোবায়েরের সঙ্গে একটী যুদ্ধে পরাস্ত হন। তায়েফ নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৭। সপ্তম পত্নীর নাম ছহবাঃ-বিন্তে রবিয়া তগ্‌লবিয়া (রাজিঃ)। ইঁহার গর্ভে ওম্মল হাসন রোমলরানোতুল কোবরা নামক পুত্র ও ওম্মে কোলছুম ছোগরা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

৮। অষ্টম স্ত্রীর নাম বিন্তে-ওমরা :—আল কায়েছ (রাঃ-আঃ) বিন্‌-আদিঃ কল্‌বি। ইঁহার গর্ভে একটী কন্যা-সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া, শৈশবেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

৯। নবম পত্নী একটী ক্রীতদাসী বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইঁহার এক মাত্র পুত্র মোহাম্মদ আছগর (রাজিঃ) কারবালার যুদ্ধে শহিদ হন।

হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজ্হুর আরও কয়েকটী কন্যা ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম জানা যায় না। অওন-বিন্-আলী (রাজিঃ) নামক তাঁহার একটী পুত্রের নাম জানা যায়, তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আছমাঃ-বিন্তে-আমিছ (রাঃ-আঃ)এর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

আমিরুল-মুমেনিন, খলিফাতুল-মোস্লেমিন হজরত আলী রাজি আল্লাহ-আনহুর বংশ-তরু কেবল মাত্র এই পাঁচটী পুত্র হইতে এযাবৎ দুনিয়াতে বিদ্যমান আছেন; ১। হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ), ২। হজরত এমাম হোসায়েন (রাজিঃ), ৩। হজরত মোহাম্মদ-বিন্-হানিফাঃ (রাজিঃ), ৪। হজরত আব্বাস (রাজিঃ), ৫। হজরত ওমর (রাজিঃ)। আর কোনও পুত্রের বংশ বিদ্যমান ছিল না। অনেকেই অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু-গ্রাসে পতিত বা শহিদ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ পুত্রের সন্তান-সন্ততি হইতে পৃথিবীতে মহা সম্মানিত সৈয়দ বংশ বিদ্যমান। তন্মধ্যে এমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশধরগণই প্রকৃত সৈয়দ, ইঁহারা হাসানী ও হোসায়নী নামে অভিহিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বস্ত কুর্সীনামা ব্যতীত প্রকৃত সৈয়দ-বংশ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

খেলাফৎ অলুভির প্রতি এক নযর।

হজরত আলী রাজি আল্লাহ-আন্হুর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে

সর্ব্বোচ্চ পদের, হজরত রেসালত মাবের (দরুদ) সম্পূর্ণ পদানুসরণ কারী আদর্শ ধর্ম্মবীরের অন্তর্ধান হইল। তিনি পবিত্র কোর-আন ও হাদীসের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়া চলিতেন। উপাসনা ও আরাধনায় তাঁহার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত। তাঁহার জীবনান্তের সঙ্গে সঙ্গে মোস্‌লেম জগতের সর্ব্ব প্রধান স্তম্ভটী ভগ্ন হইয়া পড়িল; তাঁহার পরে এমন কোনও মহাপুরুষ অবশিষ্ট রহিলেন না, সমগ্র মোস্‌লেম জগতের উপর যাঁহার প্রভাব বিস্তৃত ও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। এমন কেহ জীবিত থাকিলেন না, যিনি নহিআল্ মন্‌কের এবং আম্‌রে বিল্ মায়ারুফ্ করিতে পারেন। হজরত আলীর (রাজিঃ) শহিদ হওয়ার সংবাদ পাইয়া ওম্মোল-মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজি-আঃ) ফরমাইয়া ছিলেন, "এক্ষণে আরব জাতির যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারে; কারণ আলী রাজি আল্লাহ্ আন্‌হুর পরে এমন কোনও ব্যক্তি অবশিষ্ট রহিলেন না, যিনি তাহাদিগকে মন্দ কার্য্য হইতে বিরত রাখিতে পারেন—মানা করেন।" অবশ্য একথা মনে করা চাই না যে, হজরত আলী রাজি আল্লাহ আন্‌হুর পরে ছাহাবা (রাজিঃ)গণ "আমরে-বিন-মায়ারুফ" এবং "নহি আল্ মোন্‌কের" এর কার্য্য ছাড়িয়া দিতেন। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) যদিও হজরত আলীর (রাজিঃ) সঙ্গে ভয়ানক শত্রুতাচরণ করিতেন কিন্তু মজহাবী মস্‌লা-মসায়েলের ফতওয়া তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায়

তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। তিনি পার্থিব কোনও বিষয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন, কিংবা খোদা ও রছুলের আদেশ সম্বন্ধীয় কোনও কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। যাহা সত্য, যাহা ন্যায় তাহাই তাঁহার অবলম্বনীয় ছিল।

হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু পলিসী (চালবাজী) ও চালাকী হইতে পাক (পবিত্র) ছিলেন। তিনি কৌশল ও চালাকী দ্বারা কখনও কোন কার্য্যোদ্ধার করিতে প্রয়াস পান নাই। তাঁহার নিকট হক্ (ন্যায়) ও সত্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য ছিল। তিনি প্রথমতঃ হজরত রেছালত মাবের (দঃ) সর্ব্বাপেক্ষা করিবী রেশ্‌তাদার (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) ছিলেন বলিয়া আপনাকে খেলাফতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হক্‌দার বলিয়া মনে করিতেন; তদনুসারে তিনি পরিষ্কারভাবে ও কথায় ঘোষণা প্রচার করিয়া ছিলেন; তদনুসারে কিছু দিন পর্য্যন্ত হজরত আবুবকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আন্‌হুর হস্তে বয়েত করিয়া ছিলেন না। ঐ সময় হজরত আবুছুফিয়ান (রাজিঃ—হজরত মোয়াভিয়ার পিতা), হজরত আবুবকর সিদ্দিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, তখন তিনি নিতান্ত বিরক্ত ও ঘৃণার সহিত তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তিনি এইরূপ কার্য্যকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন। কিছু দিন পরে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, খেলাফৎ

ব্যাপারে রেশতাদারীরও (আত্মীয়তার) কোনওরূপ দখল নাই, বরঞ্চ উহার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য ও খেয়াল রাখাই একান্ত আবশ্যক। যখন একথা বুঝিতে পারিলেন যে, হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) পরে, হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) খলিফার যোগ্য পুরুষ, তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া তাঁহার হস্তে বয়েত করিলেন। বয়েত হওয়ার পরেই তিনি হজরত সিদ্দিক আক্‌বরের (রাজিঃ) সর্ব্বাপেক্ষা ভক্ত ও সাহায্যকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন মহামান্য খলিফার সর্ব্ব প্রধান ফরমাবরদার (আজ্ঞাবহ) হইয়াছিলেন। হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ) খেলাফত কালে হজরত আলীর (রাজিঃ) পরামর্শ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া গৃহীত হইত। বড় বড় রাজনৈতিক ব্যাপারে ইঁহার মতামত সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলিয়া খলিফা মনে করিতেন। মহামান্য দ্বিতীয় খলিফা হজরত আলীর (রাজিঃ) কন্যারত্নকে বিবাহ করিয়া, পরস্পরের সম্বন্ধ আরও দৃঢ়ীভূত করিয়া ছিলেন। নবী-পরিবারের প্রতি মহামান্য খলিফার অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আন্‌হুর খেলাফতের প্রথমাংশে হজরত আলীর (রাজিঃ) পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইয়াছিল; তিনিও খেলাফৎ এবং নিখিল মোসলমান সমাজের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন এবং মোসলমানদিগকে আদর্শ জাতিতে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইস্‌লাম বিস্তার এবং মোস্‌লেম রাজ্য বিস্তার, সুবিচারের প্রতিষ্ঠা,

মোসলমানদিগকে আদর্শ জাতিতে পরিণত করা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই সৎযুক্তি ও সৎপরামর্শ দান করিতেন। হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) কার্য্যে কোনও ভ্রম-ত্রুটী দেখিলেও তিনি অক্ষুণ্ণ-চিত্তে অম্লান-বদনে, স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে তাহা বলিয়া ও বুঝাইয়া দিতেন; কোনও কথাই গোপন রাখিতেন না। যখন হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আন্‌হুর খেলাফতের শেষভাগে তাঁহার বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাঁহার কোনও কোনও কার্য্যে জন-সাধারণের মধ্যে বহু লোক তাঁহার বিরুদ্ধ-বাদী হইয়া বিপ্লব ও বিদ্রোহ উপস্থিত করিল, তখন তিনি সকল বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা ও পর্য্যালোচনা করিয়া, হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আনহুর ভুল-ত্রুটী দেখাইয়া দিলেন; সেই সকল ভুল-ত্রুটী সংশোধন জন্য অনুরোধ করিলেন। পক্ষান্তরে জন-সাধারণের ন্যায্য দাবী সম্বন্ধেও তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। একজন নিরপেক্ষ মীমাংসাকারীর পক্ষে যাহা করা কর্ত্তব্য, তিনি সেই কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি মহামান্য খলিফা ও জন সাধারণের মনোবাদ মিটাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি দুই পক্ষের ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধেই স্বাধীন-ভাবে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন মদীনা শরীফে বিদ্রোহী ও বিপ্লবকারীদিগের জোর বেশী হইয়া দাঁড়াইল, এবং অবস্থা অতি গুরুতর হইয়া পড়িল; অপ্রীতিকর ও ভয়ঙ্কর কোনও ঘটনা ঘটিবার আলামত (পূর্ব্ব লক্ষণ) প্রকাশ পাইল, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে রাজনৈতিক কূট কৌশল ও চালবাজী দ্বারা

নিজের অনুকূলে অনেকটা সাফল্য করিতে পারিতেন, কিন্তু—তিনি আদৌ সেরূপ কিছু করেন নাই। তিনি ন্যায় পথে দাঁড়াইয়া ঘটনার স্রোত অনুকূল পথে প্রবাহিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; মোসলমানদিগের একতা ও ভ্রাতৃভাবের বন্ধন ছিন্ন হয়, তিনি সেরূপ কার্য্যের অনুকূলে মুহূর্তের জন্যও দাঁড়ান নাই বা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কোনও অনুধাবন করেন নাই। ইস্‌লামের উন্নত গৌরব, সম্মান ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি অটল্ পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু সময়টা বড়ই মারাত্মক ও প্রতিকূল ছিল। হজরত আলী (রাজিঃ) সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া, হজরত রছুলে আকরমের (সালঃ) সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, খোদাতালার প্রকৃত ভক্ত একজন সাদাসিদে নিঃস্বার্থপর মোসলমানের ন্যায় কেবল শান্তি স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পরম ধার্ম্মিক হজরত রসুলের (সালঃ) পদানুসরণকারী, ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমান-গণ এই সকল ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া আল্লাহর মহা দরবারে শান্তি কামনা করিতেছিলেন; তাঁহারা পার্থিব ঐশ্বর্য্য-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আন্‌হুর শাহাদতের পরে যখন মোসলমানগণ তাঁহার হাতে বায়েত করিতে চাহিয়াছিলেন, আর তিনিও আপ-নাকে ঐ মহা সম্মানিত পদের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্র বলিয়া মনে করিতেছিলেন—খেলাফতের উপর যে তাঁহার দাবী অগ্রগণ্য, সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনওরূপ সংশয় ছিল না; তখন

তিনি স্বীয় ন্যায় সঙ্গত অধিকার ও দাবী কার্য্যে পরিণত করিতে কোন রূপ বিপদ-আপদের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইতে কিছুমাত্র পশ্চাৎ পদ ছিলেন না। হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ)কে যখন খলিফা নির্ব্বাচন করা হয়, তখন ইঁহাকে (হজরত আলী [রাজিঃ]কে সকলে খলিফা নির্ব্বাচন করিবেন বলিয়া ইনি আশা করিয়াছিলেন। ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা যতদূর বুঝা যায় তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, হজরত ওমর ফারুকের পরে হজরত আলী (রাজিঃ) খলিফা নির্ব্বাচিত হইলে, যে সকল হৃদয়-বিদারক ঘটনা পরবর্ত্তী কালে ঘটিয়াছিল, তাহা ঘটিত না। সমস্ত মুসলেম জগতের ভক্তি-শ্রদ্ধা, সহানুভূতি একমাত্র ইঁনিই লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। আমাদের সাধারণ জ্ঞান সে তত্ত্বোদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ। হজরতের চারি এয়ার যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ছিলেন, ইঁহাদের খলিফা হওয়া যে আল্লাহতালার অভিপ্রেত ছিল, পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহ দ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়। মনে করুন, হজরত আলী (রাজিঃ) যদি প্রথম খলিফা হইতেন, তবে অপর তিন মহা-পুরুষের ভাগ্যে খেলাফৎ ঘটিত না। কারণ তাঁহাদের মৃত্যু খেলাফতের পর্য্যায়ক্রমেই হইয়াছে। ৩০ বৎসর কাল প্রকৃত খেলাফৎ বিদ্যমান থাকিবে, হজরতের এ ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইত না। কৌশলময় আল্লাহতালার সুকৌশলে চারি এয়ারের—প্রধান চারি আছহাবের সকলেই খলিফার পদ অলঙ্কৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেহই সে গৌরব হইতে বঞ্চিত হন

নাই; হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ) পরে যদি হজরত আলী (রাজিঃ) খলিফা হইতেন, তবে হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) আর খলিফা হইতে পারিতেন না। সুতরাং খেলাফৎ যে পর্য্যায়ক্রমে হইয়াছিল, তাহাই ঠিক; কিন্তু হজরত ওস্‌মানের খেলাফৎ কালের শেষভাগ হইতে মোসলমানদিগের মধ্যে অশান্তি-পাত আরম্ভ হয়। নবদীক্ষিত মোসলমান কিংবা সাহাবায় কারাম-গণের সন্তান-সন্ততির মধ্যে ইস্‌লামের গৌরব-ময় সর্ব্বাধিক গুণ শক্তির অভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। লোকে দীন (পরকাল) অপেক্ষা দুনিয়া (ইহকাল) কেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। স্বার্থপরতা ও গৌরবাকাঙ্ক্ষা ইহাদের মধ্যে প্রবল আকার এবং প্রকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু ছাহাবা (রাজিঃ)গণের এই হুশিয়ারিতে যে খেলাফৎ এস্‌লামীতে রেশ্‌তাদারীর (আত্মীয়তার) কোনও সংশ্রব থাকা চাই না, এই মন্তব্যে হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহুর যোগ্যতাকে, হজরত ওস্‌মান গণির (রাজিঃ) মোকাবেলায় বিফল মনোরথ হইতে হইল; তখন তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকিয়া, হজরত ওস্‌মান গণির (রাজিঃ) হস্তে বায়েত করিলেন। এই খলিফা নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে তিনি কোন কার্য্যই করিলেন না। ফলতঃ হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর প্রত্যেক কার্য্যে জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায় এ বিষয় প্রমাণিত করিতেছে যে, তিনি যে কথা বা যে কার্য্য হক্ (ন্যায্য) ও সত্য বলিয়া জানিতেন, কোনও পলিসি বা চালবাজীর বশীভূত হইয়া উহা কিছুতেই সম্পাদন

করিতেন না। তাঁহার চেহারা তাঁহার কলবের (অন্তঃ-করণের) চিত্র, তাঁহার প্রকাশ্য অবস্থা, তাঁহার বাতেনের দর্পণ স্বরূপ ছিল। তিনি এক খানি উন্মুক্ত তরবারির মত ছিলেন। তিনি সত্যকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে কখনও ইতস্ততঃ করেন নাই। সে সম্বন্ধে কেহ তাঁহার প্রতি রাজী হইবেন কি নারাজ হইবেন, সে বিষয়ে কোন পরওয়া করিতেন না। তাঁহার স্থলে যদি অন্য কোনও ব্যক্তি হইতেন, তবে হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ডের পর অনেক বিষয় বাঁচাইয়া রাখিতেন, আর খেলাফতের বায়েতের সময় বড় বড় এহ্‌তিয়াত (হুশিয়ারী) আমলে আনিতেন; সাধারণ জনরবের মূলোচ্ছেদ করিতে, আর বনু ওম্মিয়ার শত্রুতাচরণ নিষ্ফল করিবার জন্য মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ) ও মালেক ওশ্‌তর প্রমুখ বিপ্লবকারীগণের নেতাদিগকে হজরত ওস্‌মানের (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ডের পরিবর্ত্তে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রাজনৈতিক চালবাজীতে সাফল্য লাভ করা কোনওরূপ কষ্টকর ব্যাপার ছিল না; আর এরূপ ব্যাপারে তিনি সমগ্র মোস্‌লেম জগতের সহানুভূতি লাভ করিতেন। কিন্তু তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ দ্বারা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না যে, শরিয়তের বিধানানুসারে তাঁহাদের প্রতি কেছাছের দণ্ড বিধান করা যাইতে পারে। শরিয়ত বিরুদ্ধ কাজ করা তাঁহার মত বিরুদ্ধ ছিল, এজন্য তিনি এ সম্বন্ধে আর কোনও কার্য্যই করেন নাই; তাঁহার এইরূপ মৌনাবলম্বনে যে সকল বিদ্রোহ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তদ্বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত

মোকাবেলা (বিরুদ্ধাচরণ) করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই, বা ভীত হন নাই; কিন্তু তাঁহার বিবেক্ তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে বারণ করিয়াছিল, স্বায় বিপদ নিরাকরণ বা স্বার্থ-সাধন জন্য যে কার্য্য কিছুতেই করেন নাই; তাঁহার হৃদয়ের বল এতই প্রবল ছিল।

হজরত আলী রাজি আল্লাহ আন্‌হুকে যে সকল লোকের সম্মুখীন হইতে এবং প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক এইরূপ ছিল—যাঁহারা চালবাজী, ধোকা বাজী ও কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে চাহিতেন। ঐ খাঁটি ইস্‌লামী বাতাসের গতি যাহা হজরত রসুল করিম (সালঃ)এর সময় হইতে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এর সময় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অটল ছিল; যাহাতে পার্থিব সম্পদ লাভ, স্বার্থপরতা, বংশ-মর্য্যাদা বা সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা প্রভৃতি নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল, মিসর, ইরাণ (পারস্য) প্রভৃতি দেশ বিজিত হওয়াতে এবং নানা শ্রেণীর নানা মতের লোক ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, তাঁহাদের সম্মিলনে নির্দ্দোষ ও নিখুঁৎ মোস্‌লেম সমাজে কিছু কিছু করিয়া কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ঐ সকল নবদীক্ষিত মোসলমানের মধ্যে ইস্‌লামের জ্বলন্ত-রশ্মি পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছিল না। নব দীক্ষিত মোসলমানের মধ্যে পূর্ণ ধর্ম্মগতপ্রাণ খাঁটি মোসলমানের যে সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছিল, সে কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু ঐ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত

কম ছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে দুর্ব্বল, কপট, স্বার্থপর, গৌরব-লিপ্সু লোকেরা নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিলে এক বিরাট সাধারণ দল তাহাদের অন্ধ অনুকরণ করিত। হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ) পরেই যদি হজরত আলী (রাজিঃ) খলিফা নির্ব্বাচিত হইতেন, তবে ইস্‌লামের প্রভাব জীবন্ত আদর্শ, গৌরব ও প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিত বলিয়াই আমাদের সাধারণ জ্ঞানে অনুমিত হয়। কিন্তু পরম কারুনিক খোদাতালার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য যে অন্যরূপ ছিল, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। ঐরূপ হইলে চারি খলিফার খেলাফৎ পূর্ণ হইত না। যাহা হউক, হজরত ওস্‌মান গনি রাজি আল্লাহ আন্‌হুর খেলাফত লাভের পরে তিনি ফারুকী খেলাফতের অবস্থা আনয়ন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার খেলাফৎ কালে ছাহাবা রাজি আল্লাহ আন্‌হাদিগের সংখ্যা নানা কারণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। বড় বড় জলিল কদর (শ্রেষ্ঠতম ও আদর্শ স্থানীয়) ছাহাবাগণ পরলোক গমন করিয়াছিলেন, যে অল্প সংখ্যক অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ কুফায়, কেহ বস্রায়, কেহ দেমেস্কে, কেহ মিসরে, কেহ এমনে, কেহ তায়েফে, কেহ ফলাস্তনে, কেহ কেহ অন্যান্য প্রদেশের গবর্ণরী পদে বা অন্য বড় বড় পদে অভিষিক্ত ছিলেন। মক্কা ও মদীনায় তাঁহাদের সংখ্যা অনেক কম হইয়া পড়িয়াছিল। হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আন্‌হুর খেলাফৎ কালে ছাহাবাদিগের এক বিরাট দল মদীনা তৈয়বায় বাস করিতেছিলেন। মহামান্য খলিফা মদীনার

গৌরব রক্ষার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ছিলেন। অবশ্য কার্য্যোপলক্ষে মহামান্য সাহাবাগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের স্থায়ী বাসস্থান মদীনা তৈয়বায়ই ছিল। হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আন্‌হুর খেলাফৎ কালে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। পরম সমৃদ্ধি সম্পন্ন শাম দেশে বহু সংখ্যক মদীনাবাসী স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ বনি-ওম্মিয়ার এক প্রকাণ্ড দল দামেস্কে গিয়া হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) আশ্রয়ে সুখ-সম্পদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। কুফা ও বস্রায়ও পূর্ব্ব হইতেই বহু মক্কা ও মদীনাবাসী আপনার স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এজন্য যোদ্ধৃপুরুষদিগের এক বিরাট দল সেখানে বিরাজ করিত। মিশরেও বহু মক্কা ও মদীনাবাসী আর্থিক সুবিধার জন্য—উন্নতি লাভের জন্য স্থায়ী বাসেন্দা হইয়া গিয়াছিলেন।

হজরত আলী (রাজিঃ), হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সঙ্গে যুদ্ধ করা, কুফা ও বস্রার যোদ্ধৃ পুরুষদিগকে হস্তগত রাখা, মদীনা তৈয়বা তদানীন্তন মোস্‌লেম জগতের অনেকটা দাক্ষিণাংশে অবস্থিত বলিয়া খেলাফতের রাজধানী মদীনা হইতে কুফায় স্থানান্তরিত করেন। হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) শামে খুব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজ্য শাসন করিতে ছিলেন, সুতরাং সুযোগ পাইলেই তিনি মিসর এবং পারস্য—এমন কি, এরাক প্রদেশের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন; এজন্য এক দিক্ দিয়া কুফায় রাজধানী স্থাপন করা তাঁহার রাজনৈতিক

জ্ঞানের-পরিচায়ক ছিল; কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া মদীনা-তৈয়বায় অনেকটা সমৃদ্ধি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। কারণ মদীনা-তৈয়বার উপর মোস্‌লেম-জগতের এক অসাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল; এমন কি, সমগ্র হেজাজ প্রদেশই তজ্জন্য গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করা হইত; আজও তাহার সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। হজরত আলী (রাজিঃ) হেজাজ হইতে যে সাহায্য পাইতেন, মদীনা-তৈয়বা পরিত্যাগ করাতে তিনি সেই সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মোটের উপর সকল দিক্ দিয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। তবুও সেই মহাপ্রাণ ধর্ম্ম-বীর ও যুদ্ধ-বীরের হৃদয় তেমন বিচলিত হইয়াছিল না। তিনি আল্লাহ্‌তালার করুণা ও সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বিপদ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। সেরূপ ভীষণ বিপদে অন্য লোক কোথায় ভাসিয়া যাইত, তাহার ঠিকানা নাই।

মোনাফেক (কপট) এবং বিপ্লব-পন্থী লোকেরা জনাব হজরত রেছালত মাবের (দরূদ) সময়,—মোসলমানদিগকে কয়েক বার বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা তাহাদের ঘৃণিত পাপজনক অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই বিফল মনোরথ হয়। হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) ও হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ)এর খেলাফৎ কালে ইহারা আর মস্তকোত্তোলন করিতে পারে নাই। ইঁহাদের খেলাফৎ কালে প্রকৃত ধর্ম্ম-বীরগণ—মহামান্য

সাহাবা কারাম (রাজিঃ) গণ একমাত্র ধর্ম্মের জন্য—ইস্‌লামের জন্য—খোদার নামে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত-পথাবলম্বী লোকদিগকে পবিত্র ইস্‌লামের দিকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে কোরআনের উপদেশ শুনাইয়া আল্লাহ্‌তালার একত্বতার বিষয় বুঝাইয়া, সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। "হয় ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নয় জজিয়া দিয়া স্বধর্ম্মেই আস্থাবান্ থাক, অন্যথা যুদ্ধ করিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা কর" ইহাই ইস্‌লামের অনুজ্ঞা ছিল; সত্য-সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরব, মাহাত্ম্য ও সত্যতা বুঝিয়া বহু লোকই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল; আর বহু লোক জজিয়া নামক কর দিয়া, সর্ব্ব বিষয়ে মোসলমানদিগের ন্যায় স্বাধীনতা লাভ করিয়া, নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে ইস্‌লামী শাসনের অধীনে বাস করিতে লাগিল। প্রথমোক্ত দুই খলিফার শাসনকালে মহা শান্তির সহিত কাটিয়া গেল, কপট ও বিপ্লব বাদী লোকেরা মাথা তুলিতে পারিল না। তৃতীয় খলিফা ওসমান গণি রাজি আল্লাহ আন্‌হুর শাসন কালে কপট ও স্বল্প-বিশ্বাসী, স্বেচ্ছা-চারী, স্বার্থপর লোকের দল মস্তকোত্তোলন করিয়া নানা স্থানে বিপ্লব বাধাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। তিনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন এবং অনুগত লোকদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করাতে বিপ্লববাদী লোক-দিগের পক্ষে বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। অনেক সরল চেতা, ধর্ম্ম-ভীরু লোকও তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে

লাগিলেন। কিন্তু এই শেষোক্ত দল তাঁহার প্রতি খলিফার ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সর্ব্বশেষ কার্য্য, মোহাম্মদ-বিন্-আবিবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) মিসরের গবর্ণর নিযুক্ত সম্বন্ধে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল; যদিও সে বিষয় তাঁহার নিজের কোনই দোষ ছিল না, তদীয় সেক্রেটারী (মীর-মুন্‌শী) ধূর্ত্ত চূড়ামণি ও কপট শিরোমণি মায়ওয়ান-বিন্-হাকমের ষড়যন্ত্র এবং দুর্ব্ব্যবহারে খলিফা অনেকেরই বিষ-নয়নে পতিত হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই প্রকাশ্যভাবে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সরলচেতা কতিপয় সাহাবী এবং মিসর, কুফা ও বস্রার বহুতর লোক ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের পরম শত্রু, কপট কুল-কলঙ্ক আবদুল্লা-বিন্-সাবাহ্ ও তাহার দলের লোকেরা এই ঘটনাটীকে এমন ভাবে পাকাইয়া তুলিল যে, দেখিতে দেখিতে ধূমায়মান-বহ্নি ভীষণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল; সে আগুণ নির্ব্বাণের একমাত্র উপায় ছিল, মায়ওয়ানকে বিদ্রোহী ও বিপ্লববাদিদিগের হস্তে সমর্পণ করা। মহামান্য খলিফা সেই কর্ম্ম করিলে মারওয়ানের হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়ই সম্পাদিত হইত, আর খলিফার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্ভবতঃ সংঘটিত হইত না। তিনি এক দিকে আত্মীয়তার অনুরোধে, অন্য দিকে আশ্রিতের প্রাণ রক্ষা করিতে কিছুতেই মারওয়ানকে বিপ্লববাদিদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন না। সুতরাং বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিয়া মহামান্যে খলিফার জীবন-প্রদীপ

নির্ব্বাণ করিয়া দিল। ইহা দ্বারা নিরপেক্ষ ধাম্মিক লোকের এক বিরাট দল বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধাচারী হইলেন বটে, কিন্তু মদীনা-তৈয়বায় তাঁহাদের দল খুব পুরু হইলেও, প্রচণ্ড বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিতে সাহসী হইলেন না। বনি-ওম্মিয়ার অধিকাংশ প্রধান প্রধান লোক বিপ্লববাদীদিগের ঘোর শত্রু হইয়াছিলেন; তাঁহারা খলিফা হজরত ওস্মানের (রাজিঃ) শোণিত-রঞ্জিত বস্ত্র ও তাঁহার পত্নী বিবী নায়েলার (রাঃ-আঃ) ছিন্ন অঙ্গুলী দামেস্কে লইয়া গিয়া, হজরত মোয়াভিয়ার হস্তে সমর্পণ করিলেন। এদিকে হজরত আলী (রাজিঃ) অনেকের অনুরোধে খলিফার পদ গ্রহণ করিলেন। সুতরাং সেই দিন হইতে মহীয়ান্ খলিফা হজরত আলী (রাজিঃ) নানা শ্রেণীর বিপ্লববাদী, বিদ্রোহী ও বনি-ওম্মিয়ার দল কর্ত্তৃক নানা প্রকারে বিপন্ন ও বিড়ম্বিত হইতে লাগিলেন। জমল যুদ্ধ আর একটী নূতন বিপদের কারণ হইয়াছিল। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া কোনও কার্য্যই করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার ভক্তদলের মধ্যেও নানামতের চঞ্চলমতি, আত্ম-প্রাধান্যাকাঙ্ক্ষী, স্বার্থপর লোক ছিল। অন্তঃশত্রুর দ্বারা তিনি বহিঃ-শত্রু অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। যদি হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহু কিছু-কাল মাত্রও শান্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেন, এবং এত শীঘ্র ঘাতক হস্তে তাঁহার জীবনের অবসান না হইত,

তবে তিনি সকল শত্রুকে দমন করিয়া, সকলের উপর বিজয়ী হইয়া, সমগ্র ইস্‌লাম জগত একচ্ছত্রের অধীন করিতে পারিতেন। তাঁহার শাহাদতের কিছুদিন পূর্ব্বে যে ৬০ হাজার কুফাবাসী বীরপুরুষ তাঁহার পতাকা মূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহার জন্য প্রাণদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল, আর কয়েক দিন পরেই বস্রা ও পারস্যের সুবা সমূহ হইতে ৪০।৫০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। এই বিরাট বাহিনী লইয়া তিনি শাম (সিরিয়া) দেশ আক্রমণ করিলে, হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) পরাজয় অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী ছিল। এত বিপদ আপদের মধ্যেও তাঁহার বীর হৃদয় একটু মাত্র বিচলিত হইয়াছিল না। তাঁহার অসীম সাহস, অমানুষিক বীরত্ব, অতুলনীয় ধৈর্য্য ও সাহষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি সর্ব্বশক্তিমান্ খোদাতা-লার উপর নির্ভর এবং ধর্ম্মবল ও হৃদয়ের অফুরন্ত শক্তি, ইহার সম্মুখে কোনও বাধা-প্রতিবন্ধকতাই কার্য্যকরী হইত না। শামের যুদ্ধে বিজয়ী হইলে মিসর, আরব প্রভৃতি দেশ অতি সহজেই তাঁহার পদানত হইত। খারেজীদিগের ধ্বংসসাধন ত ইতিপূর্ব্বেই হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার সাফল্য লাভের সম্মুখে কোনও বাধা-প্রতিবন্ধকতাই ছিল না। ঘোর বিপদকালেও তিনি অচল পর্ব্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। হজরত রেছালতমাবের (ছালঃ) বহুগুণ ও বহু শক্তি তাঁহার মধ্যে নিহিত ছিল। মোস্‌লেম-জগতে তখন এমন কোনও পুরুষ বিদ্যমান

ছিলেন না, যাহার সঙ্গে এই মহাশক্তিশালী ধর্ম্ম-বীর ও কর্ম্ম-বীরের তুলনা করা যাইতে পারে। একাধারে এত গুণ, এত অমানুষিক শক্তি কাহারও মধ্যে ছিল না। প্রথমোক্ত দুই খলিফার পরে তাঁহার সঙ্গে তুলনা করিবার কোনও লোকই মোসলমান জগতে দেখা যাইতেছে না। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্বরূপ ছিলেন। কোর-আন ও হাদীসের বিপরীত কোনও কাজই জীবনে কখনও করেন নাই। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার ছিলেন। এই হাদীসের সত্যতা তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন হইতে বর্ণে বর্ণে প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ হজরত রসুল করিম (সালঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি এলেমের গৃহ ও আলী (রাজিঃ) সেই গৃহের দ্বার। জগতের অধিকাংশ সুফী-দরবেশ-গওছ-কোতব-তাপস আধ্যাত্ম্য শিক্ষায় হজরত আলীর (রাজিঃ) শিষ্য-প্রশিষ্য-অনুশিষ্যের অন্তর্গত। আজও পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জয় ঘোষিত হইতেছে। এমন সৌভাগ্য কয় জনের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে? এমন শারীরিক বলে বলীয়ান্ ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিবান্ পুরুষ বড় বড় পয়গম্বর ব্যতীত অন্য কোনও শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয় না। 'মায়ুছি' বা নৈরাশ্য কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। কোনও অবস্থায়ই তিনি সাহস ও ধৈর্য্য হারান নাই। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে জীবনের অবসান পর্য্যন্ত তিনি একইভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। খাদ্য ও পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে তাঁহার

কোনও আড়ম্বর ছিল না। খেলাফতের প্রারম্ভ কাল হইতে রাজনৈতিক কৌশল, চালবাজী, সুবিধাবাদিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজে কখনও সে সকল উপায় অবলম্বন করেন নাই। তিনি সকল বিষয়েই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভর করিতেন। সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে কদাচ একপদও অগ্রসর হন নাই।

ওম্মিয়া বংশীয় লোকেরা আপনাদিগকে আরব দেশে সর্দ্দার (নেতা) ও বনি-হাশেমকে আপনাদের রকীব (শত্রু) বলিয়া মনে করিতেন। ইস্‌লাম তাহাদের এই আত্মাভিমান ও অহঙ্কার মিটাইয়া দিয়াছিল। হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ আন্‌হুর শাসনকালে তাহাদের অন্তঃকরণে পুনরায় সেই পূর্ব্ব ভাব জাগরুক হয়। রাজনৈতিক শক্তি পুনরায় আপনাদের হস্তগত করিবার জন্য তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। স্বয়ং খলিফা ওম্মিয়ার বংশধর। সর্ব্ব প্রধান রাজপ্রতিনিধি বা শাসনকর্ত্তা হজরত মোয়াভিয়া (রাজিঃ) ঐ বংশীয়, আরও বহু প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও প্রধান প্রধান লোক ঐ বংশীয় ছিলেন। প্রাইভেট মেহেনারী কুচক্রী মারওয়ান-বিন্-হকম ঐ বংশের এক কুলাঙ্গার। সুতরাং ধরিতে গেলে রাজনীতির দিক্ দিয়া তাঁহাদেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। হজরত আলী (রাজিঃ) খেলাফতের পদে অভিষিক্ত হওয়ায় তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মোনাফেক (কপট) দলের বিপ্লববাদিতা তাহাদের বিশেষ অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। বিভিন্ন বংশীয় কতিপয়

সাহাবা (রাজিঃ) ঐদলে যোগ দেওয়াতে, ঠিক যেন তাঁহাদের পক্ষে সোণায় সোহাগা হইল। হজরত ওস্‌মান রাজি আল্লাহ্ আন্‌হুর শাসনের শেষ ভাগে যে অপ্রীতিকর ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়াছিল, হেজাজ প্রদেশে যে বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শিখা বিস্তার করিতেছিল, সেই ভীষণ বিপ্লবাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে হজরত আলী রাজি আল্লাহ আন্‌হুর বহু মূল্যবান্ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। জমল যুদ্ধ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। ঐ যুদ্ধ না ঘটিলে হজরত আলীর (রাজিঃ) শক্তি সম্পূর্ণ অপ্রতিহত থাকিয়া যাইত। শামের (সফিন) যুদ্ধে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জয়ী হইতে পারিতেন। হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) ভ্রম ও আকস্মিক উত্তেজনা প্রযুক্ত তাঁহার প্রতিকূল আচরণ না করিয়া পক্ষাবলম্বন করিলে, হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) সাফল্য লাভের কোনও আশাই ছিল না। বোধ হয় সপ্তাহ কালের মধ্যেই সফিন যুদ্ধের অবসান হইত এবং হজরত আলী (রাজিঃ) সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে মোস্‌লেম জগতের একমাত্র নেতা বা খলিফা হইতে পারিতেন। তিনি অবস্থার গতি ফিরাইয়া আনিবার সমস্ত আয়োজন করিয়া আনিতে ছিলেন, এমন সময় দুর্বৃত্ত আততায়ীর ভীষণ তরবারি তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়া দিল। কিন্তু যদি হজরত ওস্‌মান (রাজিঃ) এর পরে সম্ভবপর হইত যে, হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ) খেলাফতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতেন, তবে

নিশ্চয়ই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্ব অবস্থা ফিরিয়া আসিত। কিন্তু এ সকল আমাদের মানবীয় দুর্ব্বল খেয়াল বা কল্পনার কথা। খোদাতালার যাহা ইচ্ছা, ঠিক সেইরূপই কার্য্য হইয়াছে। উহার ভাল-মন্দ বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই।

হজরত আলী করমুল্লাহু ওয়াজহু এবং হজরত মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) এবং হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) এর সহিত হজরত আলীর (রাজিঃ) সমর সজ্ঘটন প্রভৃতি ব্যাপারকে আমরা বর্ত্তমান সময়ের যুদ্ধ ও শত্রুতার সঙ্গে তুলনা করিতে যাইয়া বিষম ভ্রান্তি ও ধোকায় পড়িয়া থাকি; সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা আত্ম-প্রতারিত হই। আমরা ঐ সকল বোযর্গের আখ্‌লাক (নৈতিক অবস্থার) সঙ্গে নিজেদের আখ্‌লাকের তুলনা ও পরিমাণ করিয়া থাকি; ইহা বাস্তবিক বড়ই ভ্রান্তি-জনক। একবার খুব নিবিস্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখুন, জমল যুদ্ধের পূর্ব্বে হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) কিরূপ মহাড়ম্বরে যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন এবং কিরূপ যোগ্যতার সহিত যোদ্ধৃপুরুষ-দিগকে সজ্জিত ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাঁহাদিগকে হজরত রছুলোল্লার (ছালঃ) একটী হাদীস শুনান হইল, তখন কিরূপে তাঁহারা যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং যখন মোনাফেক (কপট) ও এব্‌নে সাবার দলের ষড়যন্ত্রে রাত্রিকালে বিনা কারণে অকস্মাৎ যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল, তখন তাঁহারা যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করিয়া কিরূপে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে

চলিয়া গেলেন এবং দুষ্ট লোকের দ্বারা শোচনীয় ভাবে শহিদ হইলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যদি তাঁহাদের অন্তঃকরণে জ্বলন্ত ধর্ম্মভাব না থাকিত, স্বার্থপরতা ও আত্ম-প্রাধান্যের দুর্ম্মদ আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করিত; তাহা হইলে তাঁহারা কখনও যুদ্ধে বিরত হইতেন না। যুদ্ধে বিরত থাকার জন্য তাঁহারা ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইলেও, সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ঐ একটী মাত্র হাদীসের বর্ণনা শ্রবণে, উহা স্মরণ পথে উদিত হওয়াতে সেই বীরেন্দ্র সিংহদ্বয় নিরীহ মেষ শাবকের ন্যায় শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত ভীত ও লজ্জিত হইলেন। আর অস্ত্র ধরিলেন না; অনুতপ্ত হৃদয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইতে যাইয়া দুর্দ্দান্ত আততায়ী কর্ত্তৃক অতীব নৃশংস ভাবে শহীদ হইলেন। এরূপ ধর্ম্ম-বীরের সঙ্গে কি আমাদের ন্যায় সর্ব্ব প্রকার রিপুর বশীভূত স্বার্থান্ধ লোকের তুলনা হইতে পারে? উপরোক্ত কারণে ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আন্‌হাও লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

যাঁহাদের অমানুষিক বীরত্ব, প্রচণ্ড তরবারির ভীষণ ক্রীড়ায় বড় বড় যুদ্ধ জয় হইয়াছিল; শত শত শত্রুর মুণ্ডপাত হইয়াছিল, যাঁহাদের সিংহ-বিক্রমে শত্রু সেনাদল ভীরু ফেরুপাল সম রণ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, আজ একটি মাত্র হদী হাদীস শ্রবণে তাঁহাদের সেই দুর্ম্মদ-রণোন্মাদনা জ্বলন্ত উৎসাহ, দুর্জ্জয় সাহস, সমস্তই বিলীন হইয়া গেল। ধর্ম্মের

নিকটে, সত্যের নিকটে, ন্যায়ের নিকটে তাঁহারা 'সরলমনাঃ' শিশুর ন্যায় মস্তকাবনত করিলেন; তাঁহারা যে ভুল পথে চলিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া নিতান্তই লজ্জা অনুভব করিলেন, অনুতপ্ত হইলেন এবং যুদ্ধের সঙ্কল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্পে জলাঞ্জলি দিলেন। আর বর্ত্তমান সময়ে আমরা কি দেখিতে পাইতেছি? দুইজন প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠতম মৌলবীর মধ্যে যদি কোনও একটী মসলা লইয়া মতভেদ ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিতি হয়, তবে বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেই তর্ক বিতর্কের স্রোত চলিতে থাকে। একজন অন্য জনের অবমাননা, দুর্ণাম রটনা ও লাঞ্ছনা করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। তখন আলোচ্য মসলার বিষয় ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে গালি বর্ষণ আরম্ভ করেন। সত্য-নির্দ্ধারণের যে উদ্দেশ্য, তাহা কোথায় উড়িয়া যায়, সে বিষয়ের খোঁজ বা সন্ধান পাওয়াই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। হয় ত পরে পরস্পরের মধ্যে প্রথমে বাক্ যুদ্ধ, পরে মসী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। উভয় দলেই বিস্তর লোক জুটিয়া যায়, দুই প্রতিপক্ষ দলে ভীষণ বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা আত্ম-প্রকাশ করে। স্থান বিশেষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা আদালতে মামেলা-মোকদ্দমা পর্য্যন্ত গড়াইয়া থাকে। অনেক স্থলে সামাজিক শাসন ও হুকা তামাক, দাওত-নিমন্ত্রণের খাওয়া এবং বিবাহের আদান প্রদান পর্য্যন্ত উভয় দলের মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষেত্রে মৌলবী সাহেবগণ ইস্লামী যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী আরবের অন্ধকার

ধুগের অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কর্ত্তব্যপথ-ভ্রষ্ট হইয়া যান। উভয় মৌলবীর ফতওয়ার মধ্যে একজনের মত ভ্রান্ত ও একজনের মত ঠিক হইবেই, যিনি ভ্রান্ত-মতের পরিপোষক, তিনি যদি পরে বুঝিতে পারেন যে, আমার ফতোয়া ভ্রান্তি-মূলক, অপর মৌলবী সাহেবের ফতোয়া সহি (অভ্রান্ত), তবু প্রথমোক্ত মৌলবী সাহেব জেদের বশবর্ত্তী হইয়া, আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য গোপন করিয়া অযথা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিবেন। ধর্ম্ম, ন্যায় ও সত্যের মুণ্ডপাত করিবেন। সহি ফাতোয়ার সত্যতা স্বীকার করিয়া নিজের মস্তক হেঁট করিবেন না।

পাঠক অবগত আছেন যে, হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত আমীর মোয়াভিয়ার (রাজিঃ) মধ্যে কেমন ভীষণ শত্রুতা ছিল। এ অবস্থায় ও সফিন যুদ্ধ এবং মধ্যস্থগণের মীমাংসা-বাণী ঘোষণার পরে, হজরত আমীর মোয়াভিয়া (রাজিঃ) হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর খেদমতে এক এস্তেফ্তা পাঠাইয়া উহার ফতোয়া চাহিয়া পাঠাইলেন। ফতোয়াটী এই যে, "খোন্‌ছা মোশাক্কাল" (স্বাভাবিক নপুংসক বা হিজড়া— কৃত্রিম নয়) এর মিরাস (জায়দাদের অংশ প্রাপ্তি) সম্বন্ধে শরিয়তের কি আদেশ ?" তিনি উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন যে, উহার পেশাবগাহ্ (প্রস্রাব করিবার যন্ত্র বা স্থান) এর ছুরত (আকার বা অবস্থা) দ্বারা মিরাসের হোকম (আদেশ) জারী হইবে। যদি তাহার প্রস্রাব-দ্বার পুরুষের মতন হয়, তবে

তাহাকে পুরুষ বলিয়া গণ্য করা হইবে, আর যদি উহা স্ত্রীলোকের মতন হয়, তবে স্ত্রীলোকের আদেশ জারী হইবে।" অর্থাৎ প্রস্রাব নির্গম স্থান পরীক্ষায় পুরুষের মতন দৃষ্ট হইলে তাহাকে পুরুষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; আর উহা স্ত্রীলোকের ন্যায় হইলে স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং তদনুসারে মিরাস বা জায়দাদের (সম্পত্তির) অংশ নির্ণয় করিতে হইবে। জঙ্গে-জমল (জনল যুদ্ধ) এর পরে যখন হজরত আলী (রাজিঃ) বস্রা শহরে প্রবেশ করিলেন, তখন কয়েস্-বিন্-এবাদাঃ তাঁহার খেদমতে আরজ করিলেন, "হে আমিরুল-মুমেনিন! লোকে বলিয়া থাকে, হজরত রেছালত মাব রছুলে আকরম (ছালঃ) আপনাকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন যে, আমার পরে তোমাকে খলিফা মনোনীত করা হইবে, একথা কি সত্য?" উত্তরে হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহু ফরমাইলেন, একথা সত্য নহে। আমি হজরতের উক্তি সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিতে পারি না। যদি হজরত রেছালত পানাহ্ (ছালঃ) আমাকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিতেন, তবে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), ও হজরত ওসমানগণি (রাজিঃ)কে আমি কেন খলিফা হইতে দিতাম, খলিফা বলিফা স্বীকার করিতাম এবং কেনই বা তাঁহাদের হস্তে বায়েত করিতাম?" বর্ত্তমান সময়ের মৌলবী ও সুফীদিগের নিকট এরূপ সত্যবাদিতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও জীবন্ত ধর্ম্মভাবের আশা

করা যাইতে পারে কি? পাঠক, নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলেই এ বিষয় আপনারা হৃদয়ঙ্গম্ করিতে পারিবেন। পবিত্র কোরআন মজিদের সম্বন্ধেও—যাহার প্রারম্ভেই—এই আয়েত আছে— "যালেকাল্ কেতাবো লারায়বা ফিহে।" খোদাতালা স্বয়ং ফরমাইতেছেন, "ইউদেল্লো বিহি কাছিরাও অইয়াহ দিহি বিহি কাছিরা।" হজরত আদম আলায় হেস্ সালামের সময় হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত হক্ ও বাতেল (সত্য ও অসত্য) এই দুই বিষয়ের 'মার্কাঃ আরায়ী' (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) ও যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও চলিবে। রহমানী ও শয়তানী (খোদা ভক্ত ও শয়তানের ভক্ত) এই দুই দল লোক পৃথিবীতে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে, আর ভবিষ্যতেও থাকিবে। সত্য-পরায়ণ ও ভ্রান্ত মতানুবর্ত্তীর দল হইতে পৃথিবী কখনও খালি থাকিবে না। সৎ এবং অসৎ এই উভয় দলের লোকই সর্ব্বদা পৃথিবীতে বিরাজ করিবে। আর ইহাই হক্ ও নাহক্কের (সত্য ও অসত্যের) প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যে কারণে ধার্ম্মিক ও সৎ ব্যক্তির জন্য উহার নেকীর (ধার্ম্মিকতা ও সততা) প্রতিদান প্রাপ্তি ঘটে এবং মুমেনের (খোদা-বিশ্বাসী ও খোদার আদেশ পালক লোকের) ইমানের কদরদানীর (গুণ-গ্রাহিতা) প্রত্যাশা খোদার জনাবে করা যায়। স্থূলকথা, কোরআন মজিদের বিদ্যমানতা অনেকের জন্য হেদায়েত (সদুপদেশ), আর অধিকাংশের জন্য গোমরাহী হইয়া গিয়াছে। এইরূপ হজরত আলী করমুল্লাহে [illegible] জহুর বিদ্যমানতা কাহারও জন্য হেদাএত

(আদর্শ উপদেশ) এবং কাহারও জন্য গোমরাহী বা পথ-ভ্রষ্টতা হওয়া আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয় নহে। স্থূল কথা, সকল বিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ এবং নিরাপদ। এক দল লোক হজরত আলী রাজি আল্লাহু আনহুর অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ভক্ত সাজিয়া ন্যায়পথ উল্লঙ্ঘন করিয়াছে এবং হজরত রেছালত মাবের (ছালঃ) সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, প্রকৃত খোদা-ভক্ত আদর্শ মহা পুরুষদিগের (পূর্ব্ববর্ত্তী মহামান্য খলিফা ত্রয়ের বিরুদ্ধে এমন সকল কল্পিত ও অযথা) দোষারোপ করিতেছে ও গালি বর্ষণ করিতেছে যে, যাহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলী দিতে হয়। উপরোক্ত দল শিয়া বা রাফেজী। আবার এক দল ইহার ঠিক বিপরীত—যাহারা হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর প্রতি এরূপ মিথ্যা দোষারোপ ও গালি বর্ষণ করে যে, তাহাদিগকে খাঁটি মোসলমান নামে অভিহিত করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। ইহারা খারেজী সম্প্রদায়। বর্ত্তমান সময়ে পারস্য দেশ শিয়াদিগের প্রধান লীলা-নিকেতন ; তদ্ব্যতীত আরব দেশের ইমন, তুরস্কের অল্প খানিক স্থানে, ইরাকে, আফগানিস্তানে ও ভারতবর্ষে কিয়ৎ পরিমাণ শিয়া, আর আরবের মস্কা ও পূর্ব্ব আফ্রিকার জাঞ্জিবার (জাঙ্গেবার) রাজ্য খারেজীদিগের বাসস্থান। প্রথমোক্ত (শিয়া সম্প্রদায়) সমগ্র জগতের মোসলমানের মধ্যে আধ আনা পরিমাণ এবং শেষোক্ত সম্প্রদায় এক পাই পরিমাণ হইবে। অন্যান্য গোমরাহ (ভ্রান্ত) সম্প্রদায়ের সংখ্যা মোটের উপর এক আনার বেশী হইবে না। আর বাকী পনর আনা

মোসলমান সোন্নত মতাবলম্বী—মধ্য পথাবলম্বী। ইহারা হানাফি, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী সম্প্রদায় ভুক্ত। এই সুন্নি মোসলমান-গণ হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুকে তাঁহার পদ-মর্য্যাদার উপযুক্ত পরিমাণ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন; খেলাফতের হিসাবে ৪র্থ স্থানীয় বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার গুণ, শক্তি ও ধার্ম্মিকতার যথা যথা রূপ প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহাকে হজরত ও হজরত সিদ্দিক আকবরের (রাজিঃ) পরম আধ্যাত্ম জগতের সর্ব্ব-প্রধান ব্যক্তি বলিয়া মান্য করেন। সুতরাং হজরত আলী (রাজিঃ) সম্বন্ধে এই সোন্নত জামায়াতের লোকের বিশ্বাসই নির্ভুল।

হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুর ধার্ম্মিকতা, ধর্ম্ম-পরায়ণতা, খোদাতাআলার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা, হজরত রছুলে আকরম মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলায়হে ও সাল্লামের পদানুসরণ কারিতা, ন্যায়-পরায়ণতা, সত্য-বাদিতা, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ঐকান্তিকতা, আধ্যাত্ম বিষয়ের (তত্ত্বজ্ঞানের) ও বিদ্যার গভীরতা, সদ্বিচার, বীরত্ব, ক্ষমাগুণ, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যাবতীয় সৎগুণ ও মহা্ শক্তি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে, এজন্য আমরা সংক্ষেপে তাঁহার অতুলনীয় গুণাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া, এই স্থলেই তাঁহার পবিত্র জীবন চরিতের উপসংহার করিলাম।

আমিন! ছুম্মা আমিন!!

হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুর জীবন চরিত সমাপ্তঃ।